হাওড়া জেলার ইতিহাস

হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

।। ভাস্বতী ।।
১০৩সি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা- ৭০০ ০০৯

Howrah Zellar Itihas—Hemendra Bandyopadhyay
First Edition : 1st January, 1999

প্রকাশক :
কে. ব্যানার্জী
ভাস্বতী
১০৩সি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ :
অমরেশ ঢালি

মুদ্রক :
পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য
৯/৭বি/২, প্যারীমোহন সুর লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

ভূমিকা

১৯৮২ সালে 'শালিখার ইতিবৃত্ত' নামে একটি আঞ্চলিক ইতিহাস লিখি। এই এই বইটি হাওড়া জেলার একটি বিশিষ্ট অঞ্চলের বিস্মৃতপ্রায় দিনের কথা। বইটি প্রকাশিত হলে অনেকেই যেমন সাধুবাদ জানিয়েছেন তেমনি আবার কঠোর ভাষায় তাচ্ছিল্যপূর্ণ মন্তব্যও করেছেন—কারণ তাঁদের সম্বন্ধে নাকি বিশেষ কিছু বলা হয়নি। বইটি নিঃশেষিত হয়ে গেলে কেউ কেউ দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশ করতে অনুরোধ করেন। সেই অনুরোধে সাড়া না দিয়ে জেলার অতীত ইতিহাস নিয়ে অনুসন্ধানে ব্রতী হই অত্যন্ত ধীর গতিতে। কারণ সাংসারিক দায়দায়িত্ব অধিক পরিমাণে বহন করতে হয় বলে। ইতিমধ্যে আমার স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র অনুপম মুখার্জীর ঐকান্তিক ইচ্ছায় ও উৎসাহে হাওড়া জেলার ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে একটি সমিতি গঠনে উদ্যোগী হই—যার প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল শালকিয়া বিষ্ণুপদ পাঠগৃহে···। সেদিন শালিখা ও বালি গ্রামের মাত্র বারজন জন উৎসাহী ইতিহাস প্রেমিক মানুষ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তারপর শিবপুর শিক্ষালয়, বালি সাধারণ গ্রন্হাগার, ডাঃ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতেও সভা হয়। এইভাবে আরও কয়েকটি সভা বিভিন্ন স্থানে হলেও সর্বশেষে শ্রদ্ধেয় অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে নিয়মিত বৈঠক হয়। সকলের আগ্রহ ও পরামর্শ মত 'হাওড়া জেলা ইতিহাস প্রণয়ন সমিতি' নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। সেই সভায় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন ডঃ নিমাই সাধন বসু, শংকরী প্রসাদ বসু, ডাঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ চন্দন রায়চৌধুরী, ডাঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ দত্ত, হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। ইতিমধ্যে ১৯৯০ সালে আগস্ট মাসে কলকাতার তিনশো বছর পূর্তি উৎসব পালনের কার্যসূচী সরকার কর্তৃক ঘোষিত হয়। হাওড়া শহর আরও প্রাচীন হওয়া সত্ত্বেও সরকারী ঔদাসীন্য হাওড়া জেলা ইতিহাস প্রণয়ন সমিতিকে ব্যথিত করে। তাই সমিতির উদ্যোগে ১৯৮৯-এর ১৯শে আগস্ট হাওড়া টাউন হলে 'পাঁচশ বছরের হাওড়া' নামে একটি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে। উদ্বোধক ছিলেন হাওড়া কর্পোরেশনের মেয়র স্বদেশ চক্রবর্তী। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন প্রাক্তন বিচারপতি এস. এ. মাসুদ, ডঃ ননীগোপাল চৌধুরী, প্রাঃ উপাচার্য ডঃ অরবিন্দ বসু, প্রাঃ উপাচার্য মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী ও তারাপদ সাঁতরা প্রমুখ। সেদিন বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই অনুষ্ঠানের খবর যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে ছাপা হয়েছিল। হাওড়ার উন্নতির জন্য অর্থ বরাদ্দের দাবিপত্রও সভায় গৃহীত হয়। কয়েকদিন পরেই ঐ দাবিপত্র নিয়ে কয়েকজন সমিতির সদস্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ

করেন—যার খবর ইতিহাস প্রণয়ন সমিতির সম্পাদককে সংবাদপত্র পাঠ করে জানতে হয়। সংবাদে একথাও প্রকাশিত হয় যে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সদস্যদের পাঁচশ বছরের প্রমাণসহ তথ্যাদি সংগ্রহে পরামর্শ দেন। তারপর থেকে অবশ্য আমি ঐ কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ আর রাখিনি। নিজের চেষ্টায়ই '৫০০ বছরের হাওড়া' নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করি ('৯২)। ইতিহাস প্রণয়ন সমিতিও কয়েক বছর পরে অসিতবাবুর সম্পাদনায় 'হাওড়া শহরের ইতিবৃত্ত' দু'খণ্ডে প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, এতাবৎ জেলার ইতিহাস নিয়ে যেসব বই প্রকাশিত হয়েছে সবই প্রধানত শহর কেন্দ্রিক। গ্রামের ইতিহাস খুবই অবহেলিত হয়েছে। তাই বিগত কয়েক বছর গ্রামে অনুসন্ধান চালিয়ে এই ইতিহাসটি রচিত হল। এতে যথাসাধ্যভাবে শহর ও গ্রামের বিস্তৃত ইতিহাস সন্নিবিষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে। তবে এব্যাপারে আমাকে যাঁরা বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করেছেন তাঁদের বিশেষ কয়েকজনের নাম উল্লেখ না করলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ত্রুটি থেকে যাবে। প্রথমেই আমি বালি সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই তাঁদের পাঠাগারটিকে ব্যবহার করতে দিয়েছেন বলে—বিশেষ করে গ্রন্থাগারিক নির্মল মণ্ডল, নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন গ্রন্থের সন্ধান দিয়ে আমাকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন একদা সহকর্মী শিক্ষক প্রমথনাথ সেনগুপ্ত, বিনয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী ও সুশান্ত ঘোষ। তারাপদ সাঁতরার পরামর্শ আমাকে ভীষণভাবে সহায়তা করেছে। এছাড়া অরুণকুমার হাজরা, সম্পদ ধাড়া, দুঃখহরণ ঠাকুর চক্রবর্তী, কবি নিমাই মান্না, ডাঃ সুমন সরকার ও সত্যব্রত হালদার বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন। ডঃ নিমাই সাধন বসু আমাকে বিষয় নির্বাচনে পরামর্শ দিয়ে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। পরিশেষে এই বই প্রকাশে প্রকাশক ও সহকর্মী শিক্ষক কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যে অমানুষিক পরিশ্রম করে বইটি প্রকাশ করেছেন তা বলে শেষ করা যাবে না। হাওড়া কোর্টের যশস্বী দুই ব্যবহারজীবী সুব্রত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সনাতন মুখোপাধ্যায়ের সহায়তা না উল্লেখ করলে কর্তব্যের ত্রুটি থেকে যাবে। আশা করি হাওড়াবাসীর কাছে বইটি আদৃত হবে। তবে একথা ঠিক ইতিহাস প্রতি নিয়ত সৃষ্টি হচ্ছে। হয়তো কিছু বাদও পড়ে গেছে। এর জন্য মার্জনা চাইছি। যা বাদ রইল তা অনুসন্ধানের ভার রইল উত্তরসূরীদের উপর। ইতি—

হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দু-চার কথা

ও'ম্যালি ও মনোমোহন চক্রবর্তীর **Bengal District Gazetteers : Howrah** হাওড়া জেলার প্রথম পরিচয়পত্র। এর পরে অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত **Bengal District Gazetteers : Howrah** প্রকাশিক হল।

কিন্তু বাংলা ভাষায় হাওড়া জেলার আনুপূর্বিক ইতিহাসের অভাব ছিল। ভাগীরথীর পূর্ব পাড়ে কলকাতা আর পশ্চিম পাড়ে হাওড়া। কলকাতা ৩০০ বছর নিয়ে খুবই সোরগোল অথচ হাওড়া যে ৫০০ বছর পুরনো সে নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। লেখক হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০০ বছরের পুরনো তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে হাওড়া জেলার ইতিহাস রচনা করে ফেললেন। হাওড়াবাসী হিসেবে বিশেষ করে একজন প্রকাশক হিসেবে "৫০০ বছরের হাওড়া" বইটি প্রকাশ করা হল। এখন মনে হচ্ছে উক্ত বইটিতেও হাওড়া জেলার সব পরিচয় দেওয়া যায় নি।

লেখক হাওড়া জেলার বিশেষ করে উলুবেড়িয়া সদরের প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাই 'হাওড়া জেলার ইতিহাস' প্রকাশনায় প্রয়াসী হই। আশা করি এই বইটি হাওড়া জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস—এর আগে কেউ তা প্রকাশ করেননি।

তবে ইতিহাসের অনুসন্ধান ত ক্রমশই চলতে থাকে। এর পরেও যদি কোন নূতন তথ্য সংগৃহীত হয় তাহলে পরবর্তী সংস্করণে তা যোগ করা হবে। তাই পাঠককুলকে অনুরোধ করি নূতন তথ্য দিয়ে জেলার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করতে।

এই পুস্তক রচনায় যাঁরা তথ্য দিয়ে, ছবি দিয়ে লেখককে সাহায্য করেছেন তাঁদের সকলকে প্রকাশক হিসাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। দ্রুত মুদ্রণের জন্য যদি কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকে থাকে তার জন্য দুঃখিত। সবশেষে আবেদন জানাই পাঠককে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত জানাবার জন্য। নমস্কার—

প্রকাশক

কোন্ পাতায় কি আছে

ভৌগোলিক অবস্থান ১
নামকরণ ৭
প্রাচীনত্ব ১১
যানবাহন ১৯
স্বায়ত্ত-শাসন ৩৫
হাওড়াবাসী ও সংবাদপত্র ৫৩
লৌকিক দেবদেবী ও মেলা ৭২
জেলার পাঠাগার ও বইমেলার ইতিহাস ৯৬
কবিগান, যাত্রা, থিয়েটার ১১৮
সিনেমা—নির্বাক ও সবাক ১৪০
সঙ্গীত-বাদ্য-নৃত্য ১৫৩
ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন ১৬২
তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ ১৮১
কৃষক আন্দোলন ১৮৫
বিপ্লবী আন্দোলন ১৯৫
শ্রমিক আন্দোলন ২২৩
শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্ ২৪১
দেশবিদেশের ক্রীড়াঙ্গনে ২৬০
বঙ্গশিল্পের সূতিকাগৃহ ২৮৬
ছাত্র আন্দোলনের রূপরেখা ৩০৭
সাহিত্যের আড্ডায় ৩২২
কীর্তি যাঁদের-দেশ-বিদেশে ৩৩১
সারস্বত আঙ্গিনায় ৩৪৭
বহুজন হিতায় ৩৮১
আদালত প্রাঙ্গণে ৩৮৮
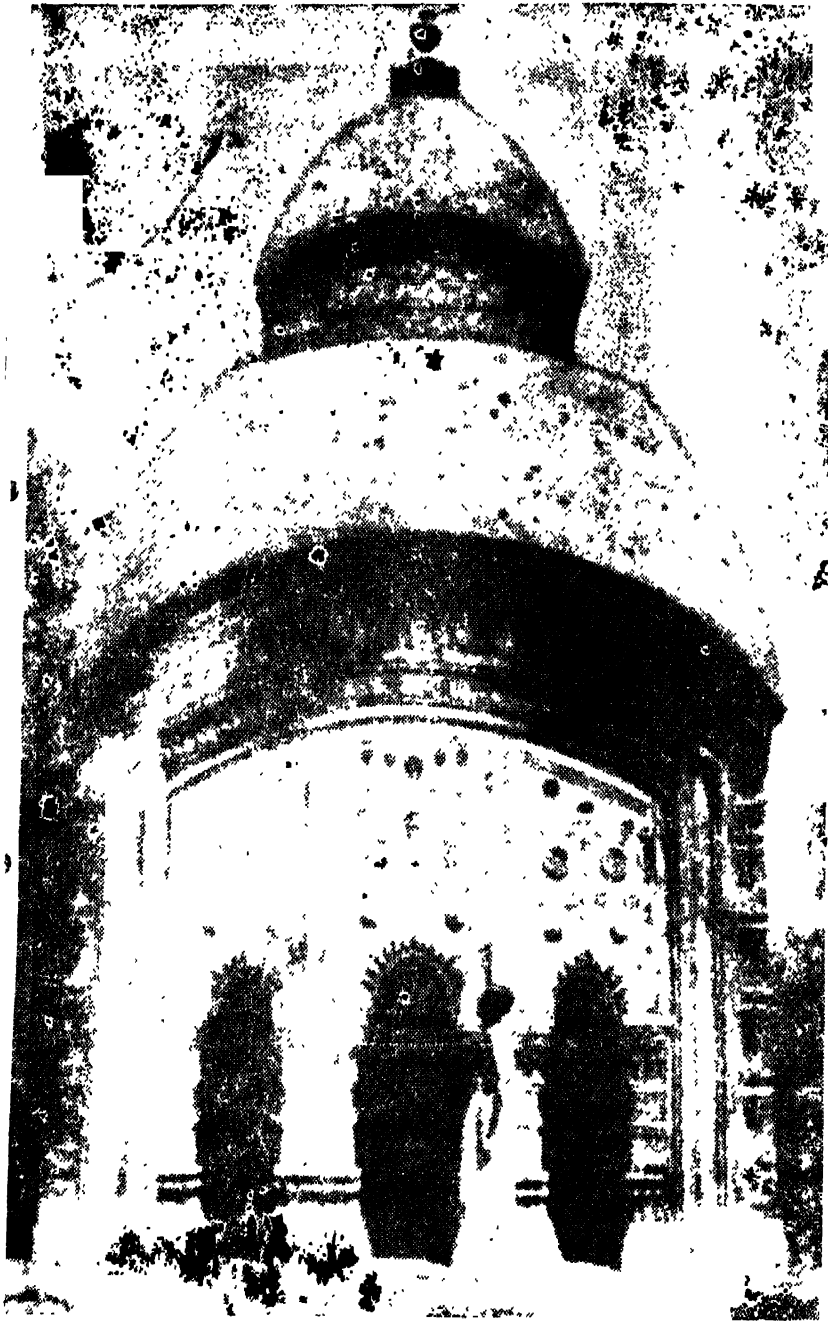
রসপুরের চণ্ডীমণ্ডপে প্রাচীন মূল্যবান পাথরের মনসামূর্তি

গড় ভবানীপুরের মাণিকনাথের শিব মন্দির

খালনায় কৃষ্ণরায় জীউর আটচালা মন্দির

শালকিয়া কয়েল বাগানের শীতলা মূর্তিতে মালা পরাচ্ছেন।
গোপাল লাল

শ্যামলীবসা-ধর্মতলায় ধর্মঠাকুরের পূজায় রত ভদ্রেশ্বর পণ্ডিত
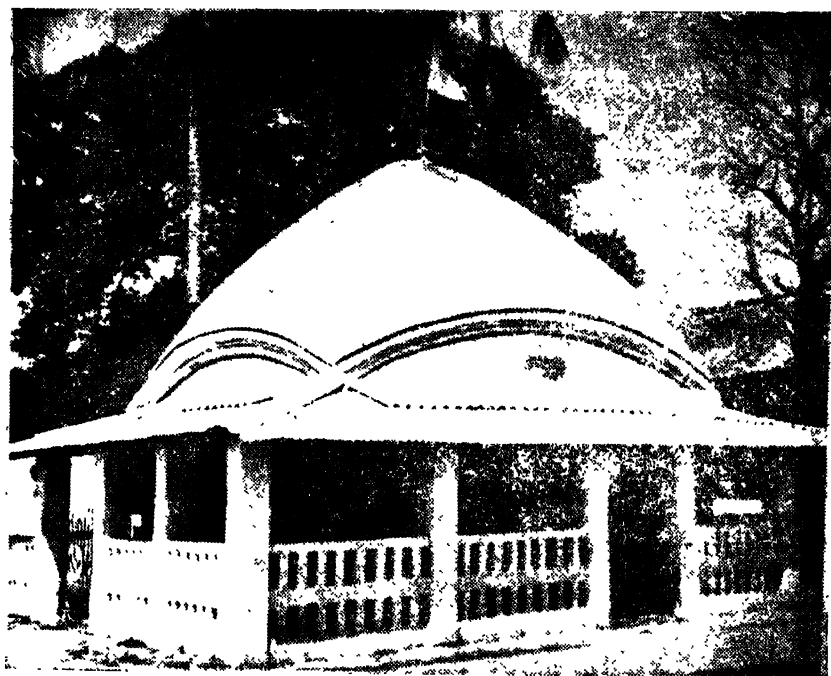
বাগনান কল্যাণপুরের 'বুড়ো সাহেব' পীরের মাজার
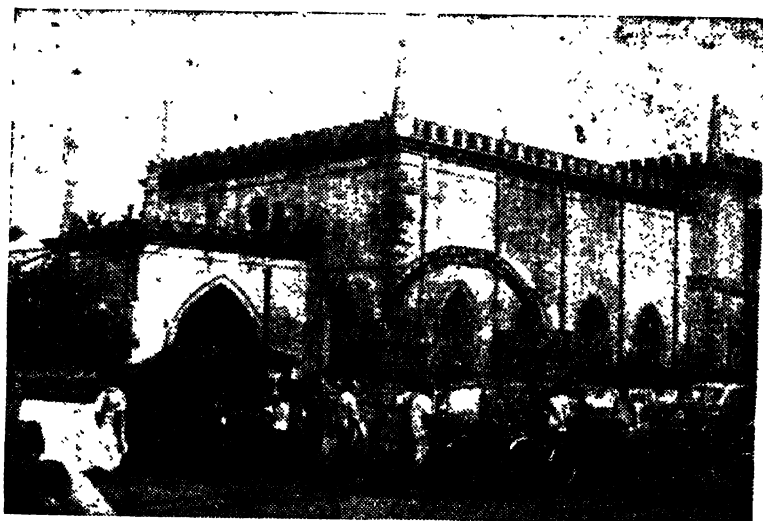
হাওড়া জেলায় প্রথম ব্যাপটিস্ট চার্চ (১৮২১) ফটো—অনঙ্গ অধিকারী

ভোট বাগানের মহাকালের ভগ্নপ্রায় মন্দির। ফটো—ডাঃ শীতাংশু মিত্র

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির, বেলুড় মঠ। ফটো—ডাঃ শীতাংশু মিত্র

বোটানিক্যাল গার্ডেনের বিখ্যাত প্রাচীন বটবৃক্ষ

লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া হাউসে'-এর ডোমে শিল্পী সুধাংশু চৌধুরীর আঁকা
চন্দ্রগুপ্ত প্রাতে নারী প্রহরিণীদের অভিবাদন গ্রহণ করছেন

সুনীলচন্দ্র সরকার
৩৩. বেলিয়াঘাটা লেন,
সালকিয়া, হাওড়া।

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

"শৈশব সঙ্গীত" গ্রন্থে "নির্ঝরিণী" কবিতার বিশেষ উপলক্ষ্যে বিশেষ অর্থ ছিল। তার থেকে বিশ্লিষ্ট করে নেওয়াতে তার একটা সাধারণ অর্থ খুঁজে বের করা দরকার হয়। আমার মনে হয় সেটা এই যে, আমাদের বাইরে বিশ্বপ্রকৃতির একটি চিরন্তনী ধারা আছে, সে আপন সূর্য চন্দ্র আলো আঁধার নিয়ে সর্বদেশের সর্বকালের। ব্যক্তিগত লোকের প্রাণ দোলে তার স্রোতের ছন্দে। জীবনে কোনো বিপুল প্রেমের আনন্দে এমন একটা পরম মুহূর্ত আসতে পারে, যখন আমার চৈতন্যের নিবিড়তা আপনাকে অসীমের সঙ্গে উপলব্ধি করে, তখন বিশ্বের নিত্য উৎসবের সাথে মানব চিত্তের উৎসব মিলিত হয়ে যায়, তখন বিশ্বের বাণী তারই বাণী হয়ে ওঠে। ইতি ৫ বৈশাখ ১৩৪০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'নির্ঝরিণী' কবিতা নিয়ে সুনীল সরকারকে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠির পাণ্ডুলিপি ছেপে দেওয়া হল—সৌজন্যে: বিশ্বভারতী
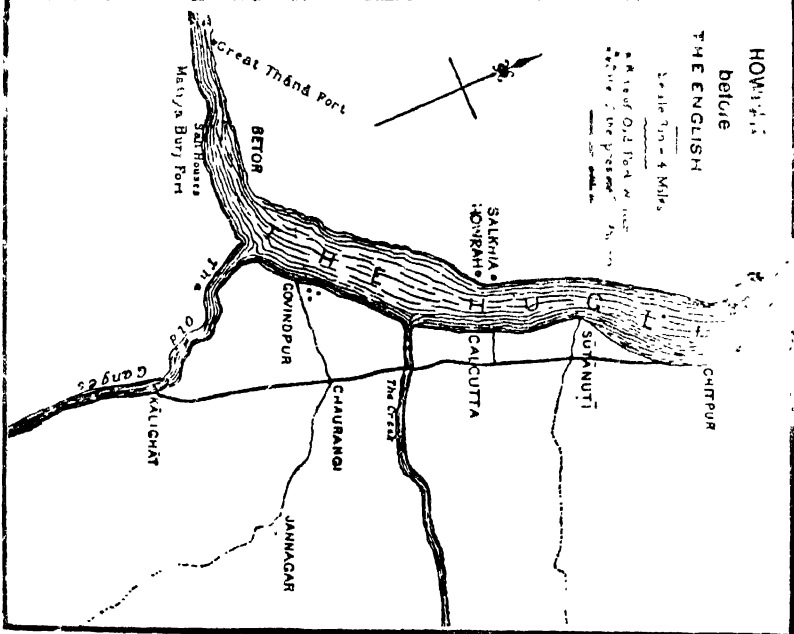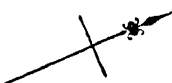
ষোড়শ শতাব্দীতে ডি. ব্যারোজের মানচিত্র
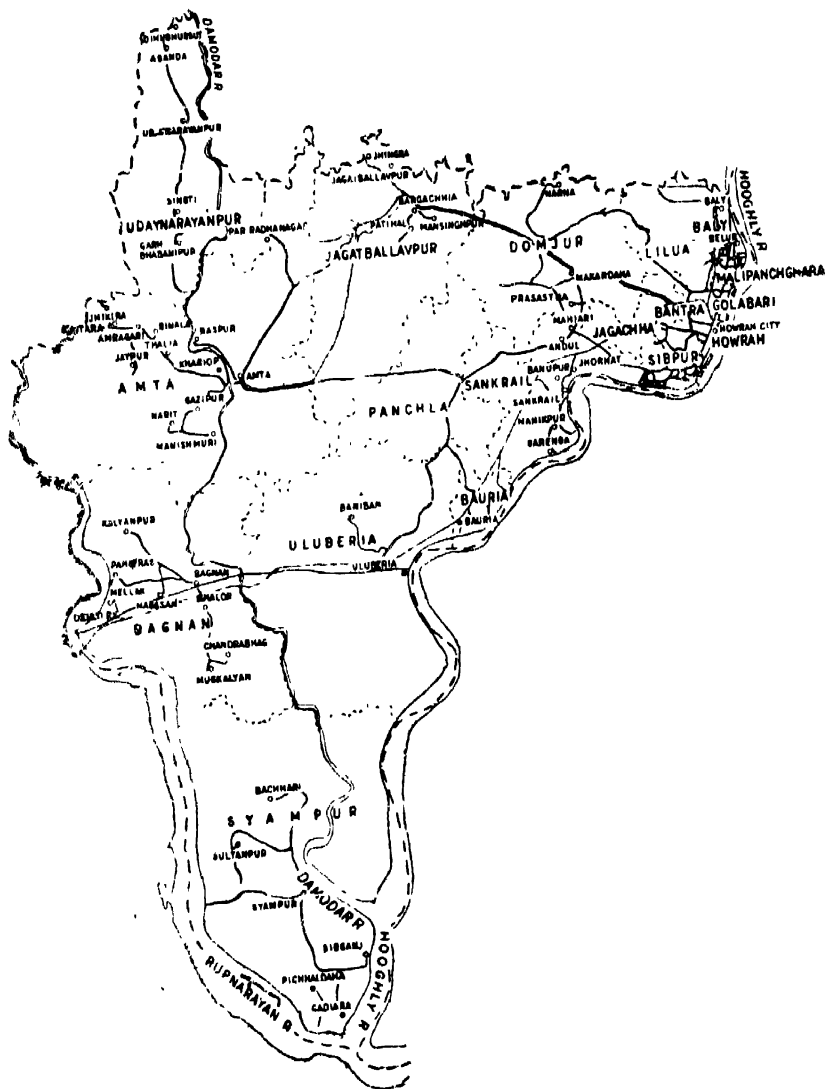
হাওড়া জেলার মানচিত্র

ভৌগোলিক অবস্থান

পশ্চিম বাংলার মধ্যে এটি হচ্ছে ক্ষুদ্রতম জেলা। এই জেলাটির আকৃতি একটি বিষম ত্রিভুজের মত। পূর্ব ও পশ্চিমের সীমারেখা দুটি নদী ও উপনদী দ্বারা বেষ্টিত। যেমন পূর্বে ভাগীরথী এবং পশ্চিমে তারই উপনদী রূপনারায়ণ। পূর্ব ও পশ্চিম-এর প্রস্থ হচ্ছে ২৮ (আঠাশ) মাইল এবং উত্তরে ও দক্ষিণে দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৪০ (চল্লিশ) মাইল। জেলাটি উত্তরে ২২° ১৩′ হতে ২২° ৪৭′ অক্ষাংশ এবং ৮৭° ৫১′ হতে ৮৮° ২২′ পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। জেলার মোট আয়তন ৫১০ বর্গমাইল।[১]

হাওড়া জেলার চতুঃসীমা বলতে উত্তরে হুগলী জেলার আরামবাগ ও শ্রীরামপুর মহকুমা, পূর্বে কলকাতাসহ উত্তর চব্বিশ পরগনার ব্যারাকপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আলিপুর ও ডায়মণ্ড-হারবার মহকুমা, দক্ষিণে মেদিনীপুরের তমলুক মহকুমা ও পশ্চিমে মেদিনীপুরের তমলুক ও ঘাটাল মহকুমা এবং হুগলীর আরামবাগের কিয়দংশ। এই জেলায় দুটি মহকুমা রয়েছে, যথা—হাওড়া সদর ও উলুবেড়িয়া মহকুমা। ১৯৬৩-এ হাওড়া জেলাকে বর্ধমান বিভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রেসিডেন্সী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[২]

হাওড়া জেলার পূর্বে ও পশ্চিমে ভাগীরথী ও রূপনারায়ণ প্রবাহিত হলেও এই জেলার ভেতর দিয়ে আর এক প্রধান নদী বয়ে গেছে যার নাম দামোদর। দামোদর নদের প্রভাব এই জেলার মানুষের জীবনযাত্রার উপর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই জেলাটি গড়ে উঠেছে নদীর পলি গঠিত সমভূমি হিসেবে। এই তিন প্রধান নদী ছাড়াও রয়েছে সরস্বতী (মৃতপ্রায়), কানা দামোদর বা কৌশিকী প্রভৃতি নদী। জেলার ভূমিভাগের ঢাল বিচিত্র—ঠিক যেন একটি বাটির মত। এই অবস্থা পরিলক্ষিত হয় হুগলী নদী ও উহার শাখা সরস্বতী নদীর মধ্যস্থ অবনত অঞ্চল (হাওড়া জলা), মধ্যাংশে রয়েছে সরস্বতী ও কানা দামোদরের মধ্যস্থ অবনত অঞ্চল (রাজপুর জলা) ও পশ্চিমাংশে আছে দামোদর ও রূপনারায়ণের মধ্যবর্তী অবনত অঞ্চল (আমতা জলা)। এই জেলার আর একটি প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অসংখ্য খাল, বিল, ঝিল ইত্যাদির অবস্থান। বর্ষার জলে এগুলি পূর্ণ হয়ে থাকে। ফলে এই সময় গ্রামগুলি খুবই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অতীতে যাতায়াতের একমাত্র উপায় ছিল নৌকা, ডোঙ্গা ও শালতি। মাঝে মাঝে বাঁধের উপর দিয়ে যাতায়াতকে নিরাপদ করা হত। জেলার বিভিন্ন অংশে খালের আধিক্য এক অংশ থেকে অপর অংশকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে—যেমন হুগলীকে বিভক্ত করেছে বালি খাল। এছাড়া জেলার মধ্যেই রয়েছে রাজগঞ্জের খাল, সিসবেড়িয়া খাল, সাঁকরাইল খাল, মাদারিয়া খাল ও চম্পা খাল প্রভৃতি। উল্লেখ্য এই যে, এই সব কটি খালই গঙ্গার জোয়ার ভাঁটার সঙ্গে

তাল রেখে চলে। জোয়ারের সময় বড় নৌকো দিয়ে গ্রামের মধ্যে পণ্যসামগ্রী চলাচল করান হয়। এছাড়া দামোদরের সঙ্গে যোগ রয়েছে বারটি খালের—যার মধ্যে মাদারিয়া, বাঁশপাতি ও গাইঘাটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর রূপনারায়ণের সঙ্গে এসে মিশেছে ছটি খাল। যার মধ্যে বাকসীর খাল খুবই প্রসিদ্ধ।

হাওড়া জেলার পূব পাশের গঙ্গানদীই ভাগীরথী নামে হিন্দুদের কাছে সমধিক পরিচিত। মুর্শিদাবাদের দক্ষিণাংশ থেকে গঙ্গা কেন ভাগীরথী নামে পরিচিত সেই পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনা করে অযথা পৃষ্ঠাসংখ্যা বাড়াতে ইচ্ছে নেই। তবে রাজা ভগীরথ মর্ত্যে যে গঙ্গা আনয়ন করে সগর বংশের ষাট হাজার তৃষ্ণার্ত সন্তানদের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন সেই পুণ্যসলিলা ভাগীরথী আজও ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের ধর্মাবেগের সঙ্গে মিশে আছে। সাঁকরাইল অংশের গঙ্গাকে হিন্দুরা গঙ্গা বলে আজও মনে করেন না। তাই ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা যে-কোন পুণ্যতিথিতে আজও স্নান করতে আসে হাওড়া ঘাট প্রভৃতি স্থানে। ও' ম্যালি এবং এম. চক্রবর্তী তাই লিখেছেন—**The portion below Sankrail is not considered sacred, however, perhaps because it was little used by boats in early times.**[৩]

প্রকৃতপক্ষে সাঁকরাইল নদী অঞ্চলটি তখন পর্তুগীজ জলদস্যু ও বোম্বেটেদের অধ্যুষিত হওয়ায় পণ্যবাহী নৌকোগুলি বেতড়ের অপর পার কালীঘাটের আদি গঙ্গার পথ ধরে সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছত। এই কালীগঙ্গাকেই পবিত্র 'আদিগঙ্গা' নামে আখ্যা দেওয়া হয়। ভাগীরথী-তীর যে কেবল হিন্দুদের কাছেই পবিত্র স্থান তাই নয়—বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরাও ভাগীরথী তীরকে সমান পবিত্র বলে মনে করতেন। তাই তিব্বতের রাজা তোসী লামা বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছে ঘুষুড়ীর ভাগীরথী তীরে একখণ্ড জমি ভিক্ষা করেছিলেন যাতে তিব্বতীরা ভাগীরথী তীরে বসে ঈশ্বর-চিন্তা করতে পারেন।[৪] সেই স্থানটি আজও 'ভোটবাগান মঠ' নামে ইতিহাসে খ্যাত হয়ে আছে।

কালীঘাটের আদি গঙ্গা মজে গেলে গঙ্গার গতিবেগ পশ্চিম দিকে পরিবর্তিত হয়। বোটানিকেল গার্ডেনের পাশ দিয়ে সাঁকরাইল হয়ে উলুবেড়িয়া দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় দামোদর একদিক থেকে এবং রূপনারায়ণ অপরদিক থেকে এসে একসঙ্গে মিলিত হয় গাদিয়ারা নামক স্থানে। এই সঙ্গম স্থলটিতেই লর্ড ক্লাইভ একটি দুর্গ তৈরী করেছিলেন যা ফোর্ট মর্নিংটন পয়েণ্ট নামে খ্যাত। আজও ভাঁটার সময় ঐ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এই স্থানটিই আবার জেমস এণ্ড মেরী চড়া (**James and Mary Sands**) নামেও বিখ্যাত। ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে জেমস এণ্ড মেরী নামে একটি জাহাজ হুগলী নদীর মুখে ঢোকবার সময় তাম্বুলী পয়েণ্টে (**Tambolee Point**) এক চড়ায় আটকে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে জাহাজটি উল্টে গিয়ে ভেঙ্গে পড়ে। ফলে চার পাঁচজন নাবিকের প্রাণনাশও হয়। বেঙ্গল লেটার টু কোর্ট, ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এক নোটে বলা হয়েছে—

Tambolee Point is shown in the Pilot Chart 1703 at the present site of Fort Mornington Point.[৫]

এই চড়াটি অনুরূপ নামে নামাঙ্কিত হয়েছে এই কারণে যে ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জেমস ও তাঁর রানী মেরী অব মোদেনার নামে ঐ জাহাজটির নাম ছিল।

হাওড়া জেলার নদীগুলির বিভিন্ন অংশে বেশ কিছু চড় দেখতে পাওয়া যাবে, যেমন ঘুষুড়ির চড়, রামকৃষ্ণপুরের চড়, শিবপুরের চড় (ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কাছে), সারেঙ্গা চড় ও উলুবেড়িয়ার চড়। এর মধ্যে আবার রামকৃষ্ণপুরের চড়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ, এই চড়টি থেকে পোর্ট কমিশনারের প্রচুর আয় হয়। নদীর ধারে বাকি চড়গুলি ইঁটখোলার জন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়।

সরস্বতী নদী এককালে সপ্তগ্রামে যাবার একমাত্র জলপথ ছিল। এই সরস্বতী নদী বেতোড়ের পাশ দিয়ে সাঁকরাইল হয়ে গঙ্গায় মিলিত হয়। তাই সরস্বতীর নিম্নাংশকে সাঁকরাইল খালও বলে। সরস্বতী ডোমজুড় থানার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ভেতর দিয়ে প্রাচীন কালে প্রবাহিত হত। পরে নদী মজে যাওয়ার ফলে জায়গায় জায়গায় বৃহৎ জলাশয়ের সৃষ্টি করে। যাকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয়, 'দহ'—যেমন মাকড়দহ, ঝাপড়দহ, ভাণ্ডারদহ ইত্যাদি।

জেলার প্রধান নদী দামোদর ছোট নাগপুরের মালভূমি থেকে বয়ে এসে হাওড়া জেলায় প্রথম প্রবেশ করে আকনা নামক গ্রামের কাছে। তারপর আমতার দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গাইঘাটা খালের সঙ্গে মিলিত হয়। আমতার পর দক্ষিণে বাগনান অভিমুখে প্রবাহিত হয়ে হুগলী পয়েণ্ট-এ এসে রূপনারায়ণের সঙ্গে মিলিত হয়। জেলায় ঢোকা থেকে হুগলী নদীতে পড়া পর্যন্ত দামোদরের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৪৫ মাইল।

এই দামোদরের আবার দুটি শাখা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথা কানা দামোদর বা কৌশিকী এবং পশ্চিম দামোদর শাখা। কানা দামোদর ইছানগর গ্রামের কাছে জেলায় প্রবেশ করে পরে দক্ষিণ দিকে রাজাপুর ঝিলে এসে মিলিত হয়। পরে আরও দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হয়ে উলুবেড়িয়ার পাশ দিয়ে ফলতা পয়েণ্টের বিপরীতে হুগলী নদীতে এসে পড়ে। এই কানা দামোদরের তীরেই একদা অনেক বর্ধিষ্ণু গ্রামের পত্তন হয়েছিল। ও'ম্যালি এবং এম. চক্রবর্তীর মতে—**A small stream now, it must have been more important in old days, as several large villages inhabited by the Bhadralok, or respectable Hindu Castes, lie along its course.**

অপর উল্লেখযোগ্য প্রধান নদী রূপনারায়ণ হাওড়া জেলায় প্রথম প্রবেশ করে ভাটোরা গ্রামের কাছে। তারপর দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হয়ে বাক্সীখালের সঙ্গে মিলিত হয়। তারও পরে দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হয়ে তমলুক অভিমুখে যাওয়ার পথে হুগলী পয়েণ্টের বিপরীত দিকে হুগলী নদীতে পড়ে। দামোদর ও রূপনারায়ণ এই দুই নদীর সংযোগ স্থাপন গাইঘাটা ও বাক্সী খালের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। সাড়ে

সাত মাইল লম্বা এই খালটি ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের হাত থেকে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট গ্রহণ করেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে জেলার প্রধান নদীগুলির গতিপথ কালের আবর্তনে একাধিকবার পরিবর্তিত হয়েছে। তবে দামোদরের গতিপথের পরিবর্তনই বড় বিচিত্র।

অতীতে এই নদী ত্রিবেণীর কাছে নয়াসরি (Nayasari) নামক স্থানে এসে হুগলী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। ক্রমে উহা মজে যায়। রেনেলের (Rennell's) ১৭৭৯—৮১ সালের মানচিত্রে ঐ স্থানটিকে 'ওল্ড দামোদর' বা পুরানো দামোদর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৬] এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে বর্তমান নদীর প্রধান জলধারাই ছিল এটি। কিন্তু পরে উহার গতি পরিবর্তনের ফলে সরস্বতীর ধারা ক্ষীণ হয়ে পড়ে এবং সপ্তগ্রাম বন্দরের মৃত্যু ঘটে। এই পরিবর্তন বোধ হয় ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের মধ্যেই ঘটেছিল। কারণ আইন-ই-আকবরীতে হুগলীকে সপ্তগ্রামের চাইতে বড় বন্দর বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৭] যদিও গাষ্টাল্ডি (Gastaldi) (১৫৬১ খ্রীঃ) এবং ডি, ব্যারোজের (De Barros) (১৫৫৩-১৬১৩) মানচিত্রে তার উল্লেখ নেই। তাঁরা কেবল সপ্তগ্রামের কথাই উল্লেখ করে গেছেন।[৮]

এই জেলাটি সম্পূর্ণই পলিমাটি গঠিত নিম্নভূমি। ১৮৩৫-৪০ সালে কলকাতায় মাটি খননকার্যের ফলে জানা যায় যে এই পলির গভীরতা অনেক। ৪৮১ ফুট গভীর পর্যন্ত খনন করেও কোন পাথর বা সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ পাওয়া যায়নি।[৯] ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩০ ফুট গভীরে জলসিক্ত এবং আংশিক অঙ্গারীভূত জলাভূমির উদ্ভিজ্জ পদার্থ দ্বারা গঠিত স্তর পাওয়া যায়। প্রাচীন স্থলভূমির অবস্থিতি এর থেকে প্রমাণিত হয়। এই স্তরেরর উপরিভাগে দুই ধরনের উদ্ভিদের অবস্থিতি পরীক্ষায় পাওয়া গেছে। এক ধরনের উদ্ভিদ চেনা গেছে—তা হল সুন্দরী। এই উদ্ভিদ গঙ্গার শেষভাগের জলাভূমিতে প্রচুর দেখা যায়। অপর উদ্ভিদ হচ্ছে ব্রাইডেলিয়া উদ্ভিদের অনুরূপ কোন লতানে উদ্ভিদের মূল। আরও গভীরের মাটিতে স্থলজ স্তন্যপায়ীর এবং জলজ সরীসৃপের হাড় পাওয়া গেছে। কলকাতার পলিমাটি সম্বন্ধে আলোচনার অর্থ হল এই যে তৎসন্নিহিত অঞ্চল হাওড়াতেও একই ধরনের ভূমিস্তর হবে।

পূর্বেই বলা হয়েছে হাওড়া জেলার সমভূমি প্রধানত নদী পলল দ্বারা গঠিত। সুতরাং এই জেলা নানা প্রকার ফসল উৎপাদনের পক্ষেও উপযোগী। এই সব চিন্তা করেই হয়তো কর্নেল রবার্ট কীড সাহেব শিবপুরে বোটানিকেল গার্ডেনের স্থান নির্বাচন করেছিলেন। যা পরবর্তীকালে ভারত তথা এশিয়ার কৃষি ও উদ্ভিদ গবেষণার শ্রেষ্ঠ উদ্যান হিসেবে খ্যাতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

জেলার প্রধান ফসলের মধ্যে রয়েছে ধান, পাট, নারকেল, আলু ও পান। পান একটি প্রধান অর্থকরী ফসল। আজও ভারতের বিভিন্নস্থানে বিখ্যাত বাঁটুল পান এখান থেকেই উহা চালান যায়। কৃষিতে হাওড়া পরনির্ভরশীল। আর যতই দিন যাচ্ছে ততই পরনির্ভরশীলতা আরও বাড়ছে। কারণ শিল্পের প্রয়োজনেই জেলার চাষের জমি শিল্প-স্থাপনের কাজে নিয়োজিত হচ্ছে।

হাওড়ার জলবায়ুকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মূলত চারটি ঋতুতে ভাগ করতে পারি, যেমন গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত ও বসন্ত। এর মধ্যে গ্রীষ্মের প্রভাবই বেশী অনুভূত হয়। নভেম্বর থেকে মে পর্যন্ত আবহাওয়া শুষ্কই থাকে। এই সময়েই পর্যায়ক্রমে শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুকে অনুভব করা যায়। তেমনি জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত টানা সময়টাকে অতিবর্ষা (জুন—আগস্ট) ও সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসকে প্রত্যাবর্তিত মৌসুমী নামে আখ্যা দেওয়া হয়। শীতের আধিক্য জেলায় খুব অনুভূত না হলেও জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি বেশ কয়েকদিন তাপমান যন্ত্রের পারদ দশ এগারো ডিগ্রী সেলসিয়াসে নেমে আসে। বসন্ত ও শরৎ ক্ষণস্থায়ী হলেও উপভোগ করার মত। জেলার শহরাঞ্চলে কাল বৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডব বড় একটা দেখা না গেলেও গ্রামাঞ্চলে এর প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় (বিশেষ করে নদী তীরবর্তী দক্ষিণাঞ্চলে)। দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে জেলার সর্বত্রই বৃষ্টিপাত হয়। জুন থেকে আগস্ট মৌসুমী বায়ু ঠিকমত বইলে প্রচুর বৃষ্টিজনিত রাস্তাঘাট জলমগ্ন হয়ে পড়ে—ফলে অস্বাস্থ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। আবার কোথাও অতি বর্ষণে বন্যার প্রকোপও দেখা দেয় ফলে গ্রামীন মানুষের অশেষ দুর্গতি ভোগ করতে হয়।

স্বাধীনোত্তর কালে দামোদরকে 'দুঃখের নদী' আক্ষরিক অর্থে না বলতে পারা গেলেও ১৯৭৮ সালের পশ্চিম বাংলায় সর্বগ্রাসী বন্যার স্মৃতি আজও জেলাবাসী ভুলতে পারেনি। আজ থেকে ষাট-সত্তর বছর আগে জেলার তিনটি জায়গায় সারা বছরে বৃষ্টিপাত মাপার যে ব্যবস্থা ছিল তাতে বছরে গড় বৃষ্টিপাতের হিসাব কিরূপ ছিল তা পাঠকদের জ্ঞাতার্থে তুলে দেওয়া হল।[১০] সরকারী পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে ১৯০০—১৯০১ সালে সর্বাধিক বার্ষিক বৃষ্টিপাত হয়েছিল ৭৮'৬ ইঞ্চি এবং ১৮৯৫—৯৬ সালে সবচেয়ে কম বার্ষিক বৃষ্টিপাত হয়েছিল ৩৫'৭ ইঞ্চি।

মাপার স্থান	বছর	নভেঃ—ফেব্রু	মার্চ—মে	জুন-আগস্ট	বার্ষিক গড়
হাওড়া	৩২—৩৩	২'২৩	৮'২১	৪৯'০৩	৫৯'৪৭
মহিষরেখা	২৫—২৬	২'৩১	৮'০৯	৪৭'৭৫	৫৮'১৫
উলুবেড়িয়া	৯—১০	১'২১	৭'৪৯	৪৪'৫৪	৫৩'২৪

যেহেতু হাওড়ার শহরাঞ্চলে কলকারখানা ও গ্রামাঞ্চলে চাষের কাজে অধিকাংশ জমি নিয়োজিত হয়েছে সেহেতু জেলায় কোন বনাঞ্চল সৃষ্টির অবকাশ হয়নি। ফলে তেমন কোন হিংস্র জন্তুর আবাসস্থলও গড়ে ওঠেনি। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ও'ম্যালি এবং এম. চক্রবর্তী হাওড়ার গেজেটিয়ারে লিখেছেন যে—তিন চার বছর আগে বালটিকরীতে একজন স্থানীয় শিকারী একটি চিতা শিকার করেছিল। আর একটি চিতাকে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হোগলা বনে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। এছাড়া কোন হিংস্র জন্তুর কথা তারা জানতে পারেননি। জগৎবল্লভপুর ও উলুবেড়িয়া অঞ্চলে বন্য শুয়র কিছু ছিল বলেও তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেছেন।

তবে হুগলী ও দামোদর নদীতে প্রায়ই কুমীরের দেখা পাওয়া যেত বলে তাঁরা মত প্রকাশ করেন। এসব সত্ত্বেও উলুবেড়িয়া অঞ্চলে হোগলা বনে 'বাঘ রোল' যে অনেক দেখা যেত তা প্রবীণরা আজও গল্প বলে থাকেন।

নদীনালা অধ্যুষিত হাওড়া জেলা সুস্বাদু মাছের জন্য তখন বেশ খ্যাতি লাভ করেছিল, যেমন—হুগলী নদীর ইলিশ, ভেটকী, ট্যাঙ্গরার স্বাদে মৎস্যপ্রিয় বাঙ্গালীর কার না জিভের লালা গড়ায়! আর তপ্‌সে মাছের ঋতুতে তপসে ভাজা ও ঝোল কোন বাঙ্গালীর না আদরণীয় আহার্য বস্তু! ওয়ালটার হ্যামিলটন সাহেব পর্যন্ত ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তপ্‌সে সম্বন্ধে লিখেছেন—**The Hooghly from Uluberia to Diamond Harbour is in fact, noted for the delicious fish last named, as the best and highest flavoured fish not only in Bengal, but in the whole world.**

সেই তপ্‌সে মাছের স্বাদ আজ আমরা কদাচিৎ পেলেও কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পানিত্রাসের সামতাবেড়ে থাকা পর্যন্ত খুবই ছিল। তাই শরৎচন্দের স্নেহধন্যা রাধারানী দেবী লিখেছেন—রূপনারায়ণের তাজা তপ্‌সে মাছ পাঠাতেন (শরৎদা) লিলুয়ায়। কলকাতাতেও বরাবর পাঠিয়েছেন।[১১]

এছাড়া রুই, মৃগেল, কাতলা প্রভৃতি মাছের চাষ আজও প্রচুর পরিমাণে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে হয়ে থাকে। বাগনান ও আমতাতে মাছের অনেক আড়তও আছে। বর্ষাকালে উলুবেড়িয়া, কোলাঘাট ও বাগনানে গেলে মৎস্যপ্রিয় বঙ্গবাসী একবার ইলিশের খোঁজ করতে এখনও ভোলেন না।

১, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ Bengal Gazetters (Howrah) 1909—O' Malley & M. Chakravorty.

২, W. B. District Gazetters (Howrah)—Amiya K. Banerjee.

১১, শরৎচন্দ্র—মানুষ ও শিল্প—রাধারানী দেবী।

নামকরণ

সাধারণভাবে জানা আছে যে প্রত্যেকটি স্থানের নামকরণের পেছনে একটি সঙ্গত কারণ বর্তমান। কখনো সেটি আমাদের কাছে বোধগম্য হয়ে ওঠে, কখনো আবার কষ্ট কল্পিতও বলে মনে হয়। পণ্ডিতদের মতে বাংলা দেশের অধিকাংশ স্থানের নামই বৃক্ষলতাদি নামের অনুসরণে। ভাষাবিদ ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাংলা স্থান নাম' গ্রন্থে বলেছেন—বৈদিক সাহিত্য থেকে জানতে পারি যে, কোন কোন বৃক্ষ মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত শ্রীবৃদ্ধির অনুকূল বলে বিবেচিত হয়। (বিস্ময়ের বিষয় এই যে বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত এই সব গাছের নাম বাংলা দেশের স্থান নামে প্রচুর মেলে)। এই প্রসঙ্গে আবার তিনি শিমুল, বট ও অশ্বত্থ গাছের প্রাধান্যই স্বীকার করেছেন।

ডঃ সেন বাংলা দেশের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে বলেছেন—পশ্চিমবঙ্গের পুরানো স্থান-নামের বারো আনা ভাগই উদ্‌ভিদ্ নাম থেকে নেওয়া।…পূর্ব ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গই তুলনায় সবচেয়ে বেশি শস্যশ্যামল অথচ যথাসম্ভব জলা-ভূমি ও বনভূমি বর্জিত।[১] বেতোড়সহ যে পাঁচটি গ্রাম ইংরেজরা গঙ্গার পশ্চিমপাড়ে সনদ লাভে সমর্থ হয়েছিল তাদের তিনটি স্থান বৃক্ষলতাদির নামানুসারে নামাঙ্কিত হয়েছে, যেমন শালকিয়া, কাসুন্দিয়া ও বেতোড়। অপর দুটির হাড়িরা (হাওড়া) প্রাকৃতিক ভূমি ভাগের (topography) প্রকারভেদ অনুসারে ও রামকৃষ্ণপুর ব্যক্তি বিশেষের নামানুসারে নিশ্চয়ই নামাঙ্কিত হয়েছে। শালকিয়াতে প্রচুর শালুক ফুল হত, কাসুন্দিয়া অঞ্চলে প্রচুর কাসুন্দে গাছ ছিল আর বেতোড়ে নদীতটে বেতের জঙ্গল ছিল। সে কারণেই তাদের অনুরূপ নাম হয়েছে।[২] হম্বড়>হাবড়া>হাওড়া হচ্ছে সে স্থান যার নদীতট জল-কাদাময়।[৩] শেষোক্ত স্থানটি অর্থাৎ রামকৃষ্ণপুর নিশ্চয়ই ব্যক্তিনাম ঘটিত।

এখন হাওড়া নামের ব্যুৎপত্তি নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজিটিয়ার্স (হাওড়া)-এর লেখক ও 'ম্যালি এবং এম. চক্রবর্তীর মতে পূর্ববঙ্গে 'হাওড়' (haor) নামে কথা চালু আছে। নিচু ও অবনত অঞ্চলে বৃষ্টি ও বর্ষার জল সঞ্চিত স্থানকেই 'হাওড়' বলা হয়। যদিও পশ্চিমবঙ্গে এ ধরনের কোন কথা চালু নেই বলে তিনি বলেছেন—'**but the word does not appear to be known in Western Bengal.**' তবে তিনি এই মতটিকেই গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের মতে—দ্রাবিড় ভাষায় 'হাওড়' মানে জলা বা নীচু জায়গা। হাওড়া সিভিক কমপ্যানিয়নের লেখক জে. বোনাজীর মতে হারিড়া থেকে হাওড়া হতে পারে। হারিড়াকে ওড়িয়া ভাষায় হাবোড় বলা হয়। হাবোড় কথার মানে জল-কাদাময় ভূমি। আর এই অঞ্চলটি

এককালে ওড়িয়া রাজাদের অধিকৃত অঞ্চল ছিল। উপরন্তু ১৯০৮ সালের জরিপ অনুসারে দেখা যায় যে হাওড়া শহর অঞ্চলে মাত্র ৮ বর্গ মাইল এলাকায় তখন খানা ডোবার সংখ্যা ছিল ১৮০০ টি। অপরদিকে অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত ১৯৭২ সালের ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজিটিয়ার্স (হাওড়া) গ্রন্থে 'হারিড়া' থেকে 'হারিয়াড়া' ও রেল স্টেশন স্থাপনের পর 'হাওড়া' হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ আবার 'হাড়ি' শব্দের সঙ্গে 'আড়া' যোগ থাকায় ব্যাখ্যা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন যে একদা এই স্থান হাড়ি সম্প্রদায়ের আশ্রয়স্থল ছিল। 'আড়া' শব্দের অর্থ বাসস্থানের জন্য উঁচু বা ডাঙ্গা জমি। 'আড়া' শব্দটিকে অষ্ট্রিক শব্দ বলেও ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

অপরপক্ষে ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সদ্য প্রকাশিত 'হাওড়া শহর কত পুরাতন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' পুস্তিকায় 'হাবড়' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে এই কথাটির জন্য ওড়িয়া কথার মানে খোঁজার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ কথাটি মূলত দেশীয়। কাদা অর্থে 'হাবড়' পূর্ব ভারতে প্রচুর প্রয়োগ আছে। এখনও যশোহরের বাঙড়ের (বৃহৎ স্বাভাবিক জলাশয়) যে ঘাটে বালি বেশি আছে তাকে বলে বেলেঘাট। যেখানে পাঁক বা কাদা বেশি তাকে বলে হাব্ড়ে (হাবড়িয়া) ঘাট। এই প্রসঙ্গে তিনি চব্বিশ পরগনার 'হাবড়া গ্রাম' ও আগড়তলার 'হাওড়া' নদীর নামও উল্লেখ করেছেন। অষ্ট্রিক 'আড়া' শব্দের সংযোগে বা হাড়িদের উঁচু বাঁধের পাড়ে (আড়া) বাসস্থান থেকে হাড়িয়ারা হয়েছে এটাও তিনি খণ্ডন করে বলেছেন যে 'হাড়িরা' কোন ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মেই হাওড়া হতে পারে না। হাড়ি + আড়া = হাড়িয়ারা—এ ব্যুৎপত্তিও কষ্ট কল্পিত। তবে ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতটি তিনি অগ্রাহ্য করতে পারেননি। সুনীতিবাবুর মতে ড়া প্রত্যয়টি অষ্ট্রিক ভাষা গোষ্ঠীর শব্দ। ঐ ভাষায় 'ওড়াক' শব্দটির অর্থ বাড়ী। 'ড়া' এসেছে 'ওড়াক' শব্দ থেকে। অতএব 'হাওড' (জলা জায়গা) + ড়া (বাড়ী) = হাওড়া (জলা জায়গায় বাড়ী)।

এতক্ষণ যে আলোচনা হল তাতে এ কথা হয়তো মেনে নিতে অসুবিধা হবে না যে 'হাবড়' অষ্ট্রিক বা নিষাদ জাতির শব্দ হউক বা 'হাবড়' ওড়িয়া শব্দই হউক— 'হাবড়' (জল-কাদাভূমি) থেকেই 'হাবড়া' ও পরে 'হাওড়া' হয়েছে। কারণ ইংরেজ আমলেও হাওড়াকে প্রথমে 'হাবড়া' বলে বিভিন্ন সরকারী এবং বে-সরকারী সংবাদ-পত্রেও নিয়মিত উল্লেখ করা হত। হাওড়া স্টেশনে প্রথম রেল চালু হবার সংবাদ সম্বন্ধে তদানীন্তন কালের বিখ্যাত পত্রিকা 'সংবাদ প্রভাকর' লিখছে—"আগামী আগস্ট মাসের (১৮৫৪ সাল) ১লা তারিখে আমাদিগের গবর্ণর জেনারেল ও অপরাপর সম্ভ্রান্ত সাহেবেরা উপস্থিত হইয়া রেইল রোড খুলিবেন। ঐ দিবস 'হাবড়ায়' ও অন্যান্য স্থানে প্রজাদিগের সামান্য সমারোহ হইবেক।" এমনকি ১৮৫৪ সালে ২৬শে অক্টোবর রেলের ম্যানেজিং ডিরেক্টার আর. ম্যাকডোনাল্ড স্টিফেনশন

স্বাক্ষরিত যে রেলের প্রথম টাইম টেবল 'সংবাদ ভাস্করে' ছাপা হয়েছিল তাতেও লেখা ছিল 'হাবড়া স্টেশন হইতে গমন।'

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে চব্বিশ পরগনাতেও (বর্তমান উত্তর চব্বিশ পরগনা) 'হাবড়া' বলে একটি গ্রাম আছে। এই দুয়ের মধ্যে তফাৎ করবার জন্যই বোধ হয় তাকে বলা হতো 'গোমো হাবড়া'। ঐতিহাসিক উইলসন সাহেব কিন্তু 'হাওড়া'কে 'হাউরা' (Houra) নামে লিখেছেন। এটা মনে হয় তখনকার দিনে ইংরেজরা নামের বানান নিজেদের মত করে লিখতেই অভ্যস্থ ছিলেন। যেমন 'রেনেল'-এর এটলাসে' প্লেট নং সাত ১৭৭৯ এবং প্লেট নং উনিশ ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে শালকিয়াকে শোলকি (Solkee অথবা Solkey) বলে ছেপেছেন। আর ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'আপজন' (Upjhon) সাহেব তাঁর মানচিত্রে রামকৃষ্ণপুর ঘাটকে রামকিষেণপুর ঘাট (Ramkissenpore Ghat) এবং শালকিয়া ঘাটকে শুলখিয়া ঘাট (Sulkhia Ghat) বা শুলকিয়া ঘাট (Sulkia Ghat) বলে চিহ্নিত করেছেন। তবে একথা সর্বসম্মতিক্রমে মেনে নেওয়া যেতে পারে যে রেল লাইন চালু হওয়ার পরেই আস্তে আস্তে 'হাবড়া' থেকে 'হাওড়া' চালু করল ঐ ইংরেজরাই। কারণ ঐ 'হারিড়া' গ্রামেতেই হাওড়া স্টেশন স্থাপিত হয়।

মোঘল সম্রাট ফারুকশিয়ার কলকাতার দিকের তেত্রিশটি গ্রামের সঙ্গে ভাগীরথীর পশ্চিম পাড়ের পাঁচটি গ্রামও ইংরেজদের দান করেছিলেন। ভাগীরথীর পূর্ব পাড়ের জমিদাররা সহজেই সম্রাটের আদেশ মেনে নিলেও পশ্চিম পাড়ের জমিদার বা ভূ-স্বামীরা তা সহজে মানতে রাজি হন নি। অবশ্য এ অনিচ্ছা প্রকাশে তাঁদের পেছন থেকে উৎসাহ দিয়েছিলেন তদানীন্তন বাংলার নবাব মুর্শীদকুলী খাঁ। হাওড়ার এ পারের জমিদারদের জাতীয়তাবোধ তীব্রতর ছিল বলেই হয়তো তাঁরা সম্রাটের ফরমানকে অগ্রাহ্য করে ইংরেজ বণিকের কাছে অনেকদিন পর্যন্ত মাথা নোয়াননি।

ফরমান দানের কয়েক বছরের মধ্যেই ভূমি রাজস্ব আদায় নীতি দুবার করে সংশোধিত হয়। মুর্শীদকুলী খাঁর আমলে ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমবার এবং তাঁরই জামাতা সুজাউদ্দিনের রাজত্বকাল ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার। এই দ্বিতীয় বারের রাজস্ব পদ্ধতি পুনর্বিন্যাসের সময় উলুবেড়িয়ার সমগ্র অংশ এবং হাওড়া সদর অঞ্চল বর্ধমান মহারাজার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত করা হল। এইভাবে হাওড়াকে ইংরেজ শাসনের তালিকাভুক্ত করা হল।

এর পরের ইতিহাস হচ্ছে ১৭৪১-৪২ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের বঙ্গদেশের পশ্চিমাংশ আক্রমণ—এমনকি তিনি থানা দুর্গ পর্যন্ত অধিকার করে রাখেন। এই আক্রমণে ভীত হয়ে বাংলার তদানীন্তন নবাব আলিবর্দী খাঁকে হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ার বিস্তীর্ণ অংশসহ বর্ধমানের অনেক অংশ ছেড়ে দিয়ে মারাঠা শক্তির সঙ্গে সমঝোতায় আসতে হয়। এই অস্থির অবস্থা চলে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।[৪]

আলীবর্দীর মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র সিরাজউদ্দোলা ১৭৫৬ সালে সিংহাসনে

বসেন। ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের প্রথম থেকেই যে বনিবনা ছিল না তা পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। সিরাজের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা থানা দুর্গ সাময়িকভাবে দখল করে রাখে। কিন্তু নূতন করে হুগলী থেকে সৈন্য পাঠালে ইংরেজরা দুর্গ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। স্মরণ করা যেতে পারে যে থানা দুর্গের এক পাশে সিরাজ একটি নবাব গৃহও নির্মাণ করেছিলেন। **An Account of Howrah Past & Present** গ্রন্থের লেখক **C. N. Banerjee** লিখেছেন—**Close to the Banian tree was seen a ruined house. This house is said to have been the Kutchery of the Nawab Sirajuddulya.**

'ক্যালকাটা ক্যাপচারের' পর সিরাজউদ্দৌল্লা কালবিলম্ব না করে মানিক চাঁদ ও দেওয়ান নন্দকুমারের হাতে কলকাতা রক্ষার ভার দিয়ে মুর্শিদাবাদ রওনা হয়ে যান। নবাবের জয়ের সংবাদ জানতে পেরে মাদ্রাজ থেকে রবার্ট ক্লাইভ ও ওয়াটসন কয়েকটি জাহাজ নিয়ে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। এই সংবাদ শুনে নন্দকুমার দুটি জাহাজে ইঁট বোঝাই করে মেটিয়াবুরুজের মুখে গঙ্গার অপরিসর স্থানে ডুবিয়ে দিয়ে ইংরেজদের রণতরীর গতিরোধ করার কৌশল করেছিলেন। কিন্তু জোয়ারের সহায়তায় এত দ্রুত গতিতে ক্লাইভ ও ওয়াটসনের জাহাজ এসে পৌঁছে গেল যে নন্দকুমারের কৌশল মনে মনেই রয়ে গেল। থানা দুর্গ ইংরেজদের সহজেই দখলে এসে গেল। তারপর সিরাজকে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজরা কিভাবে পর্যুদস্ত করে বাংলাদেশ জয় করল তা আর বঙ্গবাসীর কাছে আলোচনার অপেক্ষা রাখে না।

বাংলাদেশে ইংরেজ রাজত্বে বহুদিন পর্যন্ত হাওড়া বলে কোন পৃথক জেলা ছিল না। প্রথমে বর্তমান হাওড়া ও হুগলীকে বর্ধমান বিভাগের সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হয়েছিল। তারপর ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান থেকে হুগলী জেলাকে পৃথক করে দেওয়া হয়। কিন্তু তখনও হাওড়ার বৃহৎ অংশ হুগলীর অধীনেই ছিল। কেবল মাত্র শহর হাওড়াকে কলকাতার অংশরূপে গণ্য করা হত। তাই হাওড়ার ফৌজদারী মামলাগুলি চব্বিশ পরগনার জেলা শাসক ও প্রধান বিচারকের এজলাসে বিচারের জন্য পাঠানো হত। কিন্তু হাওড়া জেলার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় শাসক কর্তৃপক্ষ একটি আলাদা জেলা গঠনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। ফলে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়াকে হুগলী থেকে আলাদা জেলা বলে ঘোষণা করা হল। সেই নূতন জেলার প্রথম জেলা শাসক হলেন মিঃ উইলিয়াম টেলার (Mr. William Tayler)।[৫] যদিও ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হাওড়ার জেলা শাসক চব্বিশ পরগনার জজ সাহেবের অধীনস্থ ছিলেন এবং পরে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আবার হুগলীর জজ সাহেবের অধীনে যায়। তবে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে হাওড়া জেলা হিসেবে কাজ করতে পারে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে।

---

১. ২. ৩. বাংলা স্থান নাম—সুকুমার সেন।

৪. West Bengal District Gazetteers—Amiya Kumar Banerjee.

৫. Bengal District Gazetteers—Howrah—O' Malley & M. Chakravorty.

৬. Bengal District Gazeatters (Howrah) 1909—O' Malley & M. Chakravorty.

প্রাচীনত্ব

পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর দুই তীরে দুটি দর্শনীয় স্থান—একটি মহানগরী কলকাতা, অপরটি হাওড়া শহর। এই দুয়ের মধ্যে সংযোজক অব্যয় হিসেবে কাজ করছে ঝুলন্ত হাওড়া ব্রীজ। এই হাওড়া ব্রীজ আজও অগণিত দর্শকের সম্ভ্রম আদায় করে। কেউ আবার এই শহর দুটিকে বঙ্গমাতার যমজ সন্তান রূপেও আখ্যা দেন।

বাংলাদেশের ইতিহাসে রাঢ় ভূমি একটি ঐতিহাসিক অঞ্চল। এই রাঢ় আবার দু'ভাগে বিভক্ত—যথা উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়। অজয় নদের উত্তরাংশে মগধ অবধি উত্তর রাঢ় এবং অজয় নদের দক্ষিণে সমুদ্রকূল পর্যন্ত দক্ষিণ রাঢ় নামে অভিহিত। স্বাভাবিকভাবে হাওড়া, হুগলী ও বর্ধমানের দক্ষিণাংশ দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই দক্ষিণ রাঢ়ে একদা 'ভূরী শ্রেষ্ঠীক' নামে একটি অঞ্চল ছিল। আজ তার নাম হয়েছে ডিহি ভূরশুট। ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠীদের রাজত্বে ব্রাহ্মণ্য-কৌলীন্য ও জ্ঞান-গরিমা খুবই তুঙ্গে উঠেছিল। তাঁদেরই গুণকীর্তন করে 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়' নামে এক নাটকও রচনা করেছিলেন কবি কৃষ্ণ মিশ্র। 'হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি' নামক গ্রন্থের লেখক তারাপদ সাঁতরা লিখছেন—'খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের চান্দেল-রাজ কীর্তিবর্মার সভাকবি কৃষ্ণ মিশ্র তাঁর বিখ্যাত 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটকের প্রধান চরিত্রগুলি তাঁদেরই আদলে অঙ্কিত করেছিলেন।' ঐ ভূরিশ্রেষ্ঠীক-ই আজকের ডিহি ভূরশুট—যা হাওড়া জেলার উত্তর পশ্চিমাংশের শেষ সীমা। পাঠক জেনে হয়তো খুশি হবেন যে এই নাটকটি একদা হিন্দু কলেজের স্কুল বিভাগের প্রথম শ্রেণীতে (দশম শ্রেণী) পাঠ্যপুস্তকের তালিকাভুক্ত ছিল।[১]

তারও দু'শতাব্দী আগে এই ভূরিশ্রেষ্ঠীকের উল্লেখ পাওয়া যায় শ্রীধরাচার্যের 'ন্যায়কন্দলী' গ্রন্থে। তাতে বেশ ভালভাবেই লেখক নিজ পরিচিতি দানে উল্লেখ করেন—

'আসীদ্দক্ষিণরাঢ়ায়ং দ্বিজানাং ভূরিকর্মণাং।
ভূরিসৃষ্টিরিতি গ্রামো ভূরিশ্রেষ্ঠীজনাশ্রয়ঃ ॥[২]

তবে এই ভূরিশ্রেষ্ঠী অঞ্চলসহ হুগলীর মান্দারণ অঞ্চল খ্রীষ্টীয় বারো শতকে উড়িষ্যার প্রতাপশালী রাজা অনন্তবর্মন পালবংশের অন্যতম রাজা রাম পালের পুত্র কুমার পালের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে সেখানে নিজ আধিপত্য বিস্তার করেন। সেই মান্দারণই আজকের হুগলী গড়মান্দারণ নামে খ্যাত। প্রকৃতপক্ষে হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চল উড়িষ্যার রাজাদের অধীনে ছিল। তার সময়কাল হচ্ছে মুসলমান আগমনের আগে পর্যন্ত।

বাংলায় সেন রাজাদের রাজত্ব নানা কারণে ইতিহাস প্রসিদ্ধ। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম বিজয় সেন। দক্ষিণ ভারত থেকে এসে তাঁরা বাংলা দেশ বিজয় করেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে বিজয় সেন হুগলীর মান্দারণের রাজকন্যা বিলাস দেবীকে বিবাহ করেন। বৈবাহিক সম্পর্কে মান্দারণের শূর রাজাদের কর্তৃত্ব হাওড়া জেলায়ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই বংশেরই শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা লক্ষ্মণ সেন। 'বর্ধমানভুক্তি' যে সেন রাজ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূভাগ ছিল তার প্রমাণ মেলে বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত নৈহাটি গ্রামে প্রাপ্ত বল্লাল সেনের তাম্রশাসন থেকে।[৩] ভুক্তির স্তর বিন্যাস হত 'বিষয়' 'মণ্ডল' 'খটিক' 'চতুরক' এবং 'গ্রাম' পর্যায়ে। ২৪ পরগনার গোবিন্দপুর গ্রামে লক্ষ্মণ সেনের প্রদত্ত এক তাম্রশাসনে দেখা যায় যে তিনি বর্ধমান-ভুক্তির অন্তর্গত 'বেতড্ড চতুরকের' অধীন 'বিড্ডর শাসন' নামে একটি গ্রাম ব্যাসদেব শর্মা নামক এক ব্রাহ্মণকে দান করেন। ঐ গ্রামের সীমা চিহ্নিত করতে গিয়ে বলা হয়েছে—পূর্বে জাহ্নবী বা ভাগীরথী পর্যন্ত উহা বিস্তৃত ছিল। এই 'বেতড্ড চতুরক'ই বর্তমান হাওড়ার বেতোড় বা বেতাইতলা অঞ্চল বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'হাওড়া শহর কত পুরাতন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' পুস্তিকায় ইতিহাসবিদ নলিনীকান্ত ভট্টশালী লিখিত প্রবন্ধ 'লক্ষ্মণ সেনের নবাবিষ্কৃত শক্তিপুর শাসন ও প্রাচীন বঙ্গের ভৌগোলিক বিভাগ'—(সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৩৩৯) আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনের শাসনাধীন অঞ্চল উত্তরে সরস্বতী থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তারও পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার ১৩৪১ সালের সংখ্যায় কালিদাস দত্ত লিখেছেন—"গোবিন্দপুরে মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্দারা তিনি বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত বেতড্ড চতুরকের অধীন 'বিড্ডর শাসন' নামে একখানি গ্রাম ব্যাসদেব শর্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। উহাতে প্রদত্ত ভূমির নিম্নলিখিতরূপ চতুঃসীমা দেওয়া আছে—উত্তর—ধর্মনগর সীমা, পূর্ব—জাহ্নবী অর্দ্ধসীমা, দক্ষিণ—লেংঘদেব মণ্ডপী সীমা, পশ্চিম—ডালিম্ব ক্ষেত্র সীমা। এই চতুঃসীমা বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত বেতড্ড—চতুরক নামক বিভাগ পূর্বদিকে জাহ্নবী বা ভাগীরথী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উক্ত বেতড্ড—চতুরক বর্তমান হাওড়া (শিবপুর) অন্তর্গত বেতোড় নামক স্থান এবং উহারই নামানুসারে ঐ চতুরক প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।"

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে তুর্কী মুসলমান আক্রমণকারী ইখতিয়ারুদ্দিন মহম্মদ বিন বক্তিয়ারুদ্দিন খলজি হঠাৎ বাংলাদেশ আক্রমণ করলে লক্ষ্মণ সেনকে রাঢ়ভূমি ফেলে পূর্ব বাংলায় পালিয়ে যেতে হয়। এরপর ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার হিন্দুরাজা মুকুন্দদেব হরিনন্দনকে পরাজিত করে সুলতান সুলেমান করনানী সমগ্র উড়িষ্যা অধিকার করেন। তাঁরই নামানুসারে হাওড়া জেলার এক বিরাট অংশকে করনানীর রাজস্ব আদায়ের এক্তিয়ারে আনা হয়।

যার জন্য সেই বিস্তীর্ণ অংশকে সুলেমানের নামানুসারে সুলিয়ামানাবাদ বলে আখ্যা দেওয়া হয়।

সমসাময়িক সাহিত্যেও হাওড়া শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের নাম বার বার উল্লেখ হতে দেখা যায়—তার মধ্যে শালিখা, ঘুষুড়ী, বেতড় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্রদাস পিপলাই-এর 'মনসা বিজয়' কাব্যে চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য যাত্রার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

'ডাহিনে কোতরবাহি কামারহাটি বামে।
পূর্বেতে আড়িয়াদহ ঘুষীড়ি পশ্চিমে॥
চিৎপুরে পূজে রাজা সর্বমঙ্গলা।
নিশিদিশি বাহে ডিঙ্গা নাহি করে হেলা॥
তাহার পূর্বকূল বাহিয়া এড়ায় কলিকাতা।
বেতড় চাপায় ডিঙ্গা চাঁদ মহারথা॥'

এখানে চিৎপুর ও কলকাতার সঙ্গে ঘুষুড়ি এবং বেতড়ের নাম পরিষ্কার ভাবে উচ্চারিত হয়েছে। এর আরও পরে ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে[৪] (মতান্তরে ১৫৭৭) কবি-কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যেও ভাগীরথীর পূব পাড়ের নামের সঙ্গে পশ্চিম পাড়ের গ্রামের নামও সমানভাবে উল্লিখিত হয়েছে। যেমন—

ধালিপাড়া মহাস্থান কলিকাতা কুটিলাস।
দুই কূলে বসাইয়া বাট॥
পাষাণে রচিত ঘাট দুকূলে যাত্রীর নাট।
কিঙ্করে বসায় নানা হাট॥
ত্বরায় বহিয়ে তরী তিলেক না রয়।
চিৎপুর সালিখা সে এড়াইয়া যায়॥
কলিকাতা এড়াইল বেনিয়ার বালা।
বেতড়েতে উত্তরিল অবসান বেলা॥

এ ছাড়া 'চৈতন্যমঙ্গল'-এর মতে নীলাচল যাত্রার সময় শ্রীচৈতন্যদেব শান্তিপুরের কাছে ভাগীরথী পার হয়ে বর্ধমান জেলার অম্বিকা-কালনা ও কুলীনগ্রাম অতিক্রম করে দামোদর পার হবার আগে হাওড়া-হুগলীর সীমানায় অবস্থিত শিয়াখালায় উপস্থিত হন।[৫]

শুধু কাব্যে বা সাহিত্যেই নয়—বিদেশীদের প্রাচীন মানচিত্রেও বিশেষ করে ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ডি. ব্যারোজের (De Barros) ও গ্যাসটালডি (Gastaldi) ১৫৬১ খ্রীঃ অংকিত মানচিত্রেও শ্যামপুর থানার একটি স্থানকে যথাক্রমে পিছলতা (Pisolta) এবং পিছলদা (Pichhalda) বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজিটিয়ার্সের (হাওড়া, ১৯০৯ খ্রীঃ) লেখক ও'ম্যালি ও মনোমোহন চক্রবর্তী লিখছেন—Pisolta **has been identified with the modern village of Pichhaldaha, 2 miles no th—north West of Fort Mornington Point in the extreme**

south of the Uluberia sub-division. তাঁরা আরও লিখেছেন—Here boats used to cross Rupnarayan. It is mentioned in the 17th century—biographies of Chaitanya.

কিংবদন্তী আছে মহাপ্রভু নীলাচলে যাবার পথে এখানে কিছু সময় বিশ্রাম নিয়েছিলেন। তারাপদ সাঁতরা আরও লিখেছেন—"কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত 'চৈতন্য চরিতামৃতে'র মধ্য লীলায় বলা হয়েছে যে তিনি পানিহাটি থেকে নদী পথে পিছলদায় আসেন। যদিও অন্যান্য পণ্ডিতদের মতে গ্রামটি আসলে মেদিনীপুর জেলার তমলুকের কাছাকাছি অবস্থিত। অবশ্য মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অভিমত—খ্রীষ্টের জন্মের চোদ্দশত কি পনের শত বৎসর পরে যে সকল মনসার ও চণ্ডীর গান, গাওয়া যায় তাতে তমলুকের নাম নাই। সে সময়ে লোকে পিছলদা ও ছত্রভোগ হইয়া সমুদ্রে যাইত।"

কবি কঙ্কনের অব্যবহিত পরে আরও উদাহরণ পাওয়া যায় ক্ষেমানন্দ ও কেতকা দাসের রচিত 'মনসা মঙ্গলে'।[৮] তাতেও বলা হয়েছে,

কালীঘাটে কালী বন্দ বেতোড়ে বেতাই।
সুরটে ঠাকুর বন্দো আমতায় মেলাই ॥

এই বেতোড়ের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে 'শিবপুর কাহিনী'র লেখক অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখছেন—১৫৪০ (মতান্তরে ১৫৫৩) খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ দেশের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডি. ব্যারোজ (De Barros) বঙ্গের যে মানচিত্র অঙ্কিত করেন এবং যে মানচিত্রের প্রতিলিপি এখনও কলিকাতার 'মেটকাফ হল' বা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে আছে—সেই মানচিত্রেও সরস্বতী ও যমুনা ভাগীরথীর দুইটি বৃহৎ শাখারূপে বিরাজমানা দেখিতে পাই। আরও দেখিতে পাই, গঙ্গা ও সরস্বতীর সংযোগস্থলে এবং গঙ্গার উপকূলেই বেতোড়ের নাম বৃহৎ অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় ঐ মানচিত্রে বেতোড়ের সান্নিধ্যে গঙ্গার উভয় পারে কলিকাতা অথবা হাওড়ার অন্য কোন গ্রামের নাম পর্যন্ত নাই। ইহা হইতেই তদানীন্তন কালে বেতোড়ের প্রসিদ্ধি অনুমিত হইতে পারে।' বেতোড় বন্দরের প্রসিদ্ধি এতই ছিল যে চাঁদ সওদাগর পর্যন্ত সমুদ্রে বাণিজ্য যাত্রার পথে বেতাইচণ্ডীর পুজো দিতে এখানে আসতেন। তাই এই বন্দর সম্বন্ধে পণ্ডিত প্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন—It was to Satgaun what Zedda is to Mecca.

মোঘলদের সময় থেকেই বাংলার প্রসিদ্ধ বন্দর সপ্তগ্রামের অবনতি হতে থাকে। কারণ সেই সময় থেকেই সরস্বতীর নাব্যতা হ্রাস পেতে থাকে। ফলে বড় বড় বাণিজ্য পোত আর সপ্তগ্রামে যেতে পারত না। কাজেই জাহাজগুলি নঙ্গর করতো ভাগীরথীর অপর পার গার্ডেনরীচে। সেই সুবাদে বেতোড়ে পর্তুগীজরা বড় হাট গড়ে তুললো। এই সম্বন্ধে সি. আর. উইলসন সাহেবের মন্তব্যও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি লিখছেন—In the 16th century, the Stream (Sarwassati) became shallower and less accessible to the seagoing vessels but when the

Portuguese began to frequent the river about 1530, difference made itself felt. The foreigners sent their goods by boats to Satigaon. Meanwhile their ship lay at anchor in Garden Reach and an important market sprang up on the west side of the river at Betor, close to Shibpore.

প্রকৃতপক্ষেই পর্তুগীজরা বেতোড়ে হাট বসিয়ে ছোট ছোট নৌকো দিয়ে সপ্তগ্রামে পণ্যদ্রব্য কেনা-বেচা করতো। মরশুম শেষ হলে ছাউনিগুলিতে আগুন লাগিয়ে দিত। পরের বছর আবার এসে নূতন করে ছাউনি তৈরি করতো। এ সম্বন্ধে ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৫৭৮) ভিনিসীয় পর্যটক সিজার ফেডরিক (Ceasre Fedirici) লিখেছেন—"The merchants gather together for the trade from Buttor. Buttor has an infinite number of ships and Bazars while the ships stay in the season, they erect a village of straw houses which they burn when the ships leave and built again in the next season.' (Cal. Review vol. VI. p. 402)

এরপর ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার স্টুয়ার্ট রচিত মানচিত্রে এবং তারও পরে ১৭৭৯-৮০-তে রেনেলস্ ম্যাপ-এ (Rennell's Atlas) অবশ্য শালিখা, শিবপুর ও বেতোড়েরও উল্লেখ আছে। ১৭৯২-৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আপজোন'স ম্যাপ অব ক্যালকাটাতে (Upjhon's Map of Calcutta) রামকৃষ্ণপুর ঘাট, শালকিয়া ঘাট এমনকি হাওড়া ঘাটেরও উল্লেখ আছে।

কিন্তু এই পর্তুগীজরা নিজ দোষে মোঘলদের বিরাগভাজন হয়। ফলে ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে মোঘল শাসকের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে তাদের (পর্তুগীজদের) হুগলী ত্যাগ করতে হয়। শুধু হুগলী কেন—নদীবক্ষে দস্যুবৃত্তি করার অপরাধে বেতোড় বন্দর থেকেও তাদের বিতাড়িত করা হয়। পরে তারা আরাকানবাসীদের অর্থাৎ মগদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বালক বালিকাদের চুরি করে দাস হিসেবে বিক্রী করতে লাগল। এভাবে হাওড়াতে তারা দাস ব্যবসা বেশ ফলাও করে করতে লাগল। C. N. Banerjee তাঁর An Account of Howrah Past and Present গ্রন্থে লিখেছেন—Slavery was in vogue in Howrah. Public advertisement appeared in those days giving a minute description of the boy and girl to be sold or bought.

পর্তুগীজদের এই অত্যাচার বন্ধ করা এবং বঙ্গদেশে মোঘল শাসকদের আধিপত্য প্রতিরোধ করার জন্য বার-ভূঁইয়াদের চূড়ামণি যশোহর অধিপতি প্রতাপাদিত্য ভাগীরথীর দুই তীরে কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন—তার মধ্যে থানা দুর্গটি অন্যতম*। এটি ছিল বেতোড়েরই সীমানায়। শুধু তাই নয়—এই দুর্গে রাজা প্রতাপাদিত্য রডা (Rudda) নামে জনৈক পর্তুগীজ নৌ-সেনাপতিকে নিয়োগ করে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধে তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, মোঘল

নৌবহর বার বার তাঁর কাছে পরাজিত হয়েছিল। পরে অবশ্য রাজা মানসিংহ প্রতাপকে পরাজিত করে থানা দুর্গ অধিকার করেন। এইভাবে ষোড়শ শতকের শেষদিকে যে থানা দুর্গ বেতোড়ে তৈরী হয়েছিল তার বাণিজ্যিক গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে—এবং নদীর অপর পারে তখন বাণিজ্য কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়ে যায়। সেই ব্যবসা কলকাতার শেঠ ও বসাকদের দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। ঐতিহাসিক উইলসন তাঁর **Early Annals of the English in Bengal** গ্রন্থে তাই লিখেছেন **—Its (Batore) trade had now passed to the other side of the river and was in the hands of the Setts and Bysacks. In the 17th century, Batore disappeared from history, its name changed into the village of great Tanna.** এই থানাই হচ্ছে আজকের থানা মাকুয়া গ্রাম।

এর পরই ইংরেজদের সঙ্গে বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খাঁর মনোমালিন্য দেখা দিল। জোব চার্ণক ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী থেকে বিতাড়িত হলে মোঘল সৈন্যরা হিজলী পর্যন্ত তাঁকে তাড়া করে। পথিমধ্যে চার্ণক থানা দুর্গের ক্ষতি সাধনও করেন। হিজলী যুদ্ধের পর এক চুক্তিপত্রে ঠিক হয় যে ইংরেজরা জাহাজ মেরামতির জন্য উলুবেড়িয়া পর্যন্ত আসতে পারবে—তবে থানা দুর্গের কাছে যাওয়া চলবে না। চুক্তি অনুযায়ী ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুন চার্ণক উলুবেড়িয়ায় এসে উপস্থিত হলেন। আরও সুখের কথা যে জোব চার্ণক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেঙ্গল কাউন্সিলের কাছে সুপারিশ করেন যে উলুবেড়িয়াতেই ইংরেজদের ঘাঁটি করা হউক। যদিও কাউন্সিল তাঁর ঐ প্রস্তাবে কিঞ্চিৎ ভর্ৎসনা করে সুতানটিতেই তাঁবু গাড়তে আদেশ দেন। সেই আদেশ মতই ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে আগস্ট দুপুরবেলা জোব চার্ণক ভাগীরথীর পূব পাড় সুতানটিতে পদার্পণ করে ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড স্থাপন করলেন যা কালে রাজদণ্ডে পরিণত হল। এই দিন থেকেই কলকাতার জন্মদিন ইংরেজরা স্থির করে দিল—যা পরবর্তীকালে ইতিহাসেও সন্নিবিষ্ট হল।

যদি জোব চার্ণকের সুপারিশ কার্যকর হত তাহলে রাজধানী কলকাতার জয়তিলক উলুবেড়িয়া তথা হাওড়ার কপালেই হয়তো শোভা পেত। তবে এ ব্যাপারে অন্যান্য অসুবিধাগুলিও নগণ্য নয়—জনশ্রুতি আছে উলুবেড়িয়ার স্থানীয় অধিবাসীরাই নাকি সুবাদারের কাছে অভিযোগ করল সেখানে ইংরেজ কুঠি তৈরি হলে স্নানার্থী মহিলাদের অসুবিধা হবে। আসলে গঙ্গার এ পাড়ে চড়া পড়তে শুরু করায় সব জাহাজই পশ্চিম পাড়ে না ভিড়ে পূব পাড়েতেই নঙ্গর করছিল। কলকাতা প্রতিষ্ঠার পাঁচ-ছয় বছর পরেই বর্ধমান-লুণ্ঠনকারী শোভা সিং-এর ভাই হিম্মত সিং বেতোড় আক্রমণ করে থানা দুর্গ অধিকার করেন। এবার হুগলীর ফৌজদারকে ইংরেজদের সাহায্য ভিক্ষা করতে হল। "ইংরেজ 'টমাস' নামে এক যুদ্ধ জাহাজ পাঠাইলে হিম্মত সিং থানা দুর্গ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে।" এই ঘটনার পর কয়েক বছর পর্যন্ত কলকাতার পশ্চিম পাড় হাওড়াতে

শান্তি বিরাজ করলেও ইতিমধ্যেই বেতোড়ের গুরুত্ব কমে গেছে। কারণ কলকাতার দিকেই তখন পণ্য দ্রব্যের হাট প্রসার লাভ করেছে। ইংরেজরা কলকাতার শ্রীবৃদ্ধির দিকেই নজর দিচ্ছে। আর হাওড়ার দিকে তখন উঠছে নূতন নূতন গ্রাম ও জাহাজ সারানো বা জাহাজের তলা পাল্টানোর মেরামতি কেন্দ্র। চিত্তবিনোদনের জন্য হাওড়ায় অনেক বাগানবাড়ীও গড়ে ওঠে। এই বাগানগুলি আবার বেশীর ভাগই ছিল আর্মেনিয়ানদের। ১৭০৬ সালে ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন কলকাতা ঘুরতে এসে যে অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন তা বঙ্গানুবাদ করলে দাঁড়ায়—নদীর অপর পারে (হাওড়ায়) জাহাজ মেরামত ও তলা পাল্টানোর জন্য অনেক ডক হয়েছে এবং ভাল ভাল বাগান বাড়ীও তৈরী হয়েছে যার মালিক হচ্ছে আর্মেনিয়ানরা।*

আরও পরে এই দুর্গটি মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতও আক্রমণ করেন। বাংলার নবাব আলিবর্দী খাঁ একইভাবে ইংরেজের সাহায্যে তাঁকে সেখান থেকে বিতাড়িত করেন। তাই **An Account of Howrah Past & Present** গ্রন্থে **C. N. Banerjee** লিখেছেন—**In 1750 A.D. the Marhattas took the Tanna Fort.** এইভাবে এদেশীয় শাসকরা ক্রমশ দুর্বল হয়ে ইংরেজ তথা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে পদে পদে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে বিপদমুক্ত হতে লাগলেন। বিনিময়ে তারাও কিছু পেতে চাইল। তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ মোঘল সম্রাট ফারুকশিয়ারের কাছে ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলকাতা সহ আটত্রিশটি গ্রামের সনদ লাভের প্রস্তাব দেন। এই গ্রামগুলির মধ্যে ভাগীরথীর পশ্চিমপাড়ের পাঁচটি গ্রাম যথা শালিখা, হারিড়া, কাসুন্দিয়া, রামকৃষ্ণপুর ও বাট্টারের (বেতোড়) নামেরও উল্লেখ আছে।

ঐতিহাসিক উইলসন সাহেব তাঁর **The Early Annals of the English in Bengal** গ্রন্থে ৮১৫ পৃষ্ঠায় আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—**The list of towns ordered to be entered after the consultation of May 4th 1714, being a list of towns that the East India Company already possessed round Calcutta and of those they wished the Moghul to grant them in Phirmand.**

সেই শহরগুলির তালিকা নিচে দেওয়া হল।

Towns	Parganas	Rent Rs. A. P.	Total Rs. A. P.
Salican (শালিখা)	Boro	61-11-0	277-14-3
	Pican	216- 3-3	
Harirah (হাওড়া)	Boro	237- 5-4	383- 2-9
	Pican	145- 13-5	
Casundah (কাসুন্দিয়া)	Boro	119-14-4	120- 6-11
	Pican	0- 8-7	

Ramkrishnapur (রামকৃষ্ণপুর)	**Boro** **Pican**	**89- 3-8** **80-11-0**	**169-14-8**
Batter (বেতোড়)	**Boro** **Pican**	**351-13-0** **229- 1-9**	**580-14-9**

মুসলমান সুলতানদের আমল থেকেই সপ্তগ্রামের অধীনে বোরো ও পাইকান পরগনার অন্তর্গত হয়ে বেতোড় নামে পরিচিত ছিল। সম্রাট আকবরের সময় আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে যে রাজস্বের হিসেব আছে তাতে সপ্তগ্রামের অন্তর্ভুক্ত বোরোপাইকান পরগনায় অবস্থিত বেতোড়ের রাজস্বও দেখানো হয়েছে। এই তালিকাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে গঙ্গার পশ্চিম তীরে ঐ সব শহরের মধ্যে বেতোড়ের রাজস্বই সবচেয়ে বেশি। সুতরাং বেতোড় যে ঐ গ্রামগুলির মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ ছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

আলোচনান্তে দেখা যাচ্ছে যে এই সমস্ত প্রাচীন স্থানগুলি সবই বর্তমান হাওড়া শহরের সীমানায় অবস্থিত। এমতাবস্থায় দেশীয় কাব্যাদি (মঙ্গলকাব্য) বা বিদেশী পর্যটকের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে শুরু করে মানচিত্রগুলিই প্রমাণ করছে বেতোড়ের ও শালিখার প্রাচীনত্ব আটশ বছরের মত। আর হারিড়া, রামকৃষ্ণপুর এবং কাসুন্দিয়া অঞ্চলও বেতোড় বন্দরের ন্যায়ই পুরনো। এই 'হারিড়া' গ্রামটিই পরবর্তীকালে আধুনিক 'হাওড়া' শহরে রূপান্তরিত হয়েছে।

১. পুরাতন প্রসঙ্গ—বিপিনবিহারী গুপ্ত—পৃষ্ঠা ১৯২।
২. পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ।
৩, ৫. হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি—তারাপদ সাঁতরা।
৪. কলিকাতার ইতিবৃত্ত—প্রাণকৃষ্ণ দত্ত—পৃষ্ঠা ১১।
৬. ৭. হুগলী জেলার ইতিহাস—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (জ্যোতীরত্ন) মাসিক বসুমতী চৈত্র ১৩৯২।
* শালকিয়া দুর্গ নামেও একটি ছিল। দ্রঃ ম্যাপ অব ক্যালকাটা।
* Bengal District Gazetteers (Howrah) 1909—O'Malley & M. Chakraborty.

যানবাহন

পলাশীর যুদ্ধে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ছলচাতুরী ও প্রলোভনের দ্বারা বলতে গেলে বিশ্বাসঘাতকদের সহায়তায় বাংলার স্বাধীনতা কেড়ে নিলেও ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহে কিন্তু সেটা করা কোম্পানীর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তার প্রধান কারণ ছিল তদানীন্তন ইংরেজ গভর্নর জেনারেলদের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী নীতি। সিপাহী বিদ্রোহের মূলে যে লর্ড ডালহৌসীর দমনমূলক ও বিভেদপ্রবণ সাম্রাজ্যবাদী নীতিই সর্বাধিক ইন্ধন জুগিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই বিদ্রোহ ব্রিটিশ পার্লামেণ্টকেও ভাবিয়ে তুলেছিল। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে মহারানী ভিক্টোরিয়া তাঁর ঘোষণাপত্র জারী করে কোম্পানীর হাত থেকে ভারতের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নিলেন।

লর্ড ডালহৌসীর যতই দোষ থাকুক না কেন তাঁর কিছু কিছু কাজ ভারতবাসী সহজে ভুলতে পারবে না—যেমন রেল ও ডাক-তার বিভাগের আধুনিক ব্যবস্থাব প্রবর্তন। বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের সুফল যাতে ভারতেও ছড়িয়ে পড়ে (সাম্রাজ্য বিস্তার ও বিদেশী পণ্যের বাজার সৃষ্টি করা মূল উদ্দেশ্য হলেও) তার প্রথম চেষ্টা করেছিলেন লর্ড ডালহৌসী। বলতে গেলে ভারতে রেলগাড়ির জনক ছিলেন তিনি। ১৮৫৩ সালে বোম্বাই থেকে থানে পর্যন্ত প্রথম রেল চলে। ভারতের যানবাহন ইতিহাসে সেদিনটি ছিল এক যুগান্তকারী দিবস। এর পরের বছরই (১৮৫৪-য়ে) শুরু হল হাওড়া স্টেশনে রেলগাড়ির সূচনা।

ভারতে রেলগাড়ী ১৮৫৩ সালে চলা শুরু করলেও তার পরিকল্পনা কিন্তু শুরু হয়েছিল তারও প্রায় দশ বছর আগে। ১৮৪৪ সালে আর, এম, স্টিফেনসনের নেতৃত্বে লণ্ডনের একটি কোম্পানী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ভারতে রেললাইন স্থাপনের প্রস্তাব দেন। ঐ ভদ্রলোকই পরে ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলের প্রতিনিধি বা এজেণ্ট হিসাবে এমনকি ম্যানেজিং ডিরেক্টরও নিযুক্ত হন। ভারতের মাটিতে সর্বপ্রথম দুটি রেল কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয় তার মধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একটি—অপরটি হচ্ছে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলওয়ে কোম্পানী। এই দুটি কোম্পানীই ভারতে রেল লাইন স্থাপনে উদ্যোগী হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীই হচ্ছে আজকের পূর্ব রেল। এরই উদ্যোগে বঙ্গদেশে প্রথম হাওড়া স্টেশন থেকে রেল চলে ১৮৫৪ সালে। তার চমকপ্রদ ইতিহাসেরই সামান্য অংশ পাঠকের কৌতূহল মেটাবার জন্য তুলে ধরা হল।

'কলকাতা দর্পণ'-এর বর্ষীয়ান লেখক রাধারমণ মিত্র লিখছেন—১৮৫৩ সালের শেষাশেষি রেললাইন পাণ্ডুয়া অবধি তৈরী হইয়া যায়। কিন্তু গাড়ি চালানো পিছিয়ে যায় তিনটি কারণে—প্রথমতঃ…যে রেলগাড়িগুলি প্রথম এই লাইনে চলবে

সেগুলি নমুনা স্বরূপ বিলেতে তৈরী হয়ে এক জাহাজে কলকাতায় আসছিল। 'গুডউইল'* নামে সেই জাহাজটি গঙ্গাসাগরের কাছাকাছি Sandheads-এ এসেই ডুবে যায়।

দ্বিতীয়তঃ…বিলেত থেকে গাড়ী চালাবার ইঞ্জিন আসছিল তা ভুলক্রমে অস্ট্রেলিয়ায় চলে যায়।

তৃতীয়তঃ…চন্দননগরের উপর দিয়ে রেললাইন যাওয়ায় ফরাসীদের স্বাতন্ত্র্যকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। ফলে উভয়ের মধ্যে ঝগড়ার সূত্রপাত হয়।

অবশেষে ঠিক হল যে, ১৮৫৪ সালের ১লা আগস্ট হাওড়া স্টেশনে রেল চালু হবে। এ সম্বন্ধে এক বিজ্ঞপ্তি পর্যন্ত প্রচারিত হল ১৮৫৪ সালের ১লা জুলাই তারিখে। 'সংবাদ প্রভাকর' লিখছেন: "আগামী আগস্ট মাসের ১লা তারিখে আমাদিগের গবরণর জেনারেল ও অপরাপর সম্ভ্রান্ত সাহেবরা উপস্থিত হইয়া রেইল রোড খুলিবেন। ঐ দিবস হাবড়ায় (তখন হাওড়াকে বাংলায় এইভাবে লেখা হ'ত) ও অন্যান্য স্থানে প্রজাদিগের সামান্য সমারোহ হইবেক।" স্বাভাবিক কারণেই লাইনে ট্রায়ালের কাজ শুরু হ'য়ে গেল। তাই হাওড়া থেকে পাণ্ডুয়া পর্যন্ত গাড়ী চালিয়ে দেখা হ'ল লাইন ঠিকঠাক আছে কিনা। ১৮৫৪ সালের ২৮শে জুন মিঃ জন হজ্‌সন নামে এক ইংরেজ ড্রাইভার ইঞ্জিন চালিয়ে লাইন পরীক্ষা করেন।

পূর্বের বিজ্ঞাপন অনুযায়ী ১লা আগস্ট রেল চালু হ'ল না। কারণ বড়লাট লর্ড ডালহৌসী সেদিন আসতে পারলেন না। ২৯শে জুলাই (১৮৫৪) 'সংবাদ প্রভাকর' আবার লিখলেন: মর্নিং ক্রনিকেল পত্রে প্রকাশ হইয়াছে আগামী মাসের ১৬ই তারিখে (১৬ই আগস্ট) শ্রীল শ্রীযুক্ত গবরণর জেনারেল বাহাদুর সাধারণের গমনাগমনের উদ্দেশ্যে বঙ্গরাজ্যের রেইল প্রতিষ্ঠা করিবেন।

কিন্তু এবারেও তিনি কথা রাখতে পারলেন না। তাই ঐ তারিখ না পিছিয়ে বিজ্ঞাপিত দিনের একদিন আগেই অর্থাৎ ১৫-ই আগস্ট মঙ্গলবার ১৮৫৪ সালে হাওড়া থেকে হুগলী পর্যন্ত (পাণ্ডুয়া নয়) ২৪ মাইল পথে প্রথম রেল চালু হ'ল। আশিস কমল সরকারের 'পূর্ব-রেলের পথে পথে' বইতে হাওড়া স্টেশনে প্রথম রেল চলার দিনটির এক বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। তাতে তিনি লিখছেন—'টিকিটের জন্য পড়ে গেল কাড়াকাড়ি। তিনখানি প্রথম শ্রেণীর কামরা, দুখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা, তিন খানি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা। আর একখানি গার্ডের ব্রেকভ্যান। গাড়ির বহন ক্ষমতা ছিল শ'সাতেক। আর টিকিটের জন্য আবেদন পড়েছিল তিন হাজার যাত্রীর। সর্বশেষে আটশ যাত্রী সেদিন চড়তে পেরেছিলেন।' তিনি আরও লিখেছেন —'প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। তার মধ্যে একজন ছিলেন কলকাতার স্বনামধন্য গন্ধবণিক শ্রীরূপচাঁদ ঘোষ। তিনি ট্রেন থেকে নেমে জনে জনে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে সত্যি হুগলী পৌঁছেছেন তো! আর একজন হলেন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত রাধালঙ্কার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও রাশি-নক্ষত্র বিচার

---

* পুরো নাম এইচ. এস. এম. গুডউইল বা গুডউইন।

করে তবেই হাওড়া থেকে সেই প্রথম ট্রেনের যাত্রী হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু হুগলী গিয়ে আর সেই 'আগুনের গাড়িতে' চড়ে কলকাতায় ফিরে যেতে রাজি হলেন না। কারণ তাঁর মতে 'এই অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে আয়ুক্ষয় ছিল অনিবার্য'।' এরই বিপরীত চিত্র দেখা গেল একজন সাহেব যাত্রীর ক্ষেত্রে। রেলের গতিবেগ দেখে তিনি আবার গতিবাতিক হয়ে উঠলেন। 'তাঁর ঘোড়ার গাড়ির ঘোড়াটি রেলের গতিতে ছুটতে পারছে না দেখে তাকে চাবুক মারতে মারতে মেরেই ফেললেন।'[১]
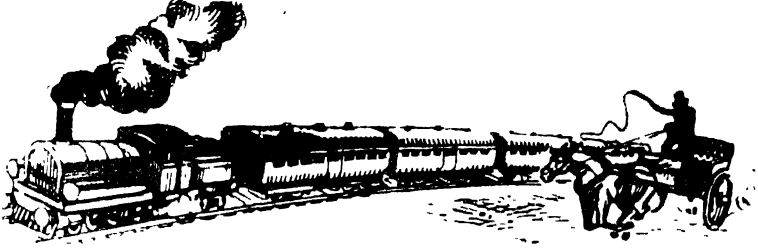
এর কয়েকদিন পরেই অর্থাৎ ১. ৯. ১৮৫৪ তারিখে পাণ্ডুয়া অবধি রেল চালু হয়। ১৫. ৮. ১৮৫৪ তারিখে যে রেল চলেছিল তার চালক ছিলেন মিঃ জন হজ্‌সন। ইনি ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলের রেলইঞ্জিনের প্রথম ইঞ্জিনিয়ার। আর যে ইঞ্জিনটি দিয়ে গাড়ী চালানো হয়েছিল ওর নাম ছিল **'Fairy Queen'**।

'কলকাতা দর্পণে' রাধারমণবাবু আরও লিখেছেন ঃ 'ফেয়ারী কুইনকে' অনেকদিন পর্যন্ত হাওড়া স্টেশনের ভেতর ঘিরে রাখা হয়েছিল লোকেদের দেখানোর জন্য। এখন আর সেটি সেখানে নেই। কোথায় আছে বা আছে কি না জানি না।' 'হুগলী জেলার ইতিহাস' রচয়িতা প্রবীণ লেখক সুধীরকুমার মিত্র তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন— **'Fairy Queen** বর্তমানে লিলুয়ায় আছে।' খবর নিয়ে জানা গেছে যে, ঐ ঐতিহাসিক রেল ইঞ্জিনটি বর্তমানে জামালপুর রেলওয়ে ওয়ার্কশপে আছে।

হাওড়া থেকে হুগলী পর্যন্ত প্রথম যেদিন রেল চলল সেদিন যে জনসাধারণের উৎসাহ ও বিস্ময় কিরকম হ'তে পারে তা পাঠকের চিন্তার ওপরই রইল। সেদিনের হাওড়া—হুগলীর মধ্যবর্তী স্টেশনগুলি ছিল কেবলমাত্র বালি, শ্রীরামপুর, চন্দননগর। চন্দননগরের পর চুঁচুড়া স্টেশন। এই স্টেশনকেই রেলের টাইম টেবিলে হুগলী স্টেশন ব'লে দেখান হয়েছে। পাঠকদের ঔৎসুক্য নিবারণের জন্য রেলের প্রথম টাইম টেবিলটি এখানে ছেপে দেওয়া হ'ল। তবে মনে রাখতে হবে, পাণ্ডুয়া পর্যন্ত লাইন হুগলী স্টেশনের পরে অর্থাৎ ১. ৯. ১৮৫৪ তারিখে চালু হয়।

পাণ্ডুয়া পর্যন্ত রেল চলাচলের দিনটিতে প্রথম রেলের টাইম টেবিল চালু হয়ে স্মরণীয় হ'য়ে আছে। ঐ দিনটিতেই আবার বর্ধমানের মহারাজার জন্মদিন ছিল। স্মরণ রাখা যেতে পারে যে, ঐ দিনে কলকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি হাওড়া থেকে পাণ্ডুয়া পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে পরে পাল্কী বা ঐ জাতীয় যানে ক'রে সোজা গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোড ধ'রে বর্ধমান গিয়ে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।

এই পাণ্ডুয়া হুগলী জেলার একটি বিখ্যাত স্থান। পূর্বে এটি 'পেঁড়ো বসন্তপুর' নামে পরিচিত ছিল। এটি একটি হিন্দু রাজার রাজধানী ছিল। হুগলী জেলার ইতিহাস রচয়িতা সুধীরকুমার মিত্রের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তিনি ঐ গ্রন্থে লিখছেন—'শুনা যায়, বুদ্ধদেবের পিতৃব্য অমৃতদোনের পুত্র পাণ্ডশাক্য নামে এক রাজা পাণ্ডু-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। পাণ্ডুশাক্যের বংশধরগণের মধ্যে রাজা পাণ্ডুদাস আমতার অধীনে পেঁড়ো বসন্তপুরে নিজ রাজ্য স্থাপন করিয়া তথায় রাজত্ব করিতেন। রাজা পাণ্ডুদাস নিজবংশের নামানুসারে উক্ত স্থানের নাম বদলাইয়া পাণ্ডুয়া নামকরণ করিয়াছিলেন।' তিনি নিজ বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য লেঃ কর্ণেল ক্রফোর্ড সাহেবের মতামতও উল্লেখ করেছেন। ক্রফোর্ড সাহেবও লিখছেন ঃ **Pandua was once the capital of a Hindu Raja and is famous as a site of great victory by the Musalman under Saha Safi over the Hindus about 1340 A. D.**

পাণ্ডুয়া পর্যন্ত রেলের প্রথম টাইম টেবিল
'সম্বাদ ভাস্কর' থেকে উদ্ধৃত হ'ল।*

কলিকাতা হইতে	প্রাতের শকট	বিকেলের শকট	পাণ্ডুয়া হইতে	প্রাতের শকট	বিকেলের শকট
হাবড়া ষ্টেশন হইতে গমন	১০-৩০	৫-৩০	পাণ্ডুয়া হইতে গমন	৭-৩০	২-৩০
বালি	১০-৪৫	৫-৪৫	মগরা	৭-৫৫	২-৫৫
শ্রীরামপুর	১১-৩	৬-৩০	হুগলী	৮-১২	৩-১২
চন্দননগর	১১-৩০	৬-৩৭	চন্দননগর	৮-৩০	৩-৩০
হুগলী	১১-৪০	৬-৪৩	শ্রীরামপুর	৮-৫১	৩-৫১
মগরা	১১-৫৮	৬-৫৮	বালি	৯-৯	৪-৯
পাণ্ডুয়া পৌছিল	১২-৩০	৭-৪০	হাবড়া পৌছিল	৯-৩০	৪-৩০

R. Macdonald Stephenson
Managing Director
১৮৫৪ সন, ২৬শে অক্টোবর

এখানে মনে রাখতে হবে যে, আনুষ্ঠানিকভাবে ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের উদ্বোধন তখনও হয়নি। বড়লাট লর্ড ডালহৌসী পর পর দু'বারই কথা দিয়েও অনুষ্ঠানে

উপস্থিত হতে পারেননি। কিন্তু পাণ্ডুয়া থেকে রানীগঞ্জ পর্যন্ত যখন লাইন পাতা হ'ল তার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অবশ্য বড়লাট লর্ড ডালহৌসী উপস্থিত ছিলেন। ১৮৫৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী শনিবার হাওড়া স্টেশনের গঙ্গার ধার গাড়ীতে গাড়ীতে ভর্তি হ'য়ে আছে। বহু গণ্যমান্য ইউরোপীয় ও এদেশীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে

Excerpt from
THE FRIEND OF INDIA
Serampore
10th August 1854

THE RAILWAY is to be opened at last. An advertisement in another column informs the public that the Railway will be opened to Hooghly on the 15th instant, and to Pundooah on the 1st September. Every day, except Sundays, a morning and evening train will leave Howrah at half past ten, and half past five, and will reach Serampore at eleven, and six o'clock. The down trains will leave Hooghly at 8-10 in the morning, and 8-88 in the evening, reaching Howrah at half past nine and five. The fares will be

UP.

	1st Class.			Second.			Third.		
Howrah to	Rs.	A.	P.	Rs.	A.	P.	Rs.	A.	P.
Bally, ...	0	12	0	0	5	0	0	1	6
Serampore, ...	1	8	0	0	9	0	0	3	0
[illegible]	2	8	0	0	15	0	0	5	0
[illegible]	3	0	0	1	2	0	0	7	0

ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনপর্ব অনুষ্ঠিত হল। কিন্তু এবারেও বড়লাট সাহেব পূর্ব নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী বর্ধমান পর্যন্ত ট্রেনে যেতে পারলেন না। হাওড়া স্টেশনের সভায় উপস্থিত থেকেই সকলের কাছ থেকে বিদায় নেন।

স্মরণ রাখা যেতে পারে যে, হাওড়া স্টেশন থেকে রেলে উঠতে হলেও কলকাতার যাত্রীদের জন্য গঙ্গার পূর্ব পাড়ে আর্মেনিয়ান ঘাটের কাছে একটি টিকিট ঘর ছিল। কিন্তু সেটি তুলে দেওয়া হয় ট্রেনে মান্থলি টিকিট ব্যবস্থা চালু করতে গিয়ে। তদানীন্তন 'সাধারণী' পত্রিকায় এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। 'সাধারণী' পত্রিকা ১২৮১ সালের ২৯শে মাঘ সংখ্যায় লিখছে—'ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ আগামী ফেব্রুয়ারী (১২৮১ সন) মাস হইতে যাহারা প্রত্যহ গাড়ীতে যাতায়াত করিবেন তাহাদিগকে কম দামে টিকিট দিবেন। হাওড়া স্টেশন হইতে যাত্রা শুরু হইবে—কলিকাতা হইতে উঠিয়া গেল।'[৩] এ প্রসঙ্গে তখনকার দিনে রেলের ভাড়ার তালিকাটিও পাঠকের কৌতূহল নিবারণের জন্য ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া থেকে পূর্বপৃষ্ঠায় ছেপে দেওয়া হল।

ভারতে রেলগাড়ী যেমন প্রথম চালু হয় বোম্বাইয়ে এবং পরে হাওড়ায় তেমনি ইলেকট্রিক রেলও বোম্বাইতে চালু হওয়ার অনেক পরে শুরু হয় হাওড়ায়। তবে সেটিও কম উল্লেখযোগ্য নয়। হাওড়া স্টেশন থেকে বৈদ্যুতিক ট্রেন চালু ক'রতে এসেছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু। তাঁর হাতেই উদ্বোধন পর্ব অনুষ্ঠিত হয় ১৪/১২/১৯৫৭। তাও হাওড়া থেকে শেওড়াফুলি পর্যন্ত প্রথম চালু হয়। তবে সে অনুষ্ঠানের বিষাদস্মৃতি এখনও আমাদের কারো কারো মনে আছে। সেদিনের সেই অনুষ্ঠানে ঐ বৈদ্যুতিক গাড়ীতে অসতর্কতাবশতঃ ঝুলে যাওয়ার জন্য কয়েকটি যুবকের অমূল্য প্রাণ বিসর্জিত হয়েছিল। সে কথা ভোলার নয়।

বি. এন. আর—ভারতীয় রেলের আর একটি উল্লেখযোগ্য শাখা হচ্ছে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে। এই শাখাটি হাওড়া জেলায় পরে সম্প্রসারিত হলেও গুরুত্বের দিক থেকে সামান্য আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। এই রেলপথটি ১৮৮৭ সালে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু হাওড়া স্টেশনের সঙ্গে এর সংযোগ সাধন হয় ১৯০০ সালে। তখন থেকে পশ্চিমে বোম্বাই, দক্ষিণে মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার সঙ্গে হাওড়া স্টেশনের যোগাযোগ সুগম হয়। রূপনারায়ণ নদীর ওপর সেতু তৈরী করে উলুবেড়িয়া মহকুমার মধ্য দিয়ে এসে উহা হাওড়া স্টেশনে যুক্ত হয়। উলুবেড়িয়া মহকুমার যাত্রী ও পণ্যদ্রব্য চলাচলে এই রেলপথের অর্থনৈতিক গুরুত্ব সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হাওড়া আমতা রেলওয়ে—হাওড়া স্টেশন থেকে ইস্টার্ণ রেল প্রথমে বঙ্গদেশের সঙ্গে উত্তর ভারতের যোগাযোগে সুবিধা করে দেয়। ১৯০০ সালে বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ হাওড়া অবধি সম্প্রসারিত হলে উলুবেড়িয়ার গঙ্গাতীরস্থ অঞ্চলগুলির যোগাযোগ স্থাপিত হয়। কিন্তু জেলার মধ্যাংশ ও উত্তর-পশ্চিমাংশের লোকেরা রেল যোগাযোগ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেল। সেইজন্য জেলাতে মিটার গেজের দুটি রেল লাইন চালানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল—যাকে লাইট রেলওয়েজ বলে আখ্যা দেওয়া হয়। যদিও বর্তমান প্রজন্মের কাছে এর কোন অস্তিত্বই দেখানো যাবে না—তথাপি

এর কিঞ্চিৎ ইতিহাস পাঠে তাদের কৌতূহল নিবৃত্ত হতে পারে। এই দুটি লাইট রেলওয়ের নাম ছিল হাওড়া—আমতা ও হাওড়া—শিয়াখালা লাইন। ১৮৮৯ সালে হাওড়া জিলা বোর্ড ও মেসার্স ওয়ালশলোভেট এণ্ড কোং সঙ্গে ছোট রেল চালু করার ব্যাপারে এক চুক্তি হয়।[৪] পরে ১৮৯৫ সালে সেই চুক্তি মেসার্স মার্টিন বার্ণ এণ্ড কোম্পানীর সঙ্গে পুনর্ণবীকরণ করা হয়—যা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এই চুক্তির ফলে হাওড়া-শিয়াখালা লাইনের জন্য ছয় লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়—আর হাওড়া-আমতা লাইনের জন্য নয় লক্ষ টাকার বরাদ্দ বাড়িয়ে ষোল লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয়।[৫] ঐ টাকা শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রী করে তোলবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

প্রথমে হাওড়া আমতা লাইন চালু হয় ১৮৯৭ সালে। গঙ্গার ধারে তেলকল ঘাট থেকে (বর্তমান বার্ণ স্ট্যাণ্ডার্ড কোং পেছনে) ট্রেন চালু হয় ডোমজুড় পর্যন্ত। আমতা পর্যন্ত প্রসারিত হয় ১৮৯৮ সালে। বড়গাছিয়া থেকে হুগলী আটপুর পর্যন্ত লাইন হয় ১৯০৪ সালে। আর চাঁপাডাঙ্গা পর্যন্ত লাইন হয় ১৯০৮ সালে। এই লাইনটি হাওড়া-শিয়াখালা লাইন নামে খ্যাত। দুটি ট্রেনের গন্তব্যস্থান আলাদা হলেও যাত্রাস্থল কিন্তু ছিল তেলকলঘাট। হাওড়া ময়দানের (বর্তমান শতবার্ষিকী পার্ক বা সম্প্রতি শরৎ সদন) উপর দিয়ে পঞ্চাননতলা রোড দিয়ে রেল গিয়ে কদমতলা স্টেশনে প্রথম থামতো। প্রবীণদের কাছে শুনেছি রেল ইঞ্জিনের সামনে বড় পিতলের ঘণ্টা বাজিয়ে আর লাইনের উপর কিঞ্চিৎ বালী ছড়িয়ে জন বহুল পঞ্চাননতলা রোড দিয়ে লোককে সতর্ক করিয়ে দিয়ে যাওয়ার মজাদার কাহিনী। হাওড়া-শিয়াখালা কদমতলা থেকে বেনারস রোড হয়ে শিয়াখালা যেতো আর হাওড়া-আমতা ট্রেন ছুটতো কদমতলা থেকে পশ্চিমে জগৎবল্লভপুর হয়ে আমতা পর্যন্ত। এই দুটি কোম্পানীকেই হাওড়া জিলা বোর্ড ও হুগলী জিলা বোর্ড তাদের রাস্তা বিনা শুল্কে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। উপরন্তু শতকরা চার টাকা হারে মূলধনের উপর লাভের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। দুঃখের কথা দেশ স্বাধীন হবার পরও ঐ ব্যবসা লাভেই চলেছিল—কিন্তু শ্রমিক মালিক বিরোধের ফলে যতদূর মনে পড়ে ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে উহা উঠে যায়। আজও গ্রামাঞ্চলে গেলে কোথাও কোথাও সরু রেল লাইনের মরচে পড়া লাইনের ভগ্নাংশ চোখে পড়বে। তেলকলঘাট থেকে স্টেশন উঠে গিয়ে কদমতলায় যায় এবং স্বাধীনতার পর উহা বাঙ্গালবাবুর পোলের নীচে স্থায়ী স্টেশন তৈরি হয়েছিল।

হাওড়া ব্রীজ (রবীন্দ্র সেতু)—হাওড়া স্টেশনের কথা বলা হল। এই প্রসঙ্গে হাওড়া ব্রীজের কথা না বললে হয়তো বে-মানান হবে। প্রবীণদের স্মরণে আছে যে, বর্তমান ক্যান্টিলিভার হাওড়া ব্রীজের বদলে তখন ভাসমান লৌহনির্মিত কাঠের পাটাতনের পুল ছিল। এই পুল সম্বন্ধে 'বাংলায় ভ্রমণ' (১ম খণ্ড) পুস্তকে লেখা হয়েছে:

"১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কতকগুলি ভাসমান নৌকার (পনটুন) উপর অর্দ্ধ মাইল

দীর্ঘ এই পুলটি নির্মিত হয়। ইহার উপর দিয়া বাস, লরী, মোটর, ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী প্রভৃতি চলিবার প্রশস্ত রাস্তা ও দুইদিকে লোক চলাচলের জন্য 'ফুট পথ' আছে। মধ্যের দুইখানি নৌকা ইচ্ছামত সরাইয়া লইয়া গিয়া পুল খুলিয়া বড় বড় স্টীমার ও জাহাজ যাতায়াতের পথ করিয়া দেওয়া হয়। সম্প্রতি এই পুলের উত্তর দিকে একটি প্রকাণ্ড ঝুলান সেতু নির্মিত হইয়াছে।"

নতুন এই ব্রীজ করতে মোট আট বছর লেগেছিল। এই ব্রীজের নকসা তৈরি করেছিল মেসার্স রেণ্ডেল (**Rendel**), পামার (**Palmer**) এবং ট্রিটন (**Triton**) কোম্পানীরা। ইংলণ্ডের মেসার্স ক্লিভল্যাণ্ড ব্রীজ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী লিমিটেড প্রধান কনট্রাক্টর ছিলেন। এই কোম্পানী আবার ফ্যাব্রিকেশনের স্টীল ওয়ার্ক করার জন্য মেসার্স ব্রেইথওয়েট, বার্ন এবং জেসপ্ (সংক্ষেপে বি. বি. জে) কোম্পানীকে সাব-কনট্রাক্ট দিয়েছিলেন। এই তিনটি কোম্পানীর পক্ষ থেকে যিনি আসল কোম্পানীর সঙ্গে ফ্যাব্রিকেশনের কাজে কন্সালটেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার হ'য়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তিনি ছিলেন বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার শালিখার অধিবাসী ললিতমোহন দাস। ললিতবাবু শালকিয়া এ. এস. স্কুলের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। উল্লেখ্য, এই পুলটি পৃথিবীতে তৃতীয় বৃহত্তম ঝুলন্ত ব্রীজ যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে ২১৫০ ফুট।

এই ঝুলন্ত ব্রীজটি তৈরি করতে জমি সমেত খরচ পড়েছিল তিন কোটি তেত্রিশ লক্ষ টাকা।[৬] মোট ইস্পাত লেগেছিল ছাব্বিশ হাজার পাঁচশ টন—যার সম্পূর্ণ পরিমাণ সরবরাহ করেছিল টাটা আয়রণ অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানী। এছাড়া বিশেষ ধরনের সামান্য স্টীল বিদেশ থেকে আনা হয়েছিল। বাজারে ঋণপত্র ছেড়ে এই ব্রীজের টাকা যোগান দেওয়া হয়। ঐ টাকা শোধ দেবার জন্য ½ শতাংশ কলকাতা কর্পোরেশনের বাড়ির করের উপর ধরা হয় এবং ½ শতাংশ কর ধার্য ছিল হাওড়া, দক্ষিণ শহরতলী, টালিগঞ্জ ও গার্ডেনরীচ পৌরসভার বাড়ির করের উপর। এছাড়া ট্রাম, বাস ও রেলের টিকিটের উপরও কর ধার্য আছে। মজার কথা ভারতের এই বিস্ময়কর পুলটির কোন উদ্বোধনপর্ব হয়নি। কারণ তখন চলছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।[৭] শত্রুপক্ষের কাছে ইহার গোপনীয়তা রক্ষা করাই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। এই পুলের উপর দিয়ে প্রথম ট্রাম চলে ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩। ১৯৪২ খ্রীঃ ডিসেম্বরে জাপানীরা কলকাতায় রাতের বেলায় যে বোমা ফেলেছিল তার লক্ষ্য বস্তু হাওড়া ব্রীজ ছিল না—বরং পরে দিনের আলোতেই তারা শহরে বোমা বর্ষণ করে।[৮]

দ্বিতীয় হুগলী সেতু (বিদ্যাসাগর সেতু)—হাওড়া স্টেশন তৈরী হলে ক্রমবর্ধমান যাত্রী ও পণ্য চলাচল ব্যবস্থা যেমন ভাসমান পনটুন ব্রীজ বহন করতে পারছিল না তেমনি স্বাধীনোত্তর কালে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে যাত্রী ও মাল পরিবহনের ভার একা হাওড়া ব্রীজের পক্ষেও বহন করা সম্ভব হচ্ছিল না। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য ১৯৭২ সালে মাত্র ৩৬ কোটি টাকার বাজেট নিয়ে হাওড়া

ব্রীজের দক্ষিণে দ্বিতীয় হুগলী সেতুর কাজ শুরু হয়। ঐ বছরেই বিশ্বের 'কেবল স্টেইড' এই দ্বিতীয় ব্রীজটির শিলান্যাস করেছিলেন ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। দশ বছরের মধ্যে উহার নির্মাণকার্য্য শেষ করার কথা ছিল। কিন্তু গঙ্গা দিয়ে এত জল বয়ে গেল যে সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও উহা শেষ হল কুড়ি বছরে। কোন কোন প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্র তাই টিপ্পনী কেটে লিখেছিল—'কেবল স্টেইড' ব্রীজের তালিকায় পৃথিবীতে দ্বিতীয় হলেও এই ব্রীজ সম্পূর্ণ হতে যে সময় নিল তা নিঃসন্দেহে বিশ্বে প্রথম। গিনেসের রেকর্ড বইতে জায়গা পাওয়ার মতো।[৯]

যা হউক, শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় হাওড়া ব্রীজ জনগণের জন্য উৎসর্গ করলেন ভারতের প্রধামন্ত্রী পি. ভি. নরসিমা রাও। ১০ই অক্টোবর শনিবার, ১৯৯২, বিকেলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী একটি সুইচ টিপে ফলকের আবরণ উন্মোচন করেন। রাজ্যপাল সৈয়দ নুরুল হাসান ও মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সহ পরিবৃত মঞ্চটি সেদিন খুবই জ্বল্‌জ্বল্‌ করছিল। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামানুসারে সেতুটির নাম রাখা হয়—বিদ্যাসাগর সেতু। কলকাতায় দীপাবলী উৎসবের কয়েকদিন আগেই এই উজ্জ্বল আলো শোভিত সেতুটির উদ্বোধনপর্ব দুই শহরের মানুষের মনে নিয়ে এসেছিল অফুরন্ত আলোর বিচ্ছুরণ। সংবাদপত্রের প্রতিবেদন থেকেই সেই আনন্দ উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ কিরূপ ছিল তা জানা যাবে। আনন্দবাজার পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার লিখছে—সময় নির্দ্ধারিত ছিল বিকেল পৌনে পাঁচটায়। তার বহু আগে থেকেই গঙ্গার দু'কূল উপচে ভিড়। এ-পাড়ে কলকাতা ও-পাড়ে হাওড়া—যতদূর চোখ যায় গঙ্গার পাড়ে, থেমে থাকা নৌকো এবং নদীতীরে খিলানের মাথায়, গাছের ডালে থিকথিক করছে মানুষ আর মানুষ। সকলেরই চোখ বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে। শেষ বিকালের ধূসর আলোয় আকাশছোঁয়া সেতুর মাথায় তখন জ্বলে উঠেছে আলো। এপাশে স্ট্রাণ্ড রোড ওপাশে ফোরসোর রোড বেয়ে মানুষের ঢল। অন্য দিনের চেয়েও বিক্রী বেড়ে গিয়েছে গঙ্গার ঘাটের ফেরিওয়ালাদের।

এই বিশ্ববিখ্যাত সেতুটি করতে মোট খরচ পড়েছে (উদ্বোধন পর্ব পর্যন্ত) ৩৮৮ কোটি টাকা। নদীর দুই তীরে সেতুর উপর দুটি করে মোট চারটি স্তম্ভ রয়েছে। প্রতিটির উচ্চতা ৪৩৫ ফুট। আর প্রতিটি স্তম্ভের মাথা থেকে উনিশটি করে তার (কেব্‌ল)—যাদের দৈর্ঘ্য হচ্ছে প্রায় ৮২৪ মিটার, গোটা সেতুটিকে টেনে রেখেছে অসম্ভব উচ্চতায়। এই সেতুটি স্থাপনের কাজে চল্লিশ একর জমি লেগেছে। এবারে দেখা যাক এই বিস্ময়কর সৃষ্টির কাজে কারা বিশ্বকর্মার ভূমিকায় ছিল। হাওড়া ব্রীজের মত এই সেতুরও প্রধান ঠিকাদার ছিল ব্রেথওয়েট, বার্ণ এ্যাণ্ড জেসপ কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড (সংক্ষেপে বি, বি, জে,)। মেন গার্ডার, মিডল গার্ডার এবং ক্রস গার্ডার ফেব্রিকেশনের ক্ষেত্রে ব্রেথওয়েট এবং বার্ণ স্ট্যাণ্ডার্ড এবং পাইলন এলিমেণ্ট, পাইলন ইরেকশন ক্রেন ফেব্রিকেশন এবং পি, ই, সি সংস্থাপনের জন্য কনসালট্যান্সি দেওয়ার ব্যাপারে জেসপের পরিষেবা গ্রহণ করা হয়েছে। আর

এসবের সমন্বয় সাধনকারীর প্রধান ভূমিকায় ছিল 'ভারত ভারী উদ্যোগ নিগম লিমিটেড'—যাকে সংক্ষেপে বলে (বি, বি, ইউ, এন, এল)। আরও গর্বের বিষয় ১৯টি করে প্রতি স্তম্ভে যে তারের টানা দেওয়া হয়েছে (যা পোলটিকে অত উঁচুতে ধরে রেখেছে) তা তৈরী করেছে উষা মার্টিন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। রাঁচিতে তৈরী সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরী হয়েছে এই কেবলগুলি। এই সেতুটির জন্য স্টীলের প্রয়োজন হয়েছে ১৩,৩০০ টন। নাটবল্টু সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে হাওড়ার বিখ্যাত কোম্পানী গেস্টকিন উইলিয়াম। এই পোলের খরচ নির্বাহের জন্য রাজ্য সরকার 'টোল ট্যাক্স' চালু করে অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা করেছেন। স্মরণে রাখতে হবে, মোট খরচের আশি শতাংশ খরচই কেন্দ্রীয় সরকার বহন করেছেন আর বাকি কুড়ি শতাংশ খরচ বহন করেছেন রাজ্য সরকার। কলকাতার দিকে জায়গা না পাওয়ায় হাওড়ার অংশেই সব টোল ঘরগুলি তৈরী হয়েছে। আর প্রতিটি টোল ঘরে কমপিউটার মাধ্যমে টোল আদায় করা হয়। হাওড়ার দিকে যান চলাচলের সুরাহা হতে এখনও অনেক বাকি—কারণ অনেক কাজই এখনও বাকি।

হাওড়ায় ট্রাম—রেলগাড়ী চালু হওয়ার পর স্থলপথে এ শহরে আর এক দ্রুতগামী যান চালু হ'ল সেটি হচ্ছে ট্রাম গাড়ী। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, একটি নদীরই অপর পারে হাওড়া শহর অবস্থিত হ'লেও এখানে ট্রাম চালু হয়েছিল কলকাতার অনেক পরে। কলকাতায় ট্রাম প্রথম চালু হয়েছিল ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৮০। অবশ্য সেই ট্রাম ঘোড়ায় টানতো। কিন্তু হাওড়া শহরে বৈদ্যুতিক ট্রাম একেবারেই চালু হ'ল। ট্রাম লাইন প্রথম চালু হ'ল হাওড়া স্টেশন থেকে শিবপুর অঞ্চলে কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্রটি স্থাপিত হ'ল শালিখায়—ঘাসবাগান ট্রাম ডিপোতে। হাওড়া-শিবপুর শাখায় প্রথম ট্রাম চালু হয় ১০ই জুন ১৯০৮। এই লাইনের দৈর্ঘ্য ছিল তিন কিলোমিটারের মত। বর্তমান শিবপুর ট্রাম ডিপো বলে যে স্থানটি পরিচিত সেখান পর্যন্তই লাইনটি ছিল। হাওড়া বাঁধাঘাট (ভায়া জি. টি. রোড) শাখায় লাইন পাতা হল ৩. ৭. ১৯০৮ তারিখে। আর হাওড়া-বাঁধাঘাট শাখায় (ভায়া হাওড়া রোড হয়ে) লাইন চালু হয় ২. ১০. ১৯০৮ তারিখে। 'কলকাতা দর্পণের' লেখক রাধারমণ মিত্র লিখছেন—'হাওড়ার উত্তর বিভাগের (শালকিয়ায়) দুটি লাইনই খোলা হয় ১৯০৮ সালে—সঠিক তারিখ জানতে পারিনি।' সুতরাং উপরিউক্ত তারিখগুলি জানা এক্ষেত্রে বিশেষ মূল্যবান। মিত্র মশায় আরও লিখেছেন—'হাওড়ার উত্তর ও দক্ষিণ বিভাগের ট্রাম লাইন আর চালু নেই। এই দুটি বন্ধ হয়ে গেছে ১৯৭০ সালে। এক্ষেত্রেও তিনি সঠিক কোন তারিখ দিতে সমর্থ হননি। এবং একটির সাল ভুল দিয়েছেন। ভবিষ্যৎ ইতিহাস রচনার কথা চিন্তা করেই সেই তারিখ দুটি দেওয়া হল। শালিখা অঞ্চলে ট্রাম উঠে যায় ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০ আর শিবপুর অঞ্চলের ট্রাম উঠে যায় ৫ই ডিসেম্বর ১৯৭১ (১৯৭০ সাল নয়) *।

---

* ট্রাম কোম্পানীর এই তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন সুপারভাইজিং ট্রাফিক এ্যাসিস্ট্যান্ট শ্রীপতিতপাবন বর্মন (ছেঁচে বর্মন)।

হাওড়ায় বাস—ট্রাম গাড়ির মতই কলকাতায় বাস চালু হবার বহু পরে হাওড়ায় বাস চলেছিল। ট্রামের মতই তখন বাস ঘোড়ায় টানতো। প্রথম ঘোড়াটানা বাস কলকাতায় চালু হয় ১৯২০ সালে।[১০] এই বাস চালু হবার পেছনে যে ইতিহাস আছে তা পড়ে পাঠক খুশিই হবেন। প্রসিদ্ধ নট অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় (নিজেকে হারায়ে খুঁজি বইতে) বলছেন—'ততদিনে শহরে বেশ বাস চালু হয়ে গেছে। জালিয়ানওয়ালাবাগ, মহাত্মাজীর আন্দোলন ইত্যাদি একের পর এক যে সব ঘটনা ঘটছে তার সঙ্গে চারিদিকে মিটিং আর হরতাল খুবই হতো। ট্রাম কোম্পানীর ধর্মঘট তো লেগেই ছিল। এক সময় সালটা ঠিক আজ মনে নেই, ট্রাম ধর্মঘট বেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। ফলে অফিসে যাতায়াত করা কষ্ট হতে লাগল মানুষের। সেজন্য যে সব অফিসে মাল বহার লরী ছিল তাতে বেঞ্চি পেতে তাঁদের বাবুদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করলেন তাঁরা। মালবাহী লরী—উঁচু তার পাটাতন, ছেলে ছোকরারা লাফিয়ে উঠতো। কিন্তু মধ্যবয়সী যাঁরা একটু বা মোটা হয়েছেন ভুঁড়ি হয়ে গেছে বেশী তাঁদেরই হতো অসুবিধা।…

মাল বইবার জন্য যাদের ছিল লরীর কারবার তারা বেশ এই সুযোগে লরী-গুলিতে বেঞ্চি ইত্যাদি দিয়ে যাত্রী বইবার লাইসেন্স বার করে নিল। এর পরই রাস্তায় বাস চলতে লাগলো। কলকাতায় বিখ্যাত **Walford** কোম্পানীর পরিচালনায় বড় বড় বাস নিয়মিত চালু হ'লেও তার আগেও কিন্তু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কলকাতার রাস্তায় বাস চলতো; 'কলকাতা দর্পণে' রাধারমণ মিত্র লিখেছেন ঃ 'দেখতে দেখতে (**Walford** কোম্পানীর আগে) কলকাতার রাস্তায় বিচিত্র সব নামকরা বাসের আমদানী হ'ল। মেনকা, কিন্নরী, উর্বশী, পথের বন্ধু, চলে এসো ও আমি যাচ্ছি, এসব।' নামগুলি থেকে নিশ্চয়ই বুঝতে পারা যায় যে, এগুলি হয়তো সবই এদেশীয়দের দ্বারা চালু হয়েছিল।

তবে ডবল ডেকার বাসের প্রবর্তন করেছিল **Walford Transport** কোম্পানী ১৯২৬ সালে। অবশ্য সেগুলি আজকের মত ছাউনি যুক্ত ছিল না। 'কলকাতা দর্পণে' তারও এক মজাদার বিবরণও দেওয়া আছে। তাতে লেখা হচ্ছে ঃ 'গ্রীষ্মের সময় প্রচুর লোক হাওয়া খেতে বাসে উঠতো। কালীঘাট থেকে এক বাসে শ্যামবাজার গিয়ে, আবার ঐ বাসেই কালীঘাটে ফিরে আসা—এ তখন ছিল বহু লোকের শখ।

এবারে হাওড়ার কথায় আসা যাক। হাওড়ায় ঠিক কত সালে বাস চলেছিল তার সঠিক তারিখ সাল জোগাড় করা সম্ভব হয়নি। সম্ভবতঃ ১৯২৪ সালে হাওড়ায় প্রথম বাস চলে। এ বাস চলা নিয়েও দুটি মত আছে—একদল বলেন, হাওড়া শহরে প্রথম বাস চলে রামরাজাতলা ও হাওড়া স্টেশনের মধ্যে। এই বাস চালান রামরাজাতলারই বাসিন্দা—রায় এণ্ড কোম্পানী নামে একটি প্রতিষ্ঠান।

অপরপক্ষে আরেক দল বলেন, হাওড়া শহরে প্রথম বাস চলে হাওড়া থেকে শালকিয়াতে। শালকেতে প্রথম যে বাস চলেছিল তার নাম 'মহাবীর'। বাবুডাঙ্গার ঘোষাল বাগানের বাসিন্দা ভোজ নাগরওয়ালা নামে জনৈক অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী

হাওড়া থেকে বাঁধাঘাট (ভায়া জি. টি. রোড) ঐ বাসটি চালান। (মতান্তরে মহাবীর বাসের মালিক ছিলেন তরণী দাস—কালীপদ দাসের জামাই।) ঐ বাসটির আসন সংখ্যা ছিল মাত্র পনেরটি। এই মালিকেরই অপর দুটি বাস ছিল **Orange William** ও **Napolean** নামে। কিন্তু এই ভদ্রলোকের ব্যবসা বেশিদিন চললো না। কারণ প্রতিদ্বন্দ্বী **S.T.A.** কোম্পানীর অর্থাৎ **Salkia Transport Agency**-র আবির্ভাব। এই কোম্পানীর মালিক নন্দকুমার সিংহ শালিখার একজন প্রাচীন বাসিন্দা। এই কোম্পানী যেমন বহুদিন চলেছিল তেমনি এই ব্যবসায়ে তাঁদের সুনামও ছিল। এর কারণও অবশ্য আছে। এই বংশের রাম সিং চৌধুরী নিজ বাসভূমি পাঞ্জাব থেকে এখানে এসে প্রথমে গরুগাড়ি, ঘোড়াগাড়ি ও উটেরগাড়ি মাধ্যমে মাল চলাচল করতেন। এমনকি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাক বিলি পর্যন্ত তখনকার দিনে এঁরা করতেন। সুতরাং নন্দকুমার সিংহ মশায়ের বংশানুক্রমিক অভিজ্ঞতা এই ব্যবসায়ে তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এই কোম্পানীর ব্যবসা এত উন্নতি করেছিল যে, এক সময়ে এঁদের অধীনে একান্নটি বাস বিভিন্ন লাইনে চলতো। বেশ কয়েক বছর হ'ল এই কোম্পানীটি উঠে গেছে। বাসের ব্যবসা ছাড়া এঁদের যাত্রীবাহী জাহাজও ছিল। মাত্র সাড়ে আট টাকায় ডেকেতে (খাওয়া সমেত) কলকাতা থেকে রেঙ্গুনে যাওয়া যেত। এঁদের দেখাদেখি বাবুডাঙ্গার শিবচন্দ্র ঢ্যাং 'কার্তিক' ও 'গণেশ' নামে দু'খানি বাস হাওড়া স্টেশন থেকে বালিখাল পর্যন্ত চালিয়েছিলেন।

আজ হাওড়া শহরে বাসের রুট ও সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক। কিন্তু উপরিউক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করলে হাওড়া শহর শালিখাতেই যে প্রথম বাস চলেছিল এই অনুমানকে একেবারে নস্যাৎ করাতো যাচ্ছেই না বরং এই দাবিই বেশি গ্রহণযোগ্য ব'লে মনে হয়। হাওড়ার বাসরুটের নম্বরগুলির দিকে যদি দৃষ্টিপাত করি তা হ'লে দেখা যাবে যে, ৫১ থেকে বাসের রুট নম্বর করা হয়েছে। ৫১নং বাস হাওড়া থেকে বাঁধাঘাট হ'য়ে বালিখাল—বর্তমানে ডানলপ ও ডানকুনি পর্যন্ত হয়েছে। এরপরই কিন্তু ৫২নং বাস শালকিয়ায় পর্যায়ক্রমে না হ'য়ে রামরাজাতলা রুটে দেওয়া হয়েছে। এমনিভাবে ৫৩ (এখন নেই) ও ৫৪নং বাস যথাক্রমে পঞ্চাননতলা ও বালি পর্যন্ত নম্বর দেওয়া হয়েছে। এভাবে ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬৩ প্রভৃতি রুটের বাসগুলি চলতে থাকে। এই বিচারে শালকিয়ায় যে প্রথম শহরে বাস চলেছিল তা স্বীকার করতেই হয়।

মিনিবাস—যানবাহনের ক্ষেত্রে মিনিবাস কথাটি বেশ এ রাজ্যে শোনা যেতে থাকে সত্তরের দশকে। কলকাতায় প্রথম মিনিবাস চালু হয় সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের মন্ত্রীসভা চলাকালীন সময়ে। ঐ মন্ত্রীসভায় রাজ্যের তদানীন্তন পরিবহন মন্ত্রী ছিলেন জ্ঞানসিং শোহন পাল। শোনা যায়, তাঁরই মাথা থেকে কলকাতায় প্রথম মিনিবাস প্রচলনের পরিকল্পনা বের হয়। কলকাতায় প্রথম এই বাস চালু হয় ১৯৭২ সালে তারপর হওড়াতেও চালু হয় একই বছরে। তবে আজকে গ্রামে গঞ্জে এই বাস চালু হলেও প্রথমে যে সুখ পাওয়া যেত তা আজ কোথাও নেই। তখন

মিনিতে কেবল মাত্র নির্দ্ধারিত সংখ্যকই যাত্রী নেওয়া হত। আর বাসগুলিতে সোজা হয়ে দাঁড়ানো যেত না। কারুর ঘাড়ে স্পণ্ডেলাইটিস হলেই ঠাট্টা করে বলতো মিনিতে হেঁট হয়ে দাঁড়ানোর জন্য হয়েছে। আজকে মিনি উঁচু হয়েছে—যাত্রী ওঠার মা বাপও নেই—তথাপি কিন্তু স্পণ্ডেলাইটিস বেড়েই চলেছে।

জল পরিবহন—হাওড়ার বর্তমান প্রজন্মের কাছে হুগলী নদী জলপথ পরিবহন সমবায় সমিতি একটি অতি পরিচিত নাম। সাধারণ মানুষ বলে হুগলী জলপথ। হাওড়া স্টেশন থেকে কলকাতার বিভিন্ন অংশে যেতে হাওড়া ব্রীজে সত্তরের দশকের শুরু থেকে যে জ্যামজট প্রায়ই লেগে থাকতো তা ভুক্তভোগীদের আজও স্মরণ থাকতে পারে। সেই অবস্থা লাঘবের জন্য দ্বিতীয় হুগলী সেতু শিলান্যাস করা হয় ১৯৭২ সালে। কিন্তু এটি একটি দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা তাই স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা হিসাবে সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের মন্ত্রীসভা আর্মেনিয়ান ঘাট ও হাওড়া স্টেশনের মধ্যে নদীপথে একটি ফেরী চলাচলের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। নদী ঘাটে পাইলিংএর কাজও শুরু হয়ে যায়। কিন্তু সরকারী কাজের দীর্ঘসূত্রতা স্বাভাবিক ভাবেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হয়ে ওঠে না। রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হেতু পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে আরও সময় লেগে যায়। অবশেষে হুগলী নদী জলপথ পরিবহন সমবায় সমিতির মাধ্যমে এই জলপথটি বামফ্রন্ট সরকার চালু করতে অনুমতি দেন। ১৯৮০ সালের ২রা মে জনসাধারণের সেবায় এটি খুলে দেওয়া হয়। যার প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন রাজ্যের বর্তমান কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্প-মন্ত্রী প্রলয় তালুকদার। হুগলী জলপথ সম্বন্ধে আলোচনার প্রারম্ভে হুগলী নদীতে যাত্রী পরিবহনের অতীত ইতিহাস সংক্ষেপে একটু আলোচনা করা যেতে পারে।

হুগলী নদীতে পণ্যপারাপারের সঙ্গে যাত্রী চলাচলেরও ব্যবস্থা ইংরেজ আমল থেকেই ছিল। আর সেটা ছিল বাষ্পীয় যানেই। এ ব্যাপারে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জোড়াসাঁকোর ধারে' রচনা থেকেই সামান্য উদ্ধৃতি দেওয়া হল। তিনি লিখছেন—খুব অসুখ থেকে ভুগে উঠেছি। নিজে ওঠবার বসবার ক্ষমতা নেই। ভোর ছটায় তখন ফেরি স্টীমার ছাড়ে জগন্নাথ ঘাট থেকে শিবতলা ঘাট* হয়ে ফেরে নটা সাড়ে নটায়। বিকেলেও যায়—অপিসের বাবুদের পেঁছে দিয়ে আসে। ঘণ্টা দুই আড়াই লাগে। ডাক্তার বললেন—গঙ্গার হাওয়া খেলে সেরে উঠব তাড়াতাড়ি। নির্মল আমায় ধরে ধরে এনে বসিয়ে দিলো স্টীমারের ডেকে একটা চেয়ারে। মনে হল, যেন গঙ্গাযাত্রা করতে চলেছি—এমনি তখন অবস্থা আমার। কিন্তু সাতদিন যেতে না যেতে গঙ্গার হাওয়ায় এমন সেরে উঠলুম, নির্মলকে বললুম, 'আর তোমার আসতে হবে না, আমি একাই যাওয়া আসা করতে পারব।' তিনি 'পথে বিপথে' বইতে আরও লিখছেন—ফেরী ঘাটগুলি ছিল পোর্ট কমিশনারের। প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বিভাগ ছিল। স্টীমার ছাড়ার ও ধরার টাইম টেবিল

* কাশী মিত্রির ঘাটের উত্তরে।

ছিল। দৈনিক যাত্রীভাড়া ছাড়া নিত্য যাত্রীদের জন্য মানথলি টিকিটেরও ব্যবস্থা ছিল।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে কলকাতার গঙ্গাবক্ষে ফেরী সার্ভিসের প্রচলন তখনকার দিনে যানজট না থাকলেও উহা চালু ছিল। এটা নূতনত্ব কিছু নয়। বরং বিদেশী কোম্পানীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে স্বদেশী কোম্পানীও গড়ে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশী প্রয়াসের উল্লেখ করা যেতে পারে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠিক করলেন যে তিনি খুলনা ও বরিশালের মধ্যে স্বদেশী ফেরী সার্ভিস চালু করেবেন। 'সরোজিনী' নামে একটি স্টীমার কিনে তিনি ফেরী চলাচল শুরু করলেন। সেদিনই আবার ঘটনাচক্রে 'ফ্লোটিলা' নামে একটি লঞ্চ সার্ভিসও চালু করল একটি বিদেশী কোম্পানী।[১১] উভয় কোম্পানীর প্রতিযোগিতা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছল যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যাত্রীদের ভাড়া না নিয়ে বরং তাদেরই মাথাপিছু টাকা দিতে শুরু করলেন—যাতে বিদেশী ফেরীতে লোকে না চাপে। ফল—ধনে প্রাণে মরার মত।

অতদিন আগেকার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। ১৯২৫ সালে ঘাটাল স্টীম নেভিগেশন কোম্পানী নামে একটি পাবলিক লিঃ কোম্পানী চালু করা হল। উদ্দেশ্য ঘাটাল থেকে কোলাঘাট পর্যন্ত স্বদেশী স্টীমারে যাত্রী চলাচল করা। বিদেশী 'হোরমিলার স্টীমার কোম্পানী'ও ঐ পথে যাত্রী চলাচল করাতো। ঘাটাল কোম্পানীকে প্রতিযোগিতায় হারাবার জন্য হোরমিলার কোম্পানী যাত্রীদের বিনামূল্যে সিগারেট দিতে লাগল। অসম এই প্রতিযোগিতায় পেরে উঠতে পারলেন না কোম্পানীর পরিচালক ও শালকিয়ার অধিবাসী বিপিনচন্দ্র ভট্টাচার্য মশায়।

বিপিনবাবুর এই সাহসিকতাপূর্ণ কাজে তদানীন্তন হাওড়া কংগ্রেসের সভাপতি সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান। তিনি কলকাতার তদানীন্তন মেয়র সুভাষ চন্দ্র বসুকে (নেতাজী) ধরে কলকাতার পোর্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আহিরীটোলা ও বাঁধাঘাটের মধ্যে ফেরী পারাপারের জন্য দুটি ঘাট ৯৯ বছরের লীজ করিয়ে দেন। আজও সেই ফেরী সার্ভিস চলছে। তবে এই কাজে বিপিনবাবুকে যাঁরা বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন সেই কোম্পানীর নামও না করলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকবে। সেই কোম্পানীটির নাম হচ্ছে 'ইন্দো সুইস্ ট্রেডিং কোং'। এখানে উল্লেখ না করে পারছি না যে বিপিনচন্দ্র ভট্টাচার্য স্বদেশী শিল্প গঠনের আড়ালে স্বদেশী আন্দোলনে সাহায্য করে যাচ্ছিলেন বলে পুলিশ তাঁর উপরে অত্যাচার করে। অপরপক্ষে ইন্দো সুইস্ কোং অন্যতম মালিক বীরু দাসগুপ্তও জার্মানী থেকে ভারতের বিপ্লবীদের অস্ত্র সরবরাহ করার কাজে যুক্ত ছিলেন। সেখান থেকে তিনি সুইজারল্যাণ্ডে পালিয়ে যান। তারপর তিনিও জাহাজ শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। বরিশালে বীরু বাবুদের ইন্দো সুইস্ কোম্পানীর ফেরী সার্ভিস ছিল। রাজনৈতিক সহমর্মীতাই বিপিনবাবু ও বীরু-বাবুকে এই কারবারটি চালাতে সাহায্য করে। যতদূর জানা যায় বিংশ শতাব্দীর

তিরিশের দশক থেকেই এই ফেরী সার্ভিসটি চালু হয় এবং অদ্যাবধি চলছে। এই বীরু দাশগুপ্তেরই এক ভাই ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রীসভার একজন বিশিষ্ট মন্ত্রী খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।* এছাড়া রাজগঞ্জ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্তও জলপথে ফেরী চলাচল করতো। স্বাধীনতা লাভের পরে তাও বন্ধ হয়ে যায়।

যা হউক কলকাতা শহরাঞ্চলের সঙ্গে হাওড়া শহরাঞ্চলের যানজটের সমস্যা এড়াবার জন্য আবার আশির দশকে নদীবক্ষে যাত্রী পারাপারের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে দেখা দেয়। তাই ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় এলে পূর্ববর্তী সরকারের পরিকল্পিত স্থানেই ফেরী চলাচল শুরু হয় যা আগেই বলা হয়েছে। প্রথমে আর্মেনিয়ান ঘাটও হাওড়া স্টেশন ঘাটের মধ্যে ফেরী চলাচল করলেও কর্তৃপক্ষের সুপরিচালনায় অচিরেই পর্যায়ক্রমে হাওড়া—চাঁদপাল ঘাট, হাওড়া—শোভাবাজার, হাওড়া—বাগবাজার, হাওড়া—বেলুড় বালী, নাজিরগঞ্জ—মেটিয়া-বুরুজ, হাওড়া—গার্ডেনরীচ, হাওড়া—ফেয়ারলি, হাওড়া—কাশীপুর ইত্যাদি খোলা হয়েছে। এই ব্যাপারে হুগলী জলপথকে হাওড়ার ব্যাঁটরা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক যেভাবে সাহায্য করে গেছে তা কর্তৃপক্ষ সর্বদাই সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেন। পরে দুই-একটি লাইন উঠে গেলেও পরবর্তী চেয়ারম্যান বিধায়ক লগনদেও সিং-এর কার্যকালে হুগলী জলপথের আর্থিক অবস্থা যেমন সুদৃঢ় হয়েছে তেমনি দুচারটি নতুন লাইনও চালু করে নিত্যযাত্রীদের সাধুবাদও কুড়িয়েছেন বা কুড়োচ্ছেন।

* এই তথ্যটি সরবরাহ করেছেন ঘাটাল কোম্পানীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী রাধেশ্যাম পাল।

১. পূর্ব রেলের পথে পথে—আশিস কমল সরকার।

২, ৩. হুগলী জেলার ইতিহাস—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মাসিক বসুমতী—১৩৪১ সন।

৪, ৫. District Gazetteer—How. 1909—O' Malley & M. Chakraborty.

৬. ৭. ৮. Howrah Civic Companion—J. Bonnerjee.

৯. আনন্দবাজার পত্রিকা ৯ই অক্টোবর, ১৯৯২।

১০. রাধারমণ বাবুর মতে ১৯২২ সনে প্রথম কলকাতায় যাত্রীবাহী বাস চালু হয়।

১১. অনন্ত রবীন্দ্রনাথ—ডঃ নিমাই বসু।

স্বায়ত্ত-শাসন

স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান বলতে প্রধানত বোঝায় কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ইত্যাদি। ইংরেজরা এদেশে শাসনভার হাতে নিয়ে প্রথমেই রাজধানী কলকাতার (আজকের সীমানায় নয়) নাগরিক জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কলকাতা কর্পোরেশন প্রথমেই গড়ে তুলেছিলেন। পরে অবশ্য বঙ্গদেশের অন্যান্য জেলায়ও মিউনিসিপ্যালিটি গঠনের জন্য তৎপর হন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে প্রথম মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট তৈরী করা হয়। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক উক্ত আইনটি আট বছর পর্যন্ত হিমঘরে আবদ্ধ থাকে।

পরে ১৮৫০ সালে ২৬নং ধারা বলে এক সরকারী বিশেষ আদেশে এই আইনটি জারি করা হল। এই আইন বলেই বাংলাদেশে মিউনিসিপ্যালিটি জেলায় জেলায় প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। বাংলাদেশে কবে কোন জেলায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্য্যায়ক্রমে মিউনিসিপ্যালিটি তৈরী হয়েছিল তা জানার আগ্রহ পাঠকমনে স্বাভাবিকভাবেই আসতে পারে। গবেষকরা এ ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য দিয়ে থাকেন। বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল আইনের রচয়িতা মিঃ পারগিটার (Mr. pergiter) লিখছেন—'**Only one Municipality in Bengal viz. Uttarpara dates its birth from 1850.**' কিন্তু **Howrah civic Companion**-এর লেখক **J. Bonnerjee** লিখছেন—**The real facts are the Uttarpara Municipality was first constituted on 14. 4. 1853 under Act XXVI of 1850.** এক্ষেত্রে তথ্যের দিক দিয়ে বিচার করলে জে, বোনাজীর মন্তব্যটিই সঠিক। বসন্ত কুমার সামন্ত তাঁর 'জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়' গ্রন্থেও লিখছেন—১৮৫১ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর শ্রীরামপুরের তদানীন্তন জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট সি, টি, বাকল্যাণ্ডের নিকট ১৮৫০ সালের মিউনিসিপ্যাল আইনের ২৬নং ধারা বলে উত্তরপাড়া পল্লীকে শহরের মর্যাদা ও অধিকার দেওয়ার প্রার্থনা জানালেন অর্থাৎ পৌরসভা গঠনের কথা বললেন। শেষ পর্যন্ত ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল উত্তরপাড়া পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হল। মিউনিসিপ্যাল কমিশনার হলেন জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও হরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—সভাপতি হলেন পদাধিকারবলে শ্রীরামপুরের ম্যাজিস্ট্রেট। অপরপক্ষে স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় (**B. P. Singha Roy**) তাঁর রচিত **Indroduction to Bengal Municipal act** পুস্তকে লিখেছেন—'**Only two Municipalities took advantage of the Act XXVI of 1850, i.e. Jamalpur and Monghyr now in Bihar, then in Bengal.**[১] অপর এক গ্রন্থের রচয়িতা এ, জে, দাস, আই, সি, এস, তাঁর **Darjeeling District**

Gazetteer, ১৯৪৭ লিখছেন—The Darjeeling Municipality was first constituted on 1st of July 1850.

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি বর্তমানে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে উন্নীত হয়েছে (১৯৮৪)। এছাড়া বালি মিউনিসিপ্যালিটি ও উলুবেড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটি নামে আরও দুটি পুরসভা কাজ করছে।

এসব সত্বেও বয়সের প্রবীণত্বে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি প্রাচীনতম না হলেও আয়তনের বিস্তৃতিতে, জনসংখ্যার আধিক্যে, শিল্প প্রতিষ্ঠানের পত্তনের গুরুত্বে, নগরী-শ্রেষ্ঠ কলকাতার সান্নিধ্যে থাকার সুবাদে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মিউনিসিপ্যালিটি বলে আখ্যা লাভ করেছিল। আজ অবশ্য তা কর্পোরেশনে উন্নীত হয়েছে। ১৮৬২ খ্রীঃ ৩রা ডিসেম্বর তারিখে সরকারের এক আদেশ বলে (যার নম্বর ছিল ৪৯৭৯) তদানীন্তন বঙ্গীয় সরকার চৌদ্দজন সদস্য বিশিষ্ট হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কমিটি নামে প্রথম একটি কমিটি তৈরী করেন। এই কমিটির প্রথম সভা হয় ১৯.১.১৮৬৩ খ্রীঃ বর্ধমান ডিভিশনের কমিশনার Mr. G. Glowden-এর সভাপতিত্বে। কিন্তু প্রথম হাওড়া মিউনিসিপ্যাল বোর্ড গঠিত হয় ১৮৬৪ খ্রীঃ ৩নং ধারা অনুসারে। কলকাতা গেজেটের ৪ঠা মে ১৮৬৪ খ্রীঃ প্রকাশিত সংখ্যায় এগারোজন সদস্য-বিশিষ্ট হাওড়া মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের সদস্যদের নাম প্রকাশিত হয়। তাঁরা হলেন—

1. Mr. E. C. Craster, District Magistrate, Chairman.
2. Mr. N. Macnicol, Vice-Chairman.
3. Dr. R. Bird M. D.
4. Mr. C. H. Denham C. E.
5. Mr. R. W. King.
6. Mr. W. Stalkartt.
7. Mr. I. Stalkartt.
8. Mr. R. N. Burgess.
9. Mr. D. W. Campbell.
10. Babu Gopal Lal Chowdhury.
11. Babu Khetra Mohon Mitter.
12. Babu Raj Mohan Bose.

এই তালিকায় ১ নম্বর নামটিকে পদাধিকার বলে সদস্য হিসাবে বাদ দিয়ে এগারজনের তালিকাটি পড়তে হবে। এখানে উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন যে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল আইনে তার অন্তর্গত অঞ্চলগুলির নামও কলকাতা গেজেটের ৪. ৫. ১৮৬৪ খ্রীঃ নোটিশরূপে ছাপা হয়েছিল। তাতে অতিরিক্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে ছিল—বালি, নিশ্চিন্দা, ঠাকুরান চক, অভয়নগর, জোরহাট, আন্দুল, মহিয়াড়ি,

বাঁকড়া, বালটিকুরি, জগাছা, জিগাছা, কোনা, দুর্গাপুর, সাতাশি, একসরা প্রভৃতি জায়গারও উল্লেখ আছে।[২]

পরে অবশ্য ১৮৮৩ খ্রীঃ ১লা এপ্রিল থেকে বালি মিউনিসিপ্যালিটি আলাদা-ভাবে গঠিত হয় যা এখনও নিজ সামর্থে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যত্র এর কথা বলা হবে।

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির বোর্ডের প্রথম সভায় (৬. ৫. ১৮৬৪) ঠিক হয় যে সাতাশি, আন্দুল-মৌড়ি, কোলা ও রাজগঞ্জ প্রভৃতি এলাকাকে হাওড়া পৌরসভা থেকে বাদ দেওয়া হউক।[৩]

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল প্রথম বোর্ডের এগারজন মনোনীত সদস্যদের মধ্যে ৬, ৭, ১১ ও ১২ নম্বর সদস্যরা সকলেই শালিখার অধিবাসী ছিলেন। এঁদের মধ্যে আবার স্টলকার্ট ভ্রাতৃদ্বয়ের অবদানই এই বোর্ড গঠনে সর্বাধিক ছিল বলে জানা যায়। এঁদের পরিচিতি অন্যত্র দেওয়া হয়েছে।

এই বোর্ডের এগার সদস্যের মধ্যে মাত্র তিনজন সদস্য ভারতীয় ছিলেন। তাই ১৮৮৪ খ্রীঃ ১লা আগস্ট এক নূতন আইন প্রবর্তিত হল। তাতে ঠিক হল যে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচিত হবেন। ১৮৮৪ খ্রীঃ ২৯শে নভেম্বর ও ১লা ডিসেম্বর সর্বপ্রথম হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রথম নির্বাচনে ভোটার ছিলেন ২৬৫২ জন। শতকরা ৬১'০৫ জন ভোট দিয়েছিলেন।[৪] এখানে মনে রাখতে হবে যে তিরিশজন সদস্য বিশিষ্ট বোর্ডের কুড়িজন হবেন নির্বাচিত—বাকি দশজন হবেন সরকার কর্তৃক মনোনীত। প্রথম নির্বাচিত সদস্যদের নামের তালিকা হল নিম্নরূপ[৫]—

ওয়ার্ড নম্বর	কমিশনারের নাম
১	পূর্ণচন্দ্র কুমার ও জটাধারী হালদার
২	অক্ষয় চ্যাটার্জী
৩	উপেন্দ্রনাথ মিত্র, দীননাথ সান্যাল, অনুকূল মিত্র
৪	রামেশ্বর মালিয়া, গিরীশ বসু
৫	উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী, শিবচন্দ্র বসু
৬	নরসিংহ দত্ত, গঙ্গাধর ব্যানার্জী
৭	অমৃতলাল পাইন, গোপালচন্দ্র মিত্র
৮	রামচন্দ্র রায়চৌধুরী, চন্দ্রকুমার ব্যানার্জী ও গুরুচরণ রায়চৌধুরী
৯	তুলসীদাস মুখার্জী, হরিনাথ শর্মা
১০	কেদারনাথ ভট্টাচার্য

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে এখনকার মত প্রতি ওয়ার্ডের জন্য একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল না। কোন কোন ওয়ার্ড অত্যধিক বড় থাকায় দুজন বা তিনজন করেও প্রতিনিধি একই ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত হতেন।

তদানীন্তন বোর্ডে ইংরেজ সিভিলয়নদের কর্তৃত্ব ছিল সর্বব্যাপী। কিন্তু ১৮৮৬ খ্রীঃ ২৪শে মার্চ বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ ক্ল্যাপ্টার পদত্যাগ করেন। তাই ৭ই এপ্রিল শালিখার অধিবাসী উপেন্দ্র নাথ মিত্র (যাঁর নামে উপেন্দ্র মিত্র লেন) প্রথম ভারতীয় যিনি বে-সরকারী চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। কিন্তু নির্বাচনে বিধিগত ত্রুটি থাকায় তাঁর নির্বাচন অবৈধ বলে বিবেচিত হওয়ায় সিভিল সার্জেন ডাঃ পিলচার চেয়ারম্যান হন। আর সাঁত্রাগাছির অধিবাসী কেদারনাথ ভট্টাচার্য প্রথম বে-সরকারী ভারতীয় ভাইস-চেয়ারম্যান হন।

১৮৯১ খ্রীঃ আবার বাবু উপেন্দ্রনাথ মিত্র বোর্ডের বে-সরকারী প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। কিন্তু এবার তিনি অসুস্থতাবশত উক্তপদে যোগ দিতে অসমর্থ হয়ে ঐ পদে ইস্তফা দেন।[৬] সরকারী তথ্য বলছে যে ১৯১৬ খ্রীঃ পর্যন্ত জেলা শাসকরাই অর্থাৎ ইংরেজ সিভিলিয়নরাই বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়ে আসছিলেন। এতদিন মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের সদস্যগণ ব্যক্তিগতভাবে মনোনীত ও নির্বাচিত হয়ে আসছিলেন।

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ১৯১৯ খ্রীঃ মণ্টেগু-চেমসফোর্ড অ্যাওয়ার্ডে স্বায়ত্তশাসনে ভারতীয়দের অংশগ্রহণের দাবি করা হয়েছিল।

ইতিমধ্যে অবশ্য হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি নাগরিকদের জন্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজ করতে সক্ষম হয়েছে—যেমন ১৮৯৬ খ্রীঃ পানীয় জলের জন্য শ্রীরামপুরে ওয়াটার ওয়ার্কস চালু হল। তারপর ১৮৯৮ খ্রীঃ হাওড়া শহরে চালু হল গ্যাসের আলো। এই গ্যাস সরবরাহের ভার নিয়েছিল ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানী। রাস্তায় রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বলতে লাগলো। 'নগর হাওড়া' গ্রন্থের রচয়িতা অলোককুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন—সে যুগে সারা বর্ধমান ডিভিশনে যে কটি প্রথম শ্রেণীর মিউনিসিপ্যালিটি ছিল তাদের মধ্যে হাওড়া ছাড়া অন্য কোথাও আলোর ব্যবস্থা ছিল না।

১৯১৬ খ্রীঃ হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি হল। এই সালেই দক্ষিণ হাওড়ার অধিবাসী মহেন্দ্র নাথ রায়-ই একমাত্র ব্যক্তি যিনি হাওড়া পৌরসভার প্রথম ভারতীয় চেয়ারম্যান (১৯১৬-২০)। শ্রীরায় চার বছরের জন্য চেয়ারম্যান থাকাকালীন সময়ে কিছু কিছু নূতন ব্যবস্থা চালু করে যান, যেমন—কর্মচারীদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের প্রচলন, হাওড়া পৌরসভার একটি মুদ্রিত ম্যানুয়েল প্রকাশ ও পৌরসভায় সার্ভে বিভাগ প্রবর্তন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য ছিল তাঁরই আমলে হাওড়া শহরের বিভিন্ন পাকা রাস্তায় গ্যাসের বাতির অবসান এবং বৈদ্যুতিক আলোর প্রবর্তন। ১৯১৬ খ্রীঃ হাওড়া শহরের রাস্তায় গ্যাসের বাতি উঠে যায়।[৭]

পূর্বেই বলা হয়েছে, স্বাধীনতা আন্দোলনে ১৯১৯ খ্রীঃ মণ্টেগু চেমসফোর্ড অ্যাওয়ার্ডে স্বায়ত্তশাসন বিভাগে ভারতীয়দের অংশগ্রহণে দাবি জানানো হয়েছিল। সুতরাং মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনেও যে রাজনৈতিক দলের প্রভাব পড়বে তাতে

আর সন্দেহের কি আছে। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিতেও তাই দেখা গেল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই পৌরসভার নির্বাচনে দলের প্রার্থী দিয়ে প্রথম নির্বাচনে অবতীর্ণ হল ১৯২৪ খ্রীঃ। এ ব্যাপারে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রধান নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করলেন। এই উপলক্ষ্যে দেশবন্ধুকে হাওড়া শহরে অনেক সভা করতে হয়েছিল। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে কংগ্রেস সেদিন জয়ী হয়েছিল ১, ২, ৩ ও ১০ নম্বর ওয়ার্ডে। আর তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন রামকৃষ্ণপুরের চারুচন্দ্র সিংহ। তাঁর দল জিতলেন (স্বভাবতই ইংরেজ ঘেষা) ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডে। বলা বাহুল্য, দেশবন্ধুর অত জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও চারু সিংহ মহাশয়ের নিকট কংগ্রেস প্রার্থীদের সেদিন পরাজয় হয়েছিল। পক্ষান্তরে তদানীন্তন তিন নম্বর ওয়ার্ডের দেশবন্ধুর মনোনীত তিনজন কংগ্রেস প্রার্থীই জয়ী হয়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন শালিখার বিজয়কুমার মুখাজী, পঙ্কজকুমার ঘোষ ও খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। এই নির্বাচন উপলক্ষে স্বয়ং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ হাওড়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বহু সভা করেছিলেন। তার মধ্যে শালিখার ক্ষেত্র মিত্র লেনের আর্য সমাজ ও পারিজাত সিনেমার কাছে ধর্মতলা মাঠে সভার দৃশ্য এখনও অনেক প্রবীণদেরই স্মৃতিতে ভাসছে। আর্য সমাজের সভায় কিছু ইংরেজ শাসকের পক্ষপুষ্ট সমর্থক তাঁর সভায় বাধা দান করার অপচেষ্টা করে। ঐ সভা শেষ করে তিনি যখন ধর্মতলার সভায় বক্তৃতা করতে যান তখন তাঁকে সেই সভায়ও বক্তৃতা করতে দেওয়া হয়নি। কংগ্রেস প্রার্থীর বিরোধীরা শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো বাতাসে ছড়িয়ে সভা পণ্ড করে দিয়েছিল। নির্বাচনের দিন রামকৃষ্ণপুর অঞ্চলে স্বয়ং চিত্তরঞ্জন দাশ করজোড়ে ভোটারদের কাছে কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দেবার আবেদন জানালেও বিত্তশালী চারুন্দ্র সিংহের বিরোধীতায় সেদিন চিত্তরঞ্জনের আবেদন পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। ফলে চারুচন্দ্র সিংহ দ্বিতীয়বারও চেয়ারম্যান হন। তিনি ১৯২০ থেকে ২০. ৮. ২৮ তারিখ পর্যন্ত চেয়ারম্যান ছিলেন।

হাওড়া পৌরসভা কর্তৃক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা তাঁরই আমলে প্রথম প্রবর্তিত হয় ১৯২৪-২৫ খ্রীঃ। প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে 'বীসে স্কীম' (**Bisse Scheme**) অনুযায়ী সরকারও পঞ্চাশ শতাংশ অনুদান দেওয়ার ব্যাপারে এগিয়ে এলেন। তাঁর কার্যকালে আরো কয়েকটি সুদূরপ্রসারী গণতান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ প্রবর্তিত হয়। যেমন, কমিশনারদের মাসিক বা পাক্ষিক সভায় সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হল।[৮] তা আজও বহাল আছে। গোপন ব্যালটের মাধ্যমে আজকে যে নির্বাচনের ব্যবস্থা আছে তা হাওড়া পৌরসভার ক্ষেত্রে প্রথম চালু হল ১৯২৫ সালের নির্বাচনে।

হাওড়া পৌরসভা স্থাপনাকাল থেকে এতদিন পর্যন্ত সেখানে কোন শ্রমিক ধর্মঘট হয়নি। কিন্তু ১৯২৭ খ্রীঃ এই চারুবাবুর আমলেই জঞ্জাল পরিষ্কার বিভাগের মজুরেরা মাহিনা বৃদ্ধির দাবীতে প্রথম ধর্মঘট করল। কর্তৃপক্ষ মাসিক আট টাকা মজুরী বৃদ্ধি করে সে বছর ধর্মঘট মেটালেও ১৯২৮ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে

আবার ধর্মঘট হয়। এবারও মাসিক আট টাকা মজুরী বৃদ্ধি করে ধর্মঘট মেটানো হয়।

চারুবাবুর আমলের আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে হাওড়া বেলিলিয়াস পার্কের ভার পৌরসভার হাতে হস্তান্তরিতকরণ। বেলিলিয়াস পার্ক আসলে আইজ্যাক র‍্যাফিয়েল বেলিলিয়াস নামে জনৈক ইহুদী ধনাঢ্য ব্যক্তির বাগানবাড়ি ছিল। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর এই একশ বিঘার বিরাট বাগান বাড়ির স্বত্ত্বাধিকারিণী হন তাঁর পত্নী রেবেকা আইজ্যাক। জনদরদিনী ও লোকপ্রিয়া শ্রীমতী রেবেকা তাঁর স্বামীর স্মৃতি-রক্ষার্থে ও জনহিতার্থে উক্ত সম্পত্তিটিকে জনগণের সেবায়ই দান করে দেন। সুদৃশ্য বাগান, বিরাট জলাশয়, ফুটবল খেলার মাঠ, সুন্দর ফুলের বাগান ও কুঞ্জবন সহ এই বাগান বাড়িটির অন্যতম প্রধান ন্যাস (ট্রাষ্টি) সুরঞ্জন দত্ত চেয়ারম্যান চারুবাবুর হাতে পৌরসভাকে হস্তান্তর করেন। এই বাগানের বাড়িটিতেই হাওড়ায় প্রথম কলেজ নরসিংহ দত্ত কলেজ ১৯২৪ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বাগানের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে হাওড়া সিভিক কম্পানিয়ানের লেখক জে. বোনার্জী লিখছেন—**It can be compared with any of the best Calcutta parks.** কিন্তু দুঃখের হলেও বাস্তব সত্য এই যে আজ তার রূপ দর্শনে জনমনে ক্ষোভ ও হতাশা ছাড়া আর কিছুই উদ্রেক করে না।

চারুবাবুর পরেই হাওড়া কোর্টের তথা বঙ্গদেশের বিশিষ্ট ফৌজদারী ব্যবহারজীবী বরদাপ্রসন্ন পাইন চেয়ারম্যান হন। কিন্তু বিশেষ আইনঘটিত ব্যাপারে অসুবিধা দেখা দেওয়ায় শ্রীপাইন চেয়ারম্যান পদে ইস্তফা দেন। ফলে শালিখার খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী প্রথমে ভাইস-চেয়ারম্যান ও পরে অ্যাকটিং চেয়ারম্যানও হন। বরদাপ্রসন্নের এই ইস্তফা নিয়ে হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটিতেও ভীষণ তোলপাড় হয়েছিল। এ ব্যাপারে স্বয়ং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কেও আসরে নামতে হয়েছিল। কারণ শ্রীচট্টোপাধ্যায় ছিলেন তখন জেলা কংগ্রেসের সভাপতি। আর খগেনবাবুও তার আগেই ছিলেন জেলা কমিটি কংগ্রেস সভাপতি। খগেন্দ্রনাথের উপর শরৎচন্দ্রের যে কিরূপ আস্থা ছিল তা নিচের চিঠি* থেকেই প্রকাশ পাবে—

Samtaberia, Panitras P. O.
Dist.—Howrah
23.1.29

My dear Khagen Babu,

According to our party decision Babu Haran Chandra Bhattacharjee and some of his friends and fellow-members of the Ward V had come to me the other night and had expressed their perfect willingness to go on with their usual work in the Ward Committee

as they had been doing previously to this unfortunate difference between themselves and the Chairman of the Municipality.

That it was a very very regretable affair all admitted and promised to forget without going into details any further. Whatever that might have happened due mainly to misunderstanding.

Yours affectionately,
S/d. Sarat Chandra Chatterjee

খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী অ্যাকটিং চেয়ারম্যান হিসেবে বছর খানেক থাকার পর রামকৃষ্ণপুরের বঙ্কিমচন্দ্র দত্ত ১৯৩৮ পর্যন্ত চেয়ারম্যান হন। যদিও এই বরদাপ্রসন্ন পাইনই নিজ ক্ষমতা বলে ১৯৩৮ খ্রীঃ থেকে ১৯৪৫ খ্রীঃ এপ্রিল মাস পর্যন্ত আবার চেয়ারম্যান পদে আসীন হন। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে বরদাবাবুর বোর্ডে ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন মৌলবী মহম্মদ শরিফ খান। খুব সম্ভবত তিনিই হাওড়া পৌরসভার প্রথম মুসলমান ভাইস-চেয়ারম্যান। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মুসমানদের পক্ষে জনপ্রতিনিধিত্ব দেবার জন্য একটি বিশেষ কনস্টিটুয়েন্সি তৈরি করা হল। তাতে প্রথম যে পাঁচজন মুসলমান জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন—ওয়ার্ড এ—মুন্সী জেল্লার রহিম, ওয়ার্ড বি—মৌলবী মহম্মদ শরিফ, ওয়ার্ড সি—খান সাহেব গুলাম রব্বানি, ওয়ার্ড ডি—মৌলবী আব্দুল আজিজ, ওয়ার্ড ই—ডাঃ শফিক আহমেদ।* খুব সম্ভব এই নির্বাচন শুরু হয় তিরিশের দশকের দ্বিতীয় অর্ধে।

হাওড়া পৌরসভার আর এক উল্লেখযোগ্য চেয়ারম্যান হচ্ছেন শালিখার অধিবাসী শৈলকুমার মুখার্জী। শৈলকুমারের আমলে হাওড়া পৌরসভার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারমূলক কাজ প্রবর্তিত হয়। যেমন জঞ্জাল পরিষ্কারে গো-যানের পরিবর্তে লরীর প্রচলন, S. N. Modak's Award[১০] অনুযায়ী পৌরকর্মীদের প্রথম গ্র্যাচুইটি চালুকরণ, পে-স্কেলের গ্রেড পরিবর্তন, পৌরসভার বর্তমান সীল প্রবর্তন (আগে সীল ছিল রেল ইঞ্জিন), বেলগাছিয়ায় ট্রেনচিং গ্রাউন্ডে দেশী সার প্রস্তুত কেন্দ্র স্থাপন এবং পৌরসভার নিজস্ব ইঞ্জিনীয়ারের অধীনে ঠিকাদারের বদলে পৌরসভার নিজস্ব কর্মী দিয়ে রাস্তা তৈরী বা মেরামতের ব্যবস্থা ইত্যাদি। শালিখায় তুলসীরাম লক্ষ্মীদেবী জয়সোয়াল প্রসূতি হাসপাতাল ও সত্যবালা সংক্রামক হাসপাতাল দুটি স্থাপন তাঁর জনহিতকর কাজের উল্লেখযোগ্য প্রয়াস।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে কুড়িটি আসনে নির্বাচন হত—বাকি দশটি ছিল মনোনীত আসন। শৈলবাবুর আমলেই এই দশটি আসনেও সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে হাওড়া পৌরসভার নির্বাচনের ব্যবস্থা তাঁরই আমলে চালু হয়। হাওড়া ময়দানে মহাত্মা গান্ধীর ঐতিহাসিক সংবর্ধনা তাঁর পৌর প্রধানের কার্যকালের আর এক স্মরণীয় ঘটনা। পরবর্তী জীবনে তিনি

* হাওড়ার প্রথম ভারতীয় জেলা জজ।

স্বাধীন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার দ্বিতীয় স্পিকার ও স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী ও আরও পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থমন্ত্রী পদেও আসীন হয়েছিলেন।

পৌরসভাগুলিকে সুপারসিড করা বা সরকার কর্তৃক পরিচালনার ভার গ্রহণ করা আজকে একটি সাধারণ নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে যা গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় স্বায়ত্তশাসনের ধ্যানধারণা পরিপন্থী বলে অনেকেই মনে করেন। কিন্তু হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যাবে যে ইংরেজ আমলেই তদানীন্তন বিদেশী সরকার সর্বপ্রথম এই পৌরসভাটিকে সুপারসিড করেছিলেন। ঘটনাটি ছিল খুবই রাজনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। ইংরেজ রাজপুরুষরা বিশ্বযুদ্ধে সর্বক্ষেত্রেই প্রায় পিছু হটছেন। ভারতের অভ্যন্তরে চলছে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের চরম সংগ্রাম। অধিকাংশ স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলিই কংগ্রেসের দ্বারা চালিত হচ্ছে। এর প্রতিফলন হাওড়া পৌরসভাও দেখা দিল। তদানীন্তন বোর্ডের সঙ্গে বিদেশী শাসকদলের প্রচণ্ড মতভেদ দেখা দিল। কংগ্রেস দলের সভা হল শালিকায় 'রামাবাসে' বিজয়কুমার মুখার্জীর (শৈলবাবুর দাদা) উপস্থিতিতে। সভায় ঠিক হয় কংগ্রেস নেতা বরদাপ্রসন্ন পাইনই চেয়ারম্যান হবেন। সদস্যরা সকলেই বাড়ি চলে যান। কিন্তু এই প্রস্তাব শৈলকুমারের পছন্দ হল না। রাতারাতি তিনি পাইনের বিরুদ্ধে সই সংগ্রহে তৎপর হলেন। তাঁর এই কাজে শালিখার কমিশনার বনওয়ারীলাল রায় এবং মধ্য হাওড়ার কমিশনার সন্তোষকুমার দত্ত প্রধান সহায় হন। এই সন্তোষবাবুই স্বাধীন ভারতে লোকসভার হাওড়া শহরের প্রথম সদস্য নির্বাচিত হন। ভোটাভুটিতে শৈলবাবু হাওড়া পৌরসভার সেবার চেয়ারমান হলেন। ফলে বরদাপ্রসন্ন কংগ্রেস ছেড়ে তদানীন্তন খাজা নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই তিনি ভারতরক্ষা আইনের জরুরী ক্ষমতায় এক সরকারী আদেশ বলে ৯. ৬. ১৯৪৪ খ্রীঃ হাওড়া পৌরসভাকে সুপারসিড করলেন। জেলার তদানীন্তন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট Mr. H. M. Nomani-কে প্রশাসক নিয়োগ করা হল।

সরকারের এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের বিরুদ্ধে মিউনিসিপ্যাল বোর্ড কোন প্রতিবাদ না করলেও ব্যক্তিগতভাবে শালিখার তিন কমিশনার মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। আনন্দের কথা, হাইকোর্টের বিচারে সরকারী আদেশ খারিজ হয়ে যায়। **Howrah Civic Companion** লিখছে—**But on a representation by three Commissioners, the Hon'ble High Court restrained him from acting as Executive Officer and the order was declared null and void.**—এই তিন কমিশনারের নাম সিভিক কম্প্যানিয়ানে উল্লিখিত হয়নি। এঁরা হলেন শালিখারই আমৃত্যু বাসিন্দা শৈলকুমার মুখার্জী, বনওয়ারীলাল রায় ও জ্যোতিষ চন্দ্র মিত্র।[১১]

ব্যাপারটির এখানেই শেষ নয়। বিদেশী শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় তদানীন্তন বাংলাদেশের সরকার মর্যাদার প্রশ্নে কলিকাতা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে বিলেতের প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করেন। এবারে কিন্তু বনওয়ারীলাল রায়কে সরকারের বিরুদ্ধে একাই লড়তে হল। সমস্ত আর্থিক দায়িত্ব তাঁকেই বহন করতে হয়েছিল। তিনি মোকদ্দমা লড়বার জন্য লণ্ডনের বিখ্যাত আইনবিদ্ স্যার ডি. এন. প্রিট্কে নিয়োগ করেছিলেন। সুখের কথা, শেষ পর্যন্ত ওখানেও বনওয়ারীলালের জয় হল। আজ সেটি একটি ইতিহাসের নজির হয়ে রয়েছে।

রাজনীতি এমন এক ব্যাপার যে তার রং পরিবর্তন হতে বেশি সময় লাগে না। যে আদর্শের ধ্বজা উড্ডীন রাখতে শৈলকুমারের নেতৃত্বে হাওড়া পৌরসভাকে সুপারসেশনের হাত থেকে বাঁচানো হল, সেই শৈলকুমার মুখাজীই পুরোভাগে থেকে ১৯৫৪ খ্রীঃ তদানীন্তন ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ ব্লকের (ইউ. পি. বি.) নেতৃত্বে পরিচালিত হাওড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক চন্দ্র দত্তের বোর্ডকে সুপারসিড করা হল।

১৯৫১ খ্রীঃ হাওড়া পৌরসভার এই নির্বাচন শুধু হাওড়াবাসীকেই ভাবিয়ে তোলেনি এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল সুদূর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পর্যন্ত। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সমস্ত নির্দল ও বামপন্থীরা একত্রিত হয়ে সেবার নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়। হাওড়া পৌরসভার নির্বাচন-যুদ্ধে এই প্রথম প্রতীক চিহ্নের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নির্বাচন-যুদ্ধে ইউনাইটেড প্রগেসিভ ব্লক (ইউ. পি. বি.) দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলে হাওড়ার কার্তিকবাবু চেয়ারম্যান এবং শালিখার শঙ্করলাল মুখাজী ভাইস চেয়ারম্যান হন। কংগ্রেসের এই পরাজয়ের সংবাদ 'নিউইয়র্ক টাইমস' পর্যন্ত বড় করে ছেপেছিল এবং কংগ্রেসকে বামপন্থীদের আগমন সম্বন্ধে হুঁসিয়ার করে দিয়েছিল।

হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট গঠন শৈলকুমার মুখাজীর অন্যতম কৃতিত্ব। হাওড়া পৌরসভাকে কর্পোরেশনে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনাও তিনি প্রথম করেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তদানীন্তন চেয়ারম্যান রবীন্দ্রলাল সিংহ।

কর্পোরেশন পর্ব শুরু হওয়ার আগে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির শেষ চেয়ারম্যান হলেন নির্মল কুমার মুখাজী। তিনি চেয়ারম্যান থাকাকালীন আবার সুপারসিড হয় এবং ১৯৭৭ খ্রীঃ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এলে সরকার মনোনীত বোর্ড গঠিত হয়—যার সভাপতি ছিলেন শালিখার আলোকদ্যুতি দাস। পরে অবশ্য এক সরকারী আদেশে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিকে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে উন্নীত করা হল ১৪. ২. ৮৩ তারিখে।

হাওড়া কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচন হয় ৮. ৭. ৮৪ তারিখে। এই নির্বাচনে পৌরসভার সীমা বৃদ্ধি করা হয়। পূর্বের আসন সংখ্যা (৩০) বৃদ্ধি পেয়ে কর্পোরেশনের আসন সংখ্যা নির্ধারিত হয় পঞ্চাশে। উনসানী, কোনা, বালটিকুরী, জগাছা ও ইছাপুর অঞ্চল নূতন করে কর্পোরেশন এলাকাভুক্ত করা হয়। অল্ডারম্যানের

আসন রাখা হল মোট তিনটি। কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচনে (১৯৮৪) বামফ্রন্ট পেল ছাব্বিশটি আর কংগ্রেস (ই) পেল চব্বিশটি আসন। আনুপাতিক হারে বামফ্রন্ট পেল অল্ডারম্যানের ২টি আসন আর কংগ্রেস (ই) পেল একটি আসন। হাওড়া কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র হলেন শালিখার অধিবাসী আলোকদূত দাস। মেয়র নির্বাচনের দিন ছিল ৯. ৮. ৮৪ তারিখ। নতুন নিয়মে কর্পোরেশনের কাজ শুরু হয় ২১. ৮. ৮৪ তারিখ থেকে। হাওড়া পৌর কর্পোরেশনের প্রথম অল্ডারম্যান হন—বামফ্রন্টের প্রভাত মুখোপাধ্যায় ও স্বদেশ চক্রবর্তী এবং কংগ্রেস (ই) পক্ষ থেকে অশোককুমার মল্লিক। আজও পর্যন্ত সেই নিয়মেই কর্পোরেশনের কাজকর্ম চলছে। এখানে উল্লেখ্য, আলোকবাবুর পূর্ণ কার্যকালের পরের নির্বাচনে দ্বিতীয় মেয়র হন স্বদেশ চক্রবর্তী। তিনিও শালিখার অধিবাসী। পর পর দুবারই শালিখা থেকে মেয়র হওয়ার সৌভাগ্য শালিখাবাসীই লাভ করেন। হাওড়া ময়দানে 'শরৎ সদন' প্রতিষ্ঠা স্বদেশ চক্রবর্তীর অন্যতম কৃতিত্ব।

বালি পৌরসভা—হাওড়া পৌরসভা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে দেখা গেছে, প্রথমে বালি-বেলুড় ঐ পৌরসভারই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৬৪ খ্রীঃ ৪ঠা এপ্রিলের এক সরকারী আদেশে ঐ বিজ্ঞপ্তিও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৮৮২ খ্রীঃ বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট স্বায়ত্তশাসনের পরিধি আরও বিস্তৃত করে। ফলে ১৮৮৩ খ্রীঃ ১লা এপ্রিল থেকে হাওড়া পৌরসভা থেকে আলাদা করে বালিকে একটি স্বতন্ত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর পৌরসভা করা হল।[১২] সেই থেকে আজও পর্যন্ত ঐ পুরসভাটি চলে আসছে। বালি পৌরসভাকে হাওড়া পৌরসভা থেকে আলাদা করার মূলে ছিল 'বালি সাধারণী সভা'। এই সভাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮০ খ্রীঃ। বালি গ্রামের আধুনিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গঠনে এই সভাটির দান আজও বালিবাসী সযত্নে রোমন্থন করেন। শিল্পনগরী হাওড়া পৌরসভার সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে গ্রাম্য সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য বালীবাসীরা হারিয়ে ফেলবে এই কথা চিন্তা করেই হয়তো 'বালি সাধারণী সভা' পৃথক পৌরসভা গঠনের দাবী তোলে। উপরন্তু পার্শ্ববর্তী উত্তরপাড়ার প্রজা হিতৈষী জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও গ্রাম্য সংস্কৃতিকে রক্ষা করে আধুনিক নগর জীবনের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে ব্রতী হয়েছিলেন। সেই দৃষ্টান্তকে সামনে রেখেই তাঁরা হয়তো এই দাবী তুলতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। বিদেশী সরকার হলেও বালিগ্রামের আবেদন তাঁদের সমর্থন লাভে দীর্ঘসূত্রতার প্রশ্রয় পেল না। হাওড়া জেলার তদানীন্তন জেলাশাসক মিঃ সি. ই. বাকল্যাণ্ড (Buckland) সাহেব ২৮শে মার্চ, ১৮৮৩ খ্রীঃ চিঠি নং (১৮৫০) মাধ্যমে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এক তালিকা দিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। তাতে ১১ জন সদস্য মনোনীত হন। তাঁরা হচ্ছেন বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়—অধ্যাপক, অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় (শান্তিবাবু)—অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট, অবিনাশ গোস্বামী—জমিদার, শ্রীচরণ মুখোপাধ্যায়—উকিল, জগৎ বন্দ্যোপাধ্যায়—উকিল, নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়—ডাক্তার, হারাধন ঘোষাল—জমিদার, গোপাল গাঙ্গুলী

—ডাক্তার, নবীন পাঠক—অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট, মতিলাল সরখেল—ব্যবসায়ী, হরিনাথ চক্রবর্তী—সাব-ইঞ্জিনিয়ার।

হাওড়া পৌরসভা গঠনের প্রথম পর্বে দীর্ঘদিন ধরে এক্স অফিসিয়ো হিসাবে জিলা ম্যাজিস্ট্রেটই বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। কিন্তু বালি মিউনিসিপ্যালিটিকে সেই বাধ্যবাধকতা থেকে সরকারী আদেশে মুক্তি দেওয়া হয়। এমনকি সরকারী আদেশে ঐ মনোনীত সদস্যদের বাইরে থেকেও চেয়ারম্যান নিয়োগের স্বাধীনতা দেওয়া হল। সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টে পরিষ্কার উল্লেখ ছিল—**It has been suggested that the Commissioners should elect the Chairman out of their own members and also the Magistrate or Sub-Divisional officer should be declared disqualified for election as Chairman.**

মনোনীত কমিশনার্সদের প্রথম সভায় (১লা এপ্রিল, ১৮৮৩) সভাপতিত্ব করেন বীরেশ্বর চ্যাটার্জী। শ্রীচরণ মুখোপাধ্যায় চেয়ারম্যান হিসাবে ডাঃ কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করেন এবং অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তা সমর্থন করেন। পৌরসভা চালনার কাজে কেদারবাবুর পূর্ব অভিজ্ঞতা (শ্রীরামপুর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন) প্রশ্নাতীত হওয়া সত্ত্বেও নবীনচন্দ্র পাঠক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এই বলে আপত্তি তোলেন যে বাইরে থেকে যখন চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হচ্ছে তখন নতুন পৌরসভার কাজের সুবিধার জন্য জেলা শাসককেই নির্বাচিত করা উচিত। ঐ যুক্তিকে সমর্থন করলেন অপর সদস্য জগৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অবশেষে ভোটাধিক্যে (পক্ষে নয়—বিপক্ষে দুই) এই সংশোধনী অগ্রাহ্য হয়ে যায়। অতঃপর বীরেশ্বর চ্যাটার্জী ভাইস-চেয়ারম্যান হতে অস্বীকার করায় অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বসম্মতিক্রমে ঐ পদে নির্বাচিত হন। অবৈতনিক সম্পাদক হন শ্রীচরণ মুখোপাধ্যায়।[১৬]

এই ঘটনাটি বিশেষ করে উল্লেখ করা হল এইজন্য যে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন পর্যন্ত বালির অধিকাংশ শিক্ষিত নাগরিকরা বিদেশী রাজপ্রভুদের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তা না হলে যেখানে রাজপ্রভুরা বালি পৌরসভাকে প্রকৃতপক্ষেই স্বায়ত্তশাসন দিতে চায় সেখানে বিদেশী আমলাদের নিমন্ত্রণ করে ডেকে আনার কি কারণ থাকতে পারে! এটা যে শুধু বালি পৌরসভার ক্ষেত্রেই ঘটেছে তা নয়—বালিতে জনকল্যাণমূলক সে যুগের প্রতিষ্ঠানগুলির সংগঠনেও এই প্রবণতা ভীষণভাবে দেখা যাবে। এ ব্যাপারে এই অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে—যা এই ধারণাকে অমূলক বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। যেমন ১৮৬৪ সালে গ্রামের ব্রাহ্মণ গুরুমশায়রা মিলে বালিকাদের শিক্ষার জন্য পাঠশালা গড়ে তুললেন। পরে সেটি নাম দিলেন মেকলে গার্লস স্কুল। স্বাধীনতার পরে তার নাম আবার পাল্টে হল বালি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। ছেলেদের জন্য ১৮৮৫ সালে জগৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের দেওয়া পাঁচ কাঠা জমিতে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হল শান্তিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়।

কিন্তু নাম রাখা হল তদানীন্তন বাংলার ছোটলাট স্যার অগস্ট্যাস রীভার্স টমসনের (Thompson) নামে। দেশ স্বাধীন হবার পর নাম হল আজকের বালি শান্তিরাম হাইস্কুল। বালির লোকের জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যে প্রথম দাতব্য চিকিৎসালয়টি তৈরী হয়েছিল তাও সেই এক জবরদস্ত বিদেশী আমলার নামে। তাঁর নাম ছিল 'বীমস্ চ্যারিটেবল ডিসপেনসারী'। যার বর্তমান নাম 'কেদারনাথ আরোগ্য ভবন'। এই বীম সাহেব ছিলেন বর্দ্ধমান ডিভিসনের কমিশনার—যার অধীনে ছিল হাওড়া জেলা। বালির জোড়া অশ্বত্থতলা হাইস্কুলের শিলান্যাস ঘটে বিদেশী জেলা শাসকের হাতে—শিলাখণ্ডে লেখা আছে—This foundation stone was laid by C. A. Radice Esquare, District Magistrate, on the 8th March 1913. যদিও ঐ স্কুলটি ১৯০৮ সালেই গ্রামের কতিপয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইংরেজ প্রভুদের আনুকূল্য লাভের জন্য ব্রাহ্মণ প্রধান চাকুরীজীবী বালির গণ্যমান্য নাগরিকদের এই মনোভাব প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বেশ স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা যায়।*

বেলুড় হাওড়া পৌরসভার সঙ্গে প্রথমে যুক্ত থাকলেও ১৮৮৪ সালে উহা বালির সঙ্গে যুক্ত হয়। বেলুড় যোগ দেওয়ায় বালি পৌরসভার সদস্য সংখ্যা এগার থেকে পনেরতে দাঁড়ায়। এঁরা সকলেই সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য। এরপর ১৯২৪-২৫ লিলুয়া গ্রামও এই পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত হয়।[১৪] এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে হাওড়া পৌরসভার মতই এখানেও কিছু সদস্য নির্বাচিত ও কিছু সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হবার প্রথা ছিল। বালি পৌর প্রতিষ্ঠানের শতবার্ষিক স্মারক গ্রন্থে 'শতবর্ষের আলোয় পুরদর্শন' প্রবন্ধে শীতাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন—"প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে পৌরসভার সকল সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন। তৃতীয় পর্যায়ে ১২ জন সদস্য ভোটার কর্তৃক নির্বাচিত ও ৬ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য ছিলেন। এই প্রথম নির্বাচনটি (১৮৯০) পরিচালনা করেন হাওড়ার জনৈক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট—সম্ভবত তৎকালে কর্মরত সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।" কিন্তু এই তথ্যটি ঠিক নয়।** সেই যুগে নির্দিষ্ট সংখ্যক নাগরিকদের ভোটাধিকার থাকলেও, জনগণের উৎসাহ কিন্তু কম ছিল না। ভোট এলেই শুধু কলকাতায়ই উৎসাহের সৃষ্টি হত না—মহানগরীর আশেপাশের শহরেও ভোটরঙ্গ বেশ জমে উঠতো। বালির ভোটরঙ্গ সেদিক থেকে বেশ উল্লেখ্য ছিল—বিখ্যাত 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় এ সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল—

> 'ধূম শুধু কলিকাতায় নয়, ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল জেলায়—
> আজ কলিকাতা, কাল ঢাকা, পরশু বালি, ওতোর পাড়া।'

* লেখকের "৫০০ বছরের হাওড়া" পুস্তকে এ সম্বন্ধে যে প্রশস্তি করা হয়েছিল, তথ্যের অভাবে তা ঠিকমত তখন ব্যাখ্যা হয়নি।

** বঙ্কিমচন্দ্র হাওড়ায় তিনবার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসেন। প্রথম ১৮৮৩, দ্বিতীয় ১৮৮৫ ও তৃতীয়বার ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে।

হাওড়া পৌরসভার মত বালি পৌরসভাতেও বহু বছর পর্যন্ত ব্যক্তিগত সুনাম ও সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি দিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করা হত। রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হয়ে বালি পৌরসভায় প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জাতীয় কংগ্রেস দলগত ভাবে ১৯২৮-২৯ সালে মাত্র চারটি আসন লাভ করেছিল। দেশ স্বাধীন হবার আগে পর্যন্ত পৌরসভাটিতে রাজনৈতিক দলের প্রভাব অপেক্ষা ব্যক্তির সুনাম, সামাজিক পরিচিতি, জনকল্যাণমূলক কাজে উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিরাই সাধারণত প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন। তবে স্বাধীনোত্তর যুগে আস্তে আস্তে রাজনৈতিক দলের প্রভাব যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় তা বলাই বাহুল্য।

প্রথম কয়েক বছর কংগ্রেসের একাধিপত্য থাকলেও ১৯৫৬ সালে বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে 'নাগরিক সমিতি' নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। নির্বাচনে নিজ নিজ দলের প্রতীক চিহ্ন নিয়ে তাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন। ১৯৬২ সালে এই পুরসভার ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা হল। এই বছর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী শৈলকুমার মুখার্জী ও হাওড়া পৌরসভার তদানীন্তন চেয়ারম্যান রবীন্দ্রলাল সিংহ হাওড়া ও বালি দুই পৌরসভাকে নিয়ে 'হাওড়া কর্পোরেশন' নামে একটি স্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থা গঠনের প্রস্তাব আনেন। হাওড়া পৌরসভার সদস্যরা এতে মত দিলেও বালি পৌরসভার তদানীন্তন চেয়ারম্যান বিমলকুমার মান্না এ ব্যাপারে বিরোধীতা করে জনমত সংগ্রহের প্রস্তাব দেন। সেই মত বালির করদাতাদের মতামত গোপন ব্যালটের মাধ্যমে যাচাই করা হয়। বিপুল উৎসাহে ভোট গ্রহণ করা হয়। ঐ সংযুক্তিকরণের বিরুদ্ধে করদাতারা তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন।

এর কয়েক মাস পরেই ২রা জানুয়ারী ১৯৬৩ সালে বালি পৌরসভা সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত হয়। প্রশাসকের অধীনে পঞ্চাশ সদস্যবিশিষ্ট হাওড়া-বালি কর্পোরেশনের নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৭ সালে। বালির সদস্য সংখ্যা ছিল দশ। এই নির্বাচনের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা চলে। তাতে বালির করদাতারা জয়লাভ করেন। ১৯৭৫ সালে রাজ্য সরকারের এক আদেশ বলে বালির ওয়ার্ডগুলির পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে ২৫টি আসনে ভিন্ন ভিন্ন ওয়ার্ডে ভাগ করা হল। ১৯৭৭ সালে ১লা অক্টোবর প্রশাসককে সাহায্য করার জন্য একটি পরামর্শ পরিষদ সরকার গঠন করেন—এই মনোনীত বোর্ডের সভাপতি ছিলেন পতিতপাবন পাঠক (প্রাঃ মন্ত্রী)। এই বোর্ডের অধীনে ১৯৮১ সালের ৩১শে মে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে বামফ্রন্টের সদস্যরা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে বোর্ড গঠন করেন। সেই থেকে আজও পর্যন্ত প্রতিটি নির্বাচনে জয়লাভ করে বামফ্রন্টের সদস্যরা পৌরসভা চালিয়ে যাচ্ছেন।* এতসব বলার পরও বালি গ্রামের উন্নতিতে প্রবীণরা এখনও ছড়া কাটেন—

* বর্তমানে পৌরসভার মোট ২৯টি ওয়ার্ড হয়েছে।

ছিরে, বীরে, শান্তিরাম*
তিন নিয়ে বালিগ্রাম।
তেমনি বেলুড় গ্রামের উন্নতিতেও লোকমুখে ছড়া শোনা যায়—
হারান, বিপিন, দীননাথ**
এই তিন নিয়ে বেলুড় মাত।

উলবেড়িয়া পৌরসভা—হাওড়া জেলার তৃতীয় পৌরসভা হচ্ছে উলবেড়িয়া পৌর-সভা। ইংরেজ আমলেই উলুবেড়িয়াকে পুরসভার অন্তর্ভুক্ত করে এক সরকারী আদেশ জারী করা হয় ১৯০৩ সালে। কয়েক বছর চলার পর উহার সার্বিক অনুপযুক্ত বিধায় ১৯০৭ সালে সরকার উহা প্রত্যাহার করে নেন। দেশ স্বাধীন হলে ১৯৫১ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী উলুবেড়িয়া ও বাউরিয়াকে শহর বলে ঘোষণা করা হয়। উহাদের তখন লোকসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১২৫৭৫ ও ১২৯৭৭ জন। কিন্তু তখনও ঐ দুটি স্থান জিলা বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডের মধ্যেই ছিল। তারও অনেক পরে ১৯৬০ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনও ওখানে হয়—যদিও তখন চার স্তর (বর্তমান ত্রিস্তরের পরিবর্তে) নির্বাচন পদ্ধতি ছিল। তারপর দীর্ঘদিন নির্বাচন হয়নি। এরপর ১৯৮২ সালে ২২শে সেপ্টেম্বর রাজ্য সরকারের মনোনীত কমিশনারদের নিয়ে উলুবেড়িয়া পুরসভা শপথ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণ করান মহকুমা শাসক ত্রিনাথকৃষ্ণ সিন্‌হা। ষোল সদস্যের মধ্যে ছিলেন বটকৃষ্ণ দাস, ডাঃ অরুণ জাসু, হীরেন্দ্রনাথ হাজরা, সত্যেন দাস, গোপাল বিশ্বাস, বঙ্কিম কুণ্ডু, গৌতম মল্লিক, রসিদ মুন্সী, মনীন্দ্র চৌধুরী, প্রদীপ দাস, অলর্ক বিকাশ সিংহরায়, পঞ্চানন বিশ্বাস, দিলীপ ব্যানার্জী, জ্যোতির্ময় গাঙ্গুলী, ভানুকরণ মিত্র ও শিব-পদ বিশ্বাস। পরে সত্যেন দাসের সভাপতিত্বে মনোনীত কমিশনাররা বটকৃষ্ণ দাস (সি. পি. এম) ও প্রদীপ দাস (ফঃ বঃ) যথাক্রমে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান-পদে নির্বাচিত হন। লক্ষণীয় সরকার মনোনীত সকল সদস্যই ছিল বামফ্রন্টের শরিক দলের সদস্য।

উলুবেড়িয়া পৌরসভার সীমানা হচ্ছে উলুবেড়িয়া, ফুলেশ্বর, লতিবপুরের তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সমগ্র এলাকা, ফোর্ট গ্লস্টার, বাউরিয়া, কালীনগর, চেঙ্গাইল ১ ও ২ ও খলিসানি অঞ্চলের কিয়দংশ। বার বর্গ মাইল পরিধি নিয়ে উলুবেড়িয়া থানার ১৩টি ও বাউরিয়া থানার ৫টি মৌজা, মোট ১৮টি মৌজার ১ লক্ষ ৪ হাজার ৭০ জন বাসিন্দা নিয়ে বর্তমানে এই পৌরসভা গঠিত। কিন্তু ১৯৮৮ সালের ২২শে মে উলুবেড়িয়া পৌরসভার প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় উনিশটি ওয়ার্ডে। বলাবাহুল্য, বামফ্রন্টই বোর্ড গঠন করে। (সি, পি, আই, এম, ১২, ফরওয়ার্ড ব্লক ৫, কংগ্রেস-২)। প্রথম নির্বাচিত বোর্ডেরও চেয়ারম্যান হলেন বটকৃষ্ণ দাস (সি. পি. আই. এম) ও সহকারী চেয়ারম্যান অলর্ক বিকাশ

* ছিরে—শ্রীচরণ মুখার্জী, বীরে—বীরেশ্বর চ্যাটার্জী, শান্তিরাম—অবিনাশ ব্যানার্জী।
** হারান—হারানচন্দ্র মুখার্জী, বিপিন—বিপিনকৃষ্ণ কুমার, দীননাথ—দীননাথ ঘোষ।

সিংহ রায় (ফঃ বঃ)। দ্বিতীয় নির্বাচন ১৯৯৪ সালের ১৫ই মে অনুষ্ঠিত হয় এবং যথারীতি বামফ্রন্টই বোর্ড গঠন করে। এবারেও বটকৃষ্ণ দাস চেয়ারম্যান ও সহকারী চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন পঞ্চানন বিশ্বাস (ফঃ বঃ)। পৌরসভার নিজস্ব বাড়ী না থাকায় স্থানাভাব ও অর্থাভাব দুটি মিলেই সাধ থাকলেও সাধ্যের বাইরে অনেক কাজই করে উঠতে পারছে না—তবে বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে নব নির্মিত পৌরভবন সেই লক্ষ্য পূরণে আশার ইঙ্গিত দেবে বলে অনেকে মনে করেন।*

জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত—জনগণের হাতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্যেই পঞ্চায়েত প্রথা চালু হল দেশ স্বাধীন হবার পর। পশ্চিম বাংলায় ১৯৬৪ সালে ১৬টি জেলা পরিষদ গঠিত হল। হাওড়া জেলা তার মধ্যে অন্যতম। হাওড়া জেলা পরিষদের নির্বাচিত প্রথম সভাপতি ও সহ-সভাপতি হলেন যথাক্রমে ডোমজুড়ের বিশ্বরতন গাঙ্গুলী ও বাগনানের জ্ঞানেন্দ্র নাথ হালদার। তাঁরা কংগ্রেসের প্রতিনিধি রূপে নির্বাচিত হন।

'ইংরেজ আমলে এই জেলা পরিষদের নাম ছিল হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড। এটি গঠিত হয় ১৮৮৬ সালের ৮ই ডিসেম্বর। প্রথম চেয়ারম্যান হয়েছিলেন সমকালীন আইনানুসারে জেলা শাসক মিঃ ই. ভি. ওয়েস্ট ম্যাকট।'[১৫] বলা বাহুল্য, পদটি ছিল পদাধিকার বলে। ১৯২০ সালে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা প্রথম চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন যথাক্রমে আশুতোষ বসু ও ব্যারিস্টার এস. পি. রায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে গান্ধীজির স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দেবার জন্য ১৯৫৬ সালে সারাদেশে পঞ্চায়েত আইন পাশ হল। পশ্চিমবঙ্গে চার স্তর** বিশিষ্ট পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার প্রথম নির্বাচন হয় ১৯৬৪ সালে। ১৯৭৩ সালে কংগ্রেসী আমলেই আইন সংশোধিত হয়ে চারস্তরের পরিবর্তে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা হল, যথা—ক ও খ মিলিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত, গ-হল পঞ্চায়েত সমিতি ও ঘ ঐ নামেই চলছে। কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত হল ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে। এই নির্বাচনে জেলার পঞ্চায়েতগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল বামফ্রন্টের প্রার্থীরা। এই বারের নির্বাচনের উল্লেখ্য তাৎপর্য হল আঠার বছর পর্যন্ত সব যুবক-যুবতীরাই প্রথম এই নির্বাচনে ভোট দিতে অধিকারী হয়। ত্রিস্তরের প্রথম জেলা সভাধিপতি ও উপ-সভাধিপতি হন যথাক্রমে শিবপদ সেনগুপ্ত ও সিরাজউদ্দিন আহমেদ।

এ প্রসঙ্গে একটি নতুন তথ্য সংযোজন করতে হচ্ছে ঐতিহাসিক কারণেই। পশ্চিম বাংলায় পঞ্চায়েতী রাজের পথ প্রদর্শক হচ্ছে এই হাওড়া জেলা। সারা ভারতে পঞ্চায়েতী প্রথা দেশ স্বাধীন হবার কয়েক বছর পরে শুরু হলেও পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু এটা সকল রাজ্যের শেষেই চালু হয়েছিল। কারণ পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় যে কোন কারণেই হউক এই ব্যবস্থা চালু করতে প্রথমে

---

* উপরোক্ত তথ্যগুলি সম্পাদ ধারা কর্তৃক প্রদত্ত।

** (ক) গ্রাম সভা, (খ) অঞ্চল পঞ্চায়েত, (গ) আঞ্চলিক পরিষদ, (ঘ) জেলা পরিষদ।

তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেননি। পরে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু তাঁকে এ ব্যাপারে অগ্রসর হতে অনুরোধ করেন। কারণ ভারতের এ রাজ্যটি ছাড়া সব রাজ্যেই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। সেইমত ডাঃ রায় পশ্চিম বঙ্গের হাওড়া জেলার 'শ্যামপুর ব্লকে' এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে চালু করলেন ১৯৫৭-৫৮ সালে। আনন্দের কথা এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ফলে শ্যামপুরের গ্রামীণ মানুষের সার্বিক উন্নতিতে জনসমর্থন বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হল। তারপর থেকে পশ্চিম বাংলার সব কটি জেলাতেই এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। আজ সেই পঞ্চায়েতীরাজ পশ্চিম বাংলার উন্নতিতে এক বিরাট ভূমিকা নিয়েছে। সুতরাং হাওড়া জেলাকে এই রাজ্যে পঞ্চায়েতী শাসন ব্যবস্থার অগ্রদূত বলা যেতে পারে।*

গত কুড়ি বছরে জেলা পঞ্চায়েতী ব্যবস্থায় বামফ্রণ্টের একক একাধিপত্য থাকায় পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা একটা সার্বিকরূপ গ্রহণে সক্ষম হয়েছে। তাই শহরে হাওড়া কর্পোরেশন, বালি পৌরসভা এবং আধা শহর উলুবেড়িয়া পৌরসভা ছাড়া বাকি জেলায়ই পঞ্চায়েতী শাসন ব্যবস্থার অঙ্গীভূত। পঞ্চায়েতী ব্যবস্থায় হাওড়াতে মোট চৌদ্দটি ব্লক বা পঞ্চায়েত সমিতি রয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সংখ্যা ১৫৮টি ** (১৯৯৮ পর্যন্ত)। এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবার সরকারী পরিকল্পনার সঙ্গে মানুষকে বহুলাংশে যুক্ত করা গেছে। তাই গ্রামের পেছিয়ে পড়া মানুষরাও আজ গ্রামের উন্নতিতে তাদের মতামত প্রকাশ করে ভালমন্দ নিদ্ধারণে এগিয়ে এসেছে—তাতে ত্রুটি বিচ্যুতি যে নেই তা নয়। তবে মনে রাখতে হবে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের শ্লোগান সার্থক হতে পারে একমাত্র পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমেই। এর বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে এই মুহূর্তে আর কিছু ভাবা যাচ্ছে না। হাওড়া জেলার পঞ্চায়েতী ব্যবস্থায় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও আর্থিক সাহায্যে যে সব কার্যক্রম গড়ে তোলা হয়েছে তার মধ্যে সামাজিক বন-সৃজন পরিকল্পনাটির সার্থক রূপায়ন চোখে পড়ার মত। গড়চুমুকে ১০০ হেক্টর জমিতে বনবীথির মধ্যে একটি 'মৃগদাব', পক্ষীরালয়' ও বিরল প্রজাতির 'বাঘরোল' সৃষ্টি পর্যটকদের কাছে স্থানটিকে করে তুলেছে আকর্ষণীয়। এ ছাড়া শ্যামপুরের ১নং, উলুবেড়িয়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতির এলাকায় সারিবদ্ধ বনসৃজন ও নারকেল বাগান সৃষ্টি পথিক ও পর্যটকদের চোখে মুখে আনন্দের জোয়ার এনে দেবে। এইসব কাজই সম্পাদিত হয়েছে গত দশ বছরে জেলা সভাধিপতি দেবী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্যকালের আমলে।—তবে এরই মধ্যে কুচক্রী মানুষের কুঠারাঘাতে যতত্র বৃক্ষ-চ্ছেদনের দৃশ্য সবুজ প্রেমিক মানুষের খুবই মনোবেদনার কারণ হয়ে ওঠে।

হাওড়া টাউন হল—হাওড়া শহরে স্বাধীনতার পরে বেশ কিছু সংখ্যক পাবলিক হল নির্মিত হয়েছে—তার মধ্যে অধুনা প্রতিষ্ঠিত 'শরৎ সদন' (হাওড়া ময়দান) খুবই আধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য-বিশিষ্ট হল। কিন্তু হাওড়া শহরের প্রথম

---

* এই তথ্যটি দিয়েছেন হাওড়া জেলার প্রথম নির্বাচিত জেলা বোর্ড সভাপতি বিশ্বরঞ্জন গাঙ্গুলী।

* * সরকারী নির্দেশে এর হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে।

পাবলিক হল হচ্ছে 'হাওড়া টাউন হল'। বহু স্মৃতিবিজড়িত বিশেষ করে স্বাধীনতা আন্দোলনে এই হলের বিশেষ মাহাত্ম্য ছিল। শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি টাউন হলের প্রয়োজনীয়তা প্রথম অনুভূত হল ১৮৮৩-এ। 'হাওড়া পিপলস এসোসিয়েশন' নামে একটি সংগঠন তদানীন্তন জেলা শাসক ও মিউনিসিপ্যালিটির এক্স অফিশিয়ো চেয়ারম্যান মিঃ সি, ই, বাকল্যাণ্ডকে এক আবেদনে জানান—**'That a spacious Hall is required for holding public meetings, public or private entertainments, meetings of the Municipal Commissioners as well as public ceremonies and reception of high authorities.'**

এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদের এক জরুরী সাধারণ সভায় (১২ই জানুয়ারী ১৮৮৩) প্রস্তাব নেওয়া হয় যে নাগরিকদের অর্থ সাহায্যে একটি টাউন হল তৈরী করা হউক। এর সঙ্গেই মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদের নিয়ে এক অছি পরিষদও গঠন করা হয়। প্রস্তাবিত খরচ ধরা হল বাড়ির জন্য ২৬,৫০০ টাকা আর ফার্নিচার ও অন্যান্য সাজসরঞ্জামের জন্য খরচ ধরা হয় ২৮,৫০০ টাকা।[১৬] টাউন হলটির নির্মাণকার্য শেষ হয় ১৮৮৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। আর উদ্বোধনপর্ব অনুষ্ঠিত হয় ১৪. ৩. ১৮৮৪তে তদানীন্তন বাংলার ছোট লাটের উপস্থিতিতে। তখন চেয়ারম্যান ছিলেন মিঃ এফ, এইচ, স্কীম। দ্বিতলে মোটা কাঠের পাটাতন দিয়ে মেজে তৈরী হয়েছিল। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে হচ্ছে ৬৬ ফুট × ৪২ ফুট। সিলিং-এর উচ্চতা ২১ ফুট। হলের ভেতরে তিনদিকে ব্যালকনির মত কাঠের পাটাতন দিয়ে বসার ব্যবস্থা আছে। এই টাউন হলের শোভাবর্ধন করছে কয়েকটি বৃহদাকার তৈলচিত্র। তার মধ্যে পূবের দেওয়ালে মোজাইক করা মঞ্চে স্থাপন করা আছে চওড়া কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো গান্ধীজীর একটি পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র। তাঁর দুপাশে রয়েছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর দুটি বৃহৎ তৈলচিত্র। গান্ধীজীর ঐ পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্রটি বসানো হয় ১৯৫০ সালে—'প্রজাতান্ত্রিক ভারতের' শাসনতন্ত্র গৃহীত বছরটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য। আর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্রটি উদ্বোধন করেন যশস্বিনী সরোজিনী নাইডু। দিনটি ছিল ১০ই জুলাই, ১৯২৬-এ। পশ্চিম দিকের দেওয়ালে শোভা পাচ্ছে ভগবান বুদ্ধের ধ্যানরত অবস্থায় একটি প্রমাণ সাইজের তৈলচিত্র। মনে রাখতে হবে যে জনসাধারণের দানের উপর নির্ভর করেই এই হলটি তৈরী হয়েছিল। যে সব দাতারা তখনকার দিনে একশ টাকা বা বেশী দান করেছিলেন তাঁদের একটি শ্বেতপাথরে খোদাই করা নামের তালিকা ঐ দেওয়ালে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

ষাটের দশকের শেষ ভাগ থেকে হাওড়া টাউন হলের অবস্থা রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অত্যন্ত কুশ্রীরূপ ধারণ করে। কিন্তু ১৯৭৭-৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক মনোনীত বোর্ডের (যার সভাপতি ছিলেন আলোকদূত দাস) আমলে টাউন

হলের সংস্কার সাধন করা হয় এক লক্ষ টাকা ব্যয় করে। আর ঐ টাকাও পাওয়া গিয়েছিল পুরস্কার হিসেবে। জেনে রাখা ভাল, ঐ দশকে হাওড়া জেলা স্বল্প সঞ্চয়ে পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক পরিমাণ অর্থ সংগ্রহে প্রথম স্থান অধিকার করার সুবাদে নগদ টাকা পুরস্কার লাভ করে। সেই টাকাই ঐ সংস্কার সাধনে ব্যয় করা হয়। দানের টাকায় গঠিত টাউন হল আলোকদূত দাসের আমলে পুরস্কারের টাকায় আবার সুসজ্জিত না হলেও সজ্জিত হল—ট্র্যাডিশনকে বজায় রেখেই। কিন্তু সম্প্রতি পূজার আগে এক সভায় বক্তা হিসাবে নিমন্ত্রিত হয়ে টাউন হলে গিয়ে দেখি যে টাউন হলের সংস্কারের নাম করে এবার যে ভাবে মনীষীদের চিত্রগুলির পুনর্বিন্যাস ঘটানো হয়েছে তা খুবই দৃষ্টিকটু। ছবিগুলি সাজানো হয়েছে অত্যন্ত অপরিকল্পিতভাবে। সবচেয়ে দৃষ্টিকটু লাগছে মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সুভাষ চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদি তৈল চিত্রগুলির পরিবর্তন সাধন ও স্থানান্তরিত করণ। দাতাদের নামের শ্বেত পাথরের ফলকও পড়া কষ্টকর। নূতন করে যা আঁকানো হয়েছে সে সব ছবিও নেহাৎই সময়ের ইতিহাসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। পুরসভার নির্দিষ্ট কাজের মধ্যে পুর সম্পত্তির পুরানো ইতিহাস বজায় রাখাও তাঁদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে বলে কর্তৃপক্ষের স্মরণে রাখা ভাল। জনগণ তাঁদের এই বিশ্বাসেই বিভিন্ন জিনিষ দান করে থাকেন।

পাঠক হয়তো জানেন যে বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ মুরারি পুকুরের বোমার মামলায় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে কারারুদ্ধ ছিলেন। জেলের মধ্যেই শ্রীঅরবিন্দ মা ভবতারিণীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি প্রকাশ্য যে সভায় প্রথম বক্তৃতা করেছিলেন সেটি ছিল হাওড়া টাউন হল। আর সেই সভাটি ছিল টাউন হলের উদ্যোক্তা 'দি হাওড়া পিপলস এসোসিয়েশন'-এর বার্ষিক সভা। সেদিন ছিল রবিবার, ২৭শে জুন, ১৯০৯ সাল।[১৭] বক্তৃতার বিষয় ছিল—'দি রাইট অব এসোসিয়েশন।' সেই বৃহৎ বক্তৃতা এখানে তুলে ধরার অবকাশ নেই। তবে বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল ভারতীয়দের স্বাধীন মত প্রকাশ ও সংঘ-সংগঠন করার উপর ইংরেজ শাসকের বিভিন্ন প্রকারের নির্যাতনমূলক আইন-কানুনের বিরুদ্ধে। শ্রীঅরবিন্দ বক্তৃতার শেষে ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের সংগঠন গড়ার অধিকার রক্ষার জন্য যে কোন মূল্যে দিতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। শেষ কটি লাইন উল্লেখ করা হল। তিনি বলেছিলেন—**Our nation will rise whatever law they make ; our nation will rise and live by the force of the law of its own being. For the fiat of God has gone out to the Indian nation, 'unite, be free, be one, be great.'**

শ্রীঅরবিন্দের হাওড়া টাউন হলের সেদিনের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি আজ ভারতের সর্বদলীয় নেতাদের মুখে কি একই কথা শুনতে পাচ্ছি না ? তাই তো তিনি হয়েছিলেন ঋষি অরবিন্দ। সেই বক্তৃতার গৌরব হাওড়াবাসীর স্মৃতিতে ধরে রাখবার

জন্যই এই কটি কথা লেখা হল। অবশ্য ঐদিনই পরের বক্তৃতা দিয়েছিলেন উত্তরপাড়ার পাবলিক লাইব্রেরীর (জয়কৃষ্ণ পাঠাগার) গঙ্গাধারের মাঠে।

১, ২, ৩, ৫, ৬, ৭, ৮, ১৬ Howrah Civic Companion—J. Bonnerjee.

৪. ১০ Municipal Administration in Bengal—Part I. Howrah

Bijoy Krishna Bhattacharjee, 1936.

৯. ১১. শালিখার ইতিবৃত্ত—হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

১২, ১৩, ১৪. বালি পৌর প্রতিষ্ঠান শতবর্ষের স্মারক গ্রন্থ, ১৮৮৩—১৯৮৩।

১৫. শতবর্ষের আলোকে হাওড়া জেলা পরিষদ—দেবী ব্যানার্জী, ১৮৮৬-১৯৮৬।

১৭. Speeches by Sri Aurobinda—2nd Edition. Nov, 1948.

হাওড়াবাসী ও সংবাদপত্র

ল্যাটিন ভাষায় একটি প্রবাদ আছে—জনসাধারণের বাণীই ভগবানের বাণী। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সংবাদপত্রকে বলা হয়েছে ফোর্থ এস্টেট বা চতুর্থ স্তম্ভ। জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষাই আবার প্রতিফলিত হয় সংবাদপত্রের মাধ্যমে। সেই ক্ষুরধার লেখনীর কাছেই সংযত আচরণ করতে বাধ্য হয় স্বৈরাচারী ও রাজতান্ত্রিক শাসক, বশ্যতা স্বীকার করতে হয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যেও আমলাতান্ত্রিক শাসকবর্গকে। ইংলণ্ডের মহাবাগ্মী চেথাম যেসব প্রসিদ্ধ বক্তৃতা দিয়ে অমরত্ব লাভ করেছেন তার এক জায়গায় তিনি সংবাদপত্রকে 'বায়ুর ন্যায় সর্ববন্ধনমুক্ত' বলে বর্ণনা করেছেন।

বাণিজ্যের নাম করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজ্যজয় যেমন এদেশে উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা—তেমনি তাঁদেরই আগমন হেতু এদেশে খ্রীষ্টান মিশনারীদের ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন এবং সংবাদপত্র প্রকাশও একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। অবশ্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের মধ্যে দুই প্রকারের মতাবলম্বীই ছিলেন—একদল ছিলেন মুক্ত সংবাদপত্রের প্রবক্তা—আর একদল ছিলেন নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রের প্রবক্তা। ওয়ারেন হেস্টিংসের মত সমালোচনায় স্পর্শকাতর শাসকও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দানে নারাজ ছিলেন না। গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ভারতীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রশ্নে অবশ্য কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন।

তবে স্যার চার্লস মেটকাফকেই (পরে লর্ড মেটকাফ) ভারতীয় সংবাদপত্র ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাদাতা নামে সাধুবাদ দেওয়া হয়। ১৮৫৭ সালে সিপাই বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে এবং ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড লিটনের শাসনকালে ভারতীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নগ্নভাবে হরণ করা হয়েছিল।

কলকাতায় প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয় ১৭৭৯ সালে।[১] তার পরের বছরই অর্থাৎ ১৭৮০ সালে ২৯শে জানুয়ারী আগস্টাস হিকি নামে জনৈক কোম্পানীর কর্মচারী 'দি বেঙ্গল গেজেট' বা ক্যালকাটা জেনেরাল এ্যাডভারটাইজার নামে একটি ইংরাজী সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। কলকাতায় এটিই প্রথম সংবাদপত্র। দুই তক্তার (**two sheets**) এই সংবাদপত্রটি রাজপুরুষদের বিশেষ করে গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এবং তাঁর বন্ধু প্রধান বিচারপতি ইলাইজা ইম্পের ব্যক্তিগত চরিত্রের কালিমালিপ্ত দিকগুলি সংবাদের শিরোনামায় ছাপতে থাকে। ফলে ক্ষমতাবান কর্তৃপক্ষ হিকিকে কারাগারে পাঠান। কিন্তু অদম্য সাহসী হিকি জেলে বসেও একই সুরে তাঁদের বিরুদ্ধে লেখনী চালিয়ে যেতে লাগলেন। এরপর শ্রীরামপুর মিশনারী সাহেবদের সম্পাদনায় 'দিগ্‌দর্শন' বাংলায় প্রথম মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত

হয়। তবে ভারতীয় মালিকানায় ও সম্পাদনায় প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। ১৮১৮ সালে জুন মাসে 'বাঙ্গাল গেজেটি' নামে পত্রিকাটি গঙ্গাকিশোরবাবু প্রকাশ করলেন। এই গঙ্গাকিশোরবাবু শ্রীরামপুর মিশনারী প্রেসে কাজ করতেন। পত্রিকা প্রকাশ ও পুস্তক প্রকাশ করে ব্যবসা করার জন্য তিনি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। অবশ্য এক বছরের বেশি পত্রিকাটি চললো না। গঙ্গাকিশোরবাবু তখন পুস্তক ছাপা ও বিক্রয় কাজে কলকাতায় একটি দোকান করেন। 'পুস্তক ব্যবসায়ে তাঁহার বিলক্ষণ লাভ হইয়াছিল।'*

সমাচার দর্পণও লিখছে—এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে বিক্রয়ার্থে বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রিতকরণের প্রথমোদ্যোগ কেবল ১৬ বৎসরাবধি হইতেছে। ইহা দেখিয়া আমাদের আশ্চর্য বোধ হয় যে এত অল্পকালের মধ্যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের ছাপার কর্মের এমত উন্নতি হইয়াছে। প্রথম যে পুস্তক মুদ্রিত হয় তাহার নাম 'অন্নদামঙ্গল'।[৩] এই ব্যাপারটি উল্লেখ করার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের লেখক রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র হাওড়ার পেঁড়ো গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। গঙ্গাকিশোরবাবুই প্রথম ছাপার অক্ষরে উহা ছেপে পুস্তকাকারে প্রকাশ করায় হাওড়া-বাসী তাঁর কাছে চিরঋণী হয়ে আছে।

কলকাতা ও শ্রীরামপুর মিশনারীদের দেখাদেখি হাওড়াতেও সংবাদপত্র প্রকাশে অনেকে এগিয়ে আসেন। তাদেরই কিছু বিবরণ উদ্ধৃত করা হল। যথা ঃ

সংবাদ মুক্তাবলী—এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি শিবপুর থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৪৮ সনে। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন কালীকান্ত ভট্টাচার্য। যদিও এটি আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণের অর্থ সাহায্যেই চলতো তথাপি বছরখানেক চলে উহা বন্ধ হয়ে যায়। পত্রিকাটি চালাতেন কতিপয় যুবক—কিন্তু উহার মুদ্রণ পারিপাট্যের বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মত ছিল। সংবাদ ভাস্কর লিখছে—···কিন্তু দেখিলাম যুব সম্পাদকরা উত্তমাভিপ্রায়ে কয়েকমাস ঐ পত্র সম্পাদন করিলেন। অতএব সাধারণকে অনুরোধ করি উক্ত পত্র সম্পাদকদিগের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য যেন সহায়তা করেন। কলিকাতা নগরে সমাচারপত্র অনেক হইয়াছে—পল্লীগ্রামে অধিক হয় নাই। বৎসরখানেক চলিবার পর পত্রিকাখানির প্রচার রহিত হয়।

শুভকরী—বালি গ্রামের দীনদরিদ্র, অনাথা, বিধবা ও দরিদ্র ছাত্রদের বিদ্যার্জনে সহায়তা করবার জন্য ১৭৮১ শকাব্দের ১৯শে চৈত্র (ইংরাজী ১৮৫৯ খ্রীঃ) 'শুভকরী' নামে একটি সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। বছর দুই পরে সভা কর্তৃক 'শুভকরী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক নির্বাচিত হন উত্তরপাড়া গভর্নমেণ্ট বাংলা পাঠশালার প্রধান শিক্ষক (মতান্তরে সহঃ শিক্ষক)* পণ্ডিত রামসদয় ভট্টাচার্য।[৪] পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১২ মে, ১৮৬২ সন।[৫] পত্রিকাটি প্রতিজ্ঞা করেছিল যে উহা কেবল ইতিহাস,

* **The Bengali Press—Samarjit Chakrabarty.**

বিজ্ঞান ও সাহিত্যপূর্ণ হবে। কিন্তু উদ্যোক্তারা সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারেননি। দ্বিতীয় সংখ্যায়ই ঘোষণা করা হল—আগামী মাস হইতে প্রধান প্রধান কতকগুলি সংবাদ আমাদের পত্রিকার এক পৃষ্ঠা অধিকার করিয়া লইবে। তিন বছর চলিবার পর 'শুভকরী' বন্ধ হইয়া যায়।[৬] বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের (১ম খণ্ড) লেখক কেদারনাথ মজুমদার 'শুভকরী'কে হাওড়ার প্রথম মুদ্রিত সাময়িক পত্রিকা বলে উল্লেখ করেছেন। মনে হয়, উহা ভুল করেই উল্লেখ করেছেন। তার অনেক আগেই ১৮৪৮ সনে শিবপুর থেকে 'সংবাদ মুক্তাবলী' প্রকাশিত হয়েছিল। একই ভুল করেছেন হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারের সম্পাদক অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও। মনে হয় তথ্যের উৎস একই। শুভকরী পত্রিকাটি যে বিষয়ে, আঙ্গিকে ও সম্পাদনায় নূতনত্ব এনেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই 'সংবাদ পূর্ণ চন্দ্রোদয়' (১৮৬৫, ১০ই আগস্ট) লিখেছিল—বালির 'শুভকরী' পত্রিকা উঠিয়া গিয়াছে—বড়ই দুঃখের বিষয়।

হাওড়া থেকে সে সময়ে যে কেবল সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সংবাদমূলক সাময়িক পত্রিকাই বের হত তা নয়। জানলে অবাক হতে হবে যে সেই সময়েও চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করার মত সাহসী ও বিজ্ঞ ব্যক্তির অভাব ছিল না। আরও বিস্ময়ের যে তার প্রধান উৎসাহদাতা ও পরিচালক ছিলেন হাওড়ার একজন বিদেশী ডাক্তার। ১৮৬৩ সালের জানুয়ারী মাসে 'আয়ুর্বেদ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। সম্পাদক ছিলেন বংশবাটী নিবাসী দ্বারকানাথ দাস।[৭] উহার আসল পরিচালক ছিলেন হাবড়ার (হাওড়া) সিভিল সার্জেন ডাঃ রবার্ট বার্ড।[৮] পত্রিকাটি যে কত উন্নতমানের ছিল তা 'সোমপ্রকাশ'-এর (১২ জানুয়ারী, ১৮৬৩) মন্তব্য থেকে বোঝা যাবে। পত্রিকাটি লিখছে—আয়ুর্বেদ পত্রিকা পাঠ করিয়া আমরা দুটি কারণে আহ্লাদিত হইলাম। এক, এরূপ পত্রিকা বাঙ্গালা ভাষায় এই নূতন প্রচারিত হইতেছে। এতদ্দ্বারা মহোপকার লাভ সম্ভাবনা আছে। দ্বিতীয়—ইহা অতি সহজ ভাষায় ও সহজ রীতিতে লিখিত হইতেছে।

এই সময়ে হাওড়ার আন্দুল-মৌড়ী নিবাসী দুই ব্যক্তির নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন বিত্তবান ও সংবাদপত্রসেবী জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক। অপরজন হচ্ছেন প্রখ্যাত পণ্ডিত ও সংবাদপত্র সম্পাদক কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

জগন্নাথপ্রসাদ নিজে প্রচুর বিত্তের অধিকারী হয়েও সাহিত্য ও বাকস্বাধীনতা রক্ষার্থে সর্বদাই সংবাদপত্রের সেবা করে গেছেন নেপথ্য নায়কের মত। ঈশ্বর গুপ্তের 'সম্বাদ প্রভাকর' পত্রিকার নাম প্রায় সকলেরই জানা। সে যুগের বিদগ্ধ ব্যক্তি মাত্রই প্রভাকরে লিখে পাঠকদের প্রভা বিতরণ করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি লেখকদের প্রথমদিকের লেখা এই কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। এই কাগজে জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিকও লেখক তালিকাভুক্ত ছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ ছিল একাধিক পত্রিকা সম্পাদকের পেছনে থেকে তিনি অর্থ জোগাতেন—যেমন 'সংবাদ রত্নাবলী' পত্রিকা। জগন্নাথবাবুর অর্থানুকূল্যে এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি

প্রকাশিত হয় ১৮৩২ সালের ২৪শে জুলাই। সম্পাদকের নাম ছিল মহেশচন্দ্র পাল। আসলে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই চালাতেন। কয়েক মাস চলার পর সেটি বন্ধ হয়ে যায়। আবার নূতন করে উহা প্রকাশিত হল ১৮৪৫ খ্রীঃ ১৩ই নভেম্বর ব্রজমোহন চক্রবর্তীর সম্পাদনায়। কিন্তু এবারেও সেই জগন্নাথপ্রসাদের মহাপ্রসাদের কৃপায়ই সেটি সম্ভব হয়। তাই সম্বাদ ভাস্কর লিখলেন—'রত্নাবলীর বিরহে কি দুঃখ মনে রহিয়াছিল তাহা বলিয়া জানাইতে পারি না। ...চক্রবর্তীবাবু সম্পাদক হইয়া 'রত্নাবলী' দেখাইলেন এবং অনুভব হইতেছে মহাপ্রসাদ (জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক) মহাশয়ও চক্রবর্তীবাবুর পশ্চাৎবর্তী আছেন।'

বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে আন্দুলের জমিদার মল্লিক বংশের জমিদারী আয়ের একাংশ জনগণের মুখের ভাষা প্রকাশের জন্যই যেন বরাদ্দীকৃত ছিল। বলা বাহুল্য, সংবাদপত্র থেকে কোন লাভের আশায় তাঁরা অর্থ ব্যয় করতেন না। জগন্নাথ মল্লিকের মতই মল্লিক বংশের আরও এক ব্যক্তির নাম এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কারণ 'সম্বাদ ভাস্করের' নাম বহুল প্রচারিত। এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন শ্রীনাথ রায়। নামে সম্পাদক হলেও আসলে চালাতেন গৌরী শংকর তর্কবাগীশ। যিনি সংবাদপত্র জগতে গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। পত্রিকাটি কলকাতার শিমলা থেকে প্রকাশ হত। সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার কাজে জমিদার আমলা ও ক্ষমতাবানদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কলম ধরতে সে যুগে এর জুড়ি পাওয়া ভার ছিল। এমনি একটি ঘটনার কথাও এর পরেই আলোচিত হবে। এহেন নামী পত্রিকাটিকে অর্থ সাহায্য দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন হাওড়া-আন্দুলের শ্রীনাথ মল্লিক মশায়। এই পত্রিকাটি ১৮৩৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪৪ সালে মথুরনাথ মল্লিকের ছোট ছেলে শ্রীনাথ মল্লিক মারা গেলে 'ভাস্কর' লিখেছিল—'শ্রীনাথ বাবু বহুকাল আমারদিগকে টাকা দিয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন—আমারদিগের সেই প্রতিপালক মিত্র চলে গেলেন।' কলকাতার সংবাদপত্র প্রকাশনের পেছনেও আন্দুলবাসী তথা হাওড়াবাসীর অবদানের এই অনাস্বাদিত কাহিনীটি জেনে বর্তমান প্রজন্মের উল্লসিত হবারই কথা।

হিন্দু কলেজের (বর্তমান প্রেসিডেন্সী কলেজ) ভাষা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ ডি, এল, রিচার্ডসনের প্রিয় ও খ্যাতনামা ছাত্র ছিলেন কাশী প্রসাদ ঘোষ। ছোটবেলা থেকেই তাঁর কবিত্ব শক্তির প্রকাশ ঘটে। তবে সেটা মাতৃভাষায় নয়—বিদেশী ইংরেজী ভাষায়। তথাপি মাতৃ ভাষায়ও কম দক্ষ ছিলেন না। তার প্রমাণ পাওয়া যায় লর্ড ব্রোহেম সাহেবের লেখা 'ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্ত্র ও ফল' পুস্তকের ভাষান্তরে। উহার অনুবাদ করেছিলেন কালীপ্রসাদ ঘোষ ও অমলচন্দ্র গাঙ্গুলী। ১৮৩২ সালের এপ্রিল মাসে সোসাইটি ফর ট্রানশ্লেটিং ইউরোপীয়ান সাইন্সেস কর্তৃক 'বিজ্ঞান সেবধি' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্র মাধ্যমে আত্মসেবা ও জনগণের প্রত্যাশাকে রূপায়িত করার জন্য তিনি ১৮৪৬ সনের ১৬ই

নভেম্বর 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' নামে একটি ইংরেজী সাপ্তাহিকও প্রকাশ করেন। নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশের সুবিধার্থে ১৮৪৯ সালে তিনি একটি মুদ্রা যন্ত্রও স্থাপন করেন। কিন্তু ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের ফলে লর্ড ক্যানিং সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার জন্য একটি আইন জারী করেন। এই আইনই ১৮৫৭ সালের ১৫ ধারা আইন নামে খ্যাত। উক্ত আইন বলে কাশী প্রসাদ সম্পাদিত ইংরেজী সাপ্তাহিক 'হিন্দু ইনটেলিজেন্সার' ও রংপুরের (অধুনা বাংলা দেশ) 'রঙ্গপুর বার্তাবাহ' প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। কাশীপ্রসাদের ইংরাজীর দখল যে কিরূপ ছিল তা 'বেঙ্গল হরকরা'-পত্রিকার মন্তব্য থেকেই জানা যায়। পত্রিকাটি লিখছে—আমরা অবগত হইলাম যে শ্রীযুক্তবাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ. ইংলণ্ডীয় কাব্যের স্বকপোলরচিত একগ্রন্থ প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। ইংলণ্ডীয় কাব্যক্ষেত্রে এতদ্দেশীয় লোকের প্রথম অধিকার এই। তৎ কাব্যান্তর্গত প্রকরণের যে কিঞ্চিৎ সংগ্রহ হরকরা কাগজে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে তদৃষ্টে যদি সমুদায় কাব্যের বিবেচনা করি তবে বোধ হয় যে তাহাতে তৎকাব্য কর্তার অনুপম যশোলাভ হইবেক।…ইংরেজী ভাষার মধ্যে যাহা দুঃসাধ্য তাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের অধিকারকরণ ক্ষমতাতে যদি আমারদের মনে কিছু সন্দেহ থাকিত তবে এই কাব্যের দ্বারা তাহা দূরীকৃত হইল।[৯]

বালি-উত্তরপাড়া থেকেও 'উত্তরপাড়া পাক্ষিক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে। বালি গ্রামের উত্তর ভাগে এই অংশটি ছিল বলেই উহার নাম উত্তরপাড়া হয়েছে—যদিও বর্তমানে উহা জেলার বাইরে। এই পত্রিকাটি পনেরো দিন অন্তর প্রকাশ পেত। পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হত 'গ্রহণেচ্ছু মহাশয়রা উক্ত নগরনিবাসী সম্পাদক বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট অথবা বালি পোষ্ট অফিসে সংবাদ করিলে পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন।' বোঝা যাচ্ছে উত্তরপাড়া তখনও বালি গ্রামের অধীনে। কবিতা, প্রবন্ধ ও সংবাদসার পত্রিকাটিতে থাকত।

ইতিপূর্বে আন্দুল গ্রামের দুই কৃতী সংবাদপত্র সেবী ও সম্পাদকের কৃতিত্ব আলোচিত হয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের পাতার পোকা ঘাটতে ঘাটতে এমনই একটি দুঃখকর ঘটনার সন্ধান পাওয়া গেল যা জানতে পারলে হাওড়াবাসীর মাথা হেট হয়ে পড়বে। এ যেন আন্দুল তথা হাওড়াবাসীর সংবাদপত্র জগতের গৌরবময় অধ্যায়ে এক বালতি দুধের মধ্যে এক ফোঁটা গোমূত্র তুল্য।

'আন্দুলরাজ' রাজনারায়ণ রায়ের নাম সকলেরই জানা—আন্দুলের সুবৃহৎ রাজবাড়ি আজও দর্শকের সম্ভ্রম আদায় করে। কলকাতার 'রাজাবাজার' এই রাজনারায়ণের নামেই নামাঙ্কিত। রাজনারায়ণের সৌধ নির্মাণের কৃতিত্বে ও শিল্পানুরাগে তাঁকে 'আন্দুলের সাহাজান' না বলে 'হাওড়ার সাহাজান' বলাই যুক্তিযুক্ত। রাজনারায়ণ রাজা হয়েও ছিলেন বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যপ্রেমিক। তিনি স্বয়ং 'পথিক' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকাও সম্পাদনা করতেন। যদিও সেটি দু'বছরের বেশী চলেনি।

কিন্তু এত গুণের অধিকারী হয়েও রাজনারায়ণ ছিলেন সমালোচনায় ভীষণ স্পর্শকাতর। এই দোষেই তাঁকে সাংবাদিক নিগ্রহের দায়ে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। 'সংবাদ ভাস্কর' সে যুগের একটি নামী পত্রিকা ছিল। সম্পাদক ছিলেন শ্রীনাথ রায়। কলকাতার সিমলা অঞ্চল থেকে উহা প্রকাশিত হত। ভাস্কর সম্পাদকের কাছে এক পত্রপ্রেরক লেখেন—রাজা রাজনারায়ণ আন্দুলের দুই ব্রাহ্মণকে 'ধর্মসভা' থেকে বহিষ্কার করিয়াছেন এবং একজন ব্রাহ্মণের বৈষ্ণবের কন্যার সঙ্গে বিবাহ দেওয়ানো উপলক্ষে অন্যান্য ব্রাহ্মণের প্রতি বল প্রয়োগ করিয়াছেন। ঐ পত্রে রাজনারায়ণের আরো কিছু কুকর্মের কথাও লেখা ছিল। কিন্তু তা বাদ দিয়েই মাত্র রাজার ব্রাহ্মণ বহিষ্কারের সংবাদটি দু'চার লাইনে ভাস্করে প্রকাশ পায়।

আত্মম্ভরী রাজনারায়ণ তা সহ্য করবেন কেন? একটি ক্ষুদ্র পত্রিকায় রাজার সমালোচনা? সুতরাং রাজাজ্ঞা দেওয়া হলো উক্ত সম্পাদককে আন্দুলে রাজসমীপে হাজির করতে। রাজার আজ্ঞাবহ লোকেরা দিবালোকে কলকাতার রাস্তায় সম্পাদক শ্রীনাথ রায়কে প্রহার করতে করতে আন্দুলে নিয়ে এল। গ্রামের দূর প্রান্তে একটি ঘরে তাঁকে তালা বন্ধ করে রাখা হলো। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৮৪০ সালের ৯ই জানুয়ারী। এই সংবাদটি 'কুরিয়ার' নামক পত্রিকায় ২২শে জানুয়ারী, ১৮৪০ এর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

শ্রীনাথ রায়ের পক্ষ থেকে সুপ্রীম কোর্টে নালিশ করা হয়। বিচারপতি টর্টন সাহেব রাজনারায়ণের নামে হেবিয়াস কর্পাস জারি করে সম্পাদক শ্রীনাথকে আদালতে হাজির করতে আদেশ দেন।

বিচারপতি টর্টন সাহেবকে যে প্রত্যক্ষদর্শী লিখিত অভিযোগ করেছিল তা 'জ্ঞানান্বেষন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাতে লেখা ছিল—কয়েকজন লাঠিয়াল ও অস্ত্রধারী ব্যক্তি শ্রীনাথকে ধরিয়া প্রহার করিয়াছেন। প্রহারকদের গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসা করলে তারা কবুল করে যে মহারাজা রাজনারায়ণের হুকুমে তারা শ্রীনাথকে প্রহার করেছে। সাক্ষীরা আরও বলে—আমরা দেখিলাম আন্দুলের বাটীতে রাজার সম্মুখেই তাঁহার দূতেরা শ্রীনাথ রায়ের গাত্রে বিছোটি লাগাইতেছে; তাহাতে শ্রীনাথ রায় অত্যন্ত যন্ত্রণায় চীৎকার শব্দে দোহাই করিতেছেন।

সাক্ষীরা আরও জানান কয়েকজন লোক শ্রীনাথ রায়কে মারপিট করিয়া শুকেশের (কলকাতার সুকিয়া স্ট্রীট) রাস্তার নিকট বাটী হইতে ধৃতকরণ পূর্বক অত্যন্ত প্রহার করত আন্দুলের বাটীতে লইয়া গেল।

এরপর রাজনারায়ণ রায় কোর্টে উপস্থিত হয়ে জানান যে শ্রীনাথ বর্তমানে তাঁর জিম্মায় নেই। রাজামশায় যে বৃথা কালক্ষেপ করবার জন্যই কোর্টকে একথা বলেছেন তা সাক্ষ্য প্রমাণসহ 'কমারশিয়াল অ্যাডভারটাইজার' পত্রিকায় ছেপে দেওয়া হয়। পত্রিকাটি লেখে—শ্রীনাথ রায়কে পূর্বেকার কারাগার হইতে উঠাইয়া লইয়া শ্রীযুক্তবাবু আশুতোষ দেবের কলিকাতার শহরর্তালস্থ উদ্যানবাটীতে কয়েদ

রাখিয়াছে। 'কুরিয়ার' পত্রিকাও লিখল—শ্রীনাথ সিমলা নিবাসী একজন অতি ধনাঢ্যবাবুর বাটীতে কয়েদ আছেন।...তাঁহাকে অনেক টাকার লোভ দর্শাইবার যত্ন করা যাইতেছে।

নির্লোভ, নির্ভীক ও ঋজু মেরুদণ্ড বিশিষ্ট, 'ভাস্কর সম্পাদক' অবশেষে জয়ী হলেন। ১৮৪০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী কোর্টের রায় প্রকাশিত হয়। তাতে শ্রীনাথ খালাস পান এবং রাজার দণ্ড হয়।

রাজা রাজনারায়ণের কাল থেকে প্রায় দেড়শ বছর কেটে গেল। ফোর্থ এস্টেটের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কতই না আর্তনাদ আজও শোনা যায়। কিন্তু আজও সাংবাদিকদের নিগৃহীত হতে হচ্ছে কখনও শাসকদলের হাতে বা কখনও পার্টির মাসলম্যানদের হাতে। রাজনারায়ণদের দল আজও আছে নামে বা বেনামে।

এবারে এমন একজন সাংবাদিকের নাম করা হবে যিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকে সংবাদপত্র জগতে স্মরণীয় হয়ে আছেন। যদিও হাওড়াবাসী তাঁর সম্বন্ধে খুবই কম জ্ঞাত। তিনি হচ্ছেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। গিরিশবাবু উত্তর কলকাতার সিমলা অঞ্চলের বিখ্যাত ঘোষ পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও যুবক বয়সেই হাওড়ায় আসেন। একান্নবর্তী সম্পত্তির মামলা মোকদ্দমা সর্বোপরি পিতার হঠাৎ মৃত্যুতে তাঁর মানসিক স্থৈর্য নষ্ট হতে বসে। তাই শরিকী বৈরীতা থেকে মানসিক শান্তির জন্য গিরিশচন্দ্র চিরতরে গঙ্গা পেরিয়ে বেলুড়ে এসে নিজের বাগানবাড়িতে ওঠেন। সালটি হচ্ছে ১৮৬৪ সালের জুলাই মাস। কিন্তু যে শান্তির জন্য তিনি বেলুড়ে এলেন তাতে বিধি বাম হলেন। বেলুড়ে আসার এক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি টাইফয়েডে আক্রান্ত হলেন। এক দিকে প্রচণ্ড বর্ষা আর একদিকে আত্মীয় পরিজন বর্জিত অস্বাস্থ্যকর বেলুড় গ্রাম। কিন্তু বড় মেয়ের জামাই শ্রীশচন্দ্র দত্তের মামা শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত তদানীন্তন কলকাতার বিখ্যাত ডাক্তার চন্দ্রকুমার দে-কে নিয়মিত বেলুড়ে এনে চিকিৎসা করিয়ে গিরিশবাবুকে ভাল করে তোলেন। গিরিশ চন্দ্র মিলিটারী এ্যাকাউণ্টস বিভাগে সামান্য কেরাণীর পদে ঢুকে নিজ দক্ষতায় অনেক উপরে উঠেছিলেন। কিন্তু সরকারী চাকুরী করেও তিনি দেশের বিশেষ করে দরিদ্র রায়তদের সেবার জন্য সংবাদপত্র সম্পাদনার সংকল্প নেন। তিনি 'দি বেঙ্গলী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন ১৮৬১ সালে। বেলুড়ে এসেই তিনি রোগ শয্যায় পড়ে থাকলেও কিন্তু কাগজ তাঁর কর্তব্য নিয়মিত পালন করে গিয়েছে। বেলুড়ে এই বাগান বাড়িটি তিনি ১৮৫৬ সালে কেনেন। বেঙ্গলী কাগজের প্রতিপাদ্য বিষয় ও তাঁর ইংরাজী ভাষার শ্লেষ ও ছটা বিদেশী শাসকদেরও সমীহ লাভে সক্ষম হয়েছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে রায়তদের কোন উপকারে আসতে পারে না তা তিনি খুলেই লেখেন। এই বন্দোবস্তকে তিনি জমিদার ও ইংরেজ শাসকদের এক অশুভ মিলন বলে বেঙ্গলী কাগজে সমালোচনা করেছিলেন। রায়ত ও গরীব চাষীদের স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি তাঁর লেখনী চালিয়ে গেছেন।

শুধু সাংবাদিকতা নয়—বক্তা হিসাবেও তিনি ছিলেন সকলের আদরণীয়। তিনি এত দ্রুত ইংরাজীতে বক্তৃতা করতেন যে তদানীন্তন রিপোর্টারদের পক্ষে তাঁর বক্তৃতার নোট নিতে বিশেষ অসুবিধা হতো। একই হাতে দি বেঙ্গলী ও দি বেঙ্গল রেকর্ডার* পরিচালনা করা গিরিশ ঘোষের এক অমর কীর্তি। এই বেঙ্গল রেকর্ডারই পরে তিনি বিখ্যাত সাংবাদিক ও দেশপ্রেমিক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছে বিক্রী করে দেন—যার পরিবর্তিত নাম হয় 'হিন্দু পেট্রিয়ট'। ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসে 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। তবে বেঙ্গল রেকর্ডার হরিশবাবু কিনেছিলেন তাঁর বড় ভাইয়ের নামে—কারণ তিনি নিজে ইংরেজ সরকারের কর্মচারী ছিলেন। যাক সেকথা—আগেই বলা হয়েছে গিরিশচন্দ্র হাওড়ার বেলুড়ে আসেন ১৮৬৪ সালে। বেলুড়ে থাকার সুবাদে ১৮৬৫ সালে ইংরেজ সরকার তাঁকে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার মনোনীত করেন। স্মরণ রাখা যেতে পারে যে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয় ১৮৬২ সালে। তদানীন্তন কালে বালিগ্রাম হাওড়া পৌরসভার অধীনেই ছিল। সে যুগে মনোনীত সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহেবরাই হাওড়া পৌরসভা চালাত। আঙ্গুলে গোণা যায় এমন কয়েকজন বাঙ্গালী মনোনীত সদস্যদের মধ্যে গিরিশবাবুই ছিলেন প্রতিবাদমুখর। এদেশীয়দের সুবিধা হয় এমন প্রস্তাব তখন কদাচিৎ সভায় পাশ করানো যেত। গিরিশচন্দ্রের খুবই আগ্রহ ছিল যে বেলুড় বাজার থেকে ঘুষুড়ী পর্যন্ত কর্দমাক্ত রাস্তাটি পাকা করা হউক। কিন্তু তাঁর জীবিত কালের মধ্যে তিনি তা করে যেতে পারেননি। কারণ মনোনীত ইংরেজ সদস্য মিঃ উইলিয়ম স্টলকার্ট (যাঁর নামে শালকিয়ায় স্টলকার্ট লেন) ঐ পথ দিয়ে শীতকালে রাইডিং করতেন। নরম মাটির রাস্তায় ঐ সময় ঘোড়ায় চড়তে আরাম লাগে—তাই অন্যান্য ইউরোপীয় সদস্যদের মিলিত করে গিরিশচন্দ্রের প্রস্তাব বার বার নাকচ করে দিতেন। যদিও গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর ঐ রাস্তা তাঁর নামে নামাঙ্কিত হয়—যা আজও রয়েছে।

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় প্রতিভাশালী সংগঠক গিরিশচন্দ্র ১৮৬৯ সালে সেপ্টেম্বর মাসে বেলুড়ে মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন।** গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর অনুরাগীদের সহায়তায় বেঙ্গলী পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন বেচারাম চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু আট ন' বছর চালানোর পর ঐ সাপ্তাহিক পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। তখন বাংলার ভাগ্যাকাশে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত এক নির্ভীক জাতীয় নেতার আবির্ভাব ঘটে। বেঙ্গলী পত্রিকার গুডউইলসহ সমস্ত মুদ্রাযন্ত্রটি সুরেন্দ্রনাথকে বিক্রী করে দেওয়া হল। এই বিক্রীর ব্যাপারটিও খুব সহজে অবশ্য হয়নি। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব তাঁর 'আর্লি হিস্ট্রী এণ্ড গ্রোথ অব ক্যালকাটা' বইতে লিখেছেন যার বঙ্গানুবাদ হচ্ছে—১৮৭৮ খ্রীঃ বাবু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী দি বেঙ্গলী কাগজের গুডউইল এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক সব জিনিষ ক্রয়

* যৌথ সম্পাদক—গিরিশচন্দ্র ও ভাই শ্রীনাথ ঘোষ।

** দি ইণ্ডিয়ান মিররের মতে ৩৭ বছরের বেশী নয়।

করেন। এই লেনদেনের ব্যাপারেও গণ্ডগোল দেখা দেয়। কিন্তু মহারাজকুমার নীলকৃষ্ণ বাহাদুর ও তাঁর বড় দাদার সহৃদয় হস্তক্ষেপের ফলে বিবাদের মীমাংসা হয়।

হাওড়াবাসী নীলকৃষ্ণ বাহাদুর ও তাঁর বড় দাদার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকবেন —কারণ স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে ঐ বেঙ্গলী পত্রিকার নাম ও মান কোনদিন উন্নতি ছাড়া অবনতি হয়নি। আর যে কথাটি সম্ভবত আমাদের অধিকাংশের কাছেই অজানাই থেকে গেছে তা হচ্ছে এই যে গিরিশচন্দ্রের সাপ্তাহিক 'বেঙ্গলি' সুরেন্দ্রনাথের হাতে পড়ে শেষ পর্যন্ত দৈনিক কাগজে পরিণত হয়েছিল।* এমনকি দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ইংরেজ সরকার পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথের ক্ষুরধার লেখনীতে শশব্যস্ত হয়ে থাকতো।

১৮৭৪ সালে জানুয়ারী মাসে 'হাবড়া হিতকারী' নামে বেতড় থেকে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও অধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তখন হাওড়ায়ই থাকতেন কালীবাবুর বাজারের কাছে। এই কাগজের প্রধান আকর্ষণ ছিল স্বয়ং কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। তাঁর সারগর্ভ লেখা পড়ার জন্য পাঠক গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন। একবার তিনি 'হাবড়া হিতকরী'তে হেমচন্দ্রের 'চিন্তা-তরঙ্গিণী' সমালোচনা করিয়া দেখাইয়া দেন যে 'হেমবাবুর 'কেন বা হইবে আন, পুরুষের শত টান' ইত্যাদি বায়রনের **'Man's love of man's life is a thing apart' (Don Juan can to I)** ইত্যাদির অনুবাদ।''•

এতক্ষণ হাওড়া শহরাঞ্চলের সাময়িক পত্র-পত্রিকা নিয়েই আলোচনা করা হল। কিন্তু হাওড়ার মফঃস্বলের অধিবাসীরাও যে এ ব্যাপারে কম উৎসাহী ছিলেন তা নয়। গ্রামের বিদ্যোৎসাহী লোকেদের মনে ক্ষুধা মেটাবার জন্য 'গ্রামবাসী' নামে একটি পাক্ষিক ১২৯৩ বঙ্গাব্দ (ইংরাজী ১৮৮৬ সন) উলুবেড়িয়া থেকে প্রকাশিত হয়। বাংলা সাময়িক পত্রের (২য় খণ্ড) লেখক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন— 'গ্রামবাসীকে রাজনীতি বিষয়ক শিক্ষা দেওয়াই পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য ছিল।' সেই যুগে ইংরেজের সমালোচনা এবং স্বাধীনতা লাভের কথা লেখা কিরূপ সাহস ও সংকল্পের প্রয়োজন হয় তা আজ হয়তো ভাবা যাবে না। কিন্তু ইতিহাসের কষ্টি-পাথরে এর বিচারমূল্য এড়িয়ে যাওয়া উচিত হবে না। অবশ্য সম্প্রতি এই মন্তব্যটি নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

'উলুবেড়ের আদিপর্ব'' পুস্তিকায় তারাপদ সাঁতরা হাওড়া গেজেটিয়ারের লেখক অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটিকে খণ্ডন করে লিখেছেন—'আসলে পত্রিকাটি রাজনৈতিক কোন বিষয় প্রকাশ করত না। এটি ছিল নব বিধান ব্রাহ্ম সমাজের সংগঠক প্রিয়নাথ মল্লিকের সম্পাদনায় ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—...**Uluberia brought out a Bengali fortnightly in 1886**

* ১৯০০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী দৈনিকে পরিণত হয়।

The life of Grish Ghosh—Manmatha Nath Ghosh M. A.

under the title **Grambashi which was a political Journal.** ব্রজেনবাবুর অনুসন্ধানলব্ধ তথ্যই যে অমিয়বাবুরও তথ্য সংগ্রহের উৎস তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। ব্রজেনবাবু আরও লিখেছেন—'১২৯৬ সালের বৈশাখ (ইং ১৮৮৯ সালে) উহা সাপ্তাহিক পত্রিকায় পরিণত হয়।' এক বছর চলার পর উহা বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৯০ সালে 'উলুবেড়িয়া দর্পণ' নামে আরও একটি পাক্ষিক প্রকাশিত হয়। ব্রাহ্মসমিতির স্থানীয় সংগঠক এককড়ি সিংহরায় কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে উক্ত পত্রিকার সংবাদদাতা হিসাবে যোগদান করেছিলেন।[১১] এছাড়া তারাপদবাবু নিজেই প্রবন্ধের একাংশে লিখেছেন—'১৮৮৬ সাল নাগাদ উলুবেড়েতে সমাজকল্যাণ বিষয় নিয়ে মাঝে মধ্যে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং সে সভায় আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগদানের খবরও পাওয়া যাচ্ছে।'

উপরিউক্ত তথ্য থেকেই এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর মত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যেখানে সভা করতে যেতেন এবং ব্রাহ্মসমাজ পরিচালিত পত্রিকার যে সংবাদদাতা জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সংবাদদাতা হিসাবে যোগ দেন তাঁর কলমে যে একান্তই নিরামিষ ধর্ম-বিষয়ক লেখা ও সংবাদ প্রকাশ পাবে এটা ভাবা একটু কষ্টকল্পিত। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও আনন্দমোহন বসু কেবল সমাজকল্যাণ বিষয়ক আলোচনা করতেই উলুবেড়িয়ায় আসতেন না। সেখানে 'ভারত সভার' একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সুতরাং রাজনীতি যে সেখানে আলোচনা বা লেখা হতে পারে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ও'ম্যালি ও মনোমোহন চক্রবর্তীও লিখছেন—**Among social and Political institutions may be mentioned the Rate Payers Association at Howrah, a Branch of the Indian Association at Uluberia, the sadharani sabha at Bally and branch of the Calcutta Anusilan Samity at Phuleswar in the Uluberia Sub division.** তবে তারাপদবাবু যে 'গ্রামবাসী' ও 'উলুবেড়িয়া দর্পণে'র সম্পাদকের নাম দুটি উদ্ধার করেছেন তার জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। ঐ সময় উলুবেড়িয়া অঞ্চলে সামাজিক ও ধর্মসভার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। ঐ সব সভার মুখপত্র হিসাবে পত্রিকাও একাধিক বের হত। এরকমই আর একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশ ঘটে ১২৯৫ সালে অর্থাৎ ইংরাজীর ১৮৮৮ সালে উলুবেড়িয়া 'হিতকরী সভা' থেকেও 'সমীরণ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ হত।

আজকাল দুর্নীতি বা জুয়োচুরি ইত্যাদি সম্বন্ধে যত্রতত্র যথেচ্ছ আলোচনা হতে শোনা যায়। তথাপি কোন পত্রিকা কেবলমাত্র দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করবার জন্যই লেখনী ধারণ করেছে এমন সংবাদ খুব কমই শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে অর্থাৎ ১৮৯৭ সালে হাওড়া থেকে অনুসন্ধান-সমিতির পক্ষ থেকে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। পত্রিকাটির

প্রথম সম্পাদক ছিলেন 'পৃথিবীর ইতিহাস'-এর লেখক হাওড়ার স্থায়ী বাসিন্দা দুর্গাদাস লাহিড়ী।* 'নানারূপ জুয়াচুরি হইতে দেশবাসীকে সতর্ক করাই 'অনুসন্ধানে'র উদ্দেশ্য।'[১২] পরে এই পত্রিকাটি সাপ্তাহিক হিসাবেও প্রকাশিত হয়েছিল।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে হাওড়া শহর থেকে 'ভাবীকাল' ও 'ইণ্ডিয়া টু-মরো' নামে দুটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হত। এ দুটিরই সম্পাদক ছিলেন বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন সাংসদ কৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায়। ভাবীকাল ও ইণ্ডিয়া টু-মরো ছিল যথাক্রমে বাংলা ও ইংরেজিতে রাজনৈতিক পত্রিকা। কিছুকাল চলার পর বিদেশী শাসনের রোষে পড়ে পত্রিকা দুটি বন্ধ হয়ে যায়। কৃষ্ণকুমারের ব্রিটিশ বিরোধী কলম সে সময়ে পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল।

এবার এমন একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার নাম করা হবে যা ইতিপূর্বে হাওড়ার ইতিহাসকারদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। অথচ এই তথ্যটি হাওড়ার সংবাদপত্রের ইতিহাসে একটি মাইলস্টোন বলে আখ্যা দেওয়া যায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে পর্যন্ত হাওড়া থেকে উন্নতমানের বহু সাময়িকপত্র প্রকাশ পেলেও দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের কোন সংবাদই পূর্বসূরীরা উল্লেখ করে যাননি। এর দুটি কারণ হতে পারে। প্রথমটি তথ্যানুসন্ধানের গভীরে না যাওয়া—দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'হিন্দী' পত্রিকা বলেই হয়তো উহা উল্লেখ না করা। কিন্তু এ ঘটনাটি কি কম গুরুত্বপূর্ণ যে পরাধীন ভারতেই কলকাতার পাশাপাশি হাওড়া-শালকিয়া থেকে একটি পূর্ণাবয়বের হিন্দী দৈনিক প্রকাশিত হত!

পত্রিকাটির জন্ম বৃত্তান্তও কম চমকপ্রদ নয়। পত্রিকার মালিক ছিলেন শালিখার বাসিন্দা মেহেরচাঁদ ধীমান। ধীমানজীর পিতা তুলসীরাম পাঞ্জাবের জলন্ধর জেলার ফিলোর গ্রাম থেকে ১৮৯০ সালে সালকিয়াতে আসেন রোজগারের আশায়। লিলুয়া ওয়ার্কসপে চাকুরীও পেয়ে গেলেন। নিষ্ঠা ও যোগ্যতা বলে শেষ জীবনে তিনি সহকারী ফোরম্যান পদে আসীন হন। ১৯২০ সালে পুত্র মেহেরচাঁদ ধীমান কলকাতায় আসেন এবং তাঁর বড় ভাই ধরমচাঁদ ধীমানের সঙ্গে জাহাজ মেরামতি ও যন্ত্রাংশ তৈরী কাজে যোগ দেন। বলা বাহুল্য, ধীমান ভ্রাতৃদ্বয়ের ব্যবসায় লক্ষ্মী দেবী আশীর্বাদ করতে কার্পণ্য করেননি। কিন্তু লক্ষ্মী-সরস্বতীর সমন্বয় ঘটিয়ে হিন্দী ভাষার প্রচার ও প্রসারের দিকে মেহেরচাঁদের আত্যান্তিক উৎসাহ ছিল। স্মরণ রাখা যেতে পারে ঊনিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত হাওড়াতে কোন হিন্দী সাময়িক পত্রিকা ছিল না। ধীমানজী তাই কলকাতা ও হাওড়ার সংস্কৃতিবান হিন্দী পাঠকদের মানসিক ক্ষুধা নিবারণের জন্য 'জাগৃতি' নামে একটি সাপ্তাহিক হিন্দী পত্রিকা প্রকাশ করলেন ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন উত্তর প্রদেশের প্রসিদ্ধ হিন্দী সাহিত্যিক মুন্সী নবজাদিক লাল শ্রীবাস্তব। মুন্সীজী এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত তদানীন্তন নামী 'চাঁদ' সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। মেহেরচাঁদ

* জন্ম নদীয়া জেলায় হলেও সাঁত্রাগাছিতে বিবাহ হওয়ায় তিনি হাওড়াতে জীবন কাটান।

ধীমানের সংগঠনে ও মুন্সীজীর সুসম্পাদনায় সালকিয়া বেনারস রোড থেকে 'জাগৃতি' সাপ্তাহিক রূপে প্রকাশিত হতে লাগল। পত্রিকাটিতে 'আর্য' সমাজের' প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতীর সমাজ সংস্কারের প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও বেদের ব্যাখ্যা বিষয়ক লেখাই বেশী প্রকাশিত হত। কিন্তু তিন বছর চলার পরই মুন্সীজীর অকস্মাৎ মৃত্যুতে জাগৃতির সম্পাদক হলেন জগদীশচন্দ্র হিমকার। ১৯৩৯ সাল থেকে তাঁরই সম্পাদনায় সাপ্তাহিক জাগৃতি দৈনিক 'জাগৃতি'তে পরিণত হল ১৯৪৫ সালে। সেই থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ হিন্দী দৈনিক হিসাবেই পত্রিকাটি চলতে থাকে। উল্লেখ্য, তদানীন্তন কলকাতায় 'দৈনিক বিশ্বমিত্র, দৈনিক লোকমান্য ও দৈনিক দেশবন্ধু' ছাড়া আর কোন হিন্দী দৈনিক প্রকাশিত হত না। বিশ্বমিত্র কাগজের পাশাপাশি 'জাগৃতি' কাগজের অসম প্রতিযোগিতা স্মরণে রাখার মত। এই কাগজটি ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে শালিখা থেকেই প্রকাশিত হত। তারপর কলকাতার লেনিন সরণী থেকে এলায়েড প্রিণ্টার্সে'র সঙ্গে মিলিত হয়ে ১৯৫৯ পর্যন্ত চলেছিল।

১৯৪৫-৪৬ সালে শালকিয়া বাজাল পাড়া লেন (বর্তমানে মটরমল লোহিয়া) থেকে 'মনোরঞ্জন' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র ত্রিপাঠী।

১৯৪৭ সাল, ১৫ই আগস্ট বহু প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন করে কর্মযজ্ঞ শুরু হল। অন্যান্য ক্ষেত্রের মত সাময়িকপত্র প্রকাশনেও যথেষ্ট উম্মাদনা দেখা যায়। যতদূর জানা যার মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই হাওড়া শহরের বুক থেকে বাংলায় গোটা দশেক সাময়িক পত্র প্রকাশ পায় যার মধ্যে আছে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল গেজেট (সম্পাদক দেবেন ঘোষ), কাসুন্দিয়া থেকে বিশ্বদূত (সম্পাদক এস, এন, চৌধুরী) শালকিয়া থেকে হাওড়া বার্তা (সম্পাদক ডাঃ শম্ভুচরণ পাল), রামকৃষ্ণপুর থেকে নব্যভারত (সম্পাদক কালোবরণ ঘোষ), কৈবর্তপাড়া (শালিখা) থেকে মজদুর সেবক (সম্পাদক বিনোদ বিহারী মুখার্জী), ক্যারী রোড (শিবপুর) খেকে আর্য ভারত (সম্পাদক প্রভুরাম চ্যাটার্জী), নিত্যধন মুখার্জী রোড থেকে শ্রম বার্তা (সম্পাদক বিভূতি নন্দী), শিবপুর থেকে অর্ঘ্য (সম্পাদক অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য) এবং হাওড়া সংস্কৃত পত্রিকা (সম্পাদক নিত্যানন্দ স্মৃতি তীর্থ) প্রভৃতি। এগুলোর মধ্যে ১৯৮৪ সালে 'হাওড়া মিউনিসিপ্যাল গেজেট' নামে মাসিক পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। হাওড়া পৌর সভার একশ পঁয়ত্রিশ বছর বয়সকালের মধ্যে এটিও একটি বিশেষ ঘটনা। এই পত্রিকাটি সুন্দর প্রচ্ছদসহ রুচিসম্মতভাবে সম্পাদিত হত। পুরসভার বিভিন্ন বিভাগের খবরাখবর, মাসিক সভার বিবরণসহ ভ্রমণ কাহিনী, গল্প, কবিতা প্রভৃতিও ছাপা হত। পত্রিকাটির চাহিদাও ছিল। সম্পাদক হিসাবে দেবেনবাবু কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। একমাত্র 'হাওড়া বার্তা' ছাড়া অন্যান্য পত্রিকাগুলি অকালেই গত হয়েছে। ১৯৫২ সালের ৯ই আগস্টে শালকিয়া জি, টি, রোড থেকে

ডাক্তার শম্ভুচরণ পালের সম্পাদনায় 'হাওড়া বার্তা' নামে একটি পাক্ষিক সমাচার পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯৬১ থেকে ওটি সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে কলকাতার অনেক প্রবীণ নামকরা সম্পাদক ও সাংবাদিকরা ডাঃ পালের বাড়ি সালকিয়ায় পদার্পণ করেছেন—যাঁদের মধ্যে সম্পাদক হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ ও বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডাঃ পালের অবর্তমানে তাঁর পুত্র ডাঃ বীরেন পাল এখনও পত্রিকাটি চালিয়ে যাচ্ছেন যদিও রুগ্নাকারে। জেলার চালু সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির মধ্যে এটি এখনও দীর্ঘস্থায়ী।

বালি পৌর এলাকা থেকে ১৯৪৯ সালের ১লা বৈশাখে 'সাধারণী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রথম সম্পাদক ছিলেন শৈলেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়। কেউ কেউ 'সাধারণী' পত্রিকাটিকে বালি পুরসভার মুখপত্ররূপে আখ্যা দিয়ে থাকেন। তা ঠিক নয়। পুরসভার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক ছিল না। তবে উক্ত মাসিকে (চার পাতা) পুরসভার কাজের গঠনমূলক সমালোচনা নিয়মিত প্রকাশিত হত। পত্রিকাটির মাথায় লেখা থাকতো—'বালি মিউনিসিপ্যাল ও ইউনিয়ন বোর্ড অঞ্চলের মাসিক মুখপত্র।' পত্রিকাটি ষোল বছর চলার পর ১৯৬৫ সালে বন্ধ হয়ে যায়—তাও আবার বিজ্ঞপ্তি দিয়েই। লেখা ছিল—এরপর 'সাধারণী' আর প্রকাশিত হবে না। 'সাধারণী'র মুদ্রণ পারিপাট্য থেকে সম্পাদনা এবং বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় মুন্সিয়ানা ছিল। তবে পত্রিকাটি স্থানীয় সমস্যা নিয়ে লিখলেও মূলতঃ পত্রিকাটি ছিল বালি গ্রামের গান্ধীবাদী নেতৃবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত। ফলে জাতীয়তাবাদী আদর্শ প্রচার ও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ক লেখা ও সংবাদই বেশী প্রাধান্য পেত।

১৯৬৫ সালে সালকিয়া থেকে বাসুদেব মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'প্রজ্ঞালোক' নামে একটি সমাচার মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯৮১ থেকে উহা সাপ্তাহিক রূপে আজও পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে।

বাগনান থেকে প্রবীণ সাংবাদিক গৌরবরণ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'বাগনান বার্তা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে প্রকাশিত হয়। প্রতি শনিবার এই পত্রিকাটি আজও পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। গৌরবাবু কলকাতায় থেকেও জন্মস্থান বাগনানকে (পিপুল্যান গ্রাম) ভুলতে পারেননি। বরং বলা যেতে পারে পিতার কাছে জন্মস্থানের ঋণ শোধ করার প্রতিশ্রুতি আজও নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে রক্ষা করে চলেছেন এই আটাত্তর বছরের সাংবাদিক। শুধু তাই নয় 'দেশ সেবক' নামে অপর একটি সাপ্তাহিক উলুবেড়িয়া থেকে সরোজাক্ষ মণ্ডলের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে। তবে তিনি সেটি দীর্ঘদিন চালাতে অসমর্থ হলে পত্রিকাটির যাবতীয় সত্বাদি কিনে নেন গৌরবাবু। কিন্তু আজও পর্যন্ত 'দেশ সেবক' পত্রিকাটি সরোজাক্ষবাবুর নামে ছাপা হলেও প্রকৃত সম্পাদনার কাজ করেন গৌরববাবুর সহধর্মিণী রেবা ভট্টাচার্য। এই দুটি কাগজই হাওড়া জেলার গ্রামীণ কৃষি, সেচ ও ক্ষুদ্র শিল্পের সমস্যাদি নিয়ে

বিশেষভাবে লেখনী ধারণ করে চলেছে। তবে সরকারী দুর্নীতি ও অপচয়ের বিরুদ্ধে নানা গোপন তথ্য প্রকাশ করে আজও সরকারী আমলাদের সমীহের পাত্র হয়ে জনসাধারণের প্রশংসা পেয়ে আসছে। এ ছাড়া গৌরবাবু ১৯৬৫ সাল থেকে 'বিচিত্র সংবাদ' বলে একটি পাক্ষিক পত্রিকাও প্রকাশ করে আসছেন। আর এককালে গৌরবাবুর সম্পাদনায় 'খেলার মাঠ' কলকাতার ময়দানে তো মুড়ি মুড়কির মত বিক্রি হতো। আজও পর্যন্ত গৌরবাবু সব্যসাচীর মত একাই সম্পাদনা, বিজ্ঞাপন সংগ্রহ, কাগজ বিলি প্রভৃতি চালিয়ে যাচ্ছেন। ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে মধ্য হাওড়া থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রফুল্ল দাসগুপ্তের 'বিচার' পাক্ষিক পত্রিকাটি বেশ কয়েক বছর শহরে সাড়া জাগিয়েছিল। দশ বছর চলার পর উহা হস্তান্তর হয়ে কলকাতা থেকে কিছুদিন চলেছিল মুকুল রায় চৌধুরীর সম্পাদনায়। সেটিও বন্ধ হয়ে যায়। ডঃ শিশির করের সম্পাদনায় মাসিক হিসাবে 'বিচার' সম্প্রতি আবার বের হচ্ছে তবে ভীষণ রুগ্নাকারে।

১৯৮১ সাল থেকে 'মাধ্যম' নামে একটি সংবাদ পত্রিকা মধ্য হাওড়া থেকে পনেরো দিন অন্তর প্রকাশিত হয়ে চলেছে আজও পর্যন্ত। সম্পাদক কাজল সেন। পত্রিকাটির মুদ্রণ পারিপাট্য চোখে পড়ার মত।

হাওড়া তথা পশ্চিমবঙ্গ থেকে এক ত্রৈভাষিক সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের খবর এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৯ সালের জানুয়ারী মাসে সালকিয়া বেনারস রোড থেকে। এই মাসিক পত্রিকাটিতে ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দীতে লেখা গল্প, কবিতা প্রভৃতি থাকতো। পত্রিকাটির নাম ছিল 'রেখা ও লেখা'। সম্পাদক ছিলেন প্রাণগোপাল আচার্য। ১৯৭৫-৭৬ সাল পর্যন্ত চলেছিল। পত্রিকাটি সর্টহ্যাণ্ড লিখন পদ্ধতি শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ সহায়ক ছিল।

হাওড়ার লোকেদের প্রায়ই আক্ষেপ করতে শুনা যায় যে কলকাতার এত কাছে থেকেও এখান থেকে একটি দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হল না—কি স্বাধীনতার পূর্বে বা স্বাধীনোত্তর ভারতে। এর অন্যান্য কারণ থাকলেও মূল কারণ হচ্ছে কলকাতার সান্নিধ্য। কিন্তু এই আক্ষেপটিও দূর করার বলিষ্ঠ প্রয়াস হিসাবে 'সান্ধ্য বিবরণ' এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৭৩ সাল ১২ই ডিসেম্বর কদমতলার দীনু লেন থেকে প্রবীণ সাংবাদিক শশধর রায় 'সান্ধ্য বিবরণ' নামে একটি চার পৃষ্ঠার হাফ ডিমাই সাইজের দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটির উদ্বোধন করেছিলেন তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধনের দিন অনেকে আশার বাণী উচ্চারণ করলেও শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাবধানী বাণীতে বলেছিলেন যে হাওড়া-বাসী যেন এই শুভ প্রচেষ্টাকে অকাল মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট হন। প্রতিদিন বিকেল তিনটে থেকে চারটের মধ্যে 'সান্ধ্য বিবরণ' দিনের সংবাদ ছাপার অক্ষরে ছেপে পাঠক ও সরকারী দপ্তরে হাজির হত। শশধর রায় 'জনসেবক' কাগজে

সাংবাদিকতা শুরু করেন। এককালে আনন্দবাজার পত্রিকার হাওড়ার সংবাদদাতাও ছিলেন। পরে তিনি অল ইণ্ডিয়া রেডিওর হাওড়ার প্রতিনিধি হয়ে আমৃত্যু কাজ করে গেছেন। এমন দিন রেডিওতে কদাচিৎ হতো যেদিন সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় আকাশবাণীতে হাওড়া সম্বন্ধে সংবাদ পঠিত না হতো। সরকারী দপ্তরের উপর মহলে শশধরবাবুর প্রভাব কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে একটি ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। কারণ ভবিষ্যতে এটি একটি জেলার সংবাদপত্রের ইতিহাসে নজির হয়ে থাকবে। ১৯৭২-৭৩ সাল হবে। দিল্লীর স্বরাষ্ট্র বিভাগ থেকে কলকাতার আকাশবাণীর ডিরেক্টরের কাছে একটি গোপন বার্তা সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে চাওয়া হল। সংবাদটির উৎস হল 'হাওড়া'। তখন রাত বারটা। শশধরবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন। হঠাৎ আকাশ বাণীর প্রধানের কাছ থেকে জরুরী ফোনে শশধরবাবুর ঘুম ভাঙ্গানো হল। শুধু কি তাই! শশধরবাবুকে বলা হল রাত্রি দুটোর মধ্যে ঐ ব্যাপারে জেলার অধিকর্তাদের কাছ থেকে বিস্তারিত জেনে যেন আকাশবাণীর অধিকর্তাকে জানানো হয়। কারণ এই সময়ের মধ্যেই দিল্লীর স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে উহা জানাতে হবে। বলা বাহুল্য, শশধরবাবুও সেই গভীর রাতে ঘুম থেকে জাগালেন জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারকে। শশধরবাবু সঠিক সংবাদ যোগাড় করে যথা সময়ে আকাশবাণীর অধিকর্তাকে জানিয়ে দিলেন। সংবাদটি যে কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা স্বল্প সময়ের ব্যবধানে প্রামাণিক সংবাদ সংগ্রহের তাগিদ থেকেই বোঝা যাচ্ছে। শশধরবাবুর প্রভাব ও কর্ম নৈপুণ্য কিরূপ ছিল তা এ ঘটনাটি থেকেই বোঝা যায়। আকাশবাণীর অন্যান্য জেলার সংবাদদাতারা নাকি কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করতেন কলকাতা কেন্দ্রের আকাশবাণী 'হাওড়াবাণী' হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁদের প্রেরিত সংবাদ আকাশবাণীতে সারাদিনে একবার তাও আবার সকালে বা দুপুরে পড়া হয়। কিন্তু সকাল, দুপুর আর সন্ধ্যে (অবশ্যই) তিন বেলাতেই হাওড়ার সংবাদ পড়া হয়। তার উত্তরে কর্তৃপক্ষ যা বলেছিলেন তাও এখানে উল্লেখ করা হল। কর্তৃপক্ষ বলেছিলেন—সংবাদ কিভাবে পড়ার উপযুক্ত করে পাঠাতে হয় তা তোমাদের শিক্ষা নিতে হবে শশধরবাবুর প্রেরিত সংবাদ শুনে।* দীর্ঘ প্রায় চৌদ্দ বছর চলার পর শশধরবাবুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 'সান্ধ্য বিবরণ'-এরও মৃত্যু ঘটে (১৯৮৬, মে-জুন)। হাওড়া থেকে প্রাতঃকালীন দৈনিক সংবাদপত্র বাংলায় প্রকাশিত না হলেও সান্ধ্য বাংলা দৈনিক হিসাবে 'সান্ধ্য বিবরণ' এখনও একমাত্র উদাহরণ হয়ে রইল।

সাময়িক পত্রিকার অকাল মৃত্যু হিসাবের বাইরে। তাই হয়তো এ রকম অনেক সাময়িকের নামও স্বাভাবিক কারণেই বাদ পড়ে যেয়ে থাকবে। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও আছে। বালি থেকে পদ্মলোচন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'জয়গুরু' এবং শ্রীমতী

---

* এই ঘটনাটি বলেছিলেন—হাওড়া জেলা পরিষদের হলে লেখক কর্তৃক আয়োজিত শশধরবাবুর স্মৃতিসভায় আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের স্থানীয় সংবাদের বিখ্যাত ভাষ্যকার নির্মল সেনগুপ্ত। সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন জেলা পরিষদের সভাপতি শ্রীদেবী বন্দোপাধ্যায়।

অসীমা মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'আর্য নারী' যথাক্রমে ১৯৫৬ এবং ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয়েও সম্ভ্রমের সঙ্গে আজও চলছে। ১৯৫৫ সালে লিলুয়া যোগেশবরী রামকৃষ্ণ মঠ থেকে 'শ্রীমা সারদা' স্বামী অসিতানন্দ মহারাজের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। তাঁর দেহ রক্ষার পরেও পত্রিকাটি বহতা নদীর মত প্রতি মাসে প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমান সম্পাদক স্বামী বিমলানন্দ। এই পত্রিকাগুলির বিষয়বস্তু একান্তই ভারতীয় সংস্কৃতি ও সনাতন ধর্মবিষয়ক। এছাড়া গল্প কবিতাও ছাপা হয়। হাওড়া জেলায় কোন মহিলা সম্পাদিত কাগজ 'আর্য নারী'র মত দীর্ঘদিন ধরে চলছে বলে জানা যায় না।

কেবলমাত্র শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা ও আন্দোলন বিষয়ক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় মধ্য হাওড়ার নিত্যধন মুখার্জী লেন থেকে। পত্রিকাটির নাম ছিল শ্রমবার্তা। সম্পাদক ছিলেন প্রশান্ত দত্ত ও বিভূতি নন্দী। পত্রিকাটি শ্রমিক মহলে আদৃত হয়েছিল। এবারে এমন একটি দলীয় রাজনৈতিক পত্রিকার নাম করা হবে যা অনেকেরই জানা। পত্রিকার নাম 'দেশহিতৈষী'। পশ্চিমবঙ্গ মার্কসবাদী দলের মুখপত্র না হলেও মার্কসবাদীদের চিন্তাধারা বা কার্যকলাপ এতে প্রচার করা হয়। এটি উল্লেখ করা হচ্ছে একটি বিশেষ কারণে। ১৯৬২ সাল। সংবাদপত্রে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হল চীন কর্তৃক ভারত আক্রান্ত। ভারতের উত্তর সীমান্তে চীনা সৈন্যরা ঢুকে প্রচুর স্থান অধিকার করে নিয়েছে। বিরোধীদের প্রশ্নোত্তরে লোকসভা ও রাজ্যসভায় তদানীন্তন ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ক্ষোভ ও দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করেন যে বন্ধু রাষ্ট্র চীন কর্তৃক ভারত আক্রান্ত হয়েছে। উত্তর লাডাক ও উত্তর পূর্বাংশে নাথুলা ও বমডিলা পর্যন্ত চীনারা ঢুকে পড়েছে। ভারতীয় লোকসভায় বিরোধী সদস্যদের (কম্যুনিষ্ট সদস্যরা ছাড়া) তীক্ষ্ন সমালোচনায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ভি. কে. কৃষ্ণমেননকে পর্যন্ত মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। অপরপক্ষে কম্যুনিষ্ট সদস্যরা এই ঘটনাটিকে প্রথমে স্বীকার করতেই চাননি। চিরাচরিত মার্কসবাদী তত্ত্ব আওড়ে তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেন যে একটি কম্যুনিষ্ট সরকার কখনও পররাষ্ট্র আক্রমণ করতে পারে না—বিশেষ করে চীনের মত বন্ধুরাষ্ট্র। স্মরণ করা যেতে পারে যে ভারতের প্রধান মন্ত্রী ও চীনের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী চৌ-এন. লাই ইতিমধ্যেই 'পঞ্চশীলে'র নীতি ঘোষণা করে চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন। 'হিন্দী চিনি ভাই ভাই' শ্লোগানে আকাশ বাতাস সেদিন মুখরিত হয়েছিল। তারাই কিনা আবার বন্ধুর বেশে ভারতকে আক্রমণ করল! কম্যুনিষ্টদের এই চীনা নীতির সমর্থনে ভারতের জনগণ ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে এবং বিশেষ বিশেষ বিশেষণ প্রয়োগ করে তাদের বিরুদ্ধে সভা সমিতিতে রোষ প্রকাশ করা হয়। তদানীন্তন কালের সংবাদপত্র ও পার্লামেণ্টের বিবরণী পাঠেই তা জানা যাবে। অবশেষে ভারত সরকার দেশদ্রোহীতার অপরাধে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। এমনকি প্রথম সারির

নেতাসহ অনেককেই কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হয়। বেশীর ভাগ কম্যুনিষ্ট নেতাই আবার গ্রেপ্তার এড়াতে আত্মগোপন করেন। চীনকর্তৃক ভারত সীমান্ত আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে হাওড়ার নেতারা 'হাওড়া হিতৈষী' নামে একটি গোপন প্রচার পত্র প্রকাশ করেন। পরে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে ঐ 'হাওড়া হিতৈষী' প্রচার পত্রটিই 'দেশ হিতৈষী' নামে পরিবর্তিত হয়—যা আজও চলছে।* আর ভারত চীন সীমান্ত আক্রমণকে কেন্দ্র করেই ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া মার্কসবাদীর সৃষ্টি।

১৯৭০ সালে বাগনানের নবাসন থেকে এবং পরে হাওড়া শহরের বৃন্দাবন মল্লিক লেন থেকে 'কৌশিকী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে আসছে। এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকের নাম তারাপদ সাঁতরা। তারপর সম্পাদক হলেন আনন্দ গঙ্গোপাধ্যায় ও সহযোগী শিবেন্দু মান্না। পত্রিকাটি দীর্ঘ আঠাশ বছর ধরে মাসিক পত্র হিসাবে নিজ অস্তিত্ব বজায় রেখে গেছে। পত্রিকাটির বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মত। গবেষণামূলক ঐতিহাসিক প্রবন্ধসহ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য এবং পটশিল্প বিষয়ক প্রবন্ধাদিতে পত্রিকাটি সমৃদ্ধ। এই পত্রিকাটির ওজন বিদ্বদ্‌সমাজে কিরূপ তা ইতিহাসসেবী ও লেখক অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের (আই, এ, এস) একটি মন্তব্যই যথেষ্ট। "কৌশিকী'র কোন ধন গৌরব নেই, গোষ্ঠীবল নেই, ছত্রাক শ্রেণীর সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতাও নেই। প্রকৃত বিদ্বজ্জন সমাজে প্রতিষ্ঠাই তার সম্বল। প্রার্থনা করি সেই মূলধনটুকু অবলম্বন করে, 'বঙ্গদর্শন' এর মহৎ অনুপ্রেরণায় তাঁরা যেন সম্মার্জনী প্রহারে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে 'ভস্মরাশি দূর করিবার ভার' যথাসাধ্য নেন—যাতে ভদ্রকুল কলঙ্ক তস্কর স্বভাবের কেউ ভবিষ্যতে 'দ্বিতীয়বার সেরূপ স্পর্ধা দেখাইতে আর সাহস' যেন না করে।[১৩] তবে ১৯৯৫ সাল থেকে 'কৌশিকী' প্রকাশিত হচ্ছে বার্ষিক পত্রিকা হিসাবে কলকাতাকে প্রধান অফিস করে।

১৯৯৫ সালের আগস্ট মাসে বালি থেকে 'সংবাদ একাল-সেকাল' নামে একটি ডবল ডিমাই সাইজের ফিচার ভিত্তিক মাসিক সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বালি গ্রামের সমস্যা, কৃতী সন্তানদের জীবন সম্বন্ধে ফিচার, পৌরসভার কাজের সমালোচনা ইত্যাদি দিয়ে কাগজটি প্রকাশিত হচ্ছিল। সম্পাদনায় ছিলেন—সুদেব মুখোপাধ্যায়। দুবছর চলার পর সেটিও বন্ধ হয়ে যায়। 'বর্তমান সংবাদ' নামে হাওড়ার বামুনগাছি থেকে শান্তিময় মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় একটি সমাচার ও ফিচার পত্রিকা (পাক্ষিক) প্রকাশিত হয়ে আসছে ১৯৮৪ সালের ১৬ই মার্চ থেকে। পত্রিকাটির 'ইয়োলো জার্নালিজমের' প্রতি ঝোঁক থাকলেও নিজ অস্তিত্ব আজও বজায় রেখে চলেছে।

এতক্ষণ কেবল বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকা নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

*স্মারক গ্রন্থ : কমরেড মদন দাস স্মৃতিরক্ষা কমিটি ১৯৮৪।

হিন্দী পত্র-পত্রিকাও যে দেশ স্বাধীন হবার পর কিভাবে হাওড়ায় প্রকাশিত হয়েছে তার কিছু আলোচনা হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন।

হাওড়া শহরে বিশেষ করে উত্তর হাওড়া অঞ্চলে হিন্দী ভাষাভাষীদের আধিক্য চোখে পড়ার মত। তাই দেশ স্বাধীন হবার দু'চার বছর আগে থেকেই এখানে হিন্দী-ভাষী শিক্ষিত লোকেরা হিন্দীতে সাময়িক পত্র প্রকাশেও উৎসাহী হয়েছিলেন। সেই রকম কয়েকটি পত্রিকার উল্লেখ নিশ্চয়ই নূতন সন্দেশ রূপে আদৃত হবে। ইতিপূর্বেই 'মনোরঞ্জন' নামে একটি হিন্দী সাপ্তাহিকের উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ পত্রিকাটি ১৯৫৩-৫৪ সাল থেকে 'ভারত-বন্ধু' নামে দৈনিক পত্রিকায় পরিণত হয়। দু'তিন বছর চলার পর উহা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৪৯ সালে 'রাহী' নামেও একটি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন বাবুলাল শর্মা ও শিউ কুমার শর্মা। পরে শ্রীকৃষ্ণ শর্মার সম্পাদনায় উহা বছর আণ্টেক চলেছিল। এটিও শালকিয়া কলু-পাড়া লেন থেকে প্রকাশিত হয়। 'জ্যোতিষ বিজ্ঞান' নামে আরও একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন পণ্ডিত তারাচন্দ্র শাস্ত্রী। এটি বাঁধাঘাটের গোবিন্দ ব্যানার্জী লেন থেকে প্রকাশিত হত। শাস্ত্রীমশায় নিজেও একজন নামী জ্যোতিষী ছিলেন। উহা ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত চলে। ১৯৫০ সালে ঐ গোবিন্দ ব্যানার্জী লেন থেকেই আবার 'ব্যাপার লক্ষ্মী' নামে একটি হিন্দী মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা করেন কামাখ্যা প্রসাদ শর্মা। পত্রিকাটির বৈশিষ্ট্য ছিল উহা কেবল ব্যবসা বিষয়ক সংবাদ ও খবরাখবরই প্রকাশ করত। এরপর যে সাপ্তাহিক হিন্দী পত্রিকাটির কথা উল্লেখ করা হবে তার ইতিহাস খুবই উল্লেখযোগ্য। পত্রিকাটির নাম 'প্রকাশ'। ১৯৫৭ সালের ১৫ই আগস্ট সাপ্তাহিক রূপে পত্রিকাটি শালকিয়া চৌরাস্তা থেকে প্রকাশিত হয়। সংবাদ বহুল মন্তব্যসহ বার পাতার এই সাপ্তাহিকটির প্রচার হিন্দীভাষীদের মধ্যে বেশ ভালই ছিল। সম্পাদক ছিলেন ক্ষমাশংকর দ্বিবেদী। ১৯৭৯ সালের ২৯শে এপ্রিল থেকে 'প্রকাশ' দৈনিক পত্রিকায় একই সম্পাদকের পরিচালনায় প্রকাশিত হয়। বর্তমানে ক্ষমাশংকর দ্বিবেদীর পুত্র শালিখাবাসী এন, এল, দ্বিবেদী উহার সম্পাদক হয়ে কলকাতা নিমতলা স্ট্রীট থেকে নিয়মিত প্রকাশ করছেন। ক্ষমাশংকর বাবু এই বৃদ্ধ বয়সেও নিজভূমি গাজীপুর থেকে একটি হিন্দী কাগজের সম্পাদনা করে যাচ্ছেন। লিলুয়া ডনবস্কো থেকে 'শংকর' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হত 'প্রকাশ' পত্রিকার সমসাময়িক কালে। প্রথমে সম্পাদক ছিলেন স্বামী স্বরূপানন্দ—পরে কাশীনাথ মিশ্র সম্পাদক হন। ১৯৫৩ সালে 'রূপলেখা' নামে একটি মাসিক হিন্দী পত্রিকা প্রকাশিত হয় কলুপাড়া লেন থেকে। সম্পাদনা করতেন বি, এল, শা। বছর চারেক চলার পর উহা সাপ্তাহিক হয়। বর্তমানে একই সম্পাদকের পরিচালনায় উহা কলকাতার লেনিন সরণী থেকে দৈনিক হিন্দী পত্রিকা রূপে প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯৬৪-৬৫ সালে শালকিয়া হরগঞ্জ রোড থেকে 'দেশকর্মী' নামে ডাঃ ডি, প্রসাদের পরিচালনায় আরও একটি হিন্দী পাক্ষিক প্রকাশিত হয়। চলে বছর দু'য়েক। সম্পাদক ছিলেন জগদীশচন্দ্র হিমকার ও শিউ কুমার শর্মা।

উপরিউক্ত তথ্যানুসন্ধানে এই প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই উঠতে পারে হাওড়া শহরে অ-বঙ্গবাসীদের মধ্যে উত্তর হাওড়া তাও আবার সালকিয়া অঞ্চল থেকেই কেন এত হিন্দী সাহিত্য ও সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ? এর উত্তরে যে সমস্ত সূত্র পাওয়া গেছে তার মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে শালকিয়ার অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থান। কলকাতার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র বড়বাজারের সঙ্গে শালিখার সান্নিধ্য। বাঁধাঘাট ও ও আহিরীটোলার মধ্যে ফেরী সার্ভিসের সুবিধা। গঙ্গা নদীর সান্নিধ্য হিন্দী ভাষীদের ধর্মীয় চিন্তাধারায় স্থানটিকে খুবই লোভনীয় করে তুলেছিল। প্রাচীন পাটকল ও সুতোকলের ব্যবসার এক প্রকৃষ্ট স্থান বলে তাঁরা শালকিয়াকে নির্বাচিত করেন। হাওড়া স্টেশনের সান্নিধ্য উত্তর ভারত, পশ্চিম ভারত ও পূর্ব ভারতের বিহারবাসীদের যাতায়াতের সুবিধা তাদের এখানে বসতি স্থাপনে আরও প্রলোভিত করে। শুধু তাই নয়, ধনী ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকেদের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান হিন্দীভাষীরা এখানে এসে আস্তানা নেন। ফলে লক্ষ্মী-সরস্বতীর সহাবস্থানের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। ধনী অ-বঙ্গবাসী ব্যবসায়ীরা শালকিয়াকে হাওড়ার বড়বাজার বলে মনে করেন। তাই পেছন থেকে শ্রেষ্ঠীরা হিন্দী সমাজের শিক্ষিত লোকেদের সহায়তায় শহরের প্রথম হিন্দী হাই স্কুল এই শালকিয়াতেই প্রথম গড়ে তুললেন। বিদ্যালয়টির নাম সত্যনারায়ণ মাধব মিশ্র বিদ্যালয় (১৯২০ সালে)। পাশাপাশি স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য তাঁরাই গড়ে তুললেন শ্রীহনুমান বালিকা বিদ্যালয়। উপরন্তু যাঁরাই এই অঞ্চলে হিন্দী পত্রিকা সম্পাদনা করতেন তাঁরা নিজেরাও হিন্দী সাংবাদিকতায় সুনাম অর্জন করেছিলেন। সংবাদপত্রকে দেশসেবার মাধ্যম ছাড়াও জীবিকা অর্জনের মাধ্যম হিসাবেও তাঁরা নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে দীর্ঘ দিন টিঁকিয়ে রাখতে পেরেছেন বা পারছেন।

১. History of Indian Journalism—J. Natarajan.

২, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১০, ১২. বাংলার সাময়িক পত্র (১৮১৮-১৮৬৮)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩. ৩০শে জানুয়ারী, ১৮৩০ সন।

১১. এককড়ি সিংহ রায় জীবনকথা, ১৯৬৪— সুষমা দাস।

৯, বেঙ্গল হরকরা (২৭শে ফেব্রুয়ারী—১৮৩০)।

১৩ বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য বিষয়ে গবেষণারত এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের রিডার ডেভিড ম্যাককাচ্চনের 'কৌশিকী' সম্বন্ধে অভিমত হচ্ছে—Your magazine is an excellent venture. All good wishes.

লৌকিক দেবদেবী ও মেলা

বাংলাদেশের আদিম অধিবাসী—কোল, ভীল, মুণ্ডা প্রভৃতি উপজাতিরা। বনজঙ্গল ও নদী পরিবৃত অঞ্চলে এই গোষ্ঠীর লোকেরা নিজেদের আশ্রয়স্থল গড়ে তুলেছিল। পরবর্তী সময়ে অন্যান্য জাতি ও উপজাতির সংমিশ্রণ ঘটেছে এদের সঙ্গে। পরিশেষে আর্যসভ্যতার ছোঁয়া পেয়ে এক উন্নত সংস্কৃতির সৃষ্টি হল—যাকে এক কথায় বাঙ্গালী সংস্কৃতি বলে আখ্যা দেওয়া হয়। এই সংস্কৃতি যেমন গড়ে উঠেছে দীর্ঘকালের মিলনের মধ্য দিয়ে তেমনি বঙ্গ সংস্কৃতির প্রবাহধারা টিকেও আছে দীর্ঘদিন ধরে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক বিভাগগুলির মধ্যে 'রাঢ়' একটি প্রসিদ্ধ অঞ্চল। পশ্চিমবঙ্গের এক বিরাট অংশ এই রাঢ়ভূমির অন্তর্গত। হাওড়া জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলও এই সীমার মধ্যে। জেলার জনসংখ্যার বেশীর ভাগ মানুষ আজও বর্গক্ষত্রিয়, নমঃশূদ্র, কেওট, কৈবর্ত, ধীবর ও মাহিষ্য সম্প্রদায়ের লোক। তাদেরই পূজিত অনার্য দেবদেবীর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে লোকসংস্কৃতির আসল রূপ। আর এই লোকসংস্কৃতির ভেতরেই মিলবে পশ্চিমবঙ্গ তথা বঙ্গ সংস্কৃতির আসল পরিচয়। হাওড়া জেলার লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি ছড়িয়ে রয়েছে গ্রামে গঞ্জে মাঠে ঘাটে ও বৃক্ষতলায়। পরে তারা শহরাঞ্চলেও নিজেদের মাহাত্ম্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। ঐ সব লৌকিক দেবদেবীদের কেন্দ্র করে নানা ব্রতকথা, ছড়া, গান ইত্যাদি রচিত হয়ে বাংলা সাহিত্যে পর্যন্ত স্থান করে নিয়েছে। গ্রাম্য অনার্য দেবদেবীদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন—ধর্মঠাকুর, পঞ্চানন্দ ঠাকুর, চণ্ডী, দক্ষিণ রায়, মনসা, শীতলা প্রভৃতি। শুধু তাই নয় ওরই পাশে গড়ে উঠেছে মুসলমান সমাজের পীরের মাজার। ধর্মের সহাবস্থানের এ এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বঙ্গ সংস্কৃতির এই মূলমন্ত্র হাওড়া জেলাতেও বেশ ভালভাবেই দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরনের লৌকিক দেবদেবীর এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাসেরও বর্ণনা এই অধ্যায়ে দেওয়া হল। বঙ্গ সংস্কৃতিকে বুঝতে গেলে একে অবহেলা করা সম্ভব নয়।

পঞ্চানন ঠাকুর—গ্রাম্যদেবতা বা লৌকিক দেবতা হিসাবে পঞ্চানন ঠাকুরের প্রভাব নিম্নবঙ্গের বনাকীর্ণ নদী তীরবর্তী জেলাগুলিতেই বেশী চোখে পড়ে। তাই হাওড়া ও চব্বিশ পরগনায় এই ঠাকুরের পূজা সমধিক প্রচলিত। তবে প্রশ্ন উঠতে পারে এর কারণ কি? আগেই বলা হয়েছে যে, ইহা একটি লৌকিক দেবতা। আদিম যুগের লোকেরা বিশ্বাস করতো যে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, বজ্রপাত, বৃষ্টি, খরা এমনকি শস্য উৎপাদন এসবই হচ্ছে কোন না কোন দেবতার কৃপায়। মৃত্যুর পরেও মানুষের আর এক জীবন সম্বন্ধে তারা চিন্তা করতো। তাই মৃতের সমাধির পাশে তাদের প্রিয় খাদ্যদ্রব্য ও পোষাক পরিচ্ছদ সাজিয়ে রাখতো। ঐ যুগের মানুষরা বিশ্বাস

করতো তাদের পূর্বপুরুষরা হচ্ছে কোন না কোন গাছপালা, ফুল বা জীবজন্তুর বংশধর। তাই তারা কেউ সাপ, কেউ ভালুক, কেউ হরিণ ও সূর্যমুখী প্রভৃতির খোলস পরে নৃত্যসহকারে নিজেরা কোন গোষ্ঠীর তার পরিচয় দান করতো। এই বিশ্বাসকেই ইতিহাসে টোটেম বিশ্বাস বলে। পঞ্চানন ঠাকুরের মূর্তিতে যে এই বিশ্বাসই ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করলেই ধরা পড়বে।

হাওড়ায় পঞ্চানন ঠাকুরের মূর্তি হচ্ছে পুরুষের উগ্র মূর্তি। ডান পা মুড়ে বা পায়ের উপর রেখে তিনি বসে আছেন। ডান হাতে রয়েছে মাভৈ মুদ্রা। দুটি বিস্ফারিত নেত্র, মাথায় সাপে জড়ানো জটা চুল। কানে ধুতুরার ফুল ও বিরাট গোঁফ। পাশে রয়েছে একটি ভাল্লুক আর এক দিকে নগ্ন অবস্থায় পেঁচো বা পাঁচু ঠাকুর। এই মূর্তিটি যে টোটেম বিশ্বাসেরই একটি অঙ্গ তা ভাল্লুকের ও সাপের অবস্থিতি থেকেই ধরা যায়। কারণ, পাঁচু ঠাকুরের বাহন হচ্ছে ভাল্লুক। 'বর্দ্ধমানের অমরাগড়ের মহেন্দ্র রাজার বংশ বিবরণ 'শিবাখ্যা-কিঙ্কর' কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে যে একদা ভল্লুকের দ্বারা পালিত হয়েছিলেন রাজার পিতামহ। শুধু তাই নয়, ঐ অমরাগড়ের সদ্‌গোপ বংশীয়েরাও পূর্বে নাকি ভাল্লুক পুষতেন এবং পালন করতেন। এমনকি মরলে নাকি তারা অশৌচ পালন করতেন।[১]

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসের লেখক আশুতোষ ভট্টাচার্য আবার বলেন— 'পেঁচো নামক কোন বৃক্ষবাসী অপদেবতা হইতেই তিনি ক্রমে পাঁচু ঠাকুর এবং অবশেষে পঞ্চানন্দ ঠাকুর নাম পরিচয় লাভ করিয়া বর্তমানে শিবরূপে পূজিত হইতেছেন।' এই পঞ্চানন্দ থেকেই পঞ্চানন কথাটি লোকমুখে প্রচারিত হয়ে আসছে। এই পঞ্চানন ঠাকুরেরই আরও একটি নাম রয়েছে যাকে প্রাচীনরা 'বাবাঠাকুর' নামেই ডেকে থাকেন। অনুমান করা যায় এই লৌকিক দেবতার 'বাবাঠাকুর' নামটিই আদিমতম।'[২] কোন কোন পণ্ডিতগণ আবার পঞ্চানন্দ দেবতাকে শিবের পুত্র বা বটুক ভৈরব বলেও অভিহিত করেছেন। চব্বিশ পরগণা ও হাওড়ার বহু স্থানে এই দেবতার স্থায়ী মন্দির বা থানও আছে। হাওড়া জেলায় পঞ্চাননতলা রোডে পঞ্চানন ঠাকুরের মন্দির খুবই বিখ্যাত। দেবতার নামেই রাস্তাটির অনুরূপ নাম হয়েছে। এছাড়া বালি, শালিখা, ঘুষুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলেও এই ঠাকুরের পূজার থান রয়েছে। তবে এই ঠাকুরের মূর্তি জেলার সর্বত্র এক রকম নয়। হাওড়া জেলার রসপুর-জয়পুর গ্রামে দু'শ বছরের প্রাচীন পঞ্চানন্দের মন্দির আছে। এ মন্দিরে পঞ্চানন্দের মূর্তির বৈশিষ্ট্য দেখার মত। ইনি ঘোড়ার উপর ভীষণ উগ্র মূর্তিতে উপবিষ্ট— সামনে তিনটি ঘট—একটি জ্বরাসুরের; একটি তাঁর নিজের ও অপরটি পাঁচু ঠাকুরের।[৩] ডোমজুড়ের কেশবপুর গ্রামে পঞ্চানন্দের স্থানে প্রতি বছর 'বানফোড়া' উৎসব দেখতে বহু লোকের সমাগম হয়।[৪]

এই ঠাকুরের মাহাত্ম্য বর্ণনায় বলা হয় তিনি মৃতবৎসা বা পুত্রহীনা নারীদের সন্তান লাভের দেবতা। তিনি আবার ধনুষ্টঙ্কার বা খ্যাঁচ ব্যাধিরও দেবতা। পৌরাণিক কাহিনী মতে রাজা সত্যবান সমস্ত দেবদেবীর পূজার ব্যবস্থা করলেও বাদ

রাখলেন পঞ্চানন্দ দেবতাকে। ক্রুদ্ধ পঞ্চানন্দ তাঁর অনুচর তরঙ্গার পরামর্শ অনুযায়ী খ্যাঁচ বা ধনুষ্টঙ্কার ব্যাধিকে বাগানে ক্রীড়ারত রাজার ছেলের কাছে পাঠান। খেলতে খেলতে রাজপুত্রের খ্যাঁচ ধরে। রাজা পুত্রের আরোগ্যের জন্য ধন্বন্তরি ন্যাবোড় সিংহ রায়কে ডেকে পাঠান। কিন্তু তরঙ্গার সাপে ধন্বন্তরির গলা দিয়ে আর মন্ত্রই উচ্চারিত হল না। পঞ্চানন্দ তখন ব্রহ্মচারীর মূর্তি ধরে রাজবাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হন। রাজা ব্রহ্মচারীকে চিনতে পারেন। প্রথমে অনিচ্ছা থাকলেও পুত্রের জীবন-লাভের জন্য অবশেষে তাঁর পূজা করতে রাজি হন। এইভাবে খ্যাঁচ দেবতা হিসাবে তিনি মর্ত্যে পূজিত হতে লাগলেন।

একদা অনার্য এই বনদেবতা আজ শুধু গ্রামাঞ্চলেই নয় শহরাঞ্চলেও এই দেবতা মানুষের মধ্যে পূজার স্থান করে নিয়েছে। আজও অগণিত মানুষ তার মনস্কামনায় এসে ভীড় করে তাঁর চরণে। কাউর কামনা পূর্ণ হয় আবার কাউর হয়তো হয়ও না—তথাপি তাঁর মহিমা কিন্তু আদিকাল থেকে আজও কমেনি বরং সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের থানের বা মন্দিরেরও শ্রীবৃদ্ধি বেড়েছে। এই শ্রীবৃদ্ধির কারণ সমাজ বিজ্ঞানীদের ভেবে দেখার মত বিষয়।

চণ্ডীদেবী—ইনিও একটি অনার্য দেবী। একদা বনাকীর্ণ অঞ্চলেই এই দেবীর আধিক্য দেখা যেত। হাওড়া যে একদা বনাঞ্চলে অবস্থিত ছিল তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং বনদেবীরূপে চণ্ডী এখানে যে পূজিতা হবেন তাতে সন্দেহ নেই। চণ্ডীদেবীর কোন বিশেষ মূর্তি নেই—পাথরকে সাক্ষী করেই এই দেবীর পূজা করা হয়। বনের দেবী হিসাবে সবররা পশুহত্যা বা শিকারে যাবার আগে ইহার আরাধনা করে থাকতো। ওরাওঁ উপজাতিরাই এই বনদেবীর পূজা শুরু করে। ওরাওঁদের 'চাণ্ডী'দেবী থেকে পরে হিন্দুদের 'চণ্ডী'দেবীতে পরিণত হয়েছে। নৃতত্ত্ববিদ শরৎচন্দ্র রায় 'ভারতে মানব সমাজ' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে ওরাওঁ প্রভৃতি জাতির 'চাণ্ডী' দেবতার সঙ্গে হিন্দু চণ্ডীদেবীর সাদৃশ্য দেখা যায়।[৫] চণ্ডী যেমন শবর জাতির দেবী তেমনি চণ্ডী আবার বণিকশ্রেণীর মঙ্গলাদেবী রূপেও পূজিতা হন। তাই তাঁকে মঙ্গলচণ্ডী নামেও পূজা করা হয়। কালকেতু উপাখ্যানে যেমন শবর দেবী হিসাবে চণ্ডী পূজিতা হন সেই চণ্ডীই আবার ধনপতি সওদাগরের কাছে মা মঙ্গল চণ্ডী নামে পূজিতা হয়েছেন। কাহিনী এদের আলাদা হলেও দুটি কাহিনীরই মূল বক্তব্য বিপদ থেকে রক্ষার কাতর কাহিনী। আদিতে যদিও বা কোন স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু পরে উহা মিলে একাকার হয়ে গেছে। তাই আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন—'স্বতন্ত্র দেব পরিকল্পনা থেকে এই উভয় কাহিনীর ভিত্তি পরবর্তীকালে এসে একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে।'[৬]

চণ্ডীদেবীর আরও বিভিন্ন রূপ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন বারুজীবীরা পূজা করে যে চণ্ডীদেবীকে তাঁর নাম সোমাই চণ্ডী। তাদের বিশ্বাস এই দেবীর কৃপায়ই তাদের পান চাষে শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। হাওড়া জেলায় পান চাষ বেশ উন্নত। তাই এই জেলায় এই দেবতার স্থান চোখে পড়ার মত। সোমাই চণ্ডীর বাৎসরিক পূজোর

দিন জেলার পান চাষীরা বোরোজ থেকে কোন পান পাতা তুলবে না। একই পন্থায় জেলে সম্প্রদায়ের লোকেরাও চণ্ডীর পুজো করে। তাদের কাছে চণ্ডী তখন মাকাল চণ্ডীরূপেই পূজিতা হন। এই দেবীরও নির্দিষ্ট কোন দেহধারী রূপ নেই। মাটির একটি কিংবা দুটি স্তূপকেই দেবী হিসাবে পুজো করা হয়। মৎস্যজীবীরা মাছ ধরার আগে জলাশয়ের পারে মাকাল চণ্ডীর নাম করে মাটির বেদীর ওপর ফুল বেলপাতা বা তুলসীপাতা দিয়ে পুজো করে। পুজোর কোন ব্যয়বাহুল্য নেই। এ ছাড়া হাওড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে অঞ্চল ভিত্তিতেও চণ্ডীর পুজোর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে নিয়মিত পুজো হয়ে থাকে এবং সেখানে বছরের বিশেষ বিশেষ দিনে মেলা ও উৎসবের আকার ধারণ করে—যেমন আমতার মেলাই চণ্ডী, মাকড়দার মাকড়চণ্ডী, শিবপুরের বেতাইচণ্ডী, জয়পুরের জয়চণ্ডী, রসপুরের গড়চণ্ডী প্রভৃতি স্থান। গড়চণ্ডীর মূর্তি কিন্তু দ্বিভুজা দুর্গামূর্তি।

এর মধ্যে আমতার মেলাইচণ্ডী ও শিবপুরের বেতাইচণ্ডী বনের মধ্যেই পূজিতা হতেন। আমতার দামোদরের পশ্চিমে জয়ন্তী বনাঞ্চলে ছিলেন মেলাইচণ্ডী আর বেতড়ের বেতবনের মধ্যে ছিলেন বেত্রচণ্ডী যা থেকে বেতাইচণ্ডী নাম হয়েছে। একদা আমতার এই অঞ্চল দামোদরের তীরে অবস্থিত হওয়ায় এখানে বন্দর গড়ে উঠেছিল। মেলাইচণ্ডীকে পুজো দিয়ে সওদাগররা বাণিজ্যে বের হত। কথিত আছে কয়েক শতাব্দী পূর্বে এক পূজারী ব্রাহ্মণ স্বপ্নাদিষ্ট হন যে জয়ন্তীর বনে দেবীর মূর্তি আছে। তিনি যেন তাঁর পুজোর ব্যবস্থা করেন। খোঁজাখুঁজির পর দেবীর একটি পাথরের মূর্তির সন্ধান পান। দামোদরের পূর্ব পার থেকে শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষায় নিয়মিত পুজো পেতে থাকেন দেবী চণ্ডী। কিন্তু বর্ষায় দামোদর পেরিয়ে জয়ন্তীর বনে নিয়মিত পুজো দেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠে। একদিন বর্ষায় জলোচ্ছ্বাসের ফলে ব্রাহ্মণ ঠাকুর নদী পারাপার করতে অসমর্থ হয়ে ফিরে যাবার কথা ভাবতে ভাবতে দেখেন যে নদীতে একটি গাছের গুঁড়ি ভেসে আসছে। তিনি ঐ গুঁড়িটিকে অবলম্বন করে নদী পার হন এবং মায়ের পুজো সমাপন করেন। এ কাজ প্রতিদিন অসম্ভব ভেবে একদিন পূজারী ব্রাহ্মণ দেবীমূর্তিকে নিয়ে ঐ কাঠের গুঁড়ির সাহায্যে এপারে চলে আসেন। ডাঙ্গায় পা দিয়ে তাঁর ভুল ভাঙ্গে এতদিন যে গাছের গুঁড়ি করে তিনি পারাপার হোতেন তা আসলে একটি কুমীর। এই অলৌকিক কাহিনী প্রচারিত হয়। তারপর থেকে আমতা ময়রাপাড়ায় নিত্য পুজোর ব্যবস্থা চলে। আরও অনেক পরে বর্তমান স্থানে অর্থাৎ আমতা বাজারে বিশাল মন্দিরটি তৈরী হয় কলকাতার হাটখোলার দত্ত পরিবারের আর্থিক সহায়তায়। আজ প্রায় একশত ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট মন্দিরে রয়েছেন চার ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট হাত-পা বিহীন দেবীমূর্তি। ভক্তজনের মনস্কামনা পূর্ণ করার সুবাদে দেবীর চোখ, কান, নাক ও মুখমণ্ডল সোনা দিয়ে বাঁধানো—মস্তকে রয়েছে রূপার মুকুট। এতবড় চণ্ডীর মন্দির জেলায় মেলা ভার।

শিবপুরের বেতাইচণ্ডীর মন্দির খুবই প্রাচীন। বেতন্ড বা বেতড় বন্দর তখন

ছিল একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। সরস্বতী নদী মজে গেলে সপ্তগ্রাম বন্দরে সরাসরি যাওয়া অসুবিধাজনক ছিল। তাই বেতড় বন্দরে নঙ্গর করে নদীপথে বাণিজ্য চলতো। ধনপতি সওদাগর প্রভৃতি বণিকরা সমুদ্রপথে বাণিজ্য করার পথে বেতড় বা বেতাই বন্দরে বেত্রদেবী তথা বেতাই চণ্ডীকে পুজো দিয়ে তবেই তাঁরা আদি গঙ্গা দিয়ে বাণিজ্যে যাত্রা করতেন। এর বিবরণ মনসামঙ্গল কাব্যেও সুন্দরভাবে বর্ণিত রয়েছে। সরস্বতী নদী শুকিয়ে গেলে এই বন্দরের গুরুত্ব কমে যায়। কিন্তু আজও পর্যন্ত বেতাইতলা বাজারের পাশেই একটি নিরাভরণ ইটের মন্দিরে সিঁদুর লেপা কোটরাগত চোখ ও লম্বা নাকযুক্ত দেবী মূর্তি ভক্তদের দ্বারা পুজালাভ করে আসছেন।

এতক্ষণ যে সব চণ্ডীদেবীর আলোচনা করা হল তাঁরা প্রত্যেকেই হিন্দু জাতির দ্বারা পূজিতা। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের দ্বারা সমানভাবে যে চণ্ডীদেবী পূজিতা হন তারই নাম ওলাই চণ্ডী। ওলাবিবি বা বিবিমা নামেও এঁদের ডাকা হয়। ওলাউঠা অর্থাৎ দাস্ত বমি রোগের দেবতা হচ্ছে ওলাইচণ্ডী। সাধারণভাবে যাকে কলেরা বলে। হাওড়া জেলার অধিকাংশ স্থানেই এই দেবীর পুজার থান আছে। এই পুজোয় হিন্দু পুরোহিত ও মুসলমান ফকির দুজনে এক সঙ্গে দুপাশে বসেই পুজো করেন। পুজার সিন্নি প্রসাদ হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তরাই ভাগ করে গ্রহণ করে। এই পুজো বহু শত বছর ধরেই বঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহন করে চলেছে।

এ ছাড়া ঘাম, বসন্ত প্রভৃতির দেবীকে বলা হয় ওলাবিবি। এই দেবীও হিন্দু মুসলমান সকলের কাছেই সমানভাবে পূজিতা হন। চব্বিশ পরগনার মত হাওড়ায়ও এর মূল খুব সুদৃঢ়। মধ্য হাওড়ায় কাসুন্দিয়া অঞ্চলে ওলাবিবি দেবীর স্থায়ী মন্দির আছে—তার সঙ্গে ওলাবিবিতলা লেন নামে একটি রাস্তাও আছে।

ধর্মঠাকুর—গঙ্গার পশ্চিমকূল অর্থাৎ রাঢ় বঙ্গের প্রধান দেবতাই হচ্ছে ধর্মঠাকুর। তবে এই দেবতা মূলত অনার্য হলেও কালে উহা আর্য ও অনার্যের এক কমন ফ্যাক্টররূপেই পরিণত হয়। ডঃ সুকুমার সেনের ভাষায়—আর্যদেবতা ধর্মঠাকুরের যেমন রথারোহী সূর্য ও বরুণরূপ আছে তেমনি অনার্যদেবতা ধর্মঠাকুরের রূপ কূর্মাবতার, তাম্রধাতু ও বৃক্ষদেবতাও বটে।[৭] কিন্তু পণ্ডিত প্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ধর্মঠাকুরকে অবশ্য বৌদ্ধ দেবতা বলে মত প্রকাশ করেছেন। শ্রীসেন শাস্ত্রী মশায়ের মতকে খণ্ডন করে বলেছেন যে বাংলাদেশে বৌদ্ধ মহাযান ধর্মের প্রভাব বিস্তার হলেও হিন্দুধর্মের লোকনাথ ও বৌদ্ধ ধর্মের 'ধর্ম' অভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তিনি এই মতও প্রকাশ করেন যে 'ধর্ম' কথাটি 'অস্ট্রিক' শব্দের সংস্কৃত রূপও হতে পারে। তবে ধর্মঠাকুরের ধ্যানে তাঁকে 'শূন্য' বলে বলা হয়েছে তার সঙ্গে বৌদ্ধ মহাযানের শূন্যের কোন মিল নেই। এই শূন্য মানে শুভ্র। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ 'ধর্মদেবতা' বাহন হচ্ছে সাদা পেঁচা ও সাদা কাক। কিন্তু যোদ্ধা বেশে ধর্মঠাকুরের বাহন হচ্ছে সাদা ঘোড়া।

রাঢ় অঞ্চলের ডোম সম্প্রদায়ের লোকেরাই এই দেবতার পূজারী। ধর্মঠাকুরের প্রতীক কূর্মাকৃতি শিলাখণ্ডের ওপরে একটি পাদুকাচিহ্ন অংকিত আছে। এই পাদুকাই ধর্মঠাকুরের আসল প্রতীক। ডোম পুরোহিতরা ঐ পাদুকা বুকে ঝুলিয়ে রাখতো। পরে কৈবর্ত, বাগদী ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাঁর পূজারী হয়। ধর্মঠাকুরের পূজার উপকরণ হিসাবে মদ ও মাংস ব্যবহার করা হোত। এমনকি শুয়োর পর্যন্ত বলি দেওয়া হোত। বর্তমানে অবশ্য হাঁস, পায়রা কোথাও আবার পাঁঠা বলিও দেওয়া হয়।

ধর্মঠাকুরের ব্যাখ্যা একটু সবিস্তারে করলে হয়তো পাঠকের ধৈর্যচ্যুতির পরিবর্তে ভালই লাগবে। কারণ পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে রাঢ়বঙ্গে এমন জেলা কদাচ দেখা যাবে যেখানে এক বা একাধিক স্থান ধর্মতলা নামে নামাঙ্কিত হয়নি।

ধর্মঠাকুরের পুজোর একটি প্রধান অঙ্গ হচ্ছে চড়ক পুজা। 'চড়ক' হচ্ছে সূর্য পুজোরই একটি অংশ। চড়ক গাছের ওপর শূন্যে চক্রাকারে যে আবর্তন করতে দেখা যায় তা সূর্য পরিক্রমণের রূপক মাত্র।[৮] শিব পুজোর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। যদিও হিন্দুধর্মের প্রভাবে এই পুজোর সাথে শিবের গাজনের (চৈত্র মাসে) একাকার হয়ে গেছে।

আসলে ধর্মঠাকুরের স্নানযাত্রা বা পুজো অনুষ্ঠিত হয় বৈশাখী পূর্ণিমা বা বুদ্ধ পূর্ণিমা তিথিতে। এই পুজোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈশাখের রৌদ্রতপ্ত ভূমির রুক্ষতায় বৃষ্টি সিঞ্চন করে জমির উর্বরতাকে ফিরিয়ে আনা। আরও একটি উদ্দেশ্যে এই পুজোর প্রবর্তন হয়েছিল তা হচ্ছে বন্ধ্যানারীর পুত্র সন্তান লাভার্থে। কথিত আছে, রাজা গৌড়েশ্বর বঙ্গদেশে এই পুজো প্রথম প্রচলন করেন। রাজরানী রঞ্জাবতী শালে ভর করে ধর্মঠাকুরের কৃপায় দুটি পুত্রসন্তান লাভ করেন—যাঁর একজনের নাম ইতিহাসে লাউসেন নামে প্রসিদ্ধ।

হাওড়া জেলায় ধর্মঠাকুরের নামে অনেক স্থানের নাম থাকলেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শালিখা ধর্মতলা, শিবপুর ধর্মতলা, খুরুট ধর্মতলা, ঘুষুড়ি ধর্মতলা, বামুনগাছি ধর্মতলা, বালি ধর্মতলা, গড়ভবানীপুরের ধর্মতলা, ডোমজুড়ের রুদ্রপুর গ্রামের ধর্মতলা প্রভৃতি। এদের মধ্যে আবার শালিখার ধর্মতলাই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। আলোচনান্তেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কিংবদন্তি আছে যে রাজা গৌড়েশ্বর একবার স্বপ্নাদিষ্ট হন যে তাঁকে ধর্মঠাকুরের পুজো প্রচলন করতে হবে। স্বপ্নে তিনি এও আদিষ্ট হন যে শালিখা গ্রামে চার বিখ্যাত পণ্ডিত যথা সীতাই পণ্ডিত, কংসাই পণ্ডিত, রামাই পণ্ডিত ও নবাই পণ্ডিত আছেন। সেখানেই এই ঠাকুরের পুজোর প্রকৃষ্ট স্থান। উল্লেখ্য, এই চার পণ্ডিতই পৌণ্ড্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন।

রাজার আদেশে শেওড়াফুলির জমিদার দীনেশ চন্দ্র চৌধুরী শালিখায় প্রচুর জমি দান করেন। সেখানেই ধর্মঠাকুরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। আজও সেখানে দেবোত্তর সামান্য জমির উপর ধর্মঠাকুরের পুজা হয়। বাকি জমিতে—ডোম,

কেওড়া, বাগ্দী ও পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ের লোকেদের বাস দেখেই ঐ বক্তব্যের সারবত্তা প্রমাণিত হয়। ধর্মঠাকুরের পুরোহিতদের পণ্ডিত নামেই আখ্যা দেওয়া হয়। ঐ চার পণ্ডিতের মধ্যে সীতাই, কংসাই পণ্ডিত সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায় না। কিন্তু রামাই পণ্ডিত খুব সম্ভবতঃ শালিখার লোক ছিলেন না। 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'র লেখক বিনয় ঘোষ তাঁর গ্রন্থে লিখছেন—'ময়নাপুরে পৌঁছে (বাঁকুড়া) সবই দেখলাম। লাউসেনের রাজধানী ও 'শূন্য পুরাণ' রচয়িতার বাসস্থান (রামাই পণ্ডিত) হতে হলে যে সব ঐতিহাসিক স্মৃতির নিদর্শন থাকা দরকার তার প্রায় সবই ময়নাপুরে আছে।' তবে নবাই পণ্ডিত যে শালিখারই অধিবাসী তাতে কোনই সন্দেহ নেই। এমনকি তিনি যে ১১১১ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন তারও নিদর্শন পাওয়া যায় বর্তমান মন্দিরের বিপরীত দিকে ধর্মতলা রোডের ওপর প্রতিষ্ঠিত শিবজী মন্দিরের স্মৃতি ফলক থেকে। শ্বেত পাথরের স্মৃতি ফলকে লেখা আছে ঃ

শ্রীশ্রী ৺ পঞ্চানন্দ শিবজী

সন ১১১১

সেবাইত—নবাইচন্দ্র পণ্ডিত, শালকিয়া ধর্মতলা।

আজও বৈশাখী পূর্ণিমা শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে শালিখা ধর্মতলায় ধর্মঠাকুরের স্নানযাত্রা ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আগেকার দিনের মত ঢাকঢোল, সং, লাঠিখেলা, অগণিত মশাল সর্ব্বোপরি 'নাগোয়া সম্প্রদায়ের' যোদ্ধাবেশধারী লোকের আকর্ষণীয় শোভাযাত্রা আর নেই। কারণ শালিখা থেকে কেওড়া সম্প্রদায়ের অবলুপ্তি। তবে এখনও বারোদিন ব্যাপী পূজা, মেলা, কবির লড়াই এবং শেষ দিনে চড়ক দোলা ও ঝাঁপ দেওয়া হয়।

ধর্মঠাকুরের সঙ্গে আর একটি নারী দেবতা থাকে তার নাম হচ্ছে কামিন্যাদেবী। শালিখা ধর্মঠাকুরের মন্দিরে সেই নারী দেবীকে দেখতে পাওয়া যাবে। গ্রামে গ্রামে কামিন্যা থেকে কালী দেবতার প্রচলন হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। কারণ রাঢ় বঙ্গের অধিকাংশ গ্রামেই কালীর সেবাইত হচ্ছে ডোম, হাড়ী, বাগ্দী সম্প্রদায়ের মানুষ। পূর্বেই বলা হয়েছে, ধর্মঠাকুর রাঢ় বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রাম্য দেবতা। যদিও চৈত্রের শিবের গাজন উৎসব ধর্মঠাকুরের গাজনোৎসব এক নয়। তথাপি ধর্মঠাকুরের এই গাজনোৎসব কালক্রমে হিন্দুদের শিবের গাজন উৎসবে একাকার হয়ে গেছে। গড়ভবানীপুরের ধর্মঠাকুরের উৎসবে প্রচুর জনসমাগম আজও হয়। আর ডোমজুড়ের রুদ্রপুরের ধর্মঠাকুরের পূজায় আসেন বহু দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ তাঁর কৃপালাভের জন্য। জয়পুরের 'মতিলাল' নামে ধর্মঠাকুরের মন্দিরটি খুব প্রাচীন। পোড়া মাটির কাজে শোভিত মন্দিরটি আজ অবশ্য জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে।

মনসা পূজা—এই পূজার প্রচলন বাংলা দেশের প্রায় সর্বত্রই রয়েছে। এর জৌলুস পূর্বও উত্তর বাংলায়ই বেশী। তবে এর পুজো সর্বত্রই এক সময়ে হয় না।

সাধারণতঃ যেখানে বর্ষা আগাম হয় সেখানে আষাঢ় মাসে এই পুজো হয়। আর যে অঞ্চলে বিলম্বিত বর্ষা দেখা যায় সেখানে ভাদ্র মাসে মনসার পুজো হয়। মনসা আসলে সাপের পুজো। বর্ষা আগমনে গর্তে জল ঢোকার ফলে সাপেরা বেরিয়ে আসে। তার দংশনের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যই মা মনসার পুজো। এই আষাঢ়ের আর একটি গ্রামীন উৎসব অম্বুবাচী। সাধারণ ধারণা অম্বুবাচীর আম, দুধ, কলা খেলে নাকি সে বছর সাপে কাটতে পারবে না। 'এই দেবীকে বিচিত্র সমন্বয়ের প্রতীকরূপে গণ্য করা হয়। ইঁনিই একই সঙ্গে পশু পুজো, বৃক্ষ পুজো, নদী উপাসনা এবং মাতৃকা আরাধনার ধারাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছেন।'[৯] দক্ষিণ ভারতের অনার্য দেবী মনসার পুজা প্রচলন নিয়ে বঙ্গদেশে যে ইতিহাস আছে তা পাঠকদের অনেকেরই জানা। পরম শিবভক্ত চাঁদ সওদাগর বিপুল বৈষয়িক ক্ষতি আসন্ন জেনেও সদম্ভে বলেছিলেন—

যে হাতে পুজেছি আমি দেব শূলপাণি।
সে হাতে পুজিব কেমনে চ্যাংমুড়ী* কানী॥

অশ্রদ্ধায় হলেও চাঁদ সওদাগরের পুজা পেয়ে এদেশে মনসা পুজার প্রচলন হয়।

হাওড়ার শহরাঞ্চলে শালিখার সীতানাথ বসু লেনস্থ বাগ্দী পাড়ায় মনসা ঠাকুরের পাথরের মূর্তির নিত্য পুজা আজও হয়। উত্তর ব্যাঁটরার মনসাতলা সমানভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে আসছে। রসপুর গ্রামের গড়চণ্ডী তলার মনসা মন্দির সমধিক উল্লেখযোগ্য। এহেন কষ্টি পাথরের মূর্তি জেলায় কদাচিৎ দেখা যায়। দামোদরের চড়া থেকে প্রাপ্ত সেন আমলের এই মূর্তিটি উচ্চতায় ১২'' এবং প্রস্থে ৫''।[১০] 'এছাড়া ডোমজুড়ের ওয়াদিপুরে মনসামাতার মন্দির বিশেষ জাগ্রত। বহু সাপে কাটা রোগী দেবীর কৃপাপুষ্ট ঔষধের দ্বারা প্রাণ ফিরে পেয়েছেন।[১১]

শীতলা পুজা—এই দেবী গুটিদানা জনিত (হাম, বসন্ত ইত্যাদি) রোগের দেবী। এই দেবীকে আবার সমন্বয়ের দেবীও বলা যেতে পারে। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ এমনকি চীনারাও এই দেবীর কৃপালাভে পুজা স্থানে মিলিত হয়। শীতলা দেবীর উল্লেখ রামায়ণ মহাভারতেও আছে। বিরাট রাজার রাজ্যে একবার বসন্ত দেখা দিলে বিরাট-রাজ পর্যন্ত শীতলার পুজো দিয়ে রেহাই পান। তা সত্ত্বেও বলা হয় এই দেবী একটি অনার্য সমাজের দেবী। পরে সকল সম্প্রদায়ের দ্বারাই তিনি বসন্ত রোগের দেবীরূপে পুজিতা হন। হিন্দুর কাছে তিনি শীতলা, মুসলমানের কাছে তিনি বুড়োবুবু, বৌদ্ধের কাছে হারীট ও চীনাদের কাছে ঊষা বলে পরিচিতা। বসন্ত ঋতুতে পৃথিবীপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে। ভক্তদের বিশ্বাস এই সময়ে দেবী নিজে গঙ্গায় স্নান করে নিজে যেমন শীতল হন এদেশের মাটিকেও তেমনি শীতল করেন। তাই শীতলা পুজার সঙ্গে বৎসরান্তে স্নান যাত্রার একটি পর্ব রয়েছে যদিও ইহার প্রচলন সম্ভবত একমাত্র হাওড়া জেলার শালিখা

চ্যাংমুড়ী মনসার আর এক নাম। দক্ষিণ ভারতে মনসাকে 'চেন্মুড়ে' বলা হয়।

অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। বলা বাহুল্য, এখানে এই স্নানযাত্রা এক অনন্যরূপ ধারণ করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। শুধু তাই নয় যত দিন যাচ্ছে ততই ভক্তদের মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ায় উৎসবের জৌলুশ দিন দিনই আকর্ষণীয় ও আড়ম্বরপূর্ণ হয়ে উঠছে। দেবীর রূপ বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ

নমস্তে শীতলাং দেবীং
রাসভস্থাং দিগম্বরীং
মার্জনীকলসোপেতানাং
সূর্পালঙ্কৃতাং মস্তকাম্।

অর্থাৎ গর্দভ পৃষ্ঠে উলঙ্গ শীতলাদেবী হাতে ঝাঁটা ও কলসী এবং মস্তকে কুলো নিয়ে অধিষ্ঠিতা। তবে শালিখার সবকটি শীতলা দেবীই কিন্তু আবক্ষ। অন্যত্র অবশ্য পূর্ণাবয়ব শীতলা মূর্তিই দেখতে পাওয়া যায়। শীতলা দেবীর মঞ্চে পঞ্চানন ঠাকুর বা জ্বরাসুরের মূর্তিও দেখতে পাওয়া যায়। জ্বরাসুর হচ্ছে জ্বরের দেবতা। হাম বা বসন্ত হলে আগে জ্বর হয়—তাই জ্বরাসুরের পূজারও ব্যবস্থা আছে শীতলা মন্দিরে। আগেই বলা হয়েছে, শালিখার শীতলামায়ের আখ্যান বৈচিত্র্য-পূর্ণ। এখানকার শীতলা দেবীরা সাত বোন। এঁরা কেউ দারু নির্মিত, কেউ মাটির হাঁড়িতে অঙ্কিত। কেবলমাত্র কয়েল বাগানের কয়েলেশ্বরী মা শীতলা হচ্ছেন পাথরের মূর্তি। এঁদের মধ্যে হরগঞ্জ বাজারের রাস্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরই 'বড়মার মন্দির' বলে খ্যাত। মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে উপেন্দ্রনাথ মিত্র লেনের শীতলা মা ছাড়া অন্যান্য বোনেরা বাদ্যভাণ্ড, সং, বিশাল শোভাযাত্রাসহ গঙ্গাস্নানে বের হন। সেইদিন জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে ভক্তজনের সমাবেশ ঘটে তা এক কথায় অবর্ণনীয়। বৈচিত্র্যপূর্ণ ভারতবর্ষের একটি সংহতির এক ক্ষুদ্র রূপ সেদিন পরিলক্ষিত হয়। শিবপুর থানার অন্তর্গত 'হাজারহাত কালী' মন্দিরের কাছেই দক্ষিণমুখী এক মন্দিরে কালী সমেত অনেক লৌকিক দেবদেবীর মূর্তি সমেত গর্দভবাহিতা মা শীতলারও নিয়মিত পূজো হয়।

দক্ষিণ রায়—চব্বিশ পরগনা জেলার প্রধান গ্রাম্য দেবতা বলতে 'দক্ষিণ রায়' অর্থাৎ বাঘের দেবতাকেই বোঝায়। ঐ জেলায় কদাচিৎ এমন গ্রাম পাওয়া যাবে যেখানে 'দক্ষিণ রায়ের' পূজো হয় না। গভীর বনাঞ্চল বেষ্টিত স্থান বলেই ওখানে বাঘের প্রকৃষ্ট আবাস স্থল। হাওড়া জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল এককালে নদী ও বনাঞ্চলের অধীন ছিল বলে ভূগোলবিদ্‌রা মত প্রকাশ করেন। সুতরাং এখানেও বাঘের অবস্থিতি অমূলক নয়। তাই প্রাচীন কালে গ্রামবাসীরা বনে শিকারে যাওয়ার আগে দক্ষিণ রায় দেবতার পূজো করে যাত্রা করতো। দ্বিজ হরিদাসের 'রায়মঙ্গল' কাব্যে হাওড়ার জোড়হাটের দক্ষিণ রায় মন্দিরের বিশেষ উল্লেখ আছে। শুধু গ্রামাঞ্চলেই নয় হাওড়ার শহরাঞ্চলেও ঐ দেবতা পূজো লাভ করে আসছেন—যেমন নেতাজী সুভাষ রোড ও চিন্তামণি দে রোডের সংযোগস্থলে এবং নেতাজী সুভাষ

রোড ও শাখামাত্রী সিনেমার পাশে। ঐ একই মন্দিরে দক্ষিণাকালী ও মনসার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ রায়েরও পূজো হয়। মূর্তিটি হচ্ছে মাথায় পাগড়ি, বাঘের উপর উপবিষ্ট হলুদবর্ণের আকৃতি বিশিষ্ট এক পুরুষ। তবে সর্বত্র একই ধরনের মূর্তি দেখা যায় না। দক্ষিণবঙ্গে কাণ্ডহীন মুণ্ডমূর্তিও দক্ষিণরায়ের দেখা যায়।[১২]

যেমন— বাঘের উপরে নাহি দক্ষিণের রায়।

একখানি মুণ্ড মাত্র বারা বলে তায়॥

বিশালাক্ষী দেবী—হাওড়া জেলায় এই দেবীর অবস্থান চোখে পড়ার মত। নদী তীরবর্তী যথা দামোদর, রূপনারায়ণ এমনকি মজে যাওয়া সরস্বতীর তীরে অবস্থিত গ্রামগুলিতে এই দেবীর অবস্থান সর্বাধিক দেখা যায়। এই দেবীকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। কেউ বলেন বাসলী, বাশুলী আবার কোথাও বিশালাক্ষী নামেও ডাকা হয়। আসলে একই দেবীর বিভিন্ন নাম। তবে এঁর মূর্তি একেক জেলায় একেক রকম। তারাপদ সাঁতরা 'হাওড়া জেলার লোক উৎসব' গ্রন্থে লিখছেন—মেদিনীপুরের চেতুয়া—বরদার রাজা শোভাসিংহের অধিষ্ঠাত্রী যে বিশালাক্ষী মূর্তি আছে—তাতে দেখা যায় দেবী চতুর্ভুজা এবং ত্রিনয়ধারিণী। মুখে গজদন্ত গলে নরমুণ্ডমালা এবং ডানদিকের উপরের হাতে ঢাল এবং বামদিকের উপরের হাতে তলোয়ার, নিচের হাত দুটিতে অভয় মুদ্রা।

অপরপক্ষে হুগলী জেলার শিয়াখালায় বিশালাক্ষী দ্বিভুজা। দক্ষিণ হাতে খাঁড়া আর বাম হাতে মড়া মাথার খুলি। মায়ের ডান পা শিবের বুকে আর বাম পা বটুক ভৈরবের মাথার উপর রয়েছে।

কিন্তু হাওড়া জেলার বিশালাক্ষীর মূর্তি বাঘের উপর উপবিষ্টা ও দশভুজা। একদা বনাকীর্ণ হাওড়া জেলা নদীতীরবর্তী মৎসজীবী ও মধু আহরণকারী লোকেরা এই দেবীর উপাসনা করতেন। পরে বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই দেবীর পূজো প্রচলিত হয়। উলুবেড়িয়া, সাঁকরাইল ও ডোমজুড়ে এর মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। ডোমজুড়ের খাঁটোরা গ্রামের বিশালাক্ষীর মন্দিরের দেবী নাকি খুবই জাগ্রত বলে ভক্তদের বিশ্বাস।

মেলার ইতিহাস—মেলার প্রচলনের সঠিক তারিখ, সাল ও প্রবর্তকের নাম না পাওয়া গেলেও এর প্রাচীনত্ব যে সর্বাধিক তা বলাই বাহুল্য। রাজা হর্ষবর্ধন প্রয়াগে মাসাধিক ব্যাপী মেলার ব্যবস্থা করেছিলেন। এ ছাড়া কুম্ভমেলা, গঙ্গাসাগর মেলা, কুরুক্ষেত্র মেলার ইতিহাসও প্রাচীনত্বেরই নিদর্শন বহন করে চলেছে। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে অধিকাংশ মেলাই এদেশে কোন না কোন দেবদেবী, ধর্মগুরু বা সুফীকে কেন্দ্র করে। লৌকিক দেবদেবীর আলোচনা প্রসঙ্গে জেলার মেলাগুলিরও বিবরণ এই অধ্যায়ে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রাচীন ও দীর্ঘস্থায়ী বলে আখ্যাত কয়েকটি মেলার বিবরণ দেওয়া হল।

রামরাজাতলার রামমেলা—এই মেলাটি আজ থেকে প্রায় দুশো বছরের আগেকার মেলা। এই মেলার ইতিহাসও কম চমকপ্রদ নয়। রামসীতার পুজোকে কেন্দ্র করেই

এই মেলার উৎপত্তি। পশ্চিমবঙ্গ তথা বঙ্গদেশেও দীর্ঘ পাঁচ মাস ব্যাপী মেলা এটি ছাড়া আর দ্বিতীয়টি পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। আগে সাঁত্রাগাছিরই মধ্যে এই এলাকাটি ছিল। কিন্তু এই পূজার প্রবর্তনের পর থেকে এই অঞ্চলটির একটি স্বকীয়তা গড়ে ওঠে। তাই পরবর্তী সময় থেকেই রামরাজাতলা নামটি সাঁত্রাগাছি থেকে পৃথকরূপে পরিচিত হয়—তৈরী হয় ঐ নামে আলাদা রেল স্টেশন।

রামরাজার প্রতিষ্ঠাতার নাম ছিল অযোধ্যারাম চৌধুরী। তিনি সাঁত্রাগাছির অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষ চন্দ্রশেখর সান্যাল উত্তরবঙ্গ থেকে সাঁত্রাগাছিতে এসে বসবাস করতে থাকেন।[১৩] অযোধ্যারাম রামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। নিত্য পূজাও তিনি বাটীতে করতেন। তাঁর বড়ই ইচ্ছা হল যে রামচন্দ্রের মূর্তি তৈরী করে তাঁর পূজা করবেন। কিন্তু মূর্তিটির কি রূপ হবে তা তিনি ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না। একদিন তিনি স্বপ্নে রাজবেশে রাম ও সীতা যুগল মূর্তি দেখতে পেলেন। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলেও মনের দ্বন্দ্ব তখনও দূর হল না। তারপর পুকুরে স্নান সেরে উঠে সেই একই মূর্তি আবার তাঁর চোখের সামনে আবির্ভূত হয়। এবারে তাঁর সন্দেহ দূরীভূত হয়ে গেল। তৈরী হল ২৩ ফুট উচ্চ রামসীতার মূর্তি। পূজা শুরু হয় চৈত্র মাসের শুক্লা নবমী থেকে শ্রাবণ মাসের শেষ রবিবার পর্যন্ত। এই ক'মাস ধরে এই পূজাকে কেন্দ্র করে এক বিরাট মেলা হয়। মেলাতে জেলার দূরদূরান্ত গ্রাম থেকেও দর্শনার্থীরা এসে এখানে হাজির হয়। কিন্তু এই পূজা শুরুও মসৃণভাবে হয়নি। রামরাজার মূর্তি গড়া হলে পূজার ব্যবস্থাদির ভার পড়ল কুলপুরোহিত প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক হরধর ন্যায়রত্নের উপর। মনে রাখা যেতে পারে যে রামপূজার আগেও ওখানে একটি বারোয়ারী সরস্বতী পূজার মণ্ডপ ছিল। তাঁদের দাবী হল রামরাজার পূজায় কোন আপত্তি নেই তবে ঐ মূর্তির কাঠামোর নির্মাণকার্য শুরু হবে সরস্বতীর পূজার দিন থেকে। এতেও বারোয়ারীর কর্তাদের আব্দার মিটল না। আরও দাবী করা হল যে রামসীতার মূর্তির চালচিত্রের মাথায় সরস্বতীর মূর্তি সন্নিবিষ্ট করতে হবে। জমিদার পক্ষ তাও মেনে নিলেন। সেই মতই আজও সেই ধারায়ই মূর্তি পূজা হয়ে আসছে। মেলার বিরাট প্রাঙ্গণে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলার কুটীর শিল্পীরা, দোকানীরা তাদের পণ্যদ্রব্য, খেলনা এমনকি গৃহস্থালীর হরেকরকম জিনিষপত্র সহ বহুবিধ খাদ্যাদি সাজিয়ে ঐ ক'মাস ব্যবসা করে। এই মেলাটির যে আকর্ষণ কিরূপ ছিল তা নিচের ছড়াটি পড়লেই বুঝতে পারা যাবে—[১৪]

> 'আহা মরি কি সভা হেরি সখের বাজারে!
> ধন্য ধন্য এই বারোয়ারী, ঠিক যেন অযোধ্যাপুরী,
> সবাই বসে ব্রহ্মচারী, জপে রাম হরে,
> দক্ষিণ হতে উলুবেড়ে
> যত সব লোক আসে নৌকা চড়ে,
> রং মেখে সং নড়ে চড়ে,

তুরুক সওয়ার* চ্যাকার করে।
আহা মরি! কি সভা হেরি সখের বাজারে।

এই ঠাকুরের বিসর্জনের শোভাযাত্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ ঘটে। নানারকম সং, পুতুল নাচের সঙ্গে আধুনিক সাজসজ্জাও দেখার মত। প্রতিমার উচ্চতা এত বেশী ছিল যে শহরে ট্রামের তার সাময়িকভাবে কাটতে হত। এমন কি টেলিফোনের তার পর্যন্ত সাময়িকভাবে খুলে রাখতে হত। কোম্পানীর সঙ্গে মামলা মোকদ্দমা হয়ে এইরূপ ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হয়।[১৫]

বালি রাসমেলা—হাওড়া জেলার প্রাচীন মেলাভূমির মধ্যে বালি-ব্যারাকপুরের রাসমেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলকাতার জোড়াসাঁকো দাঁ বংশের প্রতিষ্ঠিত এই মেলাটি আজও অম্লান হয়ে আছে। এই বংশে তৃতীয় পুরুষ গোকুলচন্দ্র দাঁ নিঃসন্তান ছিলেন। তাই তিনি শিবকৃষ্ণ দত্তকে দত্তক বা পোষ্যপুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। পরে তিনি শিবকৃষ্ণ দাঁ নামেই খ্যাতিলাভ করেন। শিবকৃষ্ণের পুত্র পূর্ণচন্দ্র দাঁ ও মাতা কাদম্বিনী দাঁ-এর ঐকান্তিক ইচ্ছায় ১৮৯১ সালে জুন মাসে ভাগীরথীর তীরে বালি ব্যারাকপুর গ্রামে রাসমন্দির তৈরী হয়। ২৫ বিঘা জমির উপর শ্রীশ্রীরাধারমণ জীউর নবরত্ন মন্দিরের উচ্চতা হচ্ছে চল্লিশ ফুট। এ ছাড়া চব্বিশ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট ছ'টি শিবমন্দির, রাসমঞ্চ, ভোগ তৈরীর ঘর, সেবাইতদের অবস্থানের ঘর এমনকি রাসবাড়ির একটি পৃথক ঘাট পর্যন্ত গঙ্গাতীরে স্থাপিত হল। নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে রাসপূর্ণিমা উপলক্ষে এই মেলা প্রায় এক মাস ধরে চলে। এই মেলার খ্যাতি ও ধারাবাহিকতা আজও সমানে চলেছে—কারণ এই মন্দিরের দেবসেবার জন্য একটি উপযুক্ত আয় বিশিষ্ট দেবোত্তর সম্পত্তির ট্রাষ্ট গঠন করে গেছেন গোকুলচন্দ্র দাঁ। ঠাকুরের নিত্যসেবা ও বার্ষিক ব্যয় বরাদ্দেরও খরচ ন্যূনতমভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। যেমন[১৬]—

নিত্যসেবার দৈনিক দ্রব্যাদি

ময়দা—দু'সের
ঘৃত—তিন পোয়া
সন্দেশ—পাঁচ পোয়া
দুগ্ধ—তিন সের
ছানা—ছ' ছটাক
মাখন—এক ছটাক
উপকরণ ফলাদি—তিন আনা
তরকারী—দু'আনা

বাৎসরিক পর্বাদির ব্যয়

শ্রীশ্রীরাধারমণজীউর
জন্মযাত্রা—দশ টাকা
ঝুলনযাত্রা—পাঁচ টাকা
জন্মাষ্টমী—দুইশত পঞ্চাশ টাকা
রাধা অষ্টমী—পঞ্চাশ টাকা
রাসযাত্রা—দু'হাজার টাকা
দোলযাত্রা—পঞ্চাশ টাকা
শ্রীশ্রীশিবরাত্রি—দশ টাকা

দেবালয়ের ব্রাহ্মণ, টহলিয়া ও চাকর-চাকরাণী এবং দেবোত্তর সম্পত্তির কর্মচারিদিগের বেতনাদি মাসিক ১০০.০০ টাকা হিসাবে ১২০০.০০ টাকা।

* তুরুক সওয়ার—ভিড় এড়াবার জন্য অশ্বারোহী পুলিশকে বলে তুরুক সওয়ার।

এই পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করার জন্যই হয়তো আজও এখানে শুধু রাসযাত্রা উৎসবই সাড়ম্বরে পালিত হয় না জন্মাষ্টমী, ঝুলন, দোল ও শিবরাত্রি প্রভৃতি উৎসবই তদাবধি উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। খরচের মাত্রা অনেক বেড়ে গেছে। সেই বাড়তি খরচ পূরণ করা হয় দাঁ বংশেরই দেবোত্তর সম্পত্তি শালকিয়া হরগঞ্জ বাজার ও তৎসংলগ্ন জমি ও ইমারতের আয় থেকে।[১৭] উল্লেখ্য, এই বাজারটি বর্তমানে হাওড়া কর্পোরেশনকে ৯৯ বছরের জন্য লীজ দেওয়া আছে। এই মেলার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে শাস্ত্রীয় মতে তিনদিন ধরে রাসযাত্রার উৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণের জীবন বৃত্তান্ত মাটির মূর্তির সাহায্যে প্রদর্শিত হয়। দর্শকদের দৃষ্টি নন্দনে উহা সদাই প্রশংসিত হয়। কিন্তু বর্তমানে প্রায় মাসাবধি এই মেলাতে জিলিপি, বাদাম ভাজা, খেলনা, এমনকি ফার্নিচার থেকে শুরু করে গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনবার জন্য বহু স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সাধারণ মানুষরা এই মেলাটির জন্য সারা বছর অধীর আগ্রহে দিন গোণে। 'ফেয়ার্স' অ্যান্ড ফেস্টিভ্যালস ইন বেঙ্গল' (১৯২৯) গ্রন্থের লেখক সি, এ, বেন্টলি তাঁর সরকারী প্রতিবেদনে অবশ্য লিখেছেন—রাসমেলা—বালি থানা। কার্তিক, ৫ দিন। ১০ হাজার দর্শক। আজও ঐ প্রতিবেদনের সঙ্গে মিল আছে শুধু অনুষ্ঠানের সময় কাল নিয়ে। আর সবই কালচক্রের পরিবর্তনের সঙ্গে মেলার সময়সূচীও বেড়ে হয়েছে একমাস এবং দর্শক সংখ্যা যে কত গুণ বেড়েছে তার হিসাব কে রাখে! তবে জমিদারী প্রথার অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মন্দির বিশেষ করে তোরণদ্বারের গাত্রে যে রুগ্নতার ছাপ চোখে পড়ে তা দাঁ পরিবারের বৈভবের অভাব না ঐতিহ্য রক্ষার অবহেলার মনোভাব সূচিত করে? এইতো গেল বালি রাসবাড়ীর ধর্মবিষয়ক ইতিহাস।

কিন্তু এই রাসবাড়ীকে ঘিরে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার অবতারণা বোধ হয় নূতন করে পাঠকের উৎসাহের উদ্রেক করবে। ঘটনাটি হচ্ছে—স্বামীজি ১৮৯৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণ করে কলকাতায় ফিরে আসেন। সে বছর শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের জন্মোৎসব মহা সাড়ম্বরে দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দিরেই পালিত হয়। স্বামীজি ও গুরুভাইয়েরা সকলেই তাতে যোগ দেন। কিন্তু গোল বাধল পরের বছর। তদানীন্তন 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার প্রবর্তক ও রক্ষণশীল সমাজের অন্যতম মুখপাত্র যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ভবতারিণী মন্দিরে শূদ্র নরেন্দ্রের ও পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণকারী সন্ন্যাসী স্বামীজির প্রবেশ নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে যুক্তি দেখান। রাণী রাসমণির জামাতা মথুরামোহনের পুত্র ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাসও যোগেন্দ্র বসুর মনোভাবকেই সমর্থন করে উক্ত পত্রিকায় একটি চিঠি লেখেন। স্বামীজির জীবন বিষয়ক বিশিষ্ট গবেষক শংকরীপ্রসাদ বসুও এই বিরোধীতার কথা উল্লেখ করেছেন।[১৮] তাঁর মতে—'স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর সঙ্গীগণ পরোক্ষভাবে মন্দির হতে বিতাড়িত হয়েছিলেন।'

এই অবস্থায় স্বামীজী বেলুড়ে প্রথমে ২২ বিঘা জমি এক বিহারী ভদ্রলোক ভগবৎ নারায়ণ সিংহ-এর কাছ থেকে মঠের জন্য ক্রয় করেন। বিক্রয় কবলাখানি

১৮৯৮ সালে ৫ই মার্চ বেলা ১২টা থেকে ১টার মধ্যে হাওড়া সাব রেজিস্টারী অফিসে রেজেস্ট্রি করা হয়।

১৮৯৮ সালে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের জন্মতিথি ও উৎসব ওখানে উদযাপিত হয়নি। সে বছর ঠাকুরের জন্মোৎসব পালিত হল পূর্ণচন্দ্র দাঁয়ের গঙ্গা তীরস্থ বালি থানার অধীন ব্যারাকপুর (বরবাকপুর) গ্রামে শ্রীশ্রীরাধারমণ জীউর রাসবাড়ীতে। তদানীন্তন The Bengalee পত্রিকায় এ সম্বন্ধে একটি বিজ্ঞাপনও ১৮৯৮ সালে ১৯শে ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত হয়েছিল। 'The Annual Ramkrishna Utsab' এই শিরোনামে। তাতে লেখা ছিল—The sixty fifth birthday Anniversary of Ramkrishna Paramhansha will be celebrated on Sunday the 27th February, 1898 at Purna Chandra Deb s (Daw's) Radharamanji's Thakurbari, Bally, Barrackpur on the right bank of the Ganges…"

স্বামীজির উপস্থিতিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের পঞ্চষষ্টিতম জন্মোৎসব যে ১৮৯৮ সালে ২৭শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার পূর্ণচন্দ্র দাঁ-এর রাসবাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা স্বামী প্রেমানন্দের ৬ মার্চ তারিখে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত চিঠি থেকেই জানা যায়—'গত রবিবার দাঁ-দের বাগানে মহোৎসব অতি উত্তমরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে—প্রায় অন্য বৎসরের তুল্য।'[১] এ ছাড়া 'The Brahmavadin' পত্রিকার ১৮৯৮ সালের ১৬ই মার্চ তারিখে 'The Birthday Festival of Sri Ramkrishna' নামে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এর লেখিকা ছিলেন 'An English Lady'.[২] বলা বাহুল্য, এই লেডী ভগিনী নিবেদিতা স্বয়ং—ছদ্মনামে ইনি বিবরণটি লিখেছিলেন।

বালি-কল্যাণেশ্বর গাজনের মেলা—এই মন্দিরের মাহাত্ম্য এমনই যা শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকেও আকৃষ্ট করেছিল। ঠাকুরের জীবনী পাঠেও জানা যায় যে তিনি এই শিবমন্দিরে এসে ফুল বেলপাতা চড়াতেন। এই শিবমন্দিরের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে বালির নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় লিখছেন—কিংবদন্তী আছে বর্তমান মন্দির প্রাঙ্গণে এক নাগা সাধু বাস করতেন। তিনি প্রায়ই লক্ষ্য করতেন যে একটি গাভী প্রতিদিন পার্শ্ববর্তী বনে গিয়ে আবার ফিরে আসে। কৌতূহলী হয়ে তিনি গাভীটিকে অনুসরণ করে দেখেন যে একটি নির্দিষ্ট স্থানে গাভীটি দাঁড়ালেই তার বাঁট থেকে দুধ পড়ে। একদিন গাভীটি চলে গেলে সাধু দেখেন যে সেখানে একটি শিবলিঙ্গ রয়েছে। সাধু জঙ্গল থেকে লিঙ্গটি তুলে আনেন এবং গ্রামবাসীদের উহার প্রতিষ্ঠা কাজে সহায়তা চান। ব্যর্থ হয়ে সাধু কলকাতার মেছুয়া বাজারের বিত্তবান ব্যক্তি দয়ারাম বসুর সাহায্যে (মতান্তরে শেওড়াফুলির জমিদার) বর্তমান স্থানে শিব প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে অবশ্য স্থানীয় ছ'আনি জমিদাররা কিছু ভূমিদান করেন। এই স্বয়ংভূ শিবের পুজোর জন্য হাটখোলা থেকে পূজারী ব্রাহ্মণও নিয়োগ করা হয়। মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী দেখে অনুমান করা হয় যে এটি অষ্টাদশ

শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে কষ্টিপাথরের বিষ্ণু মূর্তিটিও দর্শনীয়। পূজারীদের অর্থলোভে অতিষ্ঠ হয়ে জনৈক সচ্চিদানন্দ স্বামীর নেতৃত্বে ১৯৩১ সালে গ্রামবাসীরা সত্যাগ্রহ করে, তাতেই মন্দিরটি পরিচালনার ভার টেম্পল কমিটির হাতে বর্তায়। কল্যাণেশ্বর তলার শিবের গাজন উৎসব খুব বিখ্যাত। সারা বৈশাখ মাস ব্যাপী এখানে পুণ্যার্থীরা আসেন। গাজনের মেলা চলে এক মাস। শিবের মাথায় ফুল বেলপাতা চড়িয়ে শুরু হয় ভৈরব নৃত্য। গাজনে কাঁটা ঝাঁপ, বটি ঝাঁপ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা আজও শিবরাত্রিতে শিবের পুজো দিতে এখানে আসেন।*

খড়িয়পের কালীপুজোর মেলা—আমতা-খড়িয়পের শ্মশান কালীর পুজো খুবই উল্লেখযোগ্য। প্রতি বছর অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যা তিথিতে এই পুজো উপলক্ষে বর্তমানে সাতদিন ধরে মেলা বসে। প্রাচীনরা বলেন অনেক আগে একমাস ধরে মেলা বসতে তাঁরা দেখেছেন। এই মেলা শতাধিক বছরের প্রাচীন। হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর এমনকি কলকাতা থেকেও পুণ্যার্থীরা মেলা দর্শনে আসেন। মেলার প্রধান মজা নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক, কবিগান, তরজা ও যাত্রাভিনয়। সঙ্গে চলে কেনাবেচাও যেমন তামা পিতলের দ্রব্য, মণিহারী, বাঁশ ও বেতের চুবড়ি ও ধামা এবং মুখরোচক তেলেভাজা ও মিষ্টি।

রসপুর বিন্দুবাসিনী মেলা—জেলার মধ্যে বিন্দুবাসিনী পুজোকে কেন্দ্র করে এখানকার মেলা খুবই প্রাচীন ও মাহাত্ম্যপূর্ণ। ফাল্গুন মাসের সপ্তমী তিথিতে পুজো উপলক্ষে পনেরোদিন ব্যাপী মেলা বসে। এ মেলাও শতাধিক বছরের প্রাচীন। আমতা থানার বিভিন্ন গ্রাম থেকে মেলায় লোক আসেন। মেলায় হাঁড়িকুড়ি থেকে শুরু করে ময়রা, মণিহারী, তেলেভাজা এমনকি ফটো তোলারও দোকান বসে। গ্রামের লোকেদের নিয়ে যাত্রাভিনয়ের পাশাপাশি শহরের যাত্রাদলও আজকাল মেলায় এসে গ্রামবাসীদের আধুনিক যাত্রার আস্বাদন দিয়ে চলেছেন।

কল্যাণপুরের মহরমের মেলা—বাগনান থানার কল্যাণপুর গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রতি বছর মহরম উৎসব পালন করেন। এই উৎসবের প্রবর্তক করমাতুল্লাহ নামক এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি।[২১] এই উৎসবটি তিনশ বছরেরও প্রাচীন বলে দাবী করা হয়। জানা যায় বীরভুম জেলার মারগ্রাম থেকে সৈয়দ করমাতুল্লাহ এই গ্রামে আসেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি সম্প্রীতি ও ধর্মের বাণী প্রচার করে দুই সম্প্রদায়ের মানুষেরই প্রিয়পাত্র হন। পরে গ্রামের লোক তাঁকে বুড়োপীর নামেই ডাকতো। তিনি গ্রামের এক হিন্দু মন্দিরের কাছেই নিজের আস্তানা গাড়েন। হিন্দুদের উৎসবের পাশাপাশি তিনি মহরম উৎসব পালনেরও ব্যবস্থা করেন। বুড়োপীরের পরিবার ও ছেলেমেয়েরা গ্রামের দুই স্থানে পৃথকভাবে বাস করতেন। এই কারণেই গ্রামের একটি স্থানকে 'বড়মহল' ও অপরটিকে 'ছোট

* নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের প্রদত্ত তথ্যই প্রধান উৎস

মহল' বলা হয়।[২২] বড়োপীরের জমিদারীর আয় ভালই ছিল। তাই উদারচিত্ত পীরসাহেব হিন্দুদের গাজনের জন্য ও মুসলমানদের মহরমের জন্য ঐ আয় থেকে ব্যয় বরাদ্দ করে দিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মহরম উৎসবে আশপাশের গ্রাম থেকে আজও বহু লোক যোগদান করে।

কল্যাণপুরের গাজন উৎসব—এই গ্রামের আর একটি প্রধান উৎসব হল কালীঞ্জা শিবের গাজন। চৈত্র মাসের শেষ দশদিন ব্যাপী গ্রামে এই উৎসবটি মহা ধুমধামের সঙ্গে পালিত হয়। কথিত আছে বর্তমান শিব মন্দিরটি একটি বনের মধ্যে ছিল। লক্ষ্য করা হত যে একটি গাভী প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে বন মধ্যে গিয়ে আবার ফিরে আসতো। একদিন গাভীটি অনুসরণ করে দেখা যায় যে একটি নির্দিষ্ট স্থানে গেলেই গাভীটির বাঁট থেকে দুধ পড়তে থাকে। এই কথা প্রচার হতেই গ্রামের লোকেরা জঙ্গল পরিষ্কার করে দেখে যে সেখানে একটি শিবলিঙ্গ রয়েছে। গ্রামের প্রাচীন আঢ্য পরিবার সেখানে একটি প্রথমে মাটির ঘর তৈরী করে দিয়ে পুজোর ব্যবস্থা করে দেন। পরে ১১৭৩ সালে বর্তমান মন্দির ও আটচালাটি নির্মিত হয়।[২৩] এই স্বয়ংভু শিবকেই কালীঞ্জা শিব বলে ডাকা হয়। চৈত্র সংক্রান্তির এখানকার গাজনের মেলাটি আজ খুবই জাকজমক সহকারে উদযাপিত হয়—মেলায় হরেকরকমের পসরা নিয়ে উপস্থিত হয় দোকানীরা। মেলাটির বয়স চারশো বছরের বলে দাবী করা হয়।

জঙ্গলবিলাস পীরের মেলা—উলুবেড়িয়া স্টেশন থেকে মাইল দুয়েক উত্তরে গেলে বাণীবন নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামে পৌষ সংক্রান্তি দিন গেলেই দেখা যাবে এক মেলা বসেছে জঙ্গলপীর সাহেবের সমাধির সামনের মাঠে। এই মেলা পাঁচ দিন ধরে চলে। সঠিক তারিখ সাল কেউ বলতে না পারলেও মেলাটি যে শতাধিক বছরের প্রাচীন তাতে সন্দেহ নেই।[২৪] এই পীরবাবার আসল নাম ছিল আব্বাসউদ্দিন সাহ[২৫] (মতান্তরে হজরতপীর)। তাঁর মৃত্যুর পর এটির নাম হয় হজরত জঙ্গলবিলাস পীর। এখানেই তাঁকে মৃত্যুর পর সমাধিস্ত করা হয়। শোনা যায়—পীর সাহেব আরব দেশ থেকে এই দেশে মুসলমান ধর্ম প্রচারে আসেন। রাখাল বেশে তিনি ছাগল ভেড়া নিয়ে ঘুরে বেড়ালেও তিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। একদিন রাজপুর গ্রামের নদী পার হতে গেলে মাঝি একটি ভেড়ার বিনিময়ে বিনা পয়সায় নদী পার করতে রাজি হয়। সেইমত নদী পার হয়ে পীরবাবা তাকে একটি ভেড়া দিল। কিন্তু মাঝি দেখে সে ভেড়া নয় বাঘ। কোন মতে প্রাণ নিয়ে পালায়। উল্লেখ্য, উক্ত গ্রামটি বর্ধমান মহারাজের জমিদারী ভুক্ত ছিল। মহারাজের কর্মচারীরা দেখেন যে পীরবাবা একটি হিন্দু মন্দিরে আস্তানা নিয়েছে। মন্দিরের কথা বললে পীরবাবা তা মানতে রাজি হলেন না। একদিন পীরবাবা তাঁর ছাগল ভেড়া নিয়ে রাজদরবারে পৌঁছলে রাজা বাঘ দেখে ভয় পেয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে পীরবাবাকে ওখানে বেশ কিছু পরিমাণ জমি দান করতে কর্মচারীদের আদেশ দেন। পীরবাবার মৃত্যুর পর ঐ স্থানেই তাঁকে কবর দেওয়া

হয়। সেই থেকে ওখানে প্রতি বছর মেলা হয়ে আসছে। কবরের পাশেই একটি ঘাট বাঁধাই পুকুর আছে। এখনও শোনা যায় বন্ধ্যানারীরা ১লা মাঘ ঐ পুকুরে স্নান করে ফুল ভাসিয়ে দিয়ে বুক জলে আঁচল পেতে দাঁড়িয়ে থাকে। ফুল যদি আঁচলে উঠে আসে তা নিয়ে পীরের ভেতরে গেলে পীরের খাদেমগণ একটি পান খেতে দেয়। তাতেই নাকি সন্তান হয়। এই উৎসবে যে মেলা হয় তাতে বাঁশ ও বেতের তৈরী জিনিষ, মাটির পুতুল, পিতলের বাসন কোসন, নাগরদোলা, সার্কাস ও ম্যাজিক শো পর্যন্ত হয়। কোরাণ পাঠ ও কাওয়ালী গান অধিক রাত পর্যন্ত আসর মাতিয়ে রাখে। মুসলমানরা মেলাটি পরিচালনা করলেও হিন্দুরাও এতে যোগ দেয় এবং সিন্নী প্রসাদ গ্রহণ করে। তবে পীরের সমাধিটি যে হিন্দু আটচালা স্থাপত্য শিল্পের পরিচায়ক তা ত কোন দ্বিমত নেই।

রাউতারার মানিক পীরের মেলা—আমতা থানার ঝিকিরার পথে রাউতারার বড় রাস্তার ধারে রয়েছে মানিক পীরের মন্দির। হাওড়ায় অন্যত্র মানিক পীরের দরগা থাকলেও এটির সঙ্গে তাদের মূলগত পার্থক্য হচ্ছে এটি কোন মুসলমান ভক্ত নির্মিত নয়। এটি তৈরী করেন একজন বিত্তবান হিন্দু ভক্ত ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। প্রতিষ্ঠাতার নাম রামজয় রায়। এই রামজয় ছিলেন ঝিকিরার ভূস্বামী বাঞ্ছারাম রায়ের পুত্র। বাঞ্ছারাম ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশের প্রবর্তিত 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-এর ফলে এই জমিদারী লাভ করেন। পুত্র রামজয় নিজগুণপনায় বর্দ্ধমানের মহারাজার জমিদারী সেরেস্তায় কেরানীর কাজ করতেন। যশ ও অর্থ দুইই লাভ করে বাড়ীর নাম হয় বিখ্যাত 'কেরানীবাড়ী'। আজও ঝিকিরার কেরানীবাড়ী গ্রামের লোক এক ডাকেই দেখিয়ে দেবে। গোঁড়া হিন্দু পিতা হলেও ধর্মীয় গণ্ডির বাইরে এসে রামজয় তদানীন্তন সময়ে কিরূপে হিন্দু মন্দিরের পরিবর্তে একজন মুসলমান পীরের দরগা তৈরী করলেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়!

এই পীরের উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর ২রা বৈশাখ এখানে মেলা বসে। হিন্দু মুসলমানের উপস্থিতিতে মেলা ক্ষেত্র হয়ে উঠে এক মিলন তীর্থ। মেলা উপলক্ষে মণিহারী ও নানা মুখরোচক খাবারের দোকান বসে। যাদের মানত পূর্ণ হয় তাঁরা সিন্নী দিয়ে পুজো দেয়। দরগার স্থাপত্য হিন্দু দোচালা মন্দিরের আদল দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করবে।

পিছলদহ শ্রীচৈতন্য মেলা—এই মেলাটি বিরাট না হলেও ঐতিহাসিক দিক থেকে উল্লেখ্য। অনেকেরই হয়তো জানা আছে যে পিছলদহ গ্রামটি হাওড়া জেলার দক্ষিণ প্রান্তে রূপনারায়ণ নদীর তীরে অবস্থিত। প্রকাশ থাকে যে মহাপ্রভু উৎকল ও দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ শেষ করে স্বদেশে ফেরার পথে তাম্রলিপ্ত থেকে নৌকাযোগে রূপনারায়ণ পার হয়ে এই গ্রামে অবতরণ করে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নেন। পুনরায় সেখান থেকে আবার নৌকাযোগে গৃহাভিমুখে যাত্রা করেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে এই ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। সেই সময় থেকে প্রতি বছর দোলের দিন মহাপ্রভুর

আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে একদিনের জন্য এখানে মেলা বসে। এই গ্রামীন মেলাটি খুবই প্রাচীন। আশপাশের গ্রামের লোকেরা সেদিন উৎসবে এখানে মিলিত হয়।

ভাই খাঁ পীরের মেলা—উদয়নারায়ণপুরের সিংটী গ্রামে একদিনের একটি মেলা বসে। সেই দিনটি হল ১লা মাঘ। মেলাটির প্রাচীনত্ব পাঁচশো বছরেরও অধিক বলে প্রবীণ গ্রামবাসীরা দাবি করেন। কিংবদন্তী আছে পাঁচশো বছর আগে আরব দেশ থেকে এক পরিবারের সাত ভাই ও এক বোন বঙ্গদেশে আসে। তাঁদের মধ্যে তিন ভাই আস্তানা নেয় হাওড়ায়—যেমন ফতালি খাঁ মুন্সির হাটে, মাদার আলি খাঁ আমতায় এবং ভাই খাঁ সিংটী গ্রামে। এই ভাই খাঁরই সঙ্গে থাকতেন তাঁর বোন ফতেমা বিবি। এঁরা নাকি সকলেই অবিবাহিত ছিলেন। ভাই খাঁ গ্রামের রাখাল বালকদের সঙ্গে মেলামেশা করলেও তাঁর কিছু অলৌলিক ক্ষমতা দেখে গ্রামের লোকেরা তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। একদা ভাই খাঁ এক নাপিতের দোকানে দাড়ি কাটতে কাটতে শুনতে পান যে বর্দ্ধমানের মহারাজার বাণিজ্য তরী পাশ্ববর্তী দামোদর নদে চড়ায় আটকে গেছে। ঐ সংবাদ শুনে ভাই খাঁ অলৌকিক শক্তি বলে সেখানে উপস্থিত হয়ে নৌকাটিকে বিপদমুক্ত করে আসেন। নাপিত ভাই খাঁর ঘর্মাক্ত ও কর্দমাক্ত শরীর দেখেও কিছু প্রশ্ন করতে সাহস পেলো না। পরে একদিন মহারাজা স্বপ্নে ভাই খাঁর কথা জানতে পারেন এবং সন্তুষ্ট হয়ে মহারাজা তাঁকে বেশ কিছু নিষ্কর জমি দান করেন ও মিষ্টি মুখ করান। সেই জমিতেই আজও পর্যন্ত প্রতি বছর ১লা মাঘ ভাই খাঁ পীরের মেলা বসে। মেলার প্রাচীন মহিমা আজকাল কলকাতা—হাওড়া শহরের লোককেও টানতে শুরু করেছে। হিন্দু-মুসলমানের সমবেত উদ্যোগে এটি একটি মিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। মিষ্টি, তেলেভাজা ও মণিহারী দ্রব্যের দোকান ছাড়াও নাগরদোলা, ম্যাজিক, মানিক পীরের গান ইত্যাদিরও ব্যবস্থা আছে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, হুগলী জেলার হরিণ-খোলার জমিদারবাবুদের হাতী মেলায় এসে সামান্য দক্ষিণার বিনিময়ে গ্রামের ছেলেমেয়েদের আনন্দবর্দ্ধন করে।[২৬] ভাই খাঁর আসল নাম জানা যায় না। রাখাল বালকেরা তাকে 'ভাই' বলে ডাকতো। সম্ভবত সেই থেকেই পীরের অনুরূপ নাম হয়। জঙ্গল পীরের মত 'পীরপুকুরে' ফুল ভাসিয়ে বন্ধ্যা নারীর সন্তান লাভের আখ্যান এখানেও প্রচলিত আছে। এই মাজারের ঘর দরজাজানালা বিহীন। পীরের নির্দেশেই এটা চলে আসছে।*

শালিখা দশমহাবিদ্যা—এই মেলাটি উত্তর হাওড়া অঞ্চলে একদা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হলেও ইহার সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ—সেটি হচ্ছে ধর্মাচরণের মাধ্যমে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটানো। এটি আমাদের মহারাষ্ট্র কেশরী বালগঙ্গাধর তিলকের কথাই মনে করিয়ে দেয়। তিনিও মহারাষ্ট্রবাসীর মনে এমনি করে জাতীয়তাবোধের জাগরণ ঘটানোর জন্য একদা 'গণপতি' উৎসব প্রচলন করেছিলেন। শালিখায় 'জটাধারী পার্কে' এমনি ভাবে ১৯৩৬-৩৭ সালে

* ভাই খাঁর মেলার ইতিহাস—বুদ্ধদেব মণ্ডল—মেলা—১৪০১, ১লা মাঘ।

'পাঁচ ইয়ারী' যথা পূর্ণচন্দ্র মিত্র, উমাপদ চ্যাটার্জী, কৃষ্ণচন্দ্র দাস, কালীধন চক্রবর্তী ও অভয়পদ চ্যাটার্জী (কালোদা) প্রমুখ মিলে ঠিক করলেন যে দুর্গাপূজা নয়, কালীপূজো নয় একেবারে 'দশমহাবিদ্যা' পূজা করবেন। বিচিত্র চিন্তা! শুধু পূজা নয় একে কেন্দ্র করে চলবে মেলা যার উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামীন কুটীর শিল্পের প্রচার ও প্রসার। শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী দশ দেবতার মূর্তির পরিকল্পনা নিয়ে 'পাঁচ ইয়ার' গেলেন কুমারটুলীর কুমোরদের কাছে। এ ধরনের পূজোর প্রচলন কুমোররা কলকাতায় কদাচিৎ শুনেছেন। তথাপি তারা উদ্যোক্তাদের কথামত মূর্ত্তি তৈরী করতে রাজী হলেও 'ধূমাবতী'র মূর্তি তৈরীতে নারাজ--তাতে নাকি সংসারের অকল্যাণ সাধিত হয়। অনেক ঘুরে ঘুরে অবশেষে এক বৃদ্ধ কুমোরের দেখা পাওয়া গেল—তিনি অবশ্য করতে রাজি হলেন। এই দেবতারা হলেন কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, বগলা, ধূমাবতী, মাতঙ্গী ও কমলা। পূজার উপাখ্যানটি এইরূপ—রাজা দক্ষ শিবহীন যজ্ঞ করতে চাইলেন। তিনি ছিলেন বিষ্ণু অর্থাৎ সৃষ্টির উপাসক। শৈবতন্ত্রে তাঁর প্রবল অনীহা। উপরন্তু নিজ কন্যা সতী স্বয়ম্বর প্রথায় শিবকে পতিরূপে বরণ করায় তিনি শিবের ওপর আরও অসন্তুষ্ট। তাই যজ্ঞে তিনি শিবকে নিমন্ত্রণ করলেন না। এমনকি শিব যাতে যজ্ঞে প্রবেশ করতে না পারেন তার জন্য ঈশান কোণে শিবের আসনে নানাপ্রকার অস্থি ও পুরীষ রেখে অপবিত্র করা হল। সতীকে আবার বিনা নিমন্ত্রণে পিতৃগৃহে যেতে শিব বারণ করলেন। এদিকে সতীও নাছোড়বান্দা। তিনি পিতৃগৃহে যাবেনই। শিব যখন কিছুতেই রাজি হচ্ছেন না তখন সতী স্বয়ং দশটি মূর্তির আকার ধারণ করে মহামায়ার শক্তিমহিমা প্রকাশ করলেন। উপরে উল্লিখিত ঐ দশটি দেবীর পূজাই হল দশমহাবিদ্যার পূজা। এই দেবীদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ পতি আছেন—ব্যতিক্রম কেবল ধূমাবতীর। কথিত আছে, ক্ষণিকের জন্য স্বয়ং শিবকে হত্যা করে ধূমাবতী বৈধব্যদশা লাভ করেন। সতী পিতৃগৃহে এসে পতিনিন্দা শ্রবণে দেহত্যাগ করেন। এর পরের ঘটনা অনেকেরই জানা। পনেরোদিন ব্যাপী জটাধারী পার্কে ঐ পুজোকে কেন্দ্র করে যে মেলা বসতো তা আকারেও যেমন বড় ছিল তেমনিই নানা পণ্যসম্ভারের সঙ্গে ম্যাজিক, সার্কাস, কুটীর শিল্পের সমাবেশ তাকে করে তুলেছিল বিরাট। এ ছাড়া পুতুল নাচ, ব্যায়াম প্রদর্শনী, জলসা ও নাট্যপ্রদর্শনের সুখস্মৃতি আজও প্রবীণদের আলোচনার বস্তু হয়ে আছে। আশির দশকে পুরকর্তৃপক্ষ পার্কে পুজো নিষিদ্ধ করলে উহা বন্ধ হয়ে যায়। তবে বর্তমানে শালিখার নূতন মন্দিরের মাঠে 'সংঘশ্রী'র উদ্যোগে আবার নূতন করে একটি দশমহাবিদ্যা পূজা ও মেলা হচ্ছে ১৯৮২ থেকে। তার বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতাও উল্লেখ করার মত। পনের দিন ধরে এখানে চলে বেশ বড় মেলা। জনসমাগমও হয় প্রচুর। আমোদ প্রমোদ সহ সার্কাস, ইলেকট্রিক নাগরদোলা ও সাংসারিক কাজের ব্যবহৃত দ্রব্যের দোকান বসে। বিশেষ আকর্ষণীয় হয় কাঠের

(কাঁচসহ) সৌখিন খাট, ডাইনিং টেবিল, আলমারি, ঠাকুরের সিংহাসন ইত্যাদি। পুজো ও মেলাটি পরিচালনা করেন 'সালিখা সংঘশ্রী' ক্লাব।

উলুবেড়িয়া কালীমন্দিরের রাসমেলা—এই কালীমন্দিরে দুর্গাপুজো, রথযাত্রা ও রাসউৎসব তিনটিই হয়। কিন্তু রথের মেলার পরিবর্তে এখানে মাসাধিকব্যাপী রাসমেলাটাই দেখার মত। এই মেলাতে দূরদূরান্ত থেকে আসে পসারীরা—আসে লোকেরাও। মণিহারী দ্রব্য থেকে শৌখিন জিনিষপত্রের দোকান, নাগরদোলা, বাদামভাজা, কাঠের বারকোস (খুব বিক্রী হয়), জিলিপির দোকান বিশেষ করে মদনের জিলিপি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাসে দেখবার জিনিষ হচ্ছে রাসমণ্ড, বিদ্যুৎ-চালিত স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় মাটির পুতুল দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা। একই প্রথায় রামায়ণ মহাভারতের নির্বাচিত দৃশ্য দর্শকদের চমৎকৃত করে তোলে। এই রাসমেলাটি শুরু হয় ১৯৫১-৫২ সাল থেকে। উদ্যোক্তা ছিলেন রাসবিহারী ব্যানার্জী, তুলসীচরণ নন্দী, লক্ষ্মীকান্ত রায় ও ধাড়া পরিবারের দোকানের কর্মচারীরা। এই মেলায় লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়। বর্তমান জেলার মেলাগুলির মধ্যে এটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কালীমন্দিরের রথযাত্রাও প্রায় সত্তর পঁচাত্তর বছরের উপর। দুর্গোৎসবটি আরও প্রাচীন। এই কালীমন্দিরটি আনন্দময়ী কালীময়ী মন্দির নামেও পরিচিত। এটি স্থাপিত হয়েছিল ১৩২৭ সালে (ইং ১৯২০) উলুবেড়িয়ার শ্রদ্ধেয় ধর্মপ্রাণ সাবডিভিশন্যাল ম্যাজিস্ট্রেট যতীন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্নে, পরিশ্রমে ও অর্থে। মন্দিরের জন্য এক বিঘা পাঁচ কাঠা জমি দান করেছিলেন আন্দুলরাজ শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র। গঙ্গার পশ্চিম পার্শ্বস্থ চড়ার উপর মাটি ফেলে একটি পার্কও তৈরী করা হয়েছে। এই কালীমন্দিরে একটি নাটমন্দিরও তৈরী হয়েছে। যার মূলে ছিলেন আমতার নন্দলাল সরখেল। তবে এই কালীবাড়িটি কোন বংশগোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত হয় না। একটি নির্বাচিত কমিটিই এটি পরিচালনা করেন। এই কমিটির মোট সদস্যসংখ্যা একুশ—যার মধ্যে চারজন পদাধিকার বলে স্থায়ী সদস্য রয়েছেন। সংগঠনের সংবিধানগুণে এখনও পর্যন্ত কাজ নিয়মমতই চলছে।*

দাসনগরের জন্মাষ্টমী মেলা—এই অধ্যায়ে একটি উঠে যাওয়া মেলার নাম না করলে জেলার মেলার ইতিহাস ত্রুটিপূর্ণ থেকে যাবে—সেটি হচ্ছে দাশনগরের জন্মাষ্টমী মেলা। এই মেলাটি আঠাশ বছর চললেও এর স্মৃতি আজও প্রবীণ ও মাঝবয়সীদের মনে থাকার কথা। 'কর্মবীর' আলামোহন দাসের নাম বঙ্গবাসী বিশেষ করে হাওড়াবাসীর কাছে খুবই গর্বের বস্তু। একজন তথাকথিত অশিক্ষিত দরিদ্র গ্রামের মানুষ নিজের অদম্য উৎসাহ, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় নিয়ে জীবনে কত ওপরে ওঠা যায় তার অন্যতম নজীর হচ্ছেন তিনি—যাঁর নামে দাসনগর। আলামোহন-বাবুর উপাস্য দেবতা ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। স্বয়ং পার্থসারথি ছিলেন তাঁর কাছে পৌরুষের ও চালকের প্রতীক। তাই তাঁরই এক ইঞ্জিনিয়ার কর্মচারীর (রাধারমণ রায়)

* অরুণ কুমার হাজরা ও সম্পদ ধারার লিখিত তথ্যই ইহার উৎস।

উৎসাহে তিনি তাঁরই উপাস্য দেবতার নামে একটি উৎসব চালু করেন ১৯৪৮-এ। এই উৎসবেরই নাম হল জন্মাষ্ঠমী উৎসব ও মেলা। এই মেলা জন্মাষ্ঠমী থেকে শুরু করে লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত চলতো। প্রথমে দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে রাধারমণবাবুর অটোমেটিক ইলেক্ট্রিকের আলোর নৈপুণ্য দেখে আলামোহনবাবু তাঁকে জন্মাষ্টমী উৎসব পালনের জন্য পরিকল্পনা করতে আদেশ দেন। সে থেকেই মেলা শুরু হল। রাধারমণবাবু শ্রীকৃষ্ণের জীবনের বিশেষ দিকগুলি মাটির মূর্তির সাহায্যে তুলে ধরবার নকসা করেন। রাধারমণের ইঞ্জিনিয়ারিং মেধা ও কুমারটুলীর প্রখ্যাত মৃৎশিল্পী যতীন্দ্রনাথ পালের প্রমাণ সাইজের মাটির মূর্তিগুলি লোকশিক্ষার কাজে এক অপূর্ব চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করেছিল। এই মেলায় গ্রামীন কুটির শিল্প থেকে শুরু করে মণিহারী, মুখরোচক খাবার, সংসারের প্রয়োজনীয় সব জিনিষেরই দোকান বসতো। এ ছাড়া, ফটো তোলার স্টুডিও থাকতো। তদানীন্তনকালে প্রখ্যাত যাদুকর এ, সি, সরকার পর্যন্ত মেলায় নিয়মিত যাদু দেখাতেন। হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে সকলেই এই মেলায় যোগ দিতেন। এই মেলায় জনসমাগম হতো লক্ষাধিক। মেলার খরচ নির্বাহ হতো দোকানীদের কাছ থেকে দান সংগ্রহ করে। প্রতি বছরই মেলাটির অভিনবত্ব ছিল। আর ঐ অভিনবত্বের মূলে ছিল যতীন্দ্রনাথ পালের অনুপম মাটির মূর্তি ও তার সঙ্গে রাধারমণের স্বয়ংক্রিয় বিদ্যুতের কারীগরী নৈপুণ্য। মেলার কথা বলতে বলতে 'কর্মবীরের' প্রতি বারে বারেই শ্রদ্ধায় মাথা নত করছিলেন তিরানব্বই বছরের ইঞ্জিনিয়ার রাধারমণ রায়।* শ্রীকৃষ্ণের যমুনা পার, কংসের কারাগারে দেবকী ও বাসুদেব, কালীয় দমন, কংসবধ প্রভৃতি স্বয়ংক্রিয় প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলির কথা আজও দর্শকদের স্মৃতি রোমন্থন করতে শোনা যায়। পার্থসারথি মন্দিরে ঠাকুরের নিত্য পুজো আজও হয়—কিন্তু মেলাটি ১৯৭৬ সাল নাগাদ বন্ধ হয়ে যায়।

শরৎ মেলা, পানিত্রাস—অমর কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাওড়া—পানিত্রাসের বসত বাটিতে তাঁর নামে একটি পাঠাগার আছে। সেখানে তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে একটি সংগ্রহশালাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাতে তাঁর ব্যবহৃত আসবাবপত্র, বইয়ের পাণ্ডুলিপি ও বহু চিঠিপত্রের নকলসহ অন্যান্য দ্রব্যেরও প্রদর্শনী আছে। এসবই হয়েছে স্বাধীনোত্তর যুগে। আর শরৎচন্দ্রের জন্ম শতবার্ষিকীর আগেই (১৯৭৫) পানিত্রাসের বাড়ীর চালে আরও একটি পালক নূতন করে যেটি যোগ হয়েছে সেটি হচ্ছে 'শরৎ মেলা'। ১৯৭২ সালে শরৎ স্মৃতি পাঠাগার ও শরৎ মেলা পরিচালন সমিতির উদ্যোগে এই মেলাটি প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। আজও সেই মেলাটি চলে আসছে। সপ্তাহব্যাপী এই মেলাটি প্রতি বছর জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয়। বলা বাহুল্য, বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে যেমন গুরুগম্ভীর আলোচনা থাকে তেমনি থাকে সাধারণ গ্রামবাসীদের চিত্তবিনোদনের জন্য যাত্রা, নাটক, সঙ্গীতানুষ্ঠান, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার

---

* রাধারমণবাবুর খোঁজ পাই শিক্ষক ভবানী ভট্টাচার্য ও মানস রায়ের সাহচর্যে।

নাটকানুষ্ঠান ইত্যাদি। এছাড়া জনসাধারণের জন্য খোলা থাকে সংগ্রহশালা ও স্মৃতি পাঠাগার। গ্রামের শিশু ও কিশোর কিশোরীদের জন্যও একটি দিবস প্রতিপালিত হয়—বসে আঁক প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি ও শিশু নাটকাভিনয়ের মাধ্যমে। এই শরৎ মেলাকে কেন্দ্র করে দিন দিনই অধিক সংখ্যায় শহুরে জীবনের লোকেরা ঐ গ্রামে যান—গ্রামের লোকেরা শহুরে লোকের চিত্ত ধারা ও চাল চলনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে এক নূতন মেলবন্ধনে গ্রথিত হন। এর সুদূর প্রসারী ফল যে আছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে মনে রাখা ভাল যে প্রথমে ঐ মেলা তিনদিন ব্যাপী চলতো—আজ তা প্রায় এক সপ্তাহে পরিণত হয়েছে। মেলাটির সংগঠনে যাঁদের পরিকল্পনা ও সংগঠন নৈপুণ্য উল্লেখ্য তাঁরা হচ্ছেন সুনীল সিংহ, অমিয় দত্ত ও বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

ভারতচন্দ্র মেলা (পেঁড়ো)—মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়কে নিয়ে 'ভারতচন্দ্র মেলা'র ব্যবস্থা করা হয়েছে ১৯৭৬ সাল থেকে। উদ্যোক্তা হচ্ছেন ভারতচন্দ্র পল্লী পাঠাগারের কর্তৃপক্ষ। এই মেলার মূলে যিনি ছিলেন বা এখনও আছেন তিনি হচ্ছেন পুরোশ কানপুর হরিদাস নন্দী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অশোক কুণ্ডু মহাশয়। প্রতি বছর ২রা মাঘ কবির জন্ম দিনে এই উৎসব শুরু হয়, চলে সাতদিন ধরে। কবি জীবনীর আলোচনাসহ প্রতি বছরই মেলারও ব্যবস্থা করা হয়। মেলায় লোকসংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানের সঙ্গে পাঁপড়, জিলিপি, ধামা কুলো ও গ্রামীণ শিল্পের দোকানও বসে। এছাড়া যাত্রাগান, কবিগান প্রভৃতিরও ব্যবস্থা করা হয়। মাটির মডেল সহকারে কবির জীবনী প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা হয়। এই মেলাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবাংলা ও বাংলাদেশ থেকেও জ্ঞানীগুণী লোকের আগমন ঘটে এই গ্রামে। স্বাধীনতার পরেও এই গ্রামে শহর থেকে গাড়ি পথে যাতায়াত তেমন সুগম ছিল না। কিন্তু সুখের কথা এই মেলার দৌলতে সরকারের মন্ত্রী ও আমলাদের যাতায়াতের ফলে রাস্তাঘাট ও কালভার্টের সংস্কার-সাধন ঘটিয়ে শহরের সঙ্গে যাতায়াত ব্যবস্থাকে অনেক সুগম করা গেছে। তবে অর্থের অভাবে প্রতি বছর একই রকমের অনুষ্ঠান হওয়ায় গ্রামবাসীদের কাছে যেন একঘেয়েমী এসে গেছে বলে অভিযোগ।

কবি গরীবুল্লাহ সংক্রান্তিমেলা (মুন্সীহাট)—জগৎবল্লভপুর থানার মুন্সীহাট হাফেজপুর গ্রামে বাংলা পুঁথি সাহিত্যের জনক কবি শাহ গরীবুল্লাহ স্মৃতি রক্ষার্থে এই রকমই আর একটি মেলারও ব্যবস্থা করা হয়েছে গত আশির দশক থেকে। কবির স্মৃতিচারণা ছাড়াও মেলা চলে কয়েকদিন ধরে—তাতে সাধারণ দোকানপাট ছাড়া বইয়ের স্টল, শোলার ও মাটির কাজের প্রদর্শনী ও বিশিষ্ট শিল্পীদের চিত্র-প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়। যাত্রাভিনয়েরও ব্যবস্থা থাকে। এই উপলক্ষে বাংলাদেশ থেকেও খ্যাতনামা মুসলমান কবি ও লেখকরা এ মেলায় এসে যোগ দেন। এই মেলাকে কেন্দ্র করে সংস্কৃতিবান এবং সাধারণ গ্রামবাসীরাও সম্প্রদায় নির্বিশেষে

উপস্থিত থেকে সুস্থ সমাজ গঠনে সহায়তা করে চলেছেন। এরও প্রেরণাদাতা অধ্যক্ষ অশোক কুণ্ডু। এই মেলার উল্লেখযোগ্য বিষয় হল প্রতি বছর নবীন ও প্রবীণ কবিদের কবিতার আসর।

বিগত কুড়ি পঁচিশ বছরে হাওড়া জেলায় বেশ কয়েকটি নূতন মেলার প্রবর্তন হয়েছে—সেগুলি বেশীর ভাগই কোন নামী ব্যক্তি (কবি, সাহিত্যিক, ফকির) প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু একটি নদীকে কেন্দ্র করে হাওড়া জেলায় সাম্প্রতিক কালে একটি মেলা গড়ে উঠেছে তা হচ্ছে 'দামোদর মেলা'। হাওড়া জেলার গঠনে ও সংহারে দামোদরের যে কি প্রভাব তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শিবের মতই দামোদর নদ একদিকে যেমন সংহারক অপরদিকে তেমনি সৃষ্টিকারী রূপে বর্ণিত। দামোদরের বন্যায় মানুষের যে কি অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট হতো তা কহতব্য নয়। তাই পশ্চিম বাংলার 'দুঃখের নদী' হিসাবে একে একদা অভিহিত করা হত। স্বাধীনোত্তর কালে বন্যার প্রকোপ বহুলাংশে স্তিমিত হলেও মাঝে মধ্যে তার ভয়াল রূপ আজও গ্রামের মানুষকে প্রবল বর্ষায় বিনিদ্র রজনী যাপনে বাধ্য করে। তবে বন্যার পরেই আবার নদীর নূতন পলি এনে দেয় নূতন ফসলের প্রাচুর্য, গাছপালার নতুন প্রাণশক্তি। মানুষ আবার নতুন করে শুরু করে তার জয়যাত্রা। প্রকৃতির এই সৃষ্ট নদী 'দামোদর'কে উপলক্ষ করেই তার সৃষ্টি ও সংহারের মূর্তিকে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে গ্রামের মানুষের আত্মিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংহতি স্থাপনে 'অগ্রগতি' নামে একটি গ্রামীণ সংস্থা উহা প্রবর্তন করেছে। এই মেলার প্রবর্তনকাল ১৯৯২ সাল। সপ্তাহব্যাপী এই শীতকালীন মেলা (৭ই—১৩ই ডিসেম্বর) প্রথমে ছোট আকারে শুরু হলেও কয়েক বছরের মধ্যেই উহা গ্রামবাসীদের মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হয়েছে। তাই এখানে গ্রাম্য কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতির সঙ্গে আধুনিক শহুরে সংস্কৃতির এক সমন্বয় ঘটিয়ে তোলা হচ্ছে। এই মেলায় যেমন তর্জা, ছৌ নৃত্য, লোকসংগীত, বাউলের আসর বসে তেমনি মূকাভিনয়, ম্যাজিক, নৃত্যনাট্য ও নাটকের আসরও বসে। গ্রামীণ মেলার প্রধান অঙ্গ যেমন জিলিপি, বাদাম ভাজা, পাঁপড় ইত্যাদির দোকানও হয় তেমনি গ্রামের লোকের বিজ্ঞান মনস্কতার দিকে দৃষ্টি ফেরাবার জন্য বিড়লা মিউজিয়াম ও ভারত সরকারের জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার উদ্যোগে বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর আধুনিক চিন্তাধারা ও গবেষণালব্ধ ফলেরও প্রদর্শনী করা হয়। সামাজিক পণপ্রথা দূরীকরণে এই মেলার উদ্যোগে যে 'গণবিবাহ'এর আসরটি বসে তাতে গ্রামের লোকের সমর্থন ও সহযোগিতা অসঙ্গতিসম্পন্ন গ্রামবাসীর মনে এক নতুন আশার আলো এনে দিয়েছে। বর্তমানে মেলার সিংহভাগ খরচই বহন করে আই, সি, সি, ও, এবং নেদারল্যাণ্ডস-এর একটি এন. জি. ও প্রতিষ্ঠান। ততঃ কিম!*

* কবি নিমাই মান্নার তথ্যই ইহার উৎস।

১, ৩, ১২. পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ।

২, ৪, ৯, ১১. লোক সংস্কৃতির আলোকে হাওড়া—ডঃ পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য।

৫. সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা—৪র্থ সংখ্যা ১৩৪৫।

৬. বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস পৃষ্ঠা ৩৪৮।

৭. ধর্মঠাকুরের রূপ—ডঃ সুকুমার সেন।

৮. পল্লী বাংলার পাল পার্বণ—ডঃ জগদীশ ভট্টাচার্য, রবিবাসর ১৯৬৯ সাল।

১০. হাওড়া জেলা পুরাকীর্তি—তারাপদ সাঁতরা।

১৩, ১৪, ২৫. হাওড়ার গৌরব কাহিনী—সলিল মিত্র।

১৫, ২১, ২২, ২৩, ২৬. পশ্চিমবঙ্গের পূজা, পার্বণ ও মেলা—অশোক মিত্র।

১৬, ১৭. জোড়াসাঁকো দাঁ বংশবৃত্তান্ত—হারাধন দত্ত—সম্পাদনা ডঃ শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

১৮. বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (৩য়)—শংকরীপ্রসাদ বসু।

১৯, ২০. পঞ্চষষ্ঠিতম শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব (১৪০৪)—হারাধন দত্ত।

২৪. পশ্চিমবঙ্গের পূজা, পার্বণ ও মেলা—অশোক মিত্র গ্রন্থে বলেছেন দু'শো বৎসর।

১৯৯৭ সালের এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে জেলায় সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত পাঠাগারের মোট সংখ্যা হচ্ছে ১৩০টি। এছাড়া ছোট বড় আরও বেশ কিছু পাঠাগার বে-সরকারী পরিচালনায় রয়েছে। এ জেলায় পাঠাগার গঠনে মানুষের প্রয়াস ছিল বিচিত্র। কোন কোন পাঠাগার তৈরী হয়েছে ধনাঢ্য ব্যক্তি বা স্বল্পবিত্ত মানুষের বিদ্যোৎসাহীতায়, কোন কোনটি স্থাপিত হয়েছে গভীর জাতীয়তাবোধ ও স্বাদেশিকতাকে কেন্দ্র করে, কোনটি গঠিত হয়েছে নিছক বন্ধু স্মৃতি রক্ষার্থে, আবার কোনটি গঠিত হয়েছে চারি ইয়ারী বা বারো ইয়ারীর তাৎক্ষণিক ভাবাবেগকে কেন্দ্র করে। কিছু কিছু অকালে ঝড়ে গেলেও তাদের মধ্যে আজ অনেক পাঠাগারই পত্রপুষ্পে ও ফলে সুশোভিত হয়ে বঙ্গের সারস্বত চর্চার প্রশংসনীয় কেন্দ্ররূপে গণ্য হয়েছে। তাদেরই কয়েকটির আলোচনা এখানে করা হল—কারণ ডাইরেকটরী তৈরী করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। তাই আলোচনাকে স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্তই সীমায়িত রাখা হয়েছে। এতে পূর্ণ তথ্য সংগ্রহের অক্ষমতা থাকলেও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনার কোন অবকাশ নেই।

শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরী—শুধু হাওড়া জেলায় নয়—বাংলাদেশের প্রাচীনতম পাঠাগারগুলির মধ্যে শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরী অন্যতম। ১৮৭৪ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করেন কাঙ্গালীচরণ হালদার। অবশ্য তখন এর নাম ছিল 'নিউজ রুম'। ১৮৭৭ সালে গঙ্গা তীরে ফেরী ঘাটের কাছে উহা 'দি শিবপুর রীডিং রুম' নাম নিয়ে স্থানান্তরিত হয়। রীডিং রুমের অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে আর একটি পাঠাগার তৈরী হয়। ১৮৭৯ সালে রাজকুমার সেন, রায়বাহাদুরের প্রচেষ্টায় শিবপুর রিডিং রুমের প্রতিদ্বন্দ্বী পাঠাগারের সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে নতুন করে নাম রাখলেন 'দি শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরী'—যা এখনও তার বিজয় কেতন উড়িয়ে চলেছে। পাঠাগারটির সবচেয়ে বড় গৌরবের কথা এই যে এক সময়ে পরিচালক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন অমর কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৯১৫ সালে পাঠকদের চাহিদা পূরণের জন্য জি. টি, রোডের ছোট বাড়িটি বিক্রি করে শিবপুর রোডে পঁচিশ কাঠা জমির উপর বর্তমান বাড়িটি তৈরী হয়। লাইব্রেরীর সংলগ্ন একটি নিজস্ব স্থায়ী মঞ্চও রয়েছে। এই পাঠাগারটি একটি সাধারণ পাঠাগারই নয় উহাকে শিবপুরের সংস্কৃতির পীঠস্থান বলেই আখ্যা দেওয়া ভাল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শতবার্ষিকী উপলক্ষে দোতলায় 'রবীন্দ্র কক্ষ' নামে একটি হলঘর তৈরী করা হয়। ফ্রি রিডিং রুমের ব্যবস্থা রয়েছে। শিশু বিভাগটির কার্যকলাপ চোখে পড়ার মত। ১৯২৯ সাল থেকে এই বিভাগটি আজও পর্যন্ত

বিদ্যালয়ের ছাত্ররাই পরিচালনা করে আসছে। সহস্রাধিক পুষ্ট সদস্যদের সাহায্যে রাজ্য সরকার ও পৌর সভার সাহায্য ব্যতিরেকেই শতবর্ষ অতিক্রান্ত পাঠাগারটি বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়ে যায়নি—উপরন্তু নানা বিষয়ের পুস্তক ও সাময়িক পত্রের সম্ভারে জ্ঞান চর্চার শাখা প্রশাখা উন্মীলিত করে রেখেছে। এরজন্য শিবপুর বাসী ধন্যবাদার্হ। সরকারী শাসনের বাইরে থেকেই এরা এত বড় হয়েছে। বইয়ের সংখ্যা বত্রিশ হাজারের কিছু বেশী। ফ্লাওয়ার্স ও ফনা-র সম্বন্ধে বইয়ের সংগ্রহ উল্লেখ করার মত।

বালি সাধারণ গ্রন্থাগার—এই পাঠাগারটির প্রতিষ্ঠা বলা যেতে পারে বাঙালীর স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ। সবারই আমাদের জানা যে বাঙালী বিভক্ত হতে জানে—যুক্ত হতে পারে না। কিন্তু সেই অপবাদ ঘুচিয়ে তিল তিল করে পাঠাগারটিকে যে তিলোত্তমায় পরিণত করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আজকের বালি গ্রন্থাগার হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে চারটি পাঠাগারের সমাহার। ১৮৮৩ সালে কয়েকজন যুবক গোস্বামী পাড়ার হরিধন গোস্বামীর বাড়ীতে একটি লাইব্রেরী করে (বয়েজ লাইব্রেরী ?)। ঐ বছরই পাঠক পাড়ায় নিবারণ পাঠকের বাড়ীতে 'হোম লাইব্রেরী' নামে আর একটি পাঠাগার করে আর একদল যুবক। ১৮৮৫ সালে এই দুটি পাঠাগার যুক্ত হয়ে 'বয়েজ এসোসিয়েশন' নামে চলতে থাকে হরিধনবাবুর বাড়ীতে। স্থানাভাবের জন্য যুবকরা হাজির হয় শান্তিরাম চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। তাঁরই চেষ্টায় গলি থেকে সদর রাস্তায় 'বীমস চ্যারিটেবল ডিসপেনসারিতে' (বর্তমান কেদারনাথ দাতব্য চিকিৎসালয়) স্থানান্তরিত হয়। নাম হল 'স্টুডেণ্টস এসোসিয়েশন'। আবার সেখান থেকে 'রীভার টমসন' (বর্তমান শান্তিরাম) স্কুলে। এদিকে ১৯০০-১৯০১ সালে রাজেন্দ্র শেঠের বাড়ীতে 'দি ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন লাইব্রেরী' ও গোস্বামী পাড়ায় 'বয়েজ রিডিং ক্লাব' নামে দুটি নতুন পাঠাগার তৈরী হয়। এরা একত্রিত হয়ে নাম নিল 'ফ্রেণ্ডস রিডিং রুম'। এদের কর্মকর্তারা স্টুডেণ্টস এসোসিয়েশনের সঙ্গে মিলিত হয়ে চলে এল 'রীভার টমসন' স্কুলে। একই সঙ্গে কাজ চলতে থাকে। কিন্তু পাঠাগারের স্থানাভাবই নিজস্ব গৃহ তৈরীর কাজে তৎপর হতে কর্মকর্তাদের ভাবিয়ে তুললো। ১৯১২ সালে জমি কেনা এবং পরের বছর ভিত খোঁড়া হয় এবং ১৯২৪ সালের ১লা বৈশাখে পাঠাগারটি নিজস্ব বাড়ীতে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হল।[১] এই অনুষ্ঠানে সভানেত্রী ছিলেন সরলাদেবী চৌধুরানী। নতুন করে নামকরণ হল—'বালি সাধারণ গ্রন্থাগার'। সেই থেকে আর পাঠাগারটি পেছনে তাকায়নি। শতবর্ষ অতিক্রান্ত এই পাঠাগারটি ত্রিতলে পরিণত হয়েছে। চারের বদলে হয়েছে এক। শতবর্ষের স্মৃতিতে ত্রিতলেই গঠিত হয়েছে একটি সাংস্কৃতিক মঞ্চ। ফ্রি রিডিং রুম সহ নিয়মিত পুস্তকের লেনদেন হয় সদস্যদের মধ্যে। বর্তমানে পুস্তকের সংখ্যা প্রায় আঠাশ হাজার আর রয়েছে কয়েক হাজার পত্র-পত্রিকা। সদস্য সংখ্যা—১৫১৭। শিশু ও মহিলাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা হিসাবে রাধানাথ ব্যানার্জী লেনে একটি দ্বিতল বাড়ী দান করে গেছেন সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেও সপ্তাহে দুদিন

করে বই লেনদেন করেন 'কর্মী সমিতির' স্বেচ্ছাসেবী সদস্যরা—সঙ্গে রয়েছে নিত্য প্রাতঃকালীন সংবাদপত্র পাঠ। শুধু সংখ্যায় নয় দুষ্প্রাপ্য ইংরাজী গ্রন্থের মধ্যে আছে—গিবসনের দি ডিক্লাইন এণ্ড ফল অব রোমান এম্পায়ার, ভুলারের ইণ্ডিয়ান প্যালিওগ্রাফি, হ্যাভেলের দি আইডিয়েল অব ইণ্ডিয়ান আর্ট, ১৮৯৬ সালের ছাপা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ইউনিভার্সাল হিস্ট্রি অব মিউজিক ইত্যাদি।

বাংলার মধ্যে বঙ্গদর্শন ও ভারতী পত্রিকাসহ বহু প্রাচীন পত্রিকার সেট। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগিশের মহাভারতের প্রথম সংস্করণ, নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বিশ্বকোষ', দুর্গাদাশ লাহিড়ীর 'পৃথিবীর ইতিহাস' সব খণ্ড এবং তাঁরই সম্পাদিত রাধাকান্তদেব বাহাদুরের 'শব্দ কল্পদ্রুম', হরিভক্তি বিলাসিনী নামে একটি প্রাচীন গ্রন্থ ও বেশ কিছু পুঁথি। বাংলায় লেখা তালপাতায় সমগ্র মহাভারত পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সুধাংশু কুমার সেন প্রদত্ত 'গুপ্তিপাড়া সংগ্রহ' উল্লেখ করার মত। বর্তমানে এটি টাউন লাইব্রেরী হিসাবে সরকারী মান্যতা পেয়েছে।

রসপুর পিপলস্ লাইব্রেরী—হাওড়া শহরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দামোদরের বানভাসী অথচ বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম আমতা রসপুরে 'রসপুর পিপলস লাইব্রেরী' গড়ে উঠেছিল ১৮৮৩ সালে। পাঠাগার যে বিদ্যালয়ের পরিপূরক এ কথা মনে রেখেই আমতা নারিট গ্রামের প্রসিদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের প্রচেষ্টায়ই এই পাঠাগারের সূত্রপাত। তাই কায়স্থ ও মাহিষ্যপ্রধান গ্রামে বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত রসপুর হাইস্কুলকে (১৮৭৬) কেন্দ্র করেই গড়ে উঠল এই পাঠাগার। 'শিবায়ন' কাব্যের রচয়িতা কবি রামকৃষ্ণ রায়ের গ্রাম রসপুর-কলকাতা বা ছোট কলকাতা। তাই পাঠাগার সংগঠনে গ্রামবাসীরাও উৎসাহের ঘাটতি দেখালেন না। কিন্তু ১৩২০ সনে (ইং ১৯১৩ সালে) দামোদরের বন্যায় স্কুলের পাকা ঘরে বন্যার জল ঢুকে পাঠাগারের প্রভুত ক্ষতিসাধন করল। স্কুলের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক প্রসন্নকুমার রায় ও বিদ্যোৎসাহী গ্রামবাসী ভূপতি-চন্দ্র দাসের চেষ্টায় শেষোক্ত ব্যক্তির বাড়ীতে পাঠাগারটি নিয়ে গিয়ে চালানো হতে লাগলো। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পাঠাগারের সাহায্যের আবেদনে সাড়া দিয়ে পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর দশ টাকা ও টাটা কোম্পানীর মালিক জামশেদজী টাটা পর্যন্ত পাঁচ টাকা পাঠিয়ে দেন। এটাও একটা পাঠাগারের শতবর্ষের জীবনে উল্লেখ করার মত ঘটনা। ১৯৫৭ সালে আবার রসপুর হাইস্কুলে পাঠাগারটি ফিরে আসে। ১৯৬৬ সালে এটি সরকারের রুরাল লাইব্রেরী পরিকল্পনায় আসে। তৈরী হয় নিজস্ব বাড়ি, ফ্রি রিডিং রুম ও সর্বক্ষণের জন্য সরকারের বেতনভুক গ্রন্থাগারিক। পাঠ্যপুস্তক বিভাগসহ শিশু বিভাগও আছে। কবি রামকৃষ্ণ রায়ের বংশধর পাঁচুগোপাল রায় পাঠাগারের উন্নতিতে আমৃত্যু কাজ করে গেছেন। বইয়ের সংখ্যা প্রায় দশ হাজারের মত। এই গ্রামীণ পাঠাগারটির শতবর্ষ উদ্‌যাপিত হয়েছে মর্যাদার সঙ্গে।

ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী—জেলার পাঠাগারগুলির ইতিহাস লিখতে গিয়ে

এমন একটি পাঠাগারও পেলাম না যার প্রতিষ্ঠাতা বা প্রতিষ্ঠাতাদের নাম জানা যায়নি। ব্যাঁটরা লাইব্রেরীই একমাত্র ব্যতিক্রম যার জন্ম সাল পাওয়া গেলেও জন্মদাতা বা দাতাদের অদ্যাবধি নাম পাওয়া গেল না। কর্ণের জন্মদাতার নাম না জানা গেলেও তাঁর বীর যোদ্ধা হওয়াকে যেমন কেউ ঠেকাতে পারেনি তেমনি ব্যাঁটরা লাইব্রেরীরও বহুমুখী কর্মধারা কেউ রুদ্ধ করতে পারেনি। ১৮৮৪ সাল এই পাঠাগারটিকে ডোরেস রোডের (বর্তমান বেলিলিয়াস রোড) উপর একটি ঘরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। কিছু বই ও চারটি আলমারি ছাড়া আর কোন কাগজপত্র কিছুই পাওয়া যায়নি ১৮৮৪-৯৭ সাল পর্যন্ত।* লাইব্রেরীটি জন্মকাল থেকেই এত ঘাটে জল খেয়েছে যে তার বিস্তৃত বিবরণ এই সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ে দিতে না যাওয়াই বিধেয়। তবে একথা স্বীকার করতেই হয় যে পাঠাগারটি যাযাবরের মত স্থানচ্যুত হলেও তার প্রাণশক্তি কিন্তু বেড়েছে বই কমেনি। এমনকি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যখন জাপানী বোমার ভয়ে শহর ফাঁকা হয়ে গেল তখনও (১৯৪১ সালে) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮০তম জন্মোৎসব পালিত হল এই পাঠাগারে প্রখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে। দৈনিক বসুমতী লিখছে—'যুদ্ধের ভয় ও ভীতিকে উপেক্ষা করিয়া কবিগুরুর জন্মোৎসব পালনের জন্য যেরূপ বিশাল জনসমাবেশ হইয়াছিল, এই পরিস্থিতিতে সেইরূপ জনসমাগম মফঃস্বল শহরের কোন অনুষ্ঠানে প্রত্যাশা করা যায় না (১৪. ৫. ৪১)।' অবশেষে ১৯৪২ সালের শেষের দিকে ১নং নরসিংহ রোড থেকে ৪নং লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী লেনে পাঠাগারটি উঠে আসে। আজও ঐ রাস্তার ওপরই দ্বিতল / ত্রিতল সুদৃশ্য নিজস্ব ভবনে পাঠাগারটি নিজ মহিমায় অবস্থান করছে। কিশোর বিভাগের প্রচুর সংখ্যায় বইসহ, বিভিন্ন প্রকার পত্র-পত্রিকাসহ ফ্রি রিডিং রুমের ব্যবস্থা সত্যই গর্ব করার মত। পাঠাগারটিতে গেলেই দেখা যাবে আবালবৃদ্ধবণিতাদের সমাবেশ। প্রতিদিনই এই পড়ুয়াদের ভিড় চোখে পড়ার মত। 'টেক্সট বুকের' একটি আলাদা বিভাগ স্কুল-কলেজের বিদ্যার্থীদের যে কত উপকার সাধন করছে তা বলার নয়। পাঠাগারের 'বসন্তকুমার স্মৃতি ভবনে' নিভৃতে এক কোণে বসে যখন দেখি গবেষকরা গবেষণা কাজে নিমগ্ন তখনই মনটা ভরে ওঠে পাঠাগারের রচনা সম্ভারের ভাঁড়ারটি কত সমৃদ্ধ ভেবে। কিন্তু পাঠাগারটির যে বৈশিষ্ট্য আমার মনে উহাকে বিশিষ্টতা দান করেছে তা হচ্ছে ঐ অঞ্চলের শিক্ষা বিস্তারে উহার অবদান। সাধারণত পাঠাগারকে ব্যবহার করা হয় স্কুল-কলেজীয় শিক্ষার পরিপূরক ব্যবস্থা হিসাবে। কিন্তু ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরীই হয়তো ব্যতিক্রম যে নিজেরাই শিক্ষাবিস্তারে একটি সংগঠিত কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। জেনে পুলকিত হতে হবে যে ঐ পাঠাগারের কার্যক্রম কেবল পাঠককে বই দেওয়া নেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হল না। অঞ্চলের জনশিক্ষা প্রসারে তারা নিজেরাই ব্রতী হলেন। তাই পাঠাগারের সমাজশিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকে শুরু হল শিশু শিক্ষা থেকে উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষালয় স্থাপন। আজ ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরীর স্নেহসিঞ্চনে চলছে একটি নার্শারী ও কে. জি. স্কুল,

২টি প্রাথমিক, একটি মাধ্যমিক (বালিকা ও একটি উচ্চ-মাধ্যমিক (বালক) বিদ্যালয়। সম্ভবত, প্রথাগত শিক্ষাবিস্তারে একটি গ্রন্থাগারের এই সার্থক প্রয়াস গ্রন্থাগার আন্দোলনে এই বঙ্গে এক অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত। তবে এজন্য যে সকল ধনাঢ্য ও স্বল্পবিত্ত বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিরা দধীচির মত নিজেদের অস্থিচর্ম বিলিয়ে দিয়ে উহাকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন তাঁদেরকে পাঠাগারের আড়াই হাজার সদস্যরা নিশ্চয়ই স্মরণে রাখবেন—আর হাওড়াবাসীরা জানাবেন সাধুবাদ। এতদ্ সত্ত্বেও একটি ভুল সংশোধনের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারছি না।

হাওড়া জেলা গেজিটিয়ারের লেখক অমিয়কুমার ব্যানার্জী লিখছেন—**It was established in 1884 and is the second oldest library in the district.** পাঠাগার কর্তৃপক্ষও তাই ছেপেছেন তাঁদের শতবার্ষিকী স্মরণীতে (১৯৮৩)। আসলে উৎসেই ভুল রয়েছে। শুধু তাই নয় অমিয়বাবু রসপুর পিপলস লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাকালও ভুল করে লিখেছেন ১৮৮৯ সাল। প্রকৃতপক্ষে জেলার দ্বিতীয় পাঠাগার হচ্ছে 'বালি সাধারণ গ্রন্থাগার' (১৮৮৩) ও রসপুর পাবলিক লাইব্রেরী (১৮৮৩) যুগ্মভাবে। যদিও ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী আজও জনগণের স্বেচ্ছাসেবায়ই সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

মাকড়দহ সারস্বত লাইব্রেরী—হাওড়া শহরের গ্রামীণ অঞ্চলে এটি একটি প্রাচীনতম পাঠাগারের অন্যতম। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৫ সালে। কিন্তু প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পড়েই এটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯১৯ সালে এটি আবার কতিপয় বিদ্যোৎসাহী মানুষের চেষ্টায় পুনরুজ্জীবিত হয়। সেই থেকে অবিচ্ছিন্ন ভাবে পাঠাগারটি চলে আসছে নিজস্ব গৃহে। এই পাঠাগারে পুস্তকের সংখ্যা বেশী না হলেও প্রাচীন গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের সন্ধান পাওয়া যাবে। এটিও টাউন লাইব্রেরী রূপে সরকারী স্বীকৃতি পেয়েছে।

মহিয়াড়ী সাধারণ পাঠাগার—অন্যান্য স্থানের মত হাওড়া জেলার পাঠাগারগুলি গড়ে উঠেছিল দুটি উপায়ে—এক ধনাঢ্য পরিবারের দানে—দুই, কতিপয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের মিলিত উদ্যোগে। মহিয়াড়ী সাধারণ পাঠাগার হচ্ছে প্রথমোক্ত পর্যায়ের একটি পাঠাগার। শতবর্ষ অতিক্রান্ত এই পাঠাগারটি গড়ে উঠেছিল মহিয়াড়ীর জমিদার কুণ্ডু চৌধুরী পরিবারের বংশধরদের উদ্যোগে। ঐ বংশেরই অন্যতম বিদ্যোৎসাহী জমিদার অন্নদাপ্রসাদ কুণ্ডু চৌধুরী ছিলেন এর নেতৃত্বে। গ্রামের লোকের সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না। এক পয়সা, দু পয়সা, এক আনা দু আনা করে চাঁদা উঠল মোট পনেরো টাকা। এই দেখেই জমিদার বাবুরা উৎসাহিত হন এবং খুশি মনে কুণ্ডু চৌধুরী পরিবারের কর্তারা তাঁদের পারিবারিক পাঠাগারের অমূল্য পাঁচশো পুস্তক দিয়ে সাজিয়ে প্রথমেই গ্রন্থাগারটিকে গ্রামবাসীদের হাতে উৎসর্গ করে দিলেন ১৮৮৬ সালে। নাম রাখা হল মহিয়াড়ী সাধারণ পাঠাগার। প্রথমে এটি স্থাপিত হয় কুণ্ডুদেরই প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গ বিদ্যালয়'-এর একটি ঘরে। পরে জমিদার বাড়ীর বিভিন্ন অংশ ঘুরে ঘুরে বর্তমান জায়গায় স্থায়ীভাবে অবস্থান

করছে। ১৯৫৯ সালে এই পাঠাগারটি রুরাল লাইব্রেরী হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। ফলে সরকার কর্তৃক গ্রন্থাগারিক ও কর্মী নিয়োজিত হয়েছেন। এই পাঠাগারটির শতবার্ষিকী মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়েছে ১৯৮৬ সালে। পাঠাগারের জমিটিও কুণ্ডু চৌধুরীরাই দান করেছেন। দ্বিতীয় তলটি শতবার্ষিক উৎসবের স্মারক হয়ে রয়েছে। এক কথায় এই পাঠাগারটি আন্দুল মৌড়ির একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র রূপেই গ্রামের আবালবৃদ্ধবণিতার কাছে পরিচিত। এই পাঠাগারটির বৈশিষ্ট্য হল এখানে প্রায় ৩৭০টি হাতে লেখা পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি রয়েছে। প্রাচীন ইংরেজী গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী স্যার সি. ভি. রমনের গবেষণালব্ধ প্রবন্ধের বুলেটিনের সব সংখ্যাগুলি এই পাঠাগারে সংরক্ষিত থাকায় পাঠাগারটি বিজ্ঞানীদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রাচীন পাণ্ডুলিপি-গুলির একটি দেখে পণ্ডিতপ্রবর ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ভিজিটার্স বুকে লিখে গেছেন—'জয়দেবের 'গীতগোবিন্দের' এখানে অতি প্রাচীন এক পাণ্ডুলিপিতে জয়দেবের মা-বাবার নাম পাওয়া গেল। জয়দেবের অনেক পাণ্ডুলিপি আমি দেখেছি। কিন্তু কোথাও তাঁর মা-বাবার নাম পাইনি।' তেমনি বর্তমান যুগের বিদগ্ধ পণ্ডিত ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে গদ্য' গ্রন্থে (১৩৪১) ভূমিকায় লিখেছেন—'মহিয়াড়ী সাধারণ পুস্তকালয়ের কর্তৃপক্ষের সহায়তা আমাকে উপকৃত করিয়াছে। তাই সে গঙ্গাজলেই গঙ্গা পূজা করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—বিদ্যাচর্চায় অনাগত বঙ্গবাসীকে এই শতাব্দীর পাঠাগারটি আরও যে কত বিদগ্ধজনকে সহায়তা করিবে তার কি ইয়ত্তা আছে!' উল্লেখ্য, এসব প্রাচীন সংগ্রহ কিন্তু সবই মহিয়াড়ী কুণ্ডু চৌধুরী পরিবারেরই সংগ্রহ থেকে এসেছে। বইতে আজও স্ট্যাম্প দেখতে পাওয়া যায় 'Kundu Chowdhury Family Library'। গবেষকদের পক্ষে এটি একটি 'স্বর্ণখনি'। এটিও টাউন লাইব্রেরী হিসাবে সরকারী মান্যতা লাভ করেছে।

পল্লী ভারতী (গ্রন্থাগার) মৃগকল্যাণ—শতবর্ষ অতিক্রান্ত এই পাঠাগারটির নাম একবার নয়, দুবার নয়, তিনবার পালটে বর্তমান নাম ধারণ করেছে। ১৮৮৮ সালে এই পাঠাগারটির প্রতিষ্ঠাকালে নাম ছিল 'মৃগকল্যাণ সাধারণ পাঠাগার'। বহু বছর এবাড়ী, ওবাড়ী করে ১৯২৪ সালে পাঠাগারের একটি নিজস্ব বাড়ি হল —যদিও সেটি মৃন্ময় গৃহ। ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষের দানের জমিতে এবং প্রমথনাথ ঘোষের প্রদত্ত বেশীর ভাগ অর্থেই তৈরী হল এই পাঠগৃহটি। দশবছর চলার পর নিকটবর্তী সাহড়া গ্রামের একটি মৃতপ্রায় গ্রন্থাগার এর সঙ্গে যুক্ত হল—নাম হল 'মৃগকল্যাণ ইউনিয়ন লাইব্রেরী'। এরপর ১৯৩৪ সালে আবার পাঠাগারের নাম পরিবর্তন হয়ে হল—'মৃগকল্যাণ ইনস্টিটিউট'। সর্বশেষে ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হলে দেশজ রীতিতে নাম রাখা হল 'পল্লী ভারতী পাঠাগার।' আদিতে এই পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল মৃগকল্যাণ উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশে এক খণ্ড জমিতে—যা দান করেছিলেন ক্ষেত্রমোহন ঘোষাল। প্রয়োজনে ছোট্ট ঐ তরীটিকেও ত্যাগ করতে হল। পাঠাগারের মূলে ছিল গ্রামের একদল তরুণ যাঁরা রাষ্ট্রগুরু

সুরেন্দ্রনাথের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বদেশী আন্দোলনে পরবর্তী কালে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সেই থেকেই পাঠাগারটিকে কেন্দ্র করে উদ্যোক্তারা পরবর্তী কালে স্বাধীনতা সংগ্রামের যে কোন আন্দোলনেই অংশ গ্রহণ করতে পিছপা হন নি। উদ্যোক্তাদের দেশপ্রেম, নিষ্ঠা ও ত্যাগ গ্রামবাসীদেরও উৎসাহিত করেছে সংগ্রামের সাথী হতে। তাই দেখা যায় স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, ডঃ ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামীজীর ভাই), বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ও আরও অনেকে এসেছেন পাঠাগারকে উপলক্ষ করে স্বাধীনতা আন্দোলনেকে গ্রামে ছড়িতে দিতে। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, ১৯২১-এ খিলাফৎ আন্দোলন, ১৯৩০-৩১ সালে লবণ সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য কোন আন্দোলনেই পাঠাগারের কর্মীরা (গ্রামবাসীসহ) কখনই নিষ্ক্রিয় থাকেননি। ফলে পাঠাগারের উপর পড়েছে রাজরোষ—বারে বারে পাঠাগার হয়েছে লুণ্ঠিত, অগ্নিদগ্ধ ও তালাবন্ধ। ফলে শতবর্ষের পাঠাগারে যে প্রাচীন অমূল্য গ্রন্থরাজি থাকা উচিত ছিল—তার সন্ধান আজ বেশী পাওয়া যাবে না। ইংরেজের রাজরোষ যদিওবা অনেক কষ্টে কাটিয়ে ওঠা গেল কিন্তু প্রকৃতির রুদ্র রোষ থেকে বাঁচানো গেল না অবশিষ্ট অংশকেও। ১৯৫৯ দামোদরের প্রবল বন্যায় সুন্দর সেই মৃন্ময় বাড়িটি ধ্বংসাবশেষে পরিণত হল। পরে অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহায়তায় ১৯৬১-তে পাকা এক তলাটি নির্মিত হয়। বর্তমানে অবশ্য দ্বিতল হয়েছে। ১৯৮১ সালে গ্রন্থাগারটি রুরাল পাঠাগার হিসাবে সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে। ফ্রি রিডিং রুম ও কিশোর বিভাগ রয়েছে। পাঠাগারটি আজ মৃগকল্যাণ ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে—এটি কেবল মুষ্টিমেয় কিছু সংস্কৃতিবান গ্রামবাসীর পুস্তক লেনদেনের কেন্দ্র নয়। এর শতবর্ষ পালনের স্মৃতি এখনও বহুলোকের মধুর স্মৃতি হয়ে আছে।[৩]

ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব লাইব্রেরী—এই ক্লাবটি ১৮৮৯ সালে স্থাপিত হয়। পরে ১৮৯৩ সালে পল্লীর কয়েকজন যুবকের চেষ্টায় তাঁদেরই কারুর বাড়িতে একটি পাঠাগার তৈরী হয়। ১৯১০ সালে খুরুট রোডে (বর্তমান নেতাজী সুভাষ রোড) নিজস্ব জমির ওপরে একতলা বাড়ি তৈরী হয় এবং তাতেই পাঠাগার চলতে থাকে। পরে বাড়িটি দ্বিতলে পরিণত হয়। ১৯৪১ সালে একটি অছি পরিষদ তৈরী করে ক্লাবটির পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। কিন্তু সদস্যদের মধ্যে কলহকে কেন্দ্র করে ১৯৮৬—১৯৯০ পর্যন্ত ক্লাব ও পাঠাগারটি বন্ধ ছিল। পরে আইন সম্মত ভাবে আবার ১৯৯১ সাল থেকে পাঠাগারটি চালু হয়েছে। ঐ অঞ্চলের নামী-দামী নাগরিকরা আবার তৎপর হয়ে কাজ চালাচ্ছেন। এখানে ফ্রি রিডিং-রুমের ব্যবস্থা আছে—তবে বিশৃঙ্খলার সুযোগে অনেক মূল্যবান বই ও পত্রিকার হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। অষ্টাদশ পুরাণের পুরো বঙ্গানুবাদের সেটটি পাঠাগারের একদা অমূল্য সম্পদের অন্যতম বস্তু ছিল।[৪] এটি বে-সরকারী প্রচেষ্টায় আজও চলছে।

বেলুড় সাধারণ গ্রন্থাগার—১৮৯৫ সাল। সেদিন ছিল গুডফ্রাইডে। বেলুড় হাইস্কুলের পণ্ডিতমশাই যশোদানন্দন সাধু তাঁর আটজন বন্ধুদের নিয়ে একটি শুভ সংবাদ বেলুড়বাসীকে জানালেন যে তাঁরা বিদ্যালয়েরই একটি ঘরে একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার নাম রেখেছেন—'দি বেলুড় পাবলিক লাইব্রেরী' তার সঙ্গে একটি লিখিত আবেদনপত্রে গ্রামবাসীকে সাহায্য করতে আবেদন জানালেন। আজকে যেখানে বেলুড় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় সেই বাড়িতেই পাঠাগারটি তৈরী হয়। সেদিন কি কেউ ভাবতে পেরেছিল যে ঐ আটজনের কার্য একশো বছর পরে সেটি বেলুড়বাসীর কর্মযজ্ঞের একটি গর্বের বস্তু হয়ে দাঁড়াবে? ঐতিহাসিক কারণেই এই পাঠাগারটি অনন্য গৌরবের অধিকারী হয়ে আছে, সেটি হচ্ছে—ঐ বিদ্যালয়ের দ্বিতলের যে ঘরটিতে পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই ঘরেই স্বামী বিবেকানন্দ প্রায়ই বিকালে এসে বসতেন। নজির হিসাবে সেই চেয়ারটিকে আজও সযত্নে সংরক্ষণ করে চলেছেন বেলুড় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ। আজকের পাঠাগার ভবনের ভিত্তি স্থাপন হয়েছিল ১৯৪১ সালে—জমি দান করেছিলেন বালি পৌরসভা—তিন কাঠা ১৩ ছটাক। ১৯৪৬ সালে ৫ই জানুয়ারী পাঠাগারের দ্বারোদ্ঘাটন হল। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে জনসাধারণ ও বিত্তবান ব্যক্তিদের সাহায্যে তৈরী হল 'রবিতীর্থ' ভবন। তারপর 'রবিতীর্থ মঞ্চ' তৈরী হল রাজ্য সরকার, স্থানীয় জনসাধারণ ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সাহায্যে। আজ পাঠাগারটি ত্রিতলে পরিণত হয়েছে। তাতে রয়েছে বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পত্রিকা যার সংখ্যা ত্রিশ হাজারেরও বেশী। শিশু বিভাগ, মহিলা বিভাগ মিলে প্রায় এক হাজার সদস্য আছে। বেলুড় গ্রামের এটি সংস্কৃতির একটি প্রাণকেন্দ্র হলেও পাঠাগারটি আজও সরকারী আওতায় না গিয়ে 'স্বেচ্ছাসেবী গ্রন্থাগার' হিসাবে এটি জনগণের চাহিদা পূরণ করে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

১৯৯৫ সালের ১৭ই ডিসেম্বর পাঠাগারের দ্বিতলে শতবার্ষিকী সংগ্রহশালা (মিউজিয়াম) তৈরীর কাজ হাতে দেওয়া হয়েছে সাংসদ কোটার টাকাতে (সাং সুশান্ত চক্রবর্তী)।

রামকৃষ্ণপুর সংসদ লাইব্রেরী—সংস্থাটি যদিও গঠিত হয় ১৯০০ সালে তথাপি গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৯২২ সালে। এই গ্রন্থাগারটি প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয় রামকৃষ্ণপুরের বিখ্যাত বসু পরিবার নৃসিংহবসুর বাড়ীর একটি ঘরে—তাঁদেরই দেয় অর্থে ও সামগ্রীতে। ইতিপূর্বে আবার ঐ অঞ্চলে 'ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড ক্লাব' ও 'ঐক্য সমাজ' নামেও দুটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তাদের মিলন সাধনের ফলেই গঠিত হল 'রামকৃষ্ণপুর লাইব্রেরী এ্যান্ড ফ্রেন্ডস সেঞ্চুরি ক্লাব'। বিশাল নামের অসুবিধা দূর করে ১৯০৭ সালে ছোট করে সংস্থাটির নামকরণ হয় 'রামকৃষ্ণপুর সংসদ'। পাঠাগারের জন্য একটি স্থায়ী ভবনের অভাব দূর করতে এগিয়ে আসেন বসু পরিবারেরই আশুতোষ বসু ও তারাপদ বসু প্রমুখ ব্যক্তিগণ। পাঠাগারের নিজস্ব বাড়িটি হল ১৯২২ সালে। বসু পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্যই

হয়তো পাঠাগার ভবনের নাম রাখা হয় 'নৃসিংহ স্মৃতি মন্দির'। পাঠাগারটিতে ফ্রি রিডিং রুমের ব্যবস্থা আছে। শিশু বিভাগ ও টেকস্ট বুক বিভাগও বর্তমান। শতবর্ষের দোর গোড়ায় পাঠাগারটি নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করে স্থানীয় সংস্কৃতিবান নাগরিকদের মনের ক্ষুধা মেটানোর চেষ্টা করা কি কম কথা! এটিও বে-সরকারী চেষ্টায় পরিচালিত হচ্ছে।

ফ্রেণ্ডস ক্লাব লাইব্রেরী—জগাছা ফ্রেণ্ডস ক্লাব প্রায় শতবর্ষের দোর গোড়ায় এসে পৌঁছেছে। এই ক্লাবটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০১ সালে। এই ক্লাবের বিভিন্ন শাখা ছিল যেমন ব্যায়ামাগার, পাঠাগার, নাটক ও সাহিত্য বিভাগ। কিন্তু পাঠাগারটি যে কোন সালে শুরু হয়েছিল তা ঠিক করে বলা যাচ্ছে না। তবে পাঠাগার বিভাগটি যে ক্লাব প্রতিষ্ঠার অনেক পরে হয়েছে তাও নয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গরদ আন্দোলনে যে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন হয়েছিল তাতে জগাছা গ্রামের অধিবাসীরাও যোগ দিয়েছিলেন। ফ্রেণ্ডস ক্লাবের সদস্যরাও রাজরোষে গ্রেপ্তার হলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী ও পুলিন বিহারী সরকার। শুধু তাঁদের গ্রেপ্তার করেই রাজশক্তি থামলেন না। রাজশক্তি বন্ধ করলো ব্যায়ামাগার ও পাঠাগার। আবার ফ্রেণ্ডস ক্লাবের সভাপতি নিজেই লিখছেন—১৯১৫ সালে উপেন্দ্রকৃষ্ণদেব মুক্তি পেয়ে গ্রামে ফিরে পুনরায়···পাঠাগারের ও ব্যায়ামাগারের সংস্কার করালেন ও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনও হল।[৮] সুতরাং লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা যে ক্লাব গঠনের দু'তিন বছরের মধ্যেই হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই পাঠাগারটি রাজ্য সরকারের সোসাল এডুকেশন অফিস ও রামমোহন ফাউণ্ডেশন থেকে সাহায্য পেয়ে আসছিল। কিন্তু এলাকার ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য পাঠাগারের সম্প্রসারণ ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাই ক্লাব কর্তৃপক্ষ 'ফ্রেণ্ডস ক্লাব লাইব্রেরী'র জন্য নিজেদের জমি থেকে সাড়ে তিন কাঠা জমি পাঠাগারকে দান করেন। ১৯৮১ সালে পাঠাগারটি রুরাল লাইব্রেরী হিসাবে পরিগণিত হয় এবং ১৯৮৬-৮৭ সালে ওটি 'টাউন লাইব্রেরী' হিসাবে সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে। আজ নিজস্ব পাকা সুন্দর বাড়ীতে পাঠাগারটি জগাছা অঞ্চলের একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবে পরিণত হয়েছে--যা শতবর্ষের সীমারেখা প্রায় ছুঁই ছুঁই করছে।

মাজু পাবলিক লাইব্রেরী—বাংলাদেশের আর দশটা পাঠাগারের মত এই পাঠাগারটিও একজন বিদ্যোৎসাহী গ্রামবাসীর বাড়িতেই চৌদ্দজন যুবকের চেষ্টায় গড়ে ওঠে। বাড়িটি ছিল অনুজা চরণ মজুমদারের। স্থাপনাকাল ১লা অক্টোবর, ১৯০২ সাল। পরে মজুমদার পরিবারের রামলাল, হরলাল, কালীপদ ও অমূল্য চরণের প্রদত্ত জমিতে পাঠাগারের নিজস্ব গৃহের এক অংশে গড়ে উঠলো। এই পাঠাগারটির জন্মকাল থেকেই এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছিল যা অন্যান্য পাঠাগারের ক্ষেত্রে কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। হাওড়া শহর থেকে এতদূরে একটি নিভৃত পল্লীর পাঠাগারকে সাহায্য করবার জন্য কেবল হাওড়াবাসী

নয়, কলকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও এমনকি ইংরেজ সাহেবরাও এগিয়ে এসেছিলেন। তারই কিছু নমুনা এখানে উল্লেখ করা হল। ১৯১৩ সালে, ১৮ই মে পাঠাগারের শিলান্যাশ হল জেলার ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডি, সি, পেটারসনের হাতে। এরপরেই কলকাতা ও হুগলী থেকে যে সকল সহৃদয় ব্যক্তি সাহায্য করেছিলেন তাদের মধ্যে অনেক ইংরেজ ব্যক্তি এবং কোম্পানীও ছিল। কতিপয় নামও দেওয়া হল—কলকাতা থেকে বি, এ, হোয়াইট, এফ, সি, ডবলিউ ডোভার, স্যার আর, এন, মুখার্জী, বাবু উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী (W. C. Bonnerjee), মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—বেদান্তরত্ন, মেসার্স বার্ড এণ্ড কোং, কেরী স্যার ডবলিউ এল, আইরন সাইড স্যার ডবলিউ এ, রায়বাহাদুর কেদারনাথ ব্যানার্জী, বাবু মহেন্দ্রনাথ রায়, স্যার তারকনাথ পালিত। উত্তরপাড়ার ছিলেন—রাজা প্যারীমোহন মুখার্জী, রাজা জ্যোৎকুমার মুখার্জী বাহাদুর, কুমার সনৎ কুমার মুখার্জী। রাজা রণজিৎ সিং—নসীপুর তিনিও দাতাদের মধ্যে ছিলেন।[৭] এখানেই শেষ নয়—তদানীন্তন কালে কবি, লেখক ও ইতিহাসবিদ্‌গণও নিজেদের লেখা পত্রপত্রিকা দিয়ে পাঠাগারটিকে সমৃদ্ধ করেছেন—তাঁদের নামও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে—বাবু জলধর সেন (১৩)* বাবু জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২৫), বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (২), অধ্যাপক পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (২৫), অধ্যাপক বিনয় সরকার (২৬), বাবু বরদাপ্রসাদ বসু (স্বত্বাধিকারী বঙ্গবাসী পত্রিকা) (২০), রায়বাহাদুর চুণীলাল বসু (৪), ঐতিহাসিক দুর্গাদাস লাহিড়ী (৭), কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (৩), সাংবাদিকপ্রবর হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ (২), স্যার গুরুদাস ব্যানার্জী (২), ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (২), মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী (৭), কবিশেখর কালিদাস রায় (৩), বাবু সুরেন্দ্রনাথ সাধু, কলিকাতা (৩৪), কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক (৫), কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচি (১), কাশী যোগাশ্রম (২২), পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি (৬), বাবু প্যারীমোহন সরকার (৩)। শুধু কি তাই! এই পাঠাগারটিকে ১৯১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে Literary Society Act অনুসারে রেজিষ্ট্রিকৃত করা হয় স্যার তারকনাথ পালিতের পরামর্শে ও পীড়াপীড়িতে। জেলার সন্তান না হয়েও এঁরা কেন এই পাঠাগারটির ব্যাপারে এত একাত্ম হয়েছিলেন তা বুঝে ওটা আজকের আত্মকেন্দ্রিক সমাজের পক্ষে একটু দুরূহ বলেই মনে হয়। সেইজন্যই এতটা আলোচনা করা হল। এই পাঠাগারে বেশ কিছু হাতে লেখা পুঁথিও সংরক্ষিত আছে। ফ্রি রিডিং রুম ও শিশু বিভাগের ব্যবস্থা রয়েছে। সরকারী আইনে রুরাল লাইব্রেরী হিসাবে স্বাধীনতার পরেই স্বীকৃতি লাভ করে সরকারী গ্রন্থাগারিক ও কর্মী নিযুক্ত আছেন। এই পাঠাগারে একটি সাহিত্য সম্মেলনের কথা না উল্লেখ করলে হয়তো ইতিহাসকে অস্বীকার করা হবে। মাজু পাঠাগারের নাম ও সম্ভ্রম তদানীন্তনকালে কি পর্যায়ে পৌঁছেছিল তা প্রমাণ করবে ১৯২৯ সালে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন। মাজু পাঠাগারের

* পুস্তকের সংখ্যা বন্ধনীতে।

উদ্যোগেই সে বছর হাওড়া জেলার এই নিভৃত গ্রামে শুক্লপক্ষের শুভলগ্নে চাঁদের আলোয় যেন চাঁদের হাট বসে গিয়েছিল। সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন। সাহিত্য শাখার সভাপতি ছিলেন ডাঃ নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত, ইতিহাস শাখার সভাপতি ছিলেন ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ছিলেন ডঃ একেন্দ্র ঘোষ। আর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ঐ গ্রামেরই বিদগ্ধ পণ্ডিত ডাঃ সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, ডি, লিট (প্যারী)।

গঙ্গাধরপুর বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার—পাঁচলা থানার এই গ্রন্থাগারটি ১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ গ্রামের একটি প্রাচীন পাঠাগার এটি। নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে উদ্যোক্তারা দেশপ্রীতির প্রেরণায় তাড়িত হয়ে পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বইয়ের সংখ্যা প্রায় সাত হাজারের মত। গ্রামবাসীদের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও আগ্রহে আজও পর্যন্ত এটি সরকারী সাহায্য ছাড়াই বেশ চলছে।

আমতা পাবলিক লাইব্রেরী—আজকের চড়াপূর্ণ দামোদর নদীর তীরে অবস্থিত আমতা গ্রামটি অতীতে এক নাম করা বন্দর ছিল। আজ আমতা ১নং ব্লক থেকে আমতা ২নং ব্লকে যেতে গেলে বেতাই বন্দর পারাপারের কথা অনেকেই বলে থাকে। যদিও এখন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র কংক্রীটের সেতুর ওপর দিয়ে সহজেই অতিক্রম করা যায়। একদা বাণিজ্যসমৃদ্ধ আমতা গ্রাম পরে শিক্ষা বিস্তারেও মনোনিবেশ করে। তারই ফলশ্রুতি আমতা পীতাম্বর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় (১৮৫৭) ও আমতা পাবলিক লাইব্রেরী। বিদ্যালয়ের পরিপূরক হিসাবেই পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা। তাই সর্বত্রই দেখা যায় যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরেই পাঠাগার প্রতিষ্ঠার কথা মানুষের মনে উদয় হয়েছে। আরও মজার কথা যে অধিকাংশ গ্রামেতেই দেখা গেছে বিদ্যালয়ের একটি কক্ষকে পাঠাগারের সূতিকা গৃহ হিসাবে চিহ্নিত করতে। ১৯০৭ সালে 'আমতা লিটরারি ক্লাব'-এর উদ্যোগে এই পাঠাগারটি গড়া হয় আমতা বাজারের প্রবেশ পথে একটি দোতলা বাড়ির ছোট্ট ঘরে। ভাড়া দিতে অসমর্থ হওয়ায় এর ওর বাড়িতে স্থানান্তরিত হতে লাগলো। এমতাবস্থায় আমতা পীতাম্বরের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক রণধীর চট্টোপাধ্যায়ের স্নেহচ্ছায়ে উক্ত বিদ্যালয়ের টিচার্স কমনরুমে পাঠাগারটি ১৯১৮ সালে স্থানান্তরিত হল। পাঠাগারটিকে বাঁচাবার জন্য তদানীন্তন বিদেশী জেলা অফিসার মিস্টার প্রান্সের নামে উহার নাম রাখা হয় 'প্রান্স ক্লাব'। ১৯২৫ সালে আবার ওটি পীতাম্বর স্কুল থেকে সরিয়ে আনা হল রথতলার এক বাড়িতে। ১৯২৭ সালে আবার নাম পাল্টে পাঠাগারটির নাম রাখা হয় 'আমতা সাধারণ পাঠাগার'। এল ১৯৩০ সালের গান্ধীজির আইন অমান্য আন্দোলন। স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারের তোড়ে যুবক পাঠকরাও স্থির থাকতে পারল না চার দেওয়ালের মধ্যে। হ্যারিকেনের আলো জেলে আন্দোলনের খবর পড়া ও আন্দোলনের প্রবাহকে উস্কে দেবার পরিকল্পনা দুইই চলতে থাকে পাঠাগারের ছোট্ট ঘরে। রাজ শক্তির শ্যেন দৃষ্টি তাঁদের ওপর পড়তে দেরী লাগলো না। বিদেশী শাসকের নির্দেশে পাঠাগারের

দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হল। কয়েক বছর তালা বন্ধ থাকার পর ১৯৩৮ সালে উহা আবার স্থানান্তরিত হয়ে এল পীতাম্বর হাইস্কুলে। এই বছর সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপিত হল (২৮, ৩, ৩৮)। উৎসবে সভাপতিত্ব করলেন প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক সজনীকান্ত দাস। 'বন্দেমাতরমের' ধ্বনি ও জাতীয়তাবোধ গ্রামের লোকের মনে আনলো নূতন প্রেরণা। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের করাল ছায়া পাঠাগারের অগ্রগতির পথে আবার বাধা হয়ে দাঁড়াল। দেশ স্বাধীন হলেও পাঠাগারের গৃহ সমস্যা কিন্তু থেকেই গেল। অবশেষে ১৯৫৭ সালে সন্ন্যাসীচরণ, নীলমণি ও সুধীরচন্দ্র চরিত মহাশয়ত্রয়ের দানের জমির উপর তৈরী হল পাঠাগারের নিজস্ব একটি হল ঘর। ঐ সালেই পাঠাগারটি 'আমতা পাবলিক লাইব্রেরী' নামে রেজিস্ট্রীকৃত হল এরপর থেকে আর পেছনের দিকে তাকাতে হয়নি। শুধু বড়দেরই নয়—তৈরী হল আলাদা শিশু বিভাগ। পাঠাগারের উদ্যোগে প্রথম প্রকাশিত হল ছাপার অক্ষরে 'সাহিত্যিকা' নামে একটি পত্রিকা (১৯৫৫)। ২৪টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। নূতন করে সমস্যা দেখা দিল স্থানাভাবের। ১৯৭৫ সালে মহকুমা গ্রন্থাগার হিসাবে স্বীকৃত হওয়ায় সরকারী সাহায্যে সম্প্রসারণের কাজ হল। ১৯৭৯ সালে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পায়। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য বসে পাঠ্যপুস্তক পড়ারও ব্যবস্থা হয়। স্থানীয় 'বাণী মন্দিরের' প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরা তাদের সংগৃহীত ৮০০ পুস্তক, ৬টি আলমারি দান করে, আমতা পাবলিক লাইব্রেরীকে আরও সমৃদ্ধ করে তুললেন। বর্তমানে পাঠাগারের সদস্য সংখ্যা ছয় শতেরও অধিক। আর তাদের সেবায় রত আছেন গ্রন্থগারিকসহ চারজন সরকারী বেতনভুক কর্মী। এটিও টাউন লাইব্রেরী হিসাবে স্বীকৃত।*

গোবর্দ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ—প্রথমে এর নাম ছিল শালিখা সঙ্গীত সমাজ। সঙ্গীত শিক্ষাই ইহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। কিন্তু সমাজের সদস্য ও বি. ই. কলেজের ছাত্র গোবর্দ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে উহার নাম রাখা হল 'গোবর্দ্ধন সঙ্গীত সমাজ'। সালিখা বাবুডাঙ্গার হারানচন্দ্র মুখার্জীর বাড়িতে ১৯১২ সালে উহা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই থেকে সমাজের প্রধান কাজ হল সমাজ সেবা করা। তারই ফাঁকে ফাঁকে সৌখিন নাট্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হত। সাহিত্য প্রেমিক মুষ্টিমেয় সদস্য বিশেষ করে ব্রজমোহন দাস, বঙ্কিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের (মণি) ঐকান্তিক আগ্রহে ও চেষ্টায় প্রতি বছর সাহিত্য সম্মেলন হত। এতে বাংলাদেশের সাহিত্যিকরা অনেকেই যোগ দিতেন। ব্রজমোহন দাসের প্রচেষ্টায় সাহিত্য জগতের তৎকালীন সার্বজনীন 'দাদা' জলধর সেনের সভাপতিত্বে ও 'নায়ক' পত্রিকার সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহচর্যে সাহিত্য বাসরগুলি বেশ জমে উঠত। হাওড়ার অধিবাসী না হলেও জলধরবাবু এই সমাজের সভাপতি ছিলেন দীর্ঘ কুড়ি বছর (১৯১৮-১৯৩৯)। এই সময়েই সমাজের নাম আবার

* তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করেছেন কবি নিমাই মান্না।

পরিবর্তন করে রাখা হল 'গোবর্দ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ।' কয়েক বছর যেতে না যেতেই কর্মকর্তারা বুঝতে পারেন যে গ্রন্থাগার বিভাগটি না থাকলে এরূপ একটি সারস্বত প্রতিষ্ঠানের পূর্ণতা আসে না। তাই তাঁরা ১৯১৭ সালে কলকাতার প্রসিদ্ধ 'চৈতন্য লাইব্রেরী'-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুপণ্ডিত ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শে ও সক্রিয় সহায়তায় ১৯১৭ সালে কিছু সদস্যের নিজেদের প্রাপ্ত ও দানের বই দিয়েই পাঠাগার বিভাগটি শুরু হল। এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে ঘুরে অবশেষে জমিদার শিবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরাধীকারিগণ পাঠাগারের জন্য বর্তমান স্থানের জমিটি দান করেন। স্থানীয় ধনাঢ্য বঙ্গ ও অ-বঙ্গবাসীদের অর্থানুকূল্যে প্রথম তলের শিলান্যাস করেন রায় বাহাদুর জলধর সেন (২৪শে নভেম্বর ১৯৩৮) এবং ১৯৪০ সালে উহার দ্বারোদ্ঘাটন করেন অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার। দশবছর পর ১৯৫০ সালে দ্বিতল গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী।[৮] একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া (দুবারই অসুস্থতার জন্য কথা রাখতে পারেনি) বাংলা দেশের প্রথম শ্রেণীর কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, সাংবাদিক ও ধ্রুপদী গায়ক গায়িকা কেউ আসতে বাকি ছিলেন না। প্রখ্যাত বাগ্মী ও 'হিতবাদী' পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের প্রদত্ত নিজস্ব এনসাইক্লোপিডিয়ার পূর্ণ সেটটি আজও পাঠাগারের অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে। এছাড়া শোভাবাজার মহারাজার রাধাকান্তদেব বাহাদুরের 'শব্দ কল্পদ্রুম',* বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গদর্শনের' পুরো খণ্ডগুলি ও দুর্গাদাস লাহিড়ীর 'পৃথিবীর ইতিহাস' উল্লেখ করার মত। ১৮৮৫-১৯০৫ পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিটি সম্মেলনের কার্যবিবরণীর সংকলনগুলি গবেষকদের এক অমূল্য আকর হিসাবে রক্ষিত আছে। জন অর্গালিভিং কোং লিমিটেডের শতবর্ষের প্রাচীন 'ইম্পিরিয়াল ডিস্ট্রিক্ট গেজেট'—এক অভিজাত সংগ্রহ। তবে বর্তমানে পাঠাগারটির কর্তৃপক্ষ সরকারী সাহায্য ও পৌরসভার অনুদান ছাড়াই জনসাধারণের সাহায্য নিয়ে স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের সাহায্যে চালিয়ে যাচ্ছেন। ফ্রি রিডিং রুমের ব্যবস্থা সুন্দর। বছরে বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা আছে। তবে অর্থাভাবের রুগ্নতা দর্শনেই ধরা পড়ে।

ডিউক লাইব্রেরী—উত্তরপাড়ার রাজা জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায় ছোট লাট স্যার উইলিয়াম ডিউক সাহেবের নামে এই পাঠাগারটি নিজের খরচে স্থাপন করেন হাওড়া চার্চ রোডে। উহার প্রতিষ্ঠাকাল ১৯১৫ সাল। পাঠাগারটির বড় সম্পদ ছিল—প্রচুর ইংরেজী দুষ্প্রাপ্য বই ও পত্রিকার সমাবেশ। ফ্রি রিডিং রুম আজও আছে।

* কিশোরী চাঁদ মিত্র তাঁর 'দ্বারকানাথ ঠাকুর' জীবনী গ্রন্থে লিখছেন—ইহা বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত হয়েছিল। এর কাজ শেষ হতে চল্লিশ বছরেরও বেশী লেগেছিল। ১৮৫৮ খ্রীঃ এর সর্বশেষ খণ্ড প্রকাশিত হয়। সংবাদ প্রভাকর লিখছে (২৭. ৪. ১২৬১)—শব্দ কল্পদ্রুমের কথা আমরা অধিক কি লিখিব—তাহার সুখ্যাতি শরৎকালের নির্মল কলানিধির ন্যায় সর্বত্র প্রকাশ আছে। এই বইটি প্রকাশ করে রাধাকান্ত ডেনমার্কের রাজার কাছ থেকে 'এক সম্মানসূচক স্বর্ণচক্র' পুরস্কার পেয়েছিলেন।

কিন্তু প্রশাসন ও প্রতিষ্ঠাতা বংশের উত্তরাধিকারীদের ক্ষমতা বিভাজনের দ্বন্দ্বে জর্জরিত পাঠাগারটিকে দেখলে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া কোন উপায় থাকে না। এটি বে-সরকারী প্রচেষ্টায় চলে—যদিও মাথায় আছেন সম্ভবতঃ জেলা শাসক।

সাঁত্রাগাছি পাবলিক লাইব্রেরী—এই পাঠাগারটি ১৯১৬ সালে 'বাণীনিকেতন' সংস্থার একটি শাখা হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ অঞ্চলের দানবীর মন্মথনাথ শেঠের জায়গার ওপর একটি কাঁচা বাড়িতে প্রথমে পাঠাগারটির কাজ চলে। তারপর 'ছায়াবাণী' সিনেমার (বর্তমানে শ্যামলী সিনেমা) দোতলায় দেড়খানা ঘরে সাঁত্রাগাছি পাবলিক লাইব্রেরী বাণীনিকেতন চলতো। বর্তমানে যে স্থানে পাঠাগারের নিজস্ব পাকা বাড়ী রয়েছে সেই জমিটি কেনা হয় ১৯২৮ সালে। বিখ্যাত নট শিশির কুমার ভাদুড়ী (জন্মস্থান সাঁত্রাগাছি) পাঠাগারটির গৃহ নির্মাণে সাহায্য করার জন্য কলকাতায় 'আলমগীর' নাটক অভিনয় করে অর্থ সাহায্য করেছিলেন (১৯২৯ সাল)। এই ভাবে দশজনের সহায়তায় ১৯৩২ সালে ১লা জানুয়ারী নবনির্মিত বাণীনিকেতন ভবনে বাণীনিকেতন ইনস্টিটিউটের শাখাস্বরূপ সাঁত্রাগাছি পাবলিক লাইব্রেরী ও বাণীনিকেতন স্পোর্টিং ক্লাব স্থাপিত হয়। এতদিন জনসাধারণের দানের ওপর নির্ভর করে চললেও ১৯৮১ সালে এটি রুরাল লাইব্রেরী হিসাবে এবং ১৯৮৬ সালে টাউন লাইব্রেরী হিসাবে সরকারী মান্যতা লাভ করে। পাঠাগারটির ফ্রি রিডিং রুম সহ কিশোর ও ছাত্রদের পাঠ্য পুস্তকের বিভাগও আছে। পুরাতন পত্র পত্রিকার সংগ্রহটি উল্লেখ করার মত।

মাধবস্মৃতি পাঠাগার—এই পাঠাগারটির দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার মত। জেলার অন্যান্য পাঠাগারের ক্ষেত্রে এর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে কিনা সন্দেহ। বৈশিষ্ট্য দুটি হচ্ছে একক ধনাঢ্য ব্যক্তির দানে এবং প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত একই স্থানে নিজস্ব পাকা বাড়ীতে অবস্থিত পাঠাগারটি চলে আসছে। এই পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠা হয় মাধবচন্দ্র ঘোষের বিদ্যোৎসাহী পুত্র ক্ষীরোদচন্দ্র ঘোষ ও পৌত্র শীতলচন্দ্র ঘোষের যুগ্ম উদ্যোগে। ইহার প্রতিষ্ঠাকাল হচ্ছে ১৯১৭ সালের ৩রা অক্টোবর। শালকিয়ার ওয়াটকিন্স্ লেনের নিজ বাসভবনের কাছে বা অন্যত্র না করে কেন রামসীতা মন্দিরের বিপরীত দিকে গঙ্গাতীরে পাঠাগারটি তৈরী হল তারও একটি চমকপ্রদ ইতিহাস আছে। সেটি অদ্যাবধি অজ্ঞাত বলেই এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। মাধব ঘোষের আদি নিবাস মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত কাগদাঁড়ি নামক গ্রামে। অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। পিতা ফকির চন্দ্রের মৃত্যুর পর ভাগ্যান্বেষণে বড়ভাই মধুসূদন আসেন শালিখার এক আত্মীয় বাড়িতে।

মধুসূদনের অকালমৃত্যু হলে মাধবচন্দ্র মাকে নিয়ে হাঁটাপথে শালিখায় এক আত্মীয় বাড়িতে ওঠেন। পথিমধ্যে অনেকস্থানেই মাধবচন্দ্র মাকে নিয়ে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। কিন্তু শালিখায় বিশ্রাম নিয়েছিলেন যে গাছতলায় সেই স্থানেই মাধবচন্দ্র ও পৌত্র শীতলচন্দ্র পরবর্তীকালে হাওড়া পৌরসভার অনুমতিক্রমে বিশ হাজার টাকা ব্যয়ে 'মাধব স্মৃতি পাঠাগারটি' স্থাপন করেন। বলা বাহুল্য, আজও

সেই নির্মিত বাড়িতেই পাঠাগারটি চলছে। ব্যতিক্রম কেবল দ্বিতলটি দেশ স্বাধীন হবার পরে সম্প্রসারিত হয়েছে। শালিখার এই পাঠাগারে অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ও ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের উপস্থিতি স্মরণ করার মত। ইংরেজী সাহিত্যের অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ পাঠাগারের গর্বের বস্তু। (যদিও আজ কেবলই দেখার বস্তু)। পাঠাগারটি একটি অছি পরিষদ কর্তৃক জনসাধারণের সাহায্যে চলছে। ফ্রি রিডিং রুমের ব্যবস্থা আছে—প্রতি বছর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা হয়। তবে উপযুক্ত আয় না থাকায় রুগ্নতার লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়।

ঝিকিরা কেদারনাথ পাবলিক লাইব্রেরী—ঝিকিরার রায় পরিবারের মত ভট্টাচার্য বংশও উল্লেখ করার মত। এই বংশের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন কেদারনাথ ভট্টাচার্য। গ্রামের শিক্ষা বিস্তার ও জনহিতকর কাজে তাঁর অবদান ভোলার নয়। গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাই শুধু নয় তৎসঙ্গে সন্নিহিত স্থানেই গড়ে তুললেন পাঠাগার। আজকের কেদারনাথ পাবলিক লাইব্রেরী তাঁরই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯১৯ সালে। গ্রামবাসী পরবর্তী সময়ে ঐ পাঠাগারটি তাঁরই নামে নামাঙ্কিত করে যোগ্য কাজই করেছেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সরকার এটিকে রুরাল লাইব্রেরীর আওতায় আনেন। সরকারী গ্রন্থাগারিক ও কর্মীও নিযুক্ত আছেন। পুস্তকের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার—ফ্রি রিডিং রুমেরও ব্যবস্থা আছে।

রাজগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী—উলুবেড়িয়ার বাণীপুর গ্রামে এই পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৯ সালে। দেশ স্বাধীন হবার কয়েক বছর পরও এটি গ্রামের জনসাধারণের সাহায্যেই পরিচালিত হয়ে আসছিল। ১৯৫৪ সালে রাজ্য সরকারের সোসাল এডুকেশন বিভাগ কর্তৃক রুরাল লাইব্রেরী হিসাবে মান্যতা প্রাপ্ত হয়। গ্রামের লোকের আর্থিক সাহায্যে ও সরকারী অনুদানে পাঠাগারের পাকা বাড়ী তৈরী হয় ১৯৬৪ সালে। ফ্রি রিডিং রুমের ব্যবস্থা ছাড়াও শিশুদের জন্য আলাদা বিভাগ আছে। বর্তমানে বইয়ের সংখ্যা দশ হাজারেরও বেশী।

বালি শিশু সমিতি পাঠাগার—বালি শিশু সমিতি আজ আর শিশু নেই। বাণপ্রস্থের বয়সও পেরিয়ে গেছে। মানুষের ক্ষেত্রে যা সাধারণ ভাবে প্রযোজ্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সেই জড়তা তাকে আড়ষ্ট করতে পারেনি। পরন্তু ৭৫ বছর পেরিয়ে যেন সমিতিটি যৌবন প্রাপ্তিতে ফুল ও ফলে ভরে উঠেছে। ১৯২২ সালে এই সমিতিটি বালকদের নিছক খেলাধুলার জন্য স্থাপিত হলেও প্রায় সমিতির প্রতিষ্ঠালাভের অনতিকাল পরেই বিজনবিহারী গোস্বামীর (মাষ্টারমশাই) বাড়িতেই পাঠাগারটি তৈরী হয়। সেই থেকে ক্লাবের বিভিন্ন শাখার মত পাঠাগারটিও চলতে শুরু করে সমান তালে। দেশ স্বাধীন হবার বছরে (১৯৪৭) সমিতির রজত জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। ১৯৫৪ সালে সমিতির নিজস্ব পাকা দ্বিতল গৃহ হল—যার একতলায় গ্রন্থাগারটি রয়েছে। ফ্রি রিডিং রুমের ব্যবস্থা আছে—আছে

শিশু বিভাগও। বইয়ের সংখ্যা ৮০৫২। সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকেই এটি ভালভাবে চলছে।

হাওড়া সংঘ পাঠাগার—সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে প্রগতিশীল বামপন্থী চিন্তাধারাকে ছড়িয়ে দেবার জন্য যে সব পাঠাগার জেলায় তৈরী হয়েছিল তার মধ্যে এই পাঠাগারটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। যদিও এই পাঠাগারটির আদিতে নাম ছিল 'সাধনা পাবলিক লাইব্রেরী'। এটি তৈরী হয় ১৯২৪ সালে। তারপর এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে আরও ৩/৪টি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মিলনের ফলে হাওড়া সংঘ গড়ে ওঠে। ঐ সংঘ প্রতিষ্ঠিত পাঠাগারটির নামই হচ্ছে হাওড়া সংঘ পাঠাগার। নানা স্থানে স্থানান্তরিত হবার পর ১৯৪৬ সালে নীলমণি মল্লিক লেনে নিজস্ব বাড়িতে আস্তানা নিল। এই পাঠাগারের সঙ্গে সেই যুগে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের হাওড়ার অনুগামীদের অনেকেই এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যেমন—প্রাক্তন উপাচার্য মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজন সরকার, সুহৃদ বিশ্বাস প্রমুখ। স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেক সভা, আলোচনা ও প্রদর্শনী এই পাঠাগারকে কেন্দ্র করে সে যুগে অনুষ্ঠিত হত। সরকারী আনুকুল্যে এখানে বেতনভুক গ্রন্থাগারিক ও কর্মচারী নিয়োজিত হলেও সেই জনসচেতনতা ও আদর্শবোধ আজ আর দেখা যায় না। এটিকে সরকারী ইউনিট লাইব্রেরী হিসাবে গণ্য করা হয়।

বীণাপাণি লাইব্রেরী—শ্যামপুরের রামনগর গ্রামের এই পাঠাগারটি সরকারী মান্যতা প্রাপ্ত একটি রুরাল লাইব্রেরী। সরকার নিযুক্ত একজন গ্রন্থাগারিক ও একজন কর্মী আছেন। পাঠাগারটি গ্রামের কয়েকজন কলেজী যুবকের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৮ সালে। কালক্রমে নিজস্ব জমিতে পাকা বাড়ি তৈরী হয়েছে। শিশু বিভাগ ও ফ্রি রিডিং রুমের ব্যবস্থা আছে। সদস্যের সংখ্যা দু'শ। পুস্তকের সংখ্যা ছ'হাজার। সুদূর গ্রামে সত্তর বছর ধরে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখা কম গৌরবের নয়।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র পাঠাগার—এই পাঠাগারটির ভার তেমন না থাকলেও নামের জন্যই উল্লেখ্য। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক ও কবি ভারতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামেই এই পাঠাগারটি। 'রায়গুণাকর' উপাধিতে তিনি ভূষিত হয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তিনি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র নামেই সুপ্রসিদ্ধ। কবির বংশধররাই প্রথমে এই পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৩১-এ। তবে সেটি ছিল পেঁড়ো-গড়ে। পরবর্তীকালে পাঠাগারটির উন্নতিতে গ্রামবাসীরাও উৎসাহিত হন। বাজারের পাশে নিজস্ব পাকা বাড়িতে পাঠাগারটি বর্তমানে স্থায়ীভাবে চলছে। ১৯৫৭ সালে সরকার কর্তৃক পাঠাগারটি গ্রামীণ পাঠাগার বলে স্বীকৃত হয়—সরকারী গ্রন্থাগারিক ও কর্মী নিযুক্ত আছেন। পাঠাগারের পুস্তক সংখ্যা ন'হাজারের মত। ফ্রি রিডিং রুমের ব্যবস্থা ছাড়াও শিশু ও মহিলা বিভাগ রয়েছে। বর্তমানে সদস্য সংখ্যা চারশতের মত। গ্রন্থাগারে প্রাচীন (রেয়ার) গ্রন্থের কোন

হদিস পাওয়া যাবে না—এমনকি কবির নিজস্ব লিখিত গ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণের সংখ্যাগুলি পর্যন্ত নেই—যেটা পাঠাগারটিকে বিশিষ্টতা দিতে পারতো।

হাওড়া এসেমব্লী পাঠাগার—প্রথমে এটি লিটল এসোসিয়েশন ক্লাব নামেই স্থাপিত হয়। এই ক্লাবের মধ্যমণি ছিলেন জিতেন্দ্রনাথ হাজরা (পটলদা)। অনেকে আবার পটলদার ক্লাব বলেই বলতো। পরে ১৯৩৩ সালে ঐ নাম পালটে হয় হাওড়া এসেমব্লী। ক্লাবের অন্য বিভাগের মত পাঠাগার বিভাগটি দ্রুত উন্নতি লাভ করে। তার প্রধান কারণ ছিল নীলমণি চট্টোপাধ্যায় নামে জনৈক পল্লীবাসী তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ কয়েকটি আলমারিসহ ক্লাবের পাঠাগারে দান করেন। পাঠাগারটি চলতো একদল স্বদেশীওয়ালাদের পরিচালনায়। তাই স্কুলের উঁচু ক্লাসের বা কলেজের ছাত্রদের হাতে তাঁরা ছেড়ে দিলেন পাঠাগারের ভার—যার মধ্যে প্রবীণ ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন। এককালে এখানে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার উইলিয়াম জোন্সের অনূদিত কবি কালিদাসের 'শকুন্তলা' গ্রন্থের লণ্ডন-সংস্করণ এক অমূল্য সম্পদ ছিল। আজ অবশ্য পাঠাগারের সেই ঐতিহ্য অনেকাংশেই ক্ষয়িত হয়েছে। হাওড়া এসেমব্লীর ব্যাণ্ড পার্টি স্বদেশী যুগে এক উল্লেখযোগ্য জিনিষ ছিল—স্বয়ং সুভাষচন্দ্র বসু পর্যন্ত কংগ্রেসের বহু অনুষ্ঠানে এদের আহ্বান জানাতেন। সরকারী সাহায্যের বাইরে থেকেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন পাঠাগার কর্তৃপক্ষ।

বিষ্ণুপদ স্মৃতি পাঠাগার—এই পাঠাগারটি গত কয়েক বছর হল বন্ধ হয়ে গেছে। তবে এটি উল্লেখ করা হচ্ছে একটি বিস্মৃত ইতিহাসকে নজির হিসাবে তুলে ধরতে। এই পাঠাগারটি প্রথমে শিশুদের পাঠাগার হিসাবেই তৈরী হয় ১৯৩৪ সালে শ্রীরাম ঢ্যাং রোডে 'শালকিয়া ক্লাবের' কাছে। পরে ছোট বড় সকলের জন্যই উহার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। সাধারণের ধারণা, পাঠকই বইয়ের কাছে যাবে। কিন্তু এই পাঠাগারের পরিচালকবর্গ ঠিক করলেন বই-ই পাঠকের কাছে যাবে। তাই ১৯৬০ সালে ১লা সেপ্টেম্বর ভ্রাম্যমান শাখার উদ্বোধন করলেন তদানীন্তন হাওড়া পৌর সভার চেয়ারম্যান নির্মল কুমার মুখার্জী। পরের দিন 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকা লিখছে—**First of its kind in West Bengal. It is meant for only ladies and invalid people.** এ ব্যাপারে পান্নালাল আটা, সতীন্দ্রনাথ বসু ও হেমন্তকুমার ভট্টাচার্যের শ্রম ও পরিকল্পনা স্মরণ করার মত।

নারিট নবকৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগার—১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাস। বার্ষিক পরীক্ষা শেষ। নারিট গ্রামের দুটি ছেলে শংকরলাল চক্রবর্তী ও শক্তিপদ ভট্টাচার্যের মাথায় পরিকল্পনা এলো যে গ্রামে একটি পাঠাগার গড়লে কেমন হয়। যদিও গ্রামে 'নারিট বয়েজ ইউনিয়ন লাইব্রেরী' ইতিপূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। কিন্তু ভাল কাজে—'অধিকন্তু ন দোষায়'। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথা বলে এঁর ওঁর উপহারের বই নিয়ে অমরনাথ ভট্টাচার্যের সহায়তায় 'ছোট বাড়ীর' (মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের

পরিবার) একটি ঘরে স্থাপিত হল 'নারিট ফরওয়ার্ড লাইব্রেরী'। দিনটি ছিল ১৯৪৪ সালের ১২ই জানুয়ারী—স্বামীজীর জন্মদিন। তারপর উদ্যোক্তাদের অনেক বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে যেতে হলেও পিছনের দিকে আর তাঁদের তাকাতে হয়নি। ১৩৫৭ সালে (ইং ১৯৫০) নারিট গ্রামের সুসন্তান ও সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্নেহধন্য শিশুসাহিত্যিক কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের নামে পাঠাগারটির নাম পরিবর্তন করে নারিটবাসীরা তাঁদের ঋণ শোধ করার প্রয়াস করলেন—যেমন করেছেন মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের নামে 'নারিট ন্যায়রত্ন ইনস্টিটিউশন' বলে একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে। এই পাঠাগারটি কেবল পুস্তকের ভাণ্ডারই হয়ে থাকেনি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, সমাজসেবা, দুঃস্থ শিশুদের বিনামূল্যে দুগ্ধ বিতরণ এমনকি গ্রামীণ স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়েও শিক্ষাদান কেন্দ্র হিসাবে পাঠাগারের কর্তৃপক্ষ কাজ করে গেছেন। ১৯৬৩ সালে পাঠাগারটি রুরাল লাইব্রেরীরূপে সরকারী স্বীকৃতি পায়। বর্তমানে নিজস্ব দ্বিতল বাড়ীতে পাঠাগারটি পরিচালিত হচ্ছে। পুস্তকের সংখ্যাও প্রায় সাত হাজারের মত—শিশু বিভাগসহ একসঙ্গে পঁয়ত্রিশ জন বসে পড়ার মত ব্যবস্থা আছে। সদস্য সংখ্যাও ৩৫০-এর মত। সরকার নিযুক্ত একজন লাইব্রেরীয়ান ও পিওন ছাড়া গ্রামের একদল যুবক পাঠাগারটিকে আগলে রেখেছেন স্বেচ্ছাসেবা দিয়ে।

বালিটিকুরি সাধারণ পাঠাগার—১৯৪৩-এ গ্রামের অধিবাসী শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে পল্লীর কতিপয় যুবক মিলে এই পাঠাগারটি চালাতে থাকেন। পরে গ্রামের অনাথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রদত্ত জমিতে ১৯৫৮ সালের ২রা নভেম্বর নতুন বাড়ীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়! সেই থেকে আর পেছনের দিকে তাকাতে হয়নি। বর্তমানে নিজস্ব বাড়িতেই পাঠাগারটি চলছে। বর্তমানে পুস্তক সংখ্যা ৪৭৫৬টি। এ ছাড়া আছে বহুদিনের নামী মাসিক পত্র-পত্রিকা। ১৯৭৬ সালে পাঠাগারটি সরকার কর্তৃক রুরাল লাইব্রেরী হিসাবে স্বীকৃতি পায়। ১৯৯৩ সালে মহাসমারোহে সপ্তাহব্যাপী সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। ফ্রি রিডিং রুম ছাড়া রয়েছে কিশোর বিভাগ। প্রতি মাসে 'অন্বেষা' নামে একটি হাতে লেখা সুন্দর দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সরকারের নিয়োজিত একজন গ্রন্থাগারিক ও একজন কর্মী ব্যতীত গ্রামের উৎসাহী সদস্যরাও পাঠাগারটি চালনার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকেন।*

গড় ভবানীপুর পাঠাগার—উদয়নারায়ণপুরের এই গ্রামীণ পাঠাগারটি স্থাপিত হয়েছিল ১৯৩৯ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। যুদ্ধ নিয়ে সারা পৃথিবীতে গণ্ডগোল বেঁধে গেছে। তারই মধ্যে গ্রামের জনকয়েক বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি গ্রামেতে শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহ দেবার জন্য পাঠাগারটি করলেন। আজ পাঠাগারটির নিজস্ব পাকা বাড়ি হয়েছে। সরকারী মান্যতা লাভ করেছে। বইয়ের সংখ্যাও প্রায় ন' হাজার। এ ছাড়া রয়েছে ফ্রি রিডিং রুম যেখানে প্রতিদিন ১০টি করে বাংলা ও

* তথ্যের উৎস স্মরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইংরেজী পত্রিকা রাখা হয় আর সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা ৯টি। একটি গ্রামের পাঠাগারের পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়। এই পাঠাগারটি চার কিলোমিটার পর্যন্ত গ্রামবাসীর বই পড়ার আগ্রহ মিটিয়ে চলেছে। পাঠাগারের সদস্য সংখ্যা ৪২৮ জন। সরকার কর্তৃক একজন গ্রন্থাগারিক ও একজন সহকারী কর্মী আছেন।*

হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (জেলা গ্রন্থাগার)—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রদত্ত দশ কাঠা খাস জমির উপরে ১৯৫৬ সালে ডালমিয়া পার্কের উত্তর পশ্চিম কোণে সরকারী উদ্যোগে এই পাঠাগার ভবনটির শিলান্যাস করেন তদানীন্তন ডি. পি. আই. ডঃ ধীরেন্দ্রমোহন সেন। এই দ্বিতল বাড়িটিতে ফ্রি রিডিং রুমে বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা নিয়মিত পাঠের সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে। পাঠকদের পুস্তক লেনদেনের ব্যবস্থার সঙ্গে এই পাঠাগারের একটি ভ্রাম্যমান পুস্তক সরবরাহের সুন্দর বাস-গাড়ীও ছিল। সেই গাড়িতে আধুনিক পদ্ধতিতে সেলভ তৈরী করে একসঙ্গে প্রায় আড়াই হাজার বই বহন করার ব্যবস্থা ছিল। ঐ গাড়িতে করে (১৯৫৫ সাল) গ্রামের বিভিন্ন গ্রামীণ লাইব্রেরীতে পাঠকদের জন্য পুস্তক সরবরাহ করা হত। বলা বাহুল্য, নিত্য নতুন বই রুরাল লাইব্রেরীগুলির পাঠকদের কাছে পর্যায়ক্রমে পৌঁছে দেওয়াই উহার উদ্দেশ্য ছিল। আবার নির্দিষ্ট সময়ান্তে উহা বদল করে নতুন পুস্তক দেওয়া হত। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় বর্তমানে সেই ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের বিলোপ ঘটেছে।

স্মরণ করা যেতে পারে যে নব্বুই-এর দশকের প্রথমার্দ্ধে অতিরিক্ত জেলাশাসক সি. আর. চতুর্বেদীর উৎসাহে হাওড়া হিন্দী ভাষা প্রসার সমিতির উদ্যোগে বে-সরকারীভাবে পাঠাগারের দ্বিতলের এক কোণে একটি হিন্দী পুস্তক বিভাগ চালু করা হয়। উক্ত সমিতি কয়েকশ হিন্দী পুস্তকও সেখানে দান করেন। স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের দিয়ে কয়েক বছর হিন্দী পাঠকদের মধ্যে পুস্তক লেনদেনও করা হল। কিন্তু বর্তমানে হিন্দী জানা লোকের অভাবে বিভাগটি অনাদৃত অবস্থায় পড়ে আছে —সরকারী অনুমোদন না থাকার জন্যই নাকি এই অবস্থা। একই ব্যাপার ঘটেছে উর্দু বই লেনদেন করার ব্যাপারেও। ব্যাপারটি ভেবে দেখার মত। জেলা কেন্দ্রীয় পাঠাগারের পুস্তক সংখ্যা খুবই আশাপ্রদ। পুস্তকের সংখ্যা ৫২৬৬২। কর্মীর সংখ্যা—৭ জন (যদিও দশজন থাকার কথা)। কিন্তু অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে (২য় খণ্ড) ৭ হাজার পুস্তক বলে উল্লেখ করেছেন (পৃষ্ঠা ১৩৩)। এই সংখ্যাটি খুবই বিভ্রান্তিকর। পরন্তু উইলিয়াম কেরীর—এ ডিকসেনারী অব বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ সহ বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দীর যে বিপুল অভিধানের সংগ্রহ এই পাঠাগারে রক্ষিত আছে তা জেলার অন্যত্র দেখা যায় না। কিশোর বিভাগের জন্য সুন্দর অবৈতনিক পাঠগৃহ থাকা সত্ত্বেও আজ সেখানে কিশোর পাঠক আসে না—সেটা কয়েক বছর আগেও ভর্তি থাকতো। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য পাঠ্যপুস্তকের বিভাগটিও বেশ সুগঠিত।

---

* তথ্যের উৎস শিক্ষক নিরাপদ জানা।

অতসব বলার পরেও যে বিষয়টি না বললে শিবহীন যজ্ঞের মতই মনে হবে সেটি হচ্ছে হাওড়া জেলা লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের আদি কথা। মনে রাখতে হবে হাওড়া জেলার শহর ও গ্রামীণ সকল পাঠাগারেরই 'পেরেন্ট বডি' হচ্ছে এটি। এই প্রতিষ্ঠানটি তৈরি হয়েছিল ১৯৫০ সালে ('৫২ সালে নয়)। সম্প্রতি 'A short Report on the activities of Howrah District Library Association from 1956-57 to 1962-63 নামে একটি ইংরেজিতে ছাপানো রিপোর্ট হস্তগত হয়েছে। তাতে সম্পাদক গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় ১২ই এপ্রিল ১৯৬৪ সালে রিপোর্টে লিখছেন—With the closing of March 1963, our association has stepped into the fourteenth year of its existence. সুতরাং এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। যদিও অমিয়কুমার ব্যানার্জী তাঁর হাওড়া জেলা গেজিটিয়ারে (৪৯৯ পৃষ্ঠায়) ১৯৫২ সাল লিখেছেন। অন্যরাও তাই থেকে নিয়েছেন। এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার মূল উদ্যোক্তা যিনি ছিলেন তাঁর নাম আজ কদাচিৎ শুনতে বা লেখায় উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন হাওড়া জেলা স্কুলের একজন নামকরা শিক্ষক ও স্বদেশী কর্মী গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়। তাঁরই অনলস পরিশ্রমে ও বিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের (কংগ্রেস নেতা) পরিকল্পনায় হাওড়া জেলা লাইব্রেরী এসোসিয়েশন বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে এবং সরকারী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়। একাজে যাঁরা তাঁর দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন—অভয়পদ সরকার (মাধব স্মৃতি পাঠাগার), রতনমণি চট্টোপাধ্যায় ও বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায় (বালী সাধারণ গ্রন্থাগার), বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় (গ্রন্থাগারিক সংস্কৃত কলেজ) মধ্য হাওড়া ও অমরনাথ মুখোপাধ্যায় (স্যাণ্ডোদা) প্রমুখ। আরও জানা যায় যে বর্তমান হাওড়া কেন্দ্রীয় পাঠাগারের গোলাকৃতি বাড়িটির আদি নক্সাটিও এঁকে দেন বালি গ্রন্থাগারের বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় স্বয়ং। কারণ তিনি নিজেই হাওড়া বার্ন কোম্পানীর একজন প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। বলাবাহুল্য, ঐ পরিকল্পনাটিই তদানীন্তন রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এই ভাবে হাওড়া জেলা লাইব্রেরী এসোসিয়েশন ও জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের যৌথ উদ্যোগে জেলার তদানীন্তন কর্মরত গ্রন্থাগারিকদের 'লাইব্রেরীয়ান সীপের' ট্রেনিং পর্যন্ত দেওয়া হত। এটা কিন্তু কম বড় কথা নয়। একমাত্র এই জেলাই এ ধরনের ব্যবস্থা করতে পেরেছিল। যে সমস্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ঐ ট্রেনিং দিতেন তাদের মধ্যে লাইব্রেরী বিজ্ঞানের অভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রমীল বসু ও সুবোধকুমার মুখার্জীও ছিলেন। জেলার মোট চারশ ছিয়াশী জনকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল। চলেছিল বার বছর। জেলার পাঠাগারগুলির বার্ষিক সম্মেলনেরও প্রথম ব্যবস্থা করেন ঐ গোষ্ঠবাবু ও তাঁর সহযোগিগণ। এরকম একটি সফল সম্মেলন (৪র্থ বার্ষিক) অনুষ্ঠিত হয়েছিল মাজু গ্রামে। ঐ সম্মেলনে পণ্ডিত প্রবর সুনীতি কুমার চট্টোপ্যাধ্যায় স্বয়ং উপস্থিত থেকে সম্বর্দ্ধনা গ্রহণ করেছিলেন—যার সুখস্মৃতি আজও প্রবীণ পাঠাগার কর্মীদের কাছে শুনতে পাওয়া যায়। সম্মেলনের উদ্বোধন

করেছিলেন জাতীয় পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক বি, এস, কেশবন। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ও ডঃ পরিমল রায়। হাওড়া জেলার পাঠাগার আন্দোলনের ইতিহাসের উপাদানগুলি যাতে বিস্মৃতির অন্তরালে চলে না যায় তার জন্যই এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

হাওড়ায় বইমেলা—শীতের কলকাতায় নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে বইমেলা একটি উল্লেখযোগ্য নূতন সংযোজন। কলকাতার দেখাদেখি এখন প্রতি জেলায়ই বইমেলা বছরে একবার অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। হাওড়াতেও বইমেলা শুরু হয় ১৯৮১ সালে 'হাওড়া ময়দানে'। উদ্যোক্তা ও পরিচালনায় ছিল 'হাওড়া একাডেমী'—যার সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক অম্বিকা কুণ্ডু। উদ্যোক্তারা এটিকে হাওড়ায় প্রথম বইমেলা বলে দাবি করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখা যেতে পারে যে হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরী এসোসিয়েসনের প্রধান কর্ণধার গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়ের ব্যবস্থাপনায় যে জেলায় প্রথম বইমেলা হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। পর পর দুবছর হয়েছিল—১৯৫৬ সালের ১৯—২৯মে হাওড়া গার্লস স্কুলে (বর্তমান যোগেশচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়) এবং ১৯৫৭-তে ১৯—২৯ শে জুন হাওড়া গার্লস কলেজে (বর্তমান বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য কলেজ)। প্রথম বছর কলেজ স্ট্রীটের ৩০টি এবং দ্বিতীয় বছরে ৩৮ টি পুস্তক প্রকাশক যোগ দিয়েছিলেন। বই বিক্রীর অঙ্ক ছিল যথাক্রমে ১৭,৯০০ টাকা ও ১৩,০০০ টাকা। রিপোর্টেও লেখা আছে—**The book exhibition for the two years of this period ('56—'63) was organised from 19 to 29th May at Howrah Girls School and from 19th to 29th June '57 at Howrah Girls' College.*** তবে এটা ঠিক আজ যে অর্থে ও আঙ্গিকে বইমেলা করা হয় সেই অর্থে হয়তো সেটা করা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু প্রয়াস ছিল অভিনন্দন যোগ্য। আবার কেউ কেউ ১৯৮১ সালের 'হাওড়া বইমেলা'-কে সরকারী বইমেলা বলে আখ্যা দিতে প্রয়াসী হয়েছেন—সেটাও সমীচীন নয়। যদিও 'হাওড়া একাডেমী' পরিচালিত বইমেলা তদানীন্তন জেলা প্রশাসনের দুই পদাধিকারী যথা জেলাশাসক আর. কে. প্রসন্নন ও জেলা পুলিশ সুপার মিঃ সুলতান সিং-এর অকৃপণ সহযোগিতা ও প্রভাব মেলা চালাতে ভীষণ ভাবে সাহায্য করেছিল। বলাবাহুল্য, বিপুল উৎসাহের সঙ্গে ঐ মেলা তিন বছর (১৯৮৩ পর্যন্ত) হাওড়া ময়দানে চলেছিল। কিন্তু ১৯৮৪ সালে সরকারী উদ্যোগে (হাওড়া বইমেলার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক ছিল না) বালি সাধারণ গ্রন্থাগারের শতবার্ষিকী উৎসবকে কেন্দ্র করে বালি এ্যাথেলেটিক ক্লাবের মাটিতে সাতদিন ব্যাপী অন্যান্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে বইমেলাও অনুষ্ঠিত হয়। তারপর কয়েক বছর সরকারী উদ্যোগে জেলায় বইমেলা বন্ধ থাকে। বলতে বাধা নেই যে হাওড়া ময়দানে বে-সরকারী উদ্যোগে সংগঠিত বই মেলাতে

* **A Short Report on the activities of Howrah District Library Association from 1956-57 to 1962-63.** বিনয়কৃষ্ণ চক্রবর্তীর সৌজন্যে।

হাওড়াবাসী বেশ অন্তরঙ্গতা অনুভব করতো। মেলাতে নানা প্রকারের অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা ছিল। ন্যাশানাল এটলাস এণ্ড থিমাটিক ম্যাপিং অরগানিজেশন থেকে শুরু করে বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলেজ স্ট্রীটের বড় বড় প্রকাশন সংস্থা এমনকি দিল্লী ইংরাজী প্রকাশনী সংস্থাও মেলায় যোগ দিত। সুন্দর ও রুচিসম্মত পুস্তকের মণ্ডপ সাজাবার জন্যও পুরস্কার দানের ব্যবস্থা ছিল। প্রতিদিন বিকেল বেলা হলেই হাওড়ার সান্ধ্য দৈনিক 'সান্ধ্য বিবরণ' মেলার দর্শকদের হাতে হাতে ঘুরতে দেখা যেত। তাতে গতদিনে কোন কোন সাহিত্যিক, কবি মঞ্চাভিনেতা ও চিত্র শিল্পী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এসেছিলেন তা জানা যেত, মেলা সম্বন্ধে তাঁদের অভিমত কি তাও লেখা থাকতো। এ সবেরই মূলে ছিলেন 'সান্ধ্য বিবরণ-এর' সম্পাদক শশধর রায়—যার নেপথ্যে ছিলেন কৃষ্ণা কুণ্ডুর সুতীক্ষ্ন দৃষ্টি। সে কথা এখন থাক। কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর ১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে আবার হাওড়া বইমেলা শুরু হয়—তবে সেটা হাওড়া ময়দানে নয়—হাওড়া ডালমিয়া পার্কে। বর্তমানে নাম হয়েছে—হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন স্টেডিয়াম মাঠ। হাওড়া বইমেলা যে কয়েক বছর বন্ধ ছিল তা মেলার কতিপয় অত্যুৎসাহী ব্যক্তি স্বীকার করতে চান না। অথচ বঙ্গীয় গ্রন্হাগার পরিষদের হাওড়া জেলা শাখার সভাপতি সুবিনয় ঘোষ 'হাওড়া বইমেলা'—১৯৯৫-৯৬ প্রবন্ধে লিখছেন—'দীর্ঘ আট বৎসর পর গত ১৯৯৫ সালে ১১-১৯শে ফেব্রুয়ারী হাওড়ায় আবার বইমেলার আসর জমে উঠেছিল। মনে অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে অল্প সময়ের প্রস্তুতিতে এই মেলা সংগঠিত করতে হয়েছিল। মেলা উদ্বোধন করেছিলেন মাননীয় মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। এবারে হাওড়া বইমেলার উদ্বোধন হবে ২৪শে ডিসেম্বর '৯৫। চলবে ২রা জানুয়ারী ১৯৯৬।[৯] নূতন করে যে বইমেলা হচ্ছে তা পুরোপুরি সরকারী পর্যায়েই উহা পরিচালিত হয়। মেলার শৃঙ্খলা, অনুষ্ঠান-সূচী ও বৈচিত্র্য কোন অংশেই কম নেই। তবে স্টলওয়ালারা তাদের বইগুলিকে সাজাবার দিকে একেবারেই নজর দেন না। মনে হয় জনসাধারণের উৎসাহেরও ঘাটতি আছে। আর নবম হাওড়া বইমেলা বলে যে '৯৮তে লেখা হয়েছে তারই বা ভিত্তি কি? তবে কি বুঝতে হবে ১৯৮১ সালের 'হাওড়া একাডেমি পরিচালিত' বইমেলাকে ভিত্তি করেই ঐ হিসাব করা হয়েছে! তাই যদি হয়—তবে কি সেটা শোভন হবে? কারণ নব পর্যায়ে মেলার উদ্যোক্তা হচ্ছেন—হাওড়া লোকাল লাইব্রেরী অথরিটি—যেটি একটি সরকারী সংস্থা।

১। বালি সাধারণ গ্রন্থাগার—সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা - ১৯৩৬।
২। শতাব্দী স্মরণী (১৯৮৩)—বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী।
৩। শতবর্ষ স্মরণিকা (১৯৮৮)—পল্লী ভারতী।
৪। হাওড়া শহরের ইতিবৃত্ত—অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫। শতবর্ষ পরিক্রমায় (১৯৯৫)—বেলুড় সাধারণ গ্রন্থাগার।
৬। ফ্রেণ্ডস ক্লাব লাইব্রেরী (জগাছা)—দ্বারোদ্ঘাটন সংকলন (১৯৯৪)।
৭। প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসব (১৯৭৭)—মাঁজু পাবলিক লাইব্রেরী।
৮। বিংশ বার্ষিক অধিবেশন ও সাহিত্য সম্মেলন (১৯৫২-৫৩) গোবর্দ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ।
৯। হাওড়া বইমেলা-'৯৫-৯৬—স্মারক গ্রন্থ।

হাওড়ায় নাটক ও যাত্রার একটা অনুকূল আবহাওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে ঐ বিষয়ে এই মাটির প্রাচীন ঐতিহ্য। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনান্তে দেখা যায় যে, বাংলা সাহিত্যের সার্থক কবিয়াল রাম বসু এই হাওড়া-রই শালিখার অধিবাসী ছিলেন। রাম বসুকে আধুনিক কবিগানের জনক বলে আখ্যা দেওয়া হয়।[১] রাম বসুর যুগেও বিশিষ্ট কবিয়ালদের মধ্যে ছিলেন ভবানী বেনে, ঠাকুরদাস সিংহ ও মোহন সরকার প্রমুখ কবিয়ালগণ। তথাপি তাঁরা রাম বসুকে দিয়ে উচ্চ- মানের কবিগান রচনা করিয়ে নেবার জন্য তাঁর দ্বারস্থ হতেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে একদল কবিয়ালদের বলা হ'ত দাঁড়াকবি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কবিগান গাইতো বলে তাঁদেরকে দাঁড়াকবি বলা হত এরকম একটা সাধারণ ধারণা ছিল। কিন্তু সেই ধারণাটি যে সর্বৈব ভ্রান্ত তার উল্লেখ করেছেন ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙ্গালী' গ্রন্থে। তাতে তিনি বলেছেন—"পাঁচালী যেমন পা-চালি থেকে হয়নি, দাঁড়াকবিও তেমনি 'দাঁড়ানো' থেকে আসেনি। 'পাঁচালী' শব্দটি এসেছে 'পঞ্চালিকা' শব্দ থেকে। পঞ্চালিকা মানে পুতুল।" আসলে রাম বসুর পূর্বে দু'দল কবিয়ালই প্রশ্ন ও উত্তর আগে থেকেই গড়াপেটা করে আসরে অবতীর্ণ হতেন। ফলে আসর প্রথম প্রথম উপভোগ্য হলেও পরে অনেকটা পানসে হয়ে যেত। এমনও দেখা গেছে যে, নতুন করে প্রশ্ন উত্তর তৈরীর জন্য আসরের সাময়িক বিরতি দিয়েও আবার আসর বসানো হত। প্রতিভাধর কবিয়াল রাম বসুই প্রথম যিনি আসরে দাঁড়িয়েই প্রতিপক্ষকে তাৎক্ষণিক প্রশ্নের জবাব দেবার পদ্ধতি চালু করেন। তা থেকেই দাঁড়াকবি কথা চালু হয়। গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাই বলেছেন—আসরে বসে প্রতিপক্ষের জবাব দেবার প্রথা প্রচলন করেন তিনিই (রাম বসু) প্রথম।[২] এটা তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল কারণ, তিনি একজন উঁচু স্তরের কবিয়াল ছিলেন বলে। সংবাদ প্রভাকর লিখছে—ইনি 'জন্ম কবি' ছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সের সময়ে কবিতা রচনা করিয়াছেন।[৩]

এই রাম বসুই শালিখায় ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পুরো নাম রামমোহন বসু (কেউ কেউ রামচন্দ্র বসুও বলেন)।[৪] সাধারণভাবে তিনি রাম বসু নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ।[৫] রাম বসুর পিতার নাম নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, রামবাবুর পিতা হচ্ছেন রামলোচন বসু। গোপালবাবুর মতে তাঁর নাম ছিল জয়নারায়ণ বসু। কিন্তু ব্রজসুন্দর সান্যাল কোথাও তাঁকে রবিলোচন আবার কোথাও তাঁকে রামলোচন বসু বলেও উল্লেখ করেছেন।[৬] যা হোক, রাম বসু যে শালিখায়ই জন্মেছিলেন তাতে কারও সন্দেহ নেই। রাম বসুর মায়ের নাম ছিল নিস্তারিণী।

রামবাবুর ছোট বয়স থেকেই কবিত্ব শক্তি প্রকাশ পায়। তাঁর পিতা তাঁকে ইংরেজী শিক্ষা দিয়ে আরও উন্নত করবার জন্য কলকাতার জোড়াসাঁকোতে ভগ্নীপতির বাড়িতে পাঠান। কিন্তু সংবাদ প্রভাকরের মতে—৺বারাণসী ঘোষের বাড়িতে তাহার পিসার নিকট থাকিয়া তিনি লেখাপড়া করিতেন।[৭] রামবাবু কিছু ইংরেজী শিখে প্রথম জীবনে চাকরি করতে ঢোকেন এক সওদাগরী অফিসে। তখনকার দিনে তিনিই ছিলেন একমাত্র কবিয়াল যিনি কিছু ইংরেজী জানতেন।[৮] রামবাবু পরে অবশ্য চাকরি ছেড়ে নিজেই একটি কবির দল গঠন করেছিলেন—নাম ছিল 'রাম বোসের দল।'

রাম বসুর চরিত্র সম্বন্ধে বেশ কানাঘুষা শোনা যায়। তাঁর নাকি একজন রক্ষিতা ছিলেন। তাঁর নাম ছিল যজ্ঞেশ্বরী। এই যজ্ঞেশ্বরী নিজেও একজন খ্যাতনাম্নী মহিলা কবিয়াল ছিলেন। কারো কারো মতে রামবাবুর কবিত্ব শক্তির উৎসই নাকি ছিলেন এই যজ্ঞেশ্বরী। ১৩১৩ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ সংখ্যায় 'নব্য ভারতে' লেখা হচ্ছে—'রাম বসুর চরিত্রটি নিতান্ত ধোয়া তুলসীপাতা ছিল না।' আবার অনাথ কৃষ্ণ দেব তাঁর 'বঙ্গের কবিতা' পুস্তকে লিখছেন—'যজ্ঞেশ্বরীকে রাম বসু অনুগৃহীতারূপে দেখতেন।' অবশ্য তখনকার দিনে এ ধরনের অবৈধ প্রেমকে মোটেই দোষের ব'লে দেখা হত না। ১৩১৩ সালের 'নব্য ভারত' পত্রিকা লিখছে—'প্রাচীন মহাশয়েরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন যুবকগণ বেশ্যালয়ে না যাইলে ভব্যতা শিখিতে পারে না।' এখানে যজ্ঞেশ্বরী সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। তখনকার দিনে তিনি ছিলেন একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহিলা কবিয়াল। তিনি নিজেও একটি কবির দল গড়েছিলেন। তিনি স্বয়ং আসরে বসে কবিতা রচনাতেও পটিয়সী ছিলেন। পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে তিনি আসরে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণা হয়ে শ্রোতাদের চমক লাগিয়ে দিতেন। তিনি যে জাত কবিয়াল ছিলেন তার প্রমাণ পাই প্রসিদ্ধ কবিয়াল ভোলা ময়রার সঙ্গেও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংবাদ থেকে।

একবার কলকাতার এক আসরে* উপস্থিত হয়ে যজ্ঞেশ্বরী দেখলেন যে, প্রসিদ্ধ কবিয়াল ভোলা ময়রা সেখানে উপস্থিত। ভোলা ময়রার খ্যাতির কথা যজ্ঞেশ্বরী আগেই জানতেন। তাই পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচবার জন্য যজ্ঞেশ্বরী তাঁকে 'ভোলানাথ আমার পুত্র এবং আমি ভোলানাথের মাতা' বলে গান বাঁধলেন। উদ্দেশ্য যে, ভোলানাথ হয়তো মাতাকে আর তেমন হেনস্তা করবেন না। কিন্তু ভোলানাথ মাতার পুত্র আখ্যা স্বীকার করেও এমনভাবে গালাগালি দিয়ে তার উত্তর দিয়েছিলেন যা পড়লে ভোলানাথের কবি-প্রতিভার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভোলানাথের উত্তরটি চমৎকার—

তুমি মাতা যজ্ঞেশ্বরী সর্ব কার্য্যে শুভংকরী
তোমার ঐ পুরানো এঁড়ে রাম বোস বাপ।

*কাশিমবাজারের রাজবাড়ি।

যেমন পিতা তেমনি মাতা ভোলানাথের অন্নদাতা
মা—বাপ ঠিক বাগিয়ে দিলে খাপ ॥
এখন মা! শুধাই তোরে কেন এসে এই আসরে
ঘন ঘন দিচ্ছ জোরে ডাক।
বুঝি তোমার হয়েছে কাল বেহায়ার নাই কালাকাল
তাই বাবুদের সভায় এত হাঁক ॥
তোমার পুত্র ভোলানাথ গুণধর সকল কাজেই অগ্রসর
তোমার মত মাতার দুঃখ দেখিতে না চাই।
পঞ্চপিতা, সপ্তমাতা শাস্ত্রে শুনতে পাই
তুমি আমার গাভীমাতা, চল তোমায় চরাতে যাই ॥*

উল্লেখ্য, রাম বসুর সঙ্গে যজ্ঞেশ্বরীর অবৈধ যোগাযোগের ঘটনা ভোলা ময়রা বলতে কসুর করেননি। বলা বাহুল্য, যজ্ঞেশ্বরীকে সেদিন বিনা শর্তে রণে ভঙ্গ দিতে হয়েছিল।

দাঁড়া কবিদের মধ্যে আরও একটি উল্লেখযোগ্য নাম হচ্ছে রঘুনাথ দাস। কেউ কেউ বলেন, তিনিই নাকি 'দাঁড়া কবি'র প্রবর্তক ছিলেন।[১০] ডঃ ভবতোষ দত্তও গোপালবাবুর মতকে সমর্থন করেন। ঈশ্বর গুপ্তের মতে রঘুনাথ ফরাসডাঙ্গায় বাস করতেন। রঘুনাথ এক সময়ে হাওড়ার শালিখায়ও বাস করতেন এটাও অনেকের মত। ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৪র্থ) বলেছেন—'কিন্তু অনেকে বলেন রঘুনাথ নানা স্থানে বাস করতেন—শালিখা, গুপ্তিপাড়া ও কলকাতায় তাঁর যাতায়াত ছিল।' ভবতোষ দত্তের মতে—অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বার্ধে এঁর জন্ম। রঘুর জন্মস্থান নিয়ে বিভিন্ন কিম্বদন্তী আছে। কেউ বলেন কলিকাতায়, কেউ বলেন শালিখায়, কেউ বলেন গুপ্তিপাড়ায়। হরু ঠাকুর-এর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। এই সব কাহিনীর অবতারণা করে এ কথা বলা যায় যে, বিংশ শতাব্দীতে হাওড়া যাত্রা, থিয়েটার ও সিনেমায় যে গৌরবের ইতিহাস সৃষ্টি করেছে সেটা হঠাৎ গড়ে ওঠা বা ধূমকেতুর মত আগমন নয়, এটা তাঁরা পেয়েছিলেন এই মাটিতে স্বাভাবিকভাবে সৃষ্ট প্রাচীন কয়েকজন সৃজনশীল পূর্বপুরুষ কবিয়াল, অভিনেতা ও নাট্যকারের সহজাত গুণের উত্তরাধিকারী হিসেবে। ঐ সমস্ত বিস্মৃতপ্রায় প্রতিভাধরদের জন্য হাওড়াবাসী স্বতঃই গর্বিত। কবিয়াল রাম বসু সম্বন্ধে কবি ঈশ্বরগুপ্ত যে ধরনের প্রশস্তি কীর্তন করেছেন তা যে কোন প্রতিভাবান ব্যক্তির পক্ষেই প্রার্থিত বস্তু স্বরূপ। গুপ্ত কবি বলেছেন—যেমন সংস্কৃত কবিতায় 'কালিদাস', বাঙ্গালা কবিতায় 'রামপ্রসাদ' ও ভারতচন্দ্র' সেইরূপ কবিয়ালদিগের কবিতায় 'রাম বসু'—যেমন ভৃঙ্গের মধ্যে পদ্মমধু, শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন, অপুত্রের পক্ষে পুত্র-সন্তান, সাধুর পক্ষে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ, দরিদ্রের পক্ষে ধনলাভ সেইরূপ ভাবুকের পক্ষে 'রাম বসুর গীত'।[১১]

বাংলার প্রাচীন যাত্রা জগতে এক বিখ্যাত নাম হচ্ছে পালাগানকারী গোবিন্দ

অধিকারী। তিনি একদিকে যেমন উঁচুদরের যাত্রাভিনেতা ছিলেন অন্যদিকে তিনি ছিলেন একাধিক পালা রচনায় সিদ্ধহস্ত। অধিকারী মশায়ের কৃষ্ণযাত্রার সুখ্যাতি সে যুগে আসরে আসরে কীর্তিত হত। এই অধিকারী মশায়ের জন্ম হুগলী জেলার খানাকুলে হলেও তাঁর জীবনের বেশী সময়ই কেটেছে এই হাওড়া জেলারই শালিখায়। এখানেই তিনি সগৌরবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।*

গোবিন্দ অধিকারী যে কত উঁচুমানের যাত্রা পালাকার ছিলেন তার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় বিপিন বিহারী গুপ্তের 'পুরাতন প্রসঙ্গ' গ্রন্থে। প্রবীণ নাট্যাচার্য** শ্রীযুক্ত রাধামাধব কর, বিপিন বাবুকে বলেন—'তখন কলিকাতায় যাত্রাগানের খুব ধুম। সর্বত্রই যাত্রার আসর ছিল। গোবিন্দ অধিকারীর দল, রাধাকৃষ্ণ বৈরাগীর দল, বদন অধিকারীর দল, মহেশ চক্রবর্তীর দল, বৌ-মাষ্টারের দল, ঝোড়োর দল, ব্রজ অধিকারীর দল, উমেশ মিত্রের দল (গোপাল উড়ের দল নামে প্রসিদ্ধ), মদন মাষ্টারের দল. লোকা ধোপার দল প্রভৃতি যাত্রার দল তখনকার বাঙালী সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। গোবিন্দ অধিকারী রাত্রিশেষে আসরে নামিতেন। তখন যাত্রা শুনিবার জন্য কর্তারা আসিয়া বসিতেন। তৎপূর্বে রাত্রি নয়টা হইতে তিনটা পর্যন্ত ছেলে ভুলাইবার জন্য অনেক রকম সঙের ব্যবস্থা ছিল। গোবিন্দ অধিকারীর পোষাক জরি বসান শালুর কাপড়ে প্রস্তুত ছিল। যাহারা স্ত্রীলোকের ভূমিকা লইত, তাহারা কলাপাতায় গহনা পরিত।… প্রত্যেক দলই নাচ গানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। গোবিন্দ অধিকারী বৃদ্ধ বয়সেও স্ত্রীলোকের পোষাক পরিয়া বিন্দে দূতী সাজিয়া আসরে নামিতেন, অথচ কিছুমাত্র বে-মানান বলিয়া মনে হইত না। অতি মধুর কীর্তনাঙ্গে তিনি সকলকে মোহিত করিয়া দিতেন।' বৈষ্ণব গোবিন্দবাবুর জন্ম-মৃত্যু নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মতান্তর আছে। 'বঙ্গভাষার লেখক' হরিমোহন মুখোপাধ্যায় বলেন—তাঁহার ভূমিষ্ঠ হইবার প্রকৃত সন তারিখ জানা নাই। তবে তিনি যে খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করেন সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। 'বাঙ্গালীর গানে' বলা হয়েছে—১৭৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দ অধিকারীর জন্ম এবং বাহাত্তর বৎসর বয়সে হাওড়ার শালিখা গ্রামে মৃত্যু হয়।[১২] গান রচনা ও সুললিতকণ্ঠের অধিকারী, বহু পালাগানের রচয়িতা ও দূতীর ভূমিকায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা ও যাত্রা-পরিচালক গোবিন্দ অধিকারীকে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত তাঁর 'বঙ্গদর্শনে' গোবিন্দকে পরমানন্দের দলের "ছোকরা অভিনেতা' বলে উল্লেখ করেছেন।[১৩] এই বিখ্যাত যাত্রা অধিনায়ক গোবিন্দ অধিকারী থাকতেন শালিখার বর্তমান কলডাঙ্গা লেনে। একই সঙ্গে যাত্রা, কীর্তন ও কথকতায় তিনি বহু অর্থ উপার্জন করেন এবং জমিদারী ক্রয়ে সক্ষম হন।

---

* স্মরণে রাখা ভাল যে কিশোর বয়স থেকে হাওড়া জেলার ধরখালি গ্রামের গোলক দাস অধিকারীর কাছে তিনি কীর্তন শেখেন।

** ভারত সঙ্গীত সমাজ হইতে একমাত্র শ্রীযুক্ত কর মহাশয়ই নাট্যাচার্য উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। দ্রঃ পুরাতন প্রসঙ্গ।

গোবিন্দ অধিকারীর জন্মের কাছাকাছি হাওড়া ব্যাঁটরা গ্রামে আর এক পাঁচালিকার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম ঠাকুরদাস দত্ত। 'আনুমানিক ১২০৮ সালে (১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে) ইনি হাওড়ার অন্তর্গত ব্যাঁটরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঠাকুরদাসের পিতা রামমোহন দত্ত ছিলেন প্রসিদ্ধ কবিওয়াল রাম বসুর বন্ধু স্থানীয়। রাম বসুর কবির দলে তিনিও যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু জীবিকা হিসেবে রামমোহন ফোর্ট উইলিয়ামে কাজ করাই বাঞ্ছনীয় ভাবিয়াছিলেন'।[১৪] 'ঠাকুরদাসের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণের জন্ম ১৮৪২ সালে। তিনি ছিলেন পিতার মতই সঙ্গীতকর্তা। ঠাকুরদাসের অপর পুত্র শ্যামাচরণ ছিলেন সুকবি'।[১৫] 'যুবক বয়সে ঠাকুরদাসের পিতৃবিয়োগ ঘটলে তিনি শখের যাত্রাদল করেন। প্রথমে বিদ্যাসুন্দরের অনুকরণে একটি পালাগান রচনা করেন। এই সময়ে তাঁর বয়স ছিল ২৯-৩০ বৎসর'।[১৬] তাঁর বিখ্যাত পালা ছিল 'নল-দময়ন্তী', 'কলঙ্ক ভঞ্জন' ও 'শ্রীমন্তের মশান'। সেই সময়ের বিখ্যাত যাত্রাগায়ক দুর্গাচরণ ঘড়িয়াল এই তিনটি পালাই বহুদিন গেয়েছিলেন। তখনকার দিনে ঠাকুরদাসের পালাগান জেলার বিভিন্ন অংশে অভিজাত বাড়িতে গাওয়া হত। এছাড়া তাঁর রচিত বিভিন্ন পালা কলকাতার টাকী জমিদার বাড়ি, শ্রীরামপুর-রিষড়ার কৈলাসচন্দ্র বারুই-এর বাড়ি ও বাগবাজার নিবাসী গোপীনাথ দাসের বাড়িতে শখের যাত্রাদলেরা অভিনয় করত। অবশেষে ঠাকুরদাস নিজেও একটি শখের পাঁচালীর দল করেন। পরে সেটি পেশাদার দল হয়। তাই নিরঞ্জন চক্রবর্তী তাঁর বইতে লিখেছেন—এই দলের জন্যই 'পাঁচালীওয়ালা ঠাকুরদাস' নামে তাঁহার কবিখ্যাতি দিগন্ত প্রসারিত হয়।' তবে একথাও স্বীকার করতে হবে যে রাম বসুই ছিলেন ঠাকুরদাসেরও পাঁচালীগানের প্রেরণাদাতা। ঠাকুরদাস-পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ নিজ পিতা সম্বন্ধে যে প্রশস্তি রচনা করেছিলেন তা থেকেই সেটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। 'ঊনবিংশ শতাব্দীর নবচেতনায় হাওড়ার ভূমিকা' পুস্তিকায় অচল ভট্টাচার্য লিখেছেন—'পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ পিতা ঠাকুরদাস সম্পর্কে লিখেছেন—

> বহু শিক্ষা লাভ কিংবা চাকুরী গ্রহণ।
> এ সকলে ঠাকুরের না উঠিল মন॥
> পিতৃসখা রাম বসু কবিত্বের যশে।
> পবিত্র করিল মন বাণীসুধা রসে॥
> কবিতা, পাঁচালী, যাত্রা, বাউল সঙ্গীত।
> এ সকল আলাপনে হয় হরষিত॥
> অসংখ্য পাঁচালী রচি কবিতা ও গান।
> দেশে প্রচারিয়া পান অজস্র সম্মান॥
> সুকবি সে দাশু রায়, সুধা কীর্তিমান।
> যাঁহার পাঁচালী কাব্য নব অবদান॥
> ঠাকুরদাসের কাব্য করি আস্বাদন।
> 'দাদা' বলি, 'কবি' বলি, করেন বন্দন।

উল্লেখ্য, লক্ষ্মীনারায়ণও একজন গীতিকার ছিলেন। তার নমুনা উপরের পিতৃ-প্রশস্তি থেকেই বোঝা যায়। ঠাকুরদাস ১২৮৩ সালের ২১শে বৈশাখ (১৮৭৬ ইং) তারিখে লোকান্তরিত হন।[১৭] ডঃ সুকুমার সেনের মতও তাই। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় সংস্করণে) শ্রী সেন লিখছেন—'অবশ্য কোন সাহিত্য-ইতিহাসকার কিভাবে ১২৮৮ সাল নির্দেশ করিয়াছেন তাহা বুঝিবার উপায় নাই।' পাঁচালী-গানে ঠাকুরদাসের জনপ্রিয়তার মূলে ছিল পাঁচালীগানের সঙ্গে উন্নততর মার্গ-সঙ্গীতের সংমিশ্রণ।

এবার যাত্রা ও থিয়েটারের কথায় আসা যাক। যাত্রা ও থিয়েটারে হাওড়া-বাসীদের একটি বিশেষ ট্র্যাডিশন আছে। আর সেই ট্র্যাডিশনের মূলে ছিলেন কবিয়ালশ্রেষ্ঠ রাম বসু, গোবিন্দ অধিকারী এবং ঠাকুরদাস দত্ত যা পূর্বেই বলা হয়েছে। তাঁরা যে কেবল জেলার গণ্ডীর মধ্যেই নিজেদের প্রতিভা প্রকাশে সীমায়িত ছিলেন তা নয়। নগরী শ্রেষ্ঠ কলকাতার বিভিন্ন স্থানেও তাঁরা নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

পাঁচালী থেকেই যে যাত্রার উদ্ভব হয়েছে এ অভিমত অধিকাংশ পণ্ডিতই পোষণ করেন। বিশিষ্ট ভাষাবিদ ডঃ সুকুমার সেনের মতে—'পাঁচালী হইতেই যাত্রার উদ্ভব।' অধ্যাপক বৈদ্যনাথ শীল তাঁর 'বাংলা নাটকের ধারায়' লিখেছেন—'কীর্তন ভাঙ্গিয়া ঢপকীর্তন' ও ঢপকীর্তন ভাঙ্গিয়া যাত্রার উৎপত্তি। বিশিষ্ট নাটক সমালোচক অধ্যাপক ডঃ অজিত কুমার ঘোষও তাঁর 'বাংলা নাটকের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন—'পাঁচালী হইতেই জনপ্রিয় যাত্রাগানের উদ্ভব হইল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নব্য পাঁচালীর জন্ম হইয়াছে। এই পাঁচালীর ধারা উদ্ভূত হইয়াছে কীর্তন গান হইতে।' **History of Bengali Literature in the 19th Century** গ্রন্থে এস. কি. দে-ও মন্তব্য করেছেন—**Jatra, a species of popular amusement which was closely allied to Kavi and Panchali.**

পেশাদারী যাত্রার ইতিহাস জানতে গেলে জেলার বিভিন্ন বনেদী অভিজাত পরিবারের উৎসবাদির খরচের জাবদা খাতা থেকে বেশ চমকপ্রদ নজির খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। ইতিহাস গবেষক তারাপদ সাঁতরা এরকম একটি নজির খুঁজে পেয়েছেন আমতার রসপুরের এক বনেদী পরিবারের হিসাবের খাতা থেকে। তাতে তিনি জানাচ্ছেন—১১৮০ বঙ্গাব্দের (১৭৭৪ খ্রীঃ) ৩০ শে পৌষ আমতা থানার রসপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত এক যাত্রাপালায় অধিকারী দয়ারাম সূত্রধরের যাত্রা-গান শুনে রায় বাড়ীর কর্তামশায়* তাঁকে 'শিরোপা' প্রদানে সম্মানিত করেছিলেন। পাঠক জেনে পুলকিত হবেন যে ঐ যাত্রাগানের জন্য আঠার টাকা তিন পয়সা খরচ হয়েছিল। আর রাত্রিকে দিনের মত আলোকিত করার জন্য রোশনাই তেল খরচ হয়েছিল আট টাকা। এরও প্রায় একশো বছর পর (অর্থাৎ ১২৬৯ বঙ্গাব্দ, ইং ১৮৬২ খ্রীঃ) বাগনানের এক ছোট জমিদার বাড়ির দুর্গোৎসবের খরচের হিসাব খাতায় পেশাদারী যাত্রাদলের

* রামকৃষ্ণ রায়, রসপুর।

যাত্রাভিনয়ের খরচের ফর্দ পাওয়া গেছে। ঐ ফর্দটি বাগনানের গ্রামীন মিউজিয়ামে 'আনন্দ নিকেতন'-এ সংরক্ষিত আছে। হিসাবের খাতার বয়ানটি বানানসমেত ছাপা হল :

শ্রীশ্রী৵ সারদীয় পূজার যাত্রাওলা বিদাই ফুরণ ও চুক্তি—

সন ১২৬৯ সাল তারিখ হিঃ ১২ আশ্বিন নাঃ ১৭ রোজ জাত্রাওলার অধিকারী শ্রীগঙ্গারাম দাষ, সাং মনোহরপুর ফুরণ ৬ রাত্র চুক্তি

কোং	২৪৲
ফির্রি ৫ রাত চুক্তি	২॥৹
অধিকারী বিদাই	৷৹
দুতির বিদাই	৷৹
বাএন দুই জোনার বিদাই	৷৹
বেএলাদার বিদাই	৷৹
ফির্রি নগদ দেওয়া যায়	৩।৹
নবমির রাত্র	
খোরাকী ৭ রোজ	৮৵
বালকগণকে দেওয়া যায়	৷৹
	৪০৵

এই দুটি তথ্যই প্রমাণ করে—হাওড়ার গ্রামাঞ্চলে পেশাদার যাত্রাগানের প্রচলন শহরের তুলনায় পেছিয়ে ছিল না।

যাত্রার দল তৈরীর কাজে হিন্দু অধিকারীর সংখ্যাই ছিল বেশী। কিন্তু হাওড়ার মাকড়দাতে বোকা ও তার ভাই সাধু—মুসলমান ধর্মাবলম্বী হয়েও সেই সময়ে তাঁরা দুজনে একটি পেশাদার যাত্রাদল খুলেছিলেন। তাঁদের যাত্রাদলের নাম ছিল 'বোকোর যাত্রাদল'। এদের দলেও হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী, বাঁটরার ঠাকুরদাস দত্তের লবকুশ, বিদ্যাসুন্দর ও হরিশচন্দ্র নাটক অভিনীত হতো।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উলুবেড়িয়ার ফুলেশ্বরে জনৈক আশুতোষ চক্রবর্তী একটি পেশাদার যাত্রার দল করেছিলেন। তাঁর লেখা 'চন্দ্রহাস' নামে একটি পালাও ছিল। সে সময়েই 'উলুবেড়িয়া গ্রেট বেঙ্গল অপেরা' নামে আরও একটি যাত্রাদল গঠিত হয়েছিল। সংগঠকের নাম ছিল রাজকুমার ন্যায়রত্ন।

এই শতকের প্রথমেই কল্যাণপুরের আর এক প্রসিদ্ধ নাট্যকার হরিপদ চট্টোপাধ্যায় 'গৌরাঙ্গ আদর্শ যাত্রা সংঘ' নামে কলকাতার চিৎপুরে একটি যাত্রাদল করেন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র পশুপতি চট্টোপাধ্যায় পিতৃস্মৃতি কিছুদিন বজায় রেখেছিলেন। হরিপদবাবুর 'জয়দেব' ও পশুপতিবাবুর 'লায়লামজনু' ছিল সফল সৃষ্টি।

'আর্য অপেরা' বাংলাদেশের যাত্রা জগতে একটি বিখ্যাত নাম। এই অপেরার প্রতিষ্ঠাতা কিন্তু ছিলেন হাওড়া বাগনানের চাকুর গ্রামের পরেশ রায়। শুধু তাই

নয় অভিনেতাদের মধ্যে প্রায় সবাই ছিলেন বাগনানের অধিবাসী। পরে তিনি ওটা ছেড়ে 'রায় অপেরা' নামে আর একটি অপেরা খোলেন।[১৯] রায় অপেরার উল্লেখযোগ্য পালা ছিল 'কালাপাহাড়'। পরেশবাবু 'আর্য অপেরা' ছেড়ে দিলে বাগনান—কল্যাণপুরের অতুলকৃষ্ণ বসু মল্লিক 'আর্য অপেরার' ভার নেন।...অতুলবাবু শুধু মালিকই ছিলেন না—তিনি নাটকও লিখতে পারতেন। আর্য অপেরার বিখ্যাত পালাগুলির মধ্যে ছিল 'চন্দ্রহাস, সাধু তুকারাম ও বীরপুজো'। শেষোক্ত নাটকটি সম্বন্ধে তারাপদ সাঁতরা 'সেকালের হাওড়া—যাত্রা, নাটক ও নাট্যকার' প্রবন্ধে লিখছেন—বাংলা নাটকের বিবর্তন সম্পর্কে গবেষণারত বাগনানের শ্রীমদনমোহন গরাই লিখেছেন—১৩৩৭ (ইং ১৯৩১) শশিভূষণ হাজরার দল উঠে যাওয়ায় ঐ দলের স্বত্ব ক্রয় করেন কল্যাণপুরের অতুলকৃষ্ণ বসু মল্লিক। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, 'সাধুতুকারাম' যাত্রাজগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদের লেখা। তিনি সাঁত্রাগাছির সন্তান ছিলেন।

সে যুগের অধিকাংশ পালাই ছিল পৌরাণিক কাহিনী বা দেবদেবীদের নিয়ে যাত্রাভিনয় বা নাটক। এর হয়তো দুটি উদ্দেশ্য ছিল—যেমন এদেশের মানুষের মনে ধর্মীয়ভাব জাগরণ করা—দেবদেবী ও অসুরদের লড়াইতে শুভ শক্তির জয় ও অশুভ শক্তির পরাজয় সুনিশ্চিত করা। এই শুভশক্তি বলতে বোঝাতো স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের আর অশুভ শক্তি বলতে ইঙ্গিত করা হত ইংরাজ শাসককে। ইংরেজ শাসকরাও পরে এটা ধরতে পেরেছিল। তাই সাম্রাজ্যবাদী গভর্ণর জেনারেল লর্ড লিটন ১৮৭৬ খ্রীঃ কুখ্যাত দেশীয় নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ করেন। যে আইনের বলে প্রথমেই 'নীলদর্পণ' নাটককে বে-আইনী ঘোষণা করা হল। ক্রমে ক্রমে আরও অন্যান্য নাটকের উপরও একই আইন জারি হল। ১৮৭৬ সালের আইনের ফাঁক ফোকর বন্ধ করার সুপারিশ করে তদানীন্তন কলকাতার পুলিশ কমিশনার বঙ্গদেশ সরকারকে ১৯১০ সালে ৩রা নভেম্বর এক চিঠি পাঠান। সেই চিঠির সূত্র ধরেই পুলিশ এগারখানি রাজদ্রোহীতামূলক নাটকের অভিনয় বন্ধের নির্দেশ দেন যেমন—(১) সিরাজদ্দৌল্লা (২) মীরকাশিম (৩) দাদা ও দিদি (৪) ছত্রপতি (গিরিশচন্দ্র) (৫) পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত (৬) কর্মফল (৭) নন্দকুমার (৮) শিবাজী (এম. এম. গোস্বামী) (৯) সমাজ (১০) সংসার (১১) প্রতাপাদিত্য।[২০]

হাওড়াবাসী জেনে গৌরববোধ করতে পারেন যে বঙ্গদেশের এই এগারোটি রাজদ্রোহী নিষিদ্ধ নাটকের মধ্যে হাওড়ার বালিগ্রামের এক বিখ্যাত নাট্যকারেরই একাধিক বই রয়েছে—ঐ নাট্যকারের নাম হচ্ছে বালি গোস্বামী পাড়ার মনোমোহন গোস্বামী। কর্মফল, শিবাজী, সমাজ এবং সংসার—৪টি বইই তাঁর লেখা। সমাজ ও সংসার কলকাতা শহরেই বেশীদিন অভিনীত হয়েছিল।

স্বদেশী যাত্রায় চারণ কবি মুকুন্দদাসের অবদানের কথা পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। ইংরেজের আইন যতই কড়া হচ্ছে গ্রামেগঞ্জে মানুষের মন ততই শক্ত হচ্ছে। ঐসব স্বদেশী যাত্রা অভিনয় করা বা দেখার দিকে মানুষের মনে আরও জেদ চেপে

যায়। এব্যাপারে তদানীন্তন বঙ্গসরকারের চীফ সেক্রেটারী মিঃ সি, জে, স্টিফেনসন মুর, আই, সি, এস, কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে ১৯১১ সালের ২৫শে জানুয়ারী তারিখের এক চিঠিতে নাট্যানুষ্ঠান আইনের ফলশ্রুতি সম্বন্ধে রিপোর্ট দিতে বলেন। তাতে পুলিশ কমিশনার জানান—মফঃস্বলে এইসব নাটক বিশেষ করে যাত্রাপালা ব্যাপক ভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতে কোন রকম আগাম পরীক্ষা করা বা পরবর্তী-কালে বাধা দেওয়া যাচ্ছে না। তিনি বার বার নদীয়ার কথা উল্লেখ করলেন। এখানে গ্রামে গ্রামে এইসব নাটকের অনুষ্ঠান যেভাবে যাচ্ছে তাতে সরকার খুবই উদ্বিগ্ন বলে তিনি মন্তব্য করলেন।[২১]

মুকুন্দদাসের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাগনানের সর্বজনশ্রদ্ধেয় স্বদেশী নেতা বাঙ্গালপুর নিবাসী বিভূতি ঘোষ মহাশয়ও স্বদেশী যাত্রার দল খুলেছিলেন। শুধু খোলাই নয়—স্বহস্তে দেশাত্মবোধক একাধিক নাটকও রচনা করেছেন।[২২]

আমতা থানার ঝিকিরা গ্রামটি খুবই বর্দ্ধিষ্ণু। নাট্যচর্চা ও ইংরাজী শিক্ষা লাভ প্রভৃতি বিষয়ে ঝিকিরার রায় পরিবারের (রায় চৌধুরী রায়) লোকেদের খুব উৎসাহ ছিল। বার মাসে তের পার্বণ জমিদার রায় বাড়িতে লেগেই ছিল। জমিদার বাড়ির আর এক জ্ঞাতি ভাই ছিল স্বনামধন্য কেরাণী বাড়ি। এই কেরাণী বাড়ির সুসন্তান প্রফুল্ল কুমার রায় ও সদানন্দ মুখার্জীর চেষ্টায় ১৯১৫ খ্রীঃ গঠিত হল 'ঝিকিরা বান্ধব সম্মিলনী'। প্রফুল্ল রায়ের নির্দেশিত নাটকগুলির মধ্যে কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ, জয়দেব, বঙ্গেবর্গী, দেবলাদেবী, যুদ্ধক্ষেত্র, প্রফুল্ল, প্রতাপাদিত্য, রাতকানা, চন্দ্রগুপ্ত, প্রাণের দেবী, পথের শেষ প্রভৃতি গ্রামের মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। গ্রামের মানুষের নিখাদ চিত্তবিনোদনের যে বাসনা প্রফুল্লবাবুর ছিল তা স্মরণ করেই হয়তো আজও ঝিকিরাবাসী ঐ নাট্য সম্মিলনীকে বাঁচিয়ে রেখেছেন অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে। প্রফুল্লকুমারের লিখিত দুটি নাটক হচ্ছে 'মধুরে মধুর' ও 'নবজীবন'। হাওড়া জেলায় 'ঝিকিরা বান্ধব সম্মিলনী'ই হয়তো একমাত্র প্রাচীন চালু নাট্যসংস্থা যা শতায়ুর দোর গোড়ায় পৌঁছোতে চলেছে।

গ্রামাঞ্চলে আর একজন বিখ্যাত নাট্যকার ছিলেন হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বাস ছিল বাগনান—কল্যাণপুর গ্রামে। তিনিও একাধিক নাটকের ও ধর্ম পুস্তকের লেখক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। সেকালের নাট্যাভিনয়ে 'জয়দেব' নাটকটি মঞ্চে যে কিরূপ খ্যাতিলাভ করেছিল তা নাটকের ইতিহাস পাঠক মাত্রই জানেন। শুধু তাই নয় 'জয়দেব'-কে চলচ্চিত্রের রূপালীপর্দায় রূপায়িত করে প্রসিদ্ধ প্রযোজক ম্যাডান কোম্পানী সাত লক্ষ টাকা সে যুগে লাভ করে। পরিচালক ছিলেন প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক হাওড়ারই বাসিন্দা জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। হরিপদবাবুর গুণপনার কথা এখানেই শেষ নয়। তিনি মুদ্রণ শিল্পের ইতিহাসেও হাওড়াকে উচ্চ স্থানে বসিয়ে গেছেন। ১৩০৮ বঙ্গাব্দে বিদ্যাসাগর মশায়ের প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানা কিনে নিয়ে তাতেই তিনি 'জয়দেব' ছাপেন। উপরন্তু তালপাতার পুঁথি ছাপিয়ে বাংলাদেশের মুদ্রণ জগতে ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন। কিছু দেরীতে হলেও

হাওড়া শহরে 'নদের নিমাই' যাত্রা সকলের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠে। বাংলাদেশে হাওড়া সমাজের 'নদের নিমাই'-এর যাত্রাগান সদাই প্রসংশিত। এটির জন্মকাল ১৯৩১ সাল ৬ই নভেম্বর। 'স্মৃতির অর্ঘ্য, গ্রন্থে শিবপুরের বসন্ত কুমার পাল লিখছেন— শিবপুরে অনেকগুলি ভাল শখের যাত্রাদল ছিল। এদের মধ্যে হাবড়া (হাওড়া) ও শিবপুরের অনেকগুলি ভদ্রলোক মিলে 'নদের নিমাই' যাত্রাভিনয় করতে আরম্ভ করেন। …নদের নিমাই-এর পরিকল্পনা করেন 'হাবড়া সমাজে'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিশ্বরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। বিশ্বরঞ্জনবাবুর পিতা ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায় এ ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তাঁরই বহির্বাটীতে (হারকার্ট লেন) আশ্রয় নেওয়া হল। নদের নিমাইয়ের গানে অপূর্ব সুরসংযোগ করেন বিশ্বরূপবাবু। নিতাইয়ের ভূমিকায় হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমাইয়ের ভূমিকায় শ্রীমান গোপালের অভিনয় প্রশংসার যোগ্য। এই যাত্রাভিনয়ের অর্থেই নদের নিমাই মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে মধ্য হাওড়ার বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জী লেনে। মন্দিরের মহাপ্রভুর মৃন্ময় মূর্তিটি গভীর ভাবের দ্যোতনা করবে ভক্তজনের মধ্যেই। আজও হাওড়া সমাজ 'নদের নিমাই' যাত্রাভিনয় চালিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এখানে বাংলার যাত্রাজগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম না করলে বাংলার যাত্রাজগতের অঙ্গহানি ঘটবে। তিনি হচ্ছেন ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ। যাত্রার আসরে তিনি আবালবৃদ্ধবণিতার কাছে 'বড় ফণী' নামেই সমধিক পরিচিত। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার হয়েও নেশার টানে যাত্রাদল খোলেন। আসল নাম ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়। ১৮৯৩ সালে জন্মেছিলেন হাওড়া জেলার সাঁত্রাগাছি গ্রামে।[২৩] শুধু অভিনয়েই নয়—ইতিহাস, পুরাণ, সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল বলেই ভাল ভাল নাটকও লিখে গেছেন। ভারত সরকারের সঙ্গীত-নাটক একাডেমি তাঁকে ১৯৬৮ সালে সরকারী সম্মানে পুরস্কৃত করেছিলেন। 'এই বিভাগে তিনিই প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন।'[২৪] ১৯৬৮ সালে নারকেলডাঙ্গায় 'বাঁশের কেল্লা' অভিনয় করতে করতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[২৫] 'বড় ফণী' যে হাওড়াবাসীকে যাত্রাজগতে কত বড় করে গেছেন তা আজ হাওড়াবাসী বুঝতে পারছে। স্বাধীনোত্তর যুগে সত্তরের দশকে আর এক যাত্রাভিনেতা খ্যাতিলাভ করে অবসর নিয়েছেন—তিনি হচ্ছেন হাওড়া শালিখার ভোলা পাল। শখের যাত্রা অভিনয়ে শিবপুর প্যারাডাইস ক্লাব ও সাঁত্রাগাছি নাট্যসমাজের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাঁত্রাগাছির নাট্যসমাজের 'জয়দেব' পালাটি সেকালে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল। পঞ্চাশ বছর ধরে ঐ ক্লাবটি জনসাধারণকে আমোদিত করে চলেছে। কবি নিমাই মান্নাও তাঁর 'লোকসংস্কৃতির অঙ্গনে জেলা হাওড়া' লিখছেন—কুমারিয়া, মান্দারিয়া, বালিপোতায় বিখ্যাত কৃষ্ণ যাত্রার দল ছিল। সামান্য খিচুড়ী আর সামান্য খরচ এই পেলেই সন্তুষ্ট ছিল তারা। অথচ কোথায় হারিয়ে গেলো সেই 'নওল কিশোর'-র দল। আশার কথা—'এঁদের মধ্যে শ্যামপুরের সানন্দাপুর (শশাটি) গ্রামের বিশ্বনাথ মাঝির রাধাকৃষ্ণ যাত্রা পার্টি ও খোলাবেড়িয়া গ্রামের শীতল অপেরার কৃষ্ণ যাত্রা এখনও তাঁদের প্রাধান্য বজায় রেখে চলেছেন।'[২৬]

পাঁচালী থেকে যাত্রার উদ্ভব হলেও পুরাতন যাত্রার সঙ্গে কিন্তু বাংলা নাটকের কোন নাড়ীর যোগ নেই। বরং নব্য নাটকের প্রভাবেই যাত্রার রূপান্তর ঘটেছিল। রসরাজ অমৃতলাল বসুর মতে—আমাদের দেশীয় যাত্রায় গানই প্রধান, এই জন্য যাত্রা 'শুনিতে' হয়; থিয়েটার অঙ্গভঙ্গী অর্থাৎ 'অ্যাকটিং' প্রধান, এইজন্য থিয়েটার 'দেখিতে' হয়।[২৭] হাওড়ায় কবে কোথায় প্রথম থিয়েটার চালু হল তা নিয়ে মতভেদ থাকাই স্বাভাবিক। তথাপি যে সব লিখিত তথ্য পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে শিবপুরেই প্রথম থিয়েটার চালু হয়। 'নগর হাওড়া' গ্রন্থের লেখক অলোক কুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন—'প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৮ সালে শিবপুরে বৌবাজারের এক শখের নাট্যগোষ্ঠীর নাটক অভিনীত হবার পরই এ নগরের মানুষ নাটক অভিনয়ে উৎসাহিত হয়। অপরপক্ষে 'পুরাতন প্রসঙ্গ'-এ বিপিন বিহারী গুপ্ত লিখেছেন—'১৮৬৫-৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় শখের থিয়েটারের খুব ধুম পড়িয়া গেল। শিবপুরে বাঁধা ষ্টেজে 'রামাভিষেক' নাটক অভিনীত হইল।'

আবার 'স্মৃতির অর্ঘ্য' গ্রন্থে বসন্ত কুমার পাল লিখেছেন—পিতার মুখে শুনিয়াছি ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠীভাগে কলকাতায় প্রথম 'পদ্মাবতী' নাটক অভিনয়ের পর তাঁহারা শিবপুরে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক অভিনয় করেন। মাইকেল নিজে আসিয়া তাহাদের উৎসাহিত করিতেন এবং তাহারা এ অভিনয়ে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।'

এখানে এমন একজন অভিনেতার নাম উল্লিখিত হচ্ছে যিনি অভিনয়ে প্রথমে নেমেই প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা হিসেবে সে-যুগে বঙ্গরঙ্গ মঞ্চে আদৃত হয়েছিলেন। তিনি হচ্ছেন নাট্যাচার্য্য রাধামাধব কর। তিনি হাওড়ায়ই জন্মেছিলেন। শ্রীকর ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ সালে বিপিন বিহারী গুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেন—১৮৫৩ সালের পৌষ মাসে সাঁত্রাগাছিতে আমি জন্মগ্রহণ করি। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কর আমার চেয়ে এক বছর পাঁচ মাসের বড়। আমার বয়স যখন পাঁচ বৎসর তখন আমার পিতৃদেব (স্বর্গীয় ডাক্তার দুর্গাদাস কর) বরিশাল হইতে ঢাকায় বদলি হইয়া গেলেন।' এই রাধামাধব কর উচ্চশিক্ষার পথ ত্যাগ করে অভিনয়ে মেতে উঠলেন। ১৮৭২ সাল। কলকাতার রাজেন্দ্র পালের বাড়িতে 'লীলাবতী' নাটক হচ্ছে। খোলা আকাশের নিচে দর্শকরা বসেছেন। দর্শকদের মধ্যে আছেন দীনবন্ধু মিত্র, মহেন্দ্রলাল সরকার, কানাইলাল দে, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার রাজকৃষ্ণ মিত্র প্রমুখ দর্শকগণ। অভিনয়ের সময় বৃষ্টি হল। 'সেই ভিজে চেয়ারের উপর বসিয়া ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখ ভদ্রলোকগণ অভিনয় দর্শন করিলেন।'[২৮] এই নাটকে রাধামাধববাবু—ক্ষীরোদ বাসিনী, ললিত—গিরিশ চন্দ্র ঘোষ ও ঝি-এর ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তাফী অভিনয় করেছিলেন। রাধামাধব-বাবু বিপিনবাবুকে বলেছিলেন—'এইখানে আপনাকে বলিয়া রাখি 'ঊষা' 'অনিরুদ্ধ'

* ইনি কার মাইকেল মেডিক্যাল কলেজে অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর নামেই বর্তমান আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ।

হইতে আরম্ভ করিয়া 'লীলাবতী' পর্যন্ত যতগুলি নাটক আমরা অভিনয় করিয়াছিলাম সমস্তগুলি স্ত্রীলোকের ভূমিকার শিক্ষকতা আমাকেই করিতে হইত। আমি কলিকাতা হইতে চলিয়া যাওয়ার পর 'লীলাবতী' অভিনয় বন্ধ হইয়া গেল। স্বর্গীয় গিরিশ চন্দ্র ঘোষ আমার নামের উল্লেখ করিয়া একস্থানে লিখিয়াছেন—'শ্রীযুক্ত রাধামাধব কর থিয়েটারের শিক্ষকতার দাবি রাখেন।'[২৯]

তারপরই শিবপুর, শালকিয়া ও ব্যাঁটরাতেও শখের থিয়েটার ক্লাব বেশ কয়েকটি গড়ে উঠল। সমাজ সেবায়ও তাঁরা এগিয়ে এলেন। সাহায্য-রজনী করে হাসপাতালের জন্যও টাকা তুলতে শুরু করলেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল শিবপুরে কবি মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' অভিনয়। নগর হাওড়ার লেখক অলোকবাবু লিখছেন —'শিবপুরের অম্বিকা পাল তাঁর প্রতিবেশী শ্যামাচরণ মুখার্জি, মহেন্দ্র মিত্র, চন্দ্রকান্ত সরকার ও অন্যান্যদের নিয়ে মধুসূদন দত্ত-এর 'কৃষ্ণকুমারী' মঞ্চস্থ করলে নাট্যকার স্বয়ং সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন। তিনি আরও লেখেন—শালকিয়া ক্লাবের প্রখ্যাত শিল্পী চারু গাঙ্গুলী, গিরিশ চ্যাটার্জি, হারু মাষ্টার প্রভৃতি অভিনয় করেন 'শাহজাহান' ও 'রাজা বাহাদুর'। **Full Moon Dramatic** ক্লাব 'জনা' ও 'রিজিয়া' নাটক প্রদর্শন করার পরই ইউনাইটেড ক্লাবের সদস্য নরেন হালদার, মহেন্দ্র চ্যাটার্জি—'চাঁদবিবি' ও 'রানী দুর্গাবতী' অভিনয় করেন।'

সে যুগে আর একজন বঙ্গবিখ্যাত অভিনেতার কথা এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি হচ্ছেন রসরাজ অমৃতলাল বসু। এই রসরাজ উত্তর কলকাতার কম্বুলিয়াটোলায় থাকলেও তাঁর শ্বশুরবাড়ি ছিল হাওড়ার শালিখার কামিনী স্কুল লেনে। অমৃতলালের বিবাহ হয়েছিল কৈশোরে। তিনি নিজেই স্মৃতি কথায় বলছেন—'এণ্টান্স পরীক্ষা দিবার পূর্বেই আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল।'[৩০] বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'অমৃতময় অমৃতলাল' প্রবন্ধে লিখেছেন—'অমৃতলালের বিবাহ হয় ১৮৬৮ সালে। সে সময় বাল্যবিবাহের জোর মহড়া চলিত, কাজেই অমৃতলালও তাহাতে বাদ পড়েন নাই। শালিখার বিখ্যাত ভূম্যধিকারী স্বর্গীয় জয়রাম ঘোষের* পৌত্রীকে তিনি বিবাহ করেন।'[৩১] অমৃতবাবুর শালিখায় শ্বশুরালয়ে থাকারও একটি ইতিহাস আছে। নাট্যজগতের লোকেদের জানা আছে যে টিকিট বিক্রী করে অভিনয় করার ব্যাপারে গিরিশ ঘোষের সঙ্গে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফীর মতবিরোধ হয়েছিল। ফল মনোমালিন্য ও দল ছাড়াছাড়ি। কিন্তু এই ধারণা ভুল। পুরাতন প্রসঙ্গ-তে অমৃতলাল বিপিনবাবুকে বলেন—'এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। গিরীশবাবু বলিয়াছিলেন, 'থিয়েটারের জন্য একখানা ভাল বাড়ি না করিয়া টিকিট বেচিবার ব্যবস্থা করিলে কিছুই হইবে না। আগে ভাল স্টেজ কর, তারপরে টিকিট বিক্রয় কর; নইলে লোকে টিকিট কিনিবে কেন?'

যা হোক উভয়ের মধ্যে যখন এই মনোমালিন্য চলছিল অমৃতলাল তখন কলকাতা ছেড়ে শালিখায় শ্বশুরবাড়ীতে এসে বাস করছিলেন। দু'রথীর মধ্যে এই দ্বন্দ্ব

* জয় নারায়ণ ঘোষ হবে—যাঁর নামে রাস্তাও আছে।

থেকে সরে গিয়ে মানসিক শান্তিলাভের জন্যই বোধ হয় এই সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন। অবশ্য এই দুয়ের দ্বন্দ্ব থেকে যে ইতিহাসের সৃষ্টি হয়েছিল তা বাংলা তথা বাঙ্গালীর শিক্ষা সংস্কৃতিতে এক অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে। তার ফলশ্রুতি হিসেবেই এদেশে প্রথম পাবলিক স্টেজের প্রতিষ্ঠা। নাট্যমঞ্চটির নাম 'ন্যাশানাল থিয়েটার'—প্রতিষ্ঠাকাল ৭ই ডিসেম্বর ১৮৭২ সাল—বাংলা ১২৭৯ সালের ২৩শে অগ্রহায়ণ, শনিবার। স্থান—জোড়াসাঁকো মধুসূদন সান্যালের ঘড়িওয়ালা বাড়ি। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক দিয়ে মঞ্চটি উদ্বোধন করা হল। এর প্রধান উদ্যোক্তা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী এবং অভিনয়ের মধ্যমণি 'সৈরিন্ধ্রী' মেয়ের ভূমিকায় রসরাজ অমৃতলাল বসু। বঙ্গরঙ্গমঞ্চে 'নীলদর্পণে'র এটি হল প্রথম অভিনয়।

এই প্রসঙ্গটি সবিস্তারে আলোচনা করা হল এজন্যই যে, অমৃতলাল তখন শালিখায় থাকতেন। এখান থেকেই গঙ্গা পেরিয়ে অভিনয় করতে কলকাতায় যেতেন। 'অমৃতময় অমৃতলাল' প্রবন্ধে বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাই লিখেছেন—'বিধাতা কল টিপিলেন। জানি না, কি সৌভাগ্যবলে অমৃতলাল বাহিরের বাস তুলিয়া দিয়া শালিখায় আসিয়া বাসা বাঁধিলেন।'[৩১]

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শালিখায় এক প্রসিদ্ধ নাট্যকারের জন্ম হয় ছিল। তাঁর নাম আজ স্মৃতির অন্তরালেই প্রায় চলে গেছে। তিনি হচ্ছেন হরিশচন্দ্র মিত্র। জন্ম ১৮৩৮-৩৯ সাল। সাংবাদিকতা ও বহু সাহিত্য পত্রিকা নিজ হাতে সম্পাদনা করে নিজ স্বীকৃতির স্বাক্ষর রেখে গেছেন। একদা তাঁর নাটকগুলি দর্শক মনে বিশেষ রেখাপাত করেছিল। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক ছিল—হাস্যরস তরঙ্গিণী, যাও ধরবে কে?, ঘর থাকতে বাবুই ভেজে, কীচক বধ কাব্য, নির্বাসিতা সীতা, বিধবা বঙ্গাঙ্গনা ও হতভাগ্য শিক্ষক ইত্যাদি।[৩২]

এবার বিংশ শতাব্দীর বঙ্গরঙ্গমঞ্চের আর এক প্রতিভাবান অভিনেতা ও থিয়েটার পরিচালকের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক—তিনি হচ্ছেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী। তাঁর অভিনয়ের মুন্সিয়ানা সম্বন্ধে এখানে আলোচনার সুযোগ না থাকাই ভাল। কিন্তু শিশিরবাবু ছিলেন এই জেলারই সন্তান। তাঁর পৈতৃক বাস ও জন্মস্থান হচ্ছে হাওড়ার সাঁত্রাগাছিতে। কিন্তু সেই বসতবাটি ত্যাগ করে শিশির বাবুর পিতা হরিদাস ভাদুড়ি কলকাতায় চলে যান। শিশিরকুমার ভাদুড়ির ভাইপো নিরাকিশোর ভাদুড়ি 'দেশ' পত্রিকায় (৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯) সংখ্যায় লিখেছেন—'শিশির কুমারের পিতা হরিদাস ভাদুড়ি হাওড়ার এক সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশের সন্তান ছিলেন। জ্ঞাতিদের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে হরিদাস হাওড়ার বসতবাটি পরিত্যাগ করে কলকাতায় এসে বসবাস করতে থাকেন।' সাঁত্রাগাছির গ্রামের জ্ঞাতিরা শিশিরবাবুর পরিবারের উপর বিরক্তিকর আচরণ করে থাকলেও জেলারই অপর একটি অংশ শালকিয়ার অধিবাসীরা কিন্তু শিশিরকুমারের অর্থ সংকটের দিনে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই ইতিহাসের উল্লেখ শিশির ভাদুড়ির জন্ম শতাব্দীতে পত্র-পত্রিকায় লেখা বিবিধ প্রবন্ধাদিতে কোথাও দৃষ্টিগোচর হয়নি। তাই শিশির-

বাবুর ঐতিহাসিক জীবনের পূর্ণ ইতিহাস তৈরীর কাজে আরও সঠিক তথ্য সরবরাহের তাগিদেই কিছু ঘটনার কথা লেখা হচ্ছে।

১৯৩১ সালের ১২ই জানুয়ারী নিউ ইয়র্ক শহরের 'ভ্যান্ডার বিল্ট' থিয়েটারে 'সীতা' অভিনয় প্রথম শুরু হয়।[৩৪] সেখানে ছমাস তিনি নাটক অভিনয় করেছিলেন।

তবে তাতে লক্ষ্মীর বেসাতি হয়নি। পরন্তু তাঁকে দল নিয়ে অর্থ সংকটেই পড়তে হয়েছিল। একথা অভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এমনকি আমেরিকা প্রবাসী শিশির-বান্ধব সত্য সেনও তাঁদের লেখায় প্রকাশ করেছেন। এই অর্থ সংকট কাটাবার জন্যই শিশিরবাবুকে ভারতে এসে প্রথমেই দিল্লীতে বড়লাট লর্ড আরউইনের উপস্থিতিতে 'সীতা' অভিনয় করতে হল। বলা বাহুল্য, লাটসাহেব অভিনয়ে অত্যন্ত প্রীত হলেন। এখানে বলে রাখা দরকার আমেরিকায় 'সীতা' অভিনয় দেখে New York-এর The Sun নামে বিখ্যাত পত্রিকা সমালোচনা লেখে—বিদেশী সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে মস্কো আর্ট থিয়েটারের নিচেই ভারতীয় দলের স্থান।[৩৫]

কিন্তু বাংলাদেশে পা দিয়ে শিশিরকুমার প্রথম 'সীতা' অভিনয় করলেন হাওড়ায় —শালকিয়ার 'নাট্যপীঠ' সিনেমায় (অধুনা পিকাডিলি সিনেমা)—কলকাতার কোন রঙ্গমঞ্চে নয়। শিশিরকুমারের আর্থিক সংকট মোচনের জন্য তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু বাবুডাঙ্গার মুখার্জী পরিবারের হরিগোপাল মুখার্জী তার ব্যবস্থা করেছিলেন। আর এ ব্যাপারে প্রাথমিক সমস্ত ব্যয়-ভার বহন করেছিলেন বিষ্ণুচরণ আটা (আটা কাউন্টারীজের মালিক)। শিশির কুমার ও হরিগোপাল ছিলেন হরিহর আত্মা। শিশিরবাবু হরিগোপালকে 'গোপাল' বলেই ডাকতেন। শোনা যায়, বন্ধুর দেনা শোধ করার জন্যই নাকি শালকিয়ায় 'সীতা' অভিনয়ের স্থান ঠিক করেন শিশিরবাবু। আসল কথা হচ্ছে বিপদগ্রস্ত বন্ধুকে সাহায্য করার জন্যই হয়তো হরিগোপাল বাবু স্বেচ্ছায় এই অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন।* নাট্যপীঠে শিশিরবাবুর 'সীতা' ছাড়া 'ষোড়শী' 'পল্লীসমাজ' একাদিক্রমে পঁচিশদিন ধরে অভিনীত হয়েছিল। তারও পরে 'আলমগীর' 'রিজিয়া' ও 'শেষরক্ষা' প্রভৃতি নাটকও অভিনীত হয়। শেষজীবনে শিশিরকুমার অবশ্য নিজেই 'আলমগীর' নাটক অভিনয় করেছিলেন সাঁত্রাগাছি বাণী নিকেতন গ্রন্থাগারের সাহায্যার্থে। হয়তো কৃতজ্ঞতা স্বরূপ পাঠাগারের মঞ্চটির নাম রাখা হয় 'শিশির মঞ্চ'।

হরিগোপাল বাবুর বন্ধুত্বের সূত্রে বাবুডাঙ্গা অঞ্চলে একদল শখের অভিনেতা শিশিরবাবুর হাতে গড়ে উঠেছিলেন—তাঁদের মধ্যে নৃপেশ রায় ও তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই নৃপেশ রায় কলকাতার শ্রীরঙ্গমে শিশির-বাবুর দলে অভিনয় করতেন। তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা হিসেবে তখন

---

* এই তথ্যটি আমাকে জানিয়েছিলেন নির্বাক যুগের বিখ্যাত অভিনেতা শালকিয়ার অধিবাসী ও হরিগোপাল বাবুর প্রতিবেশী ৺কান্তিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরিচিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে শিশিরবাবু মর্মাহত হয়ে বলেন—আমার অতি প্রিয় 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নাটকটির অভিনয় নৃপেশের মৃত্যুতে একদম বন্ধ হয়ে গেল। অতবড় অভিনেতা বাংলাদেশে খুব কমই জন্মেছে।'[৩৬] শিবপুরে 'অলকা সিনেমা' স্থাপন করেন হরিগোপালবাবু এবং তার উদ্বোধন করান তিনি বন্ধু শিশিরবাবুকে দিয়ে। যে চেয়ারে বসে শিশিরবাবু সেদিন উদ্বোধন করেছিলেন আজও সেটি সযত্নে রেখেছেন সিনেমা কর্তৃপক্ষ। 'অলকা' নামটি শিশিরবাবুরই দেওয়া।

কলকাতার সঙ্গে তাল রেখে প্রতি শনি ও রবিবার নিয়মিত নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল শালিখার ভৈরব দত্ত লেন ও মুন্সী জেল্লার লেনের সংযোগস্থলে। সময়কাল ছিল বর্তমান শতকের তিরিশের দশক। নাটকগুলি ছিল—'জনা', 'আলিবাবা', 'জয়দেব', 'রিজিয়া', 'প্রফুল্ল' ইত্যাদি। এই নাটকগুলি বিনা পয়সায়ই শুধু দর্শকরা দেখতেন না—অভিনয়ান্তে নিখরচায় ভরপেট আহারেরও ব্যবস্থা ছিল। মঞ্চ পরিচালক ও ধনাঢ্য ব্যক্তি যোগীন্দ্রনাথ মুখার্জী এর সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতেন।[৩৭] অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন জ্ঞান মুখার্জী, অনুকূল মুখার্জী, জ্ঞানেন্দ্র-নাথ বসু, দেবেন্দ্রনাথ বসু, কুঞ্জবিহারী চ্যাটার্জী (মিনার্ভায় অভিনয় করতেন) ও কয়েল বাগানের গণেশ শর্মা (অধিকারী*) প্রমুখের নাম আজও প্রবীণদের সুখ-স্মৃতিতে অটুট রয়েছে।

শালকিয়া চৌরাস্তায় 'মদন' সিনেমা (আজ নেই) নামে একটি হল ছিল। সেখানে নিয়মিত ইংরেজী সিনেমা দেখানো হত। মাঝে মাঝেই এই মঞ্চে প্রসিদ্ধ অভিনেতা দুর্গাদাস ব্যানার্জী অভিনয় করতেন। দুর্গাদাসবাবু এক সময়ে বেশ কয়েকবছর শালিখায় গিনি মসজিদের পেছনে তাঁর শ্বশুর আনন্দ মুখার্জীর বাড়িতে কাটিয়ে গেছেন। কলকাতার সঙ্গে হাওড়াবাসীকেও তিনি তাঁর সু-অভিনয়ে বহুদিন আনন্দদান করে গেছেন।

শালকিয়ার 'বান্ধব সমিতি' শখের থিয়েটার হিসাবে অতীতে এটির বিশেষ নাম ছিল। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী উচ্চশিক্ষিত লোকেরা থিয়েটারে ও যাত্রায় তখন বিশেষ যোগ দিতেন না। কিন্তু এই থিয়েটার দলটিতে যোগ দিলেন হাওড়া পৌর-সভার ভাইস চেয়ারম্যান খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, ডক্টর অবনী দত্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র খগেন্দ্রনাথ দাস, শৈলকুমার মুখার্জী (প্রাঃ মন্ত্রী), হাওড়া কোর্টের বিশিষ্ট ব্যবহারজীবিগণ যেমন—জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, জিতেন্দ্রনাথ বসু। এছাড়া রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। আর এঁদের নাট্যশিক্ষক ছিলেন স্বয়ং প্রকাশ মুস্তাফী। গোলাবাড়ী থানার কাছে ক্যালিডোনিয়ন ডকের মাঠে প্রকাশবাবুর পরিচালনায় 'দুর্গাদাস' নাটকের সুখস্মৃতি আজও প্রবীণদের স্মৃতিতে ভেসে উঠে। এই ক্লাবটি ভেঙ্গেই ১৯২৮ সালে হাওড়া নর্থ ক্লাবের সৃষ্টি। উত্তর হাওড়ার এমন কোন অভিজাত ও শিক্ষিত ঘরের লোক

* শিশিরবাবুর দলে পরে অভিনয় করেন।

ছিলেন না যিনি সে সময় এ ক্লাবের সঙ্গে জড়িত না ছিলেন। আজও ক্লাবটি নিজ অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। হাওড়ার আর এক বিশিষ্ট নাট্যকার ছিলেন তারকনাথ মুখোপাধ্যায়। বহুদিন শালিখায় বাস করেছেন।* তাঁর কয়েকটি নাটক স্বাধীনোত্তর বাংলায় খুবই জনপ্রিয় ছিল, যেমন 'যুগাবতার', 'মীরাবাঈ', 'পারের আলো' প্রভৃতি। এই 'যুগাবতার' নাটকটির আদিতে নাম ছিল 'শ্রীরামকৃষ্ণ'। ১৯৪৮ সাল। দক্ষিণ কলকাতার 'কালিকা' থিয়েটার (এখন সিনেমা) নামে একটি থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হল। তারক মুখোপাধ্যায়ের 'শ্রীরামকৃষ্ণ' নাটকটি দিয়েই মঞ্চটি উদ্বোধন করবেন বলে স্বত্বাধিকারী রাম চৌধুরী মনস্থ করেন। কিন্তু একদল 'শ্রীরামকৃষ্ণ' ভক্ত ঠাকুরকে নিয়ে এ-ধরনের পেশাদারী অভিনেতাদের দিয়ে বিভিন্ন পূত চরিত্রের অভিনয় করার বিরুদ্ধে আপত্তি তুললেন। থিয়েটারের দরজায় পুলিশ পর্যন্ত মোতায়েন করা হল। কিন্তু রাম চৌধুরীও জেদ ধরলেন যে তিনি ঐ নাটকই মঞ্চস্থ করবেন। 'যে বই **censor** থেকে **pass** হয়েছে তা বন্ধ করবার চেষ্টা করলে আইনের আশ্রয় নেব'।[৩৮] পরে সমঝোতা হল নাটকটি রূপক হবে। আর নাম হবে শ্রীরামকৃষ্ণ-এর বদলে 'যুগাবতার'। শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকায় নির্মলেন্দু লাহিড়ী ও নীতিশ মুখোপাধ্যায় এসব দেখে অভিনয় করতে অসম্মত হন। অবশেষে খুঁজে পেতে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনোনীত করা হল। আর রাসমণির (নারায়ণী) ভূমিকায় অভিনয়ে প্রথম মলিনাদেবী নারাজ হলেও অবশেষে রাজী হন। উল্লেখ্য, সে যুগে এই নাটকটি পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে পাঁচ শত রজনী চলে কলকাতায় এক নজির সৃষ্টি করেছিল। এই নাটকে অভিনয় করে মলিনা দেবীর মনের কি পরিবর্তন হয়েছিল তা তিনি নিজের মুখেই বলেছেন—'সত্যই যারা এই বইতে অভিনয় করে তারা প্রত্যেকেই শান্তিতে আছে এবং খুবই আত্মতৃপ্তি অনুভব করে অভিনয় করে, অন্ততঃ আমি শিল্পী হিসেবে এইটুকু তাদের মনের কথা বলতে পারি'**। এই গৌরব কেবল তারকবাবুর একার নয়—এটা হাওড়াবাসীরও পরম আনন্দ। এ ছাড়া চল্লিশ থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত উচ্চাঙ্গের নাটক মঞ্চস্থ করে 'ক্ষণিকা' 'সান্ধ্যসম্মিলনী' 'শীলনী' প্রভৃতি নাট্যসংস্থাগুলি উত্তর হাওড়ার লোকেদের মনোরঞ্জন করে গেছে। হাওড়ার শালিখা অঞ্চলের জীবন গোস্বামী নামে একজন অভিনেতা দীর্ঘদিন ধরে শিশির বাবুর দলে অভিনয় করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত অভিনয় ছিল 'কাভালোর' ভূমিকায়। প্রসিদ্ধ নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য পরিচালিত 'দ্বিধা' নাটকটি নিয়মিত এক বছরের মত অভিনীত হয়েছিল শালিখার 'শীশ মহল' নাট্যমঞ্চে যা বর্তমানে 'রাখী' সিনেমা হয়েছে। এতে কলকাতার নামী শিল্পীরাই অভিনয় করতেন যেমন তৃপ্তি মিত্র ও তরুণ কুমার প্রমুখ।

ব্যাঁটরা অঞ্চলেও নাটকের খুব প্রচলন ছিল। শুধু বাংলা নাটক অভিনয়েই নয় ইংরাজী নাটক অভিনয়েও এই অঞ্চলের অভিনেতারা পারদর্শী ছিলেন। ১৮৭৩

---

* এক সময় তিনি পঞ্চানন্দতলার ঝাউতলায়ও থাকতেন।

** এই ঘটনাটির পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে লেখকের 'শালিখার ইতিবৃত্ত' থেকে।

খ্রীষ্টাব্দে ব্যাঁটরার একটি নাটুকে দল শোভাবাজারের বেনেটোলার কার্তিক চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাড়িতে 'মার্চেণ্ট অফ ভিনিস' অভিনয় করে নাকি প্রচুর প্রশংসা লাভ করেছিল।[৩৯] ইংরাজীতে নাটক করে সেকালে হাওড়ার অভিনেতাদের এই খ্যাতি নিশ্চয়ই হেলাফেলা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ব্যাঁটরা পারিজাত সমাজ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে প্রতিষ্ঠিত হলেও বহুদিন যাবৎ এই সংস্থা ভাল ভাল নাটক অভিনয়ে সুনাম অর্জন করেছিল। ব্যাঁটরার কালীপ্রসন্ন পাইন, রাজকুমার দেউটি ও ব্যোমকেশ অধিকারী প্রমুখ নাট্যামোদীরা-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। পরবর্তী সময়ে 'দক্ষিণ ব্যাঁটরা সান্ধ্য সম্মিলনী' নামে আর একটি সংস্থাও নাট্যাভিনয়ে বেশ সাড়া ফেলেছিল।

বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রথমার্দ্ধে (১৯২১-২২) 'কমলা থিয়েটার' নামে একটি পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ গড়ে ওঠে। এটির প্রকৃত স্থান নির্ণয়ে অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের বর্তমান সম্পাদক প্রবীণ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছেন—শিবপুর (হবে হাওড়া) জুট মিলের পশ্চিমে কুণ্ডুর বাগান অঞ্চলেই কমলা থিয়েটার ছিল। হাওড়া পৌর সভার প্রবীণ কাউন্সিলার বিনয় রায়েরও মত তাই। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে আরও লিখেছেন—'এই হাওড়ার প্রথম পাবলিক থিয়েটার নাটকাভিনয় শুরু হয়—এতে স্ত্রীভূমিকা স্ত্রীলোকেই অভিনয় করত। বালিকা কাননবালা এই রঙ্গমঞ্চে প্রথম অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এর-স্বত্বাধিকারী ছিলেন বনোয়ারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে এটিও বেশীদিন চলেনি।...শালিখার নাট্যপীঠের (১৯৩১) প্রায় দশ বছর আগে কমলা থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।' এখানে নাট্যপীঠের প্রতিষ্ঠা বছরটি ঠিক নেই। ঐ নাট্যমঞ্চটি ১৯৩০-এর ২৭শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক জলধর সেন, রায়বাহাদুর। তদানীন্তন নামী পত্রিকা 'বঙ্গবাণী' লিখছে—গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শালিখা নাট্যপীঠের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। নাট্যপীঠ শালিখার সর্বপ্রথম পাকা রঙ্গালয়।... এই নবগৃহের বাহির ও ভিতরের সৌন্দর্য কলিকাতার চৌরঙ্গী অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ প্রেক্ষাগারগুলি অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে।

এ থেকেই নাট্যপীঠের সঠিক জন্ম তারিখ পাওয়া গেল আর পাওয়া গেল হলের পারিপাট্যের খবর। এটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শালিখার বিখ্যাত আটা পরিবারের সন্তান বিষ্ণুপদ আটা।

হাওড়ার আর এক প্রসিদ্ধ নাট্যকার ব্রজেন দের কথা আমাদের অনেকেরই জানা আছে। শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে নাটক লেখার কাজে তিনি ছিলেন কৃতবিদ্য। বহু সামাজিক ও ধর্মীয় নাটক লিখে তিনি বঙ্গ রঙ্গমঞ্চকে উপহার দিয়েছেন। নাটকের ক্লাইম্যাক্স সৃষ্টিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সংলাপ রচনায় ভাষার মুন্সীয়ানা তাঁকে যাত্রা ও নাটকের মঞ্চে স্মরণীয় করে রেখেছে। বাগনানের কাছে বাইনান

---

* হাওড়া শহরের ইতিবৃত্তের লেখক।

স্কুলের তিনি প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৯৭৫ সালে তিনি রাজ্য সরকার কর্তৃক পুরস্কৃতও হন। তাঁর পালাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল স্বর্ণলঙ্কা, সোনাই দীঘি, দোষী কে ?, বর্গী এলো দেশে, নটী বিনোদিনী, মৃত্যুঞ্জয়, সূর্য সেন, নিষিদ্ধ ফল, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি।

হাওড়া শহরের উত্তরাঞ্চল বালি গ্রামে যাত্রার প্রচলন ঠিক কবে শুরু হয়েছিল তা সঠিক করে বলা যায় না। তবে সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে ১৮৮৫-৯০ সালের মধ্যে রিভারর্স টমসন স্কুলের (অধুনা বালি শান্তিরাম) সংস্কৃত শিক্ষক নিবারণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্কৃত 'শকুন্তলা' গ্রন্থটিকে নাটকের উপযোগী করে যাত্রার আঙ্গিকে মঞ্চস্থ করেন। অভিনয়ে আধুনিকতা ও রামলাল দাস দত্তের সার্থক ধ্রুপদী সুর সংযোজনায় বালি গ্রামের দর্শকদের মন জয় করে নেয়। এই যাত্রাভিনয়টি এতই হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল যে রক্ষণশীল সমাজপন্থীরা পর্যন্ত এদের সমর্থক হয়ে ওঠেন। যাত্রাভিনয়টি অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'সখা নাট্য সমাজে'র উদ্যোগে। বালি আর্যধর্ম সংরক্ষণী সভার অর্ধশতাব্দী উপলক্ষে ক্ষুদ্র একটি পুস্তিকায় ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানতে পারা যায়—'১৩০১ সালে (বঙ্গাব্দ) বালি সখা নাট্য সমাজ 'শকুন্তলা' অভিনয় করিতেছিলেন। সেই অভিনয়ে আকৃষ্ট হয়ে অনেকে সংরক্ষণী সভা ত্যাগ করেন'।[৪০] এরপর আদি সখা সঙ্গীত সমিতির সদস্যরাও 'শকুন্তলা' পালা অভিনয় করে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ১৯২৫-২৬ পর্যন্ত এদের বিজয় রথ চলেছিল। বালিতে যাত্রা ও নাটক প্রায় একই সময়ে পাশাপাশি চলতে থাকে। তাই কখনও মঞ্চে কখনও যাত্রার আসরে ১৯০৭—১২ সালের মধ্যে চৈতন্যলীলা, বিল্বমঙ্গল, বৃত্রাসুর, ভীষ্ম, দানব দলন প্রভৃতি পালা ও নাটক খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠে। বালির 'গেইটি ক্লাব' দীর্ঘদিন ধরে ভাল ভাল নাটক অভিনয় করে জনমনে দাগ কেটে গেছে। ১৯০৫-৭ সাল থেকে তিরিশের দশকের অর্দ্ধেক পর্যন্ত এদের অভিনীত জনপ্রিয় নাটকগুলি ছিল নীলদর্পণ, প্রফুল্ল, সাজাহান, হরিশচন্দ্র প্রভৃতি। বালির নর্থ ক্লাবেরও নাট্যাভিনয় দেখার মত ছিল।

বালির নাটক অভিনেতাদের মধ্যে আবার উঁচুদরের কয়েকজন নাট্যকারও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে স্থায়ী আসন লাভ করে আছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন নলিনচন্দ্র মিশ্র, মনোমোহন গোস্বামী ও তারা কুমার মুখোপাধ্যায়। মনোমোহন গোস্বামীর সংসার, সমাজ, সাধনা, শিবাজী, কর্মফল, মুরলা প্রভৃতি নাটক কলকাতার রঙ্গমঞ্চেই বেশী অভিনীত ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এর মধ্যে আবার একাধিক নাটকই ইংরেজ সরকারের রোষে পড়ে নিষিদ্ধ নাটক বলে ঘোষিত হয়েছিল। যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। নাটক রচনা ও অভিনয় নৈপুণ্য এই যুগ্ম প্রতিভা নিয়ে তিনি কলকাতার নাটক পরিচালক ও অভিনেতা অমর দত্তের সান্নিধ্যে এসে নাট্যজগতে যশস্বী হয়ে ওঠেন। তাঁর নাটকের প্রধান উপজীব্য বিষয়ই ছিল দেশের মুক্তি সাধন, জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটানো ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই।

১৯২০ সালে গোস্বামী মহাশয় পরলোকগমন করেন। নলিন মিশ্রও সঙ্গীতে ও সাহিত্য চর্চায় পারদর্শী ছিলেন। সখের যাত্রা ও থিয়েটারে বালি গ্রামে তাঁর সুনাম ছিল। তাঁর 'অশোক' নামে একখানি ঐতিহাসিক নাটকও মুদ্রিত হয়েছিল।[৪১]

বালির নাট্য সমিতিগুলির মধ্যে 'সবুজ সংঘের' নাম বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। এই সংঘের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হত শ্রীপঞ্চমী বা সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে। তাই বালির লোকেরা এই উৎসবকে 'সারস্বত উৎসব' বলেই বলে থাকে। এই উৎসবের স্বাতন্ত্র্যও ছিল বলার মত। সবুজ সংঘের সদস্যরা প্রতি বছরই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নূতন নূতন নাটক অভিনয় করতেন। বলা বাহুল্য, তখনকার দিনে রবীন্দ্র-নাটকের অভিনয় শান্তিনিকেতন ও ঠাকুর বাড়ীর নিজস্ব পরিমণ্ডলেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাধ্যরণ শহরে ও গ্রামাঞ্চলে উহা কদাচিৎ অভিনীত হত। অন্য নাটক যদিও বা সম্ভব ছিল 'রক্ত করবীর' মত নাটক যা কবি স্বয়ং তখনও অভিনয় করেননি বালি গ্রামের সবুজ সংঘের সভ্যরা তাও অভিনয় করলেন। ঐ 'রক্তকরবীকে স্বয়ং নাট্টাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ী পর্যন্ত 'শক্ত করবী' বলে সে সময় অভিনয় করতে নারাজ হন।*

১৯২৬ সালে সবুজ সংঘের সভ্যরা 'রক্তকরবী' প্রথম অভিনয় করলেন। অভিনয়ের মান যে কিরূপ হয়েছিল তা কলকাতার তদানীন্তন ইংরেজী দৈনিক Forward পত্রিকার (২২. ১. ১৯২৬) সমালোচনা থেকেই বুঝতে পারা যায়। পত্রিকাটি লিখছে—The whole play was a grand success. The aotors seemed to be thoroughly involved with the underlying spirit of the book. The songs sung by Srijut Promode Behari Goswami were a great treat. All credit is due to sj. Santosh kumar Banerjee and Rai Sahib Dharmadas Mukherjee who organised the play... শুধু কি অভিনয়? মঞ্চসজ্জাতেও যে মুন্সিয়ানার পরিচয় ছিল তাও পত্রিকাটি উল্লেখ করতে ভোলেনি। পত্রিকাটি আরও লিখছে—The stage was beautifully decorated with fresh foliage and green leaves ard the only background was a net work painted in imitation of one by Srijut Gaganendra Nath Tagore.[৪২]

এখানে মনে রাখতে হবে যে ১৯২৬ সালে 'রক্তকরবী' পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তার নাট্যরূপ দিয়ে বালি গ্রামের সবুজ সংঘের সদস্যরা বঙ্গরঙ্গমঞ্চে এক ঐতিহাসিক নজির সৃষ্টি করে গেছেন। তাই সেই কীর্তিমানদের নাম যথাসাধ্য ছেপে দেওয়া হল ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই। পরিচালক—সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায় (সতুদা)। অন্যান্যদের মধ্যে রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, নলিনীরঞ্জন গোস্বামী, সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমোদবিহারী গোস্বামী, ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়,

* ১৯৫৪, ১০ই মে শম্ভু মিত্র পরিচালিত বহুরূপীর প্রযোজনায় প্রথম অভিনীত হয়

জ্যোৎস্নাকুমার ব্যানার্জী, রবীন্দ্রনাথ মল্লিক প্রমুখ। অন্যান্য অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে ছিল ডাকঘর, ফাল্গুনী, ঋণশোধ, মুক্তধারা, তপতী, গুরু প্রভৃতি। এই সংঘের আয়ুষ্কাল ছিল ১৯১৮ থেকে ৩০ সাল পর্যন্ত। বালি ঘোষ পাড়ার শরৎচন্দ্র নিয়োগীর উদ্যোগে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর যাত্রাভিনয়ের সুখ্যাতি উল্লেখ করতেই হয়। ১৯২০ সাল টানা ষোল বছর এই নাটক দিয়েই তাঁরা উত্তরপাড়া রাজবাটী চন্দননগর ও চণ্ডীতলা প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেদের মন জয় করেন।

বালি গ্রামে যাত্রা ও নাটকের ইতিহাসে 'শিশু সমিতি'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখ না করলে অধ্যায়টি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ১৯২২ সাল থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত এরা যাত্রা ও নাটক নিয়মিত অভিনয় করে গেছে। শুধু বঙ্গদেশেই নয় বঙ্গের বাইরেও এরা যাত্রাভিনয়ে প্রচুর সুনাম ও প্রশংসাপত্র লাভ করেছে। তবে একথা ঠিক এদের অধিকাংশ সুখ্যাতি অর্জিত হয়েছে যাত্রাভিনয়ে। নামটি 'শিশুসমিতি' থাকলেও এখন কিন্তু সেই শিশুরা বাণপ্রস্থে যাবার বয়সেই এসে পৌঁছেছে। তবে এই সংস্থা মূলত নাট্যচর্চার জন্য তৈরী হলেও কালে কর্মকর্তারা খেলাধুলা, ব্যায়ামচর্চা এমনকি গ্রন্থাগারও তৈরী করেছেন। ষাটের দশকে এঁদের শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা নাটকই তাঁদের বিজয় পতাকা উড্ডীন করে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পালা অভিনয় ছিল ত্রৈলঙ্গস্বামী, রামপ্রসাদ, রানী রাসমণি, ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি। অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে কর্ণার্জুন, দুর্গাদাস, সীতা, ক্ষত্রবীর, উল্কা, জনা, মন্ত্রশক্তি, আনন্দমঠ প্রভৃতি নাটকও তাদের সুনাম বর্দ্ধিত করে।* বালির প্রবীণরা এখনও প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে বিজনবিহারী গোস্বামী, ফুলকুমার মুখোপাধ্যায়, তারাপদ গোস্বামী ও অবনীনাথ গোস্বামী প্রমুখের গুণপনা নিয়ে আলোচনা করতে ক্লান্তিবোধ করেন না। অবনীনাথের লেখা একাধিক গীতিআলেখ্যের মধ্যে 'শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯৩১-৩২ সাল থেকে শচীন্দ্রপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের (শচে কানাই প্রচেষ্টায় বালি 'সান্ধ্য সম্মিলনীর' নাট্যপ্রয়াসও উল্লেখ্য। কলকাতার পেশাদারী নামী ও দামী অভিনেতাদের দিয়ে বালিতে নাটক করানোর কৃতিত্ব তিনি প্রথম দেখিয়েছিলেন। এঁরই প্রচেষ্টায় ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, ধীরাজ ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, বিপিন গুপ্ত, সরযূবালা, রানীবালা প্রমুখের অবিস্মরণীয় অভিনয় দেখতে বালিবাসী একদা সক্ষম হয়েছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পরে বালির একজন নামী অভিনেতার নাম অবশ্যই করা দরকার—তিনি হচ্ছেন তারাপদ সাউ। তিনি শুধু নিজেই নন, তাঁর পরিবারের পুত্র, কন্যা, নাতি-নাতনি সকলকেই অভিনয়ে নামিয়ে প্রশংসা পেয়েছিলেন। বালি ইনস্টিটিউট আয়োজিত সারা বাংলা সঙ্গীত ও যন্ত্র সঙ্গীত প্রতিযোগিতা বিশেষ মাত্রা এনে দিয়েছিল।

বালি কেবল ভাল অভিনেতারই জন্ম দেয়নি—ভাল নাট্যকারেরও জন্ম দিয়েছিল। তাঁদের কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু একথাটি হয়তো হাওড়াবাসীর অনেকের

* সম্প্রতি বালি শিশু সমিতি ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে একটি মূল্যবান স্মরণিকা প্রকাশ করেছেন।

কাছেই অজ্ঞাত থেকে গেছে যে নাট্টাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী একসময় উপযুক্ত নাটকের অভাবে 'শ্রীরঙ্গমের' শুভ উদ্বোধন করতে পারছিলেন না। এমনি সময়ে বালির বঙ্গশিশু বিদ্যালয়ের শিক্ষক তারাকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর জীবনদর্শনের মুকুর হিসাবে রচিত 'জীবনরঙ্গ' নাটকটি নিয়ে নাট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করলেন। 'জীবনরঙ্গ'-এর কল্পিত অমরেশ চরিত্রটিতেই শিশিরকুমার খুঁজে পেলেন তাঁর বহু ঈপ্সিত স্পর্শমণিকে। নাটকে অমরেশ চরিত্রের সঙ্গে শিশিরবাবুর জীবনসমস্যা ও মঞ্চজীবনের স্বপ্ন মিলে একাকার হয়ে গেল। চট্‌জলদি সিদ্ধান্ত হল তারাবাবুর 'জীবনরঙ্গ' দিয়েই 'শ্রীরঙ্গম' রঙ্গালয়ের চাকা ঘোরানো শুরু হবে। তাই 'জীবনরঙ্গ' নাটকের ভূমিকা' প্রবন্ধে তারাকুমার লিখছেন—১৯৪১ খ্রীঃ 'শ্রীরঙ্গম' সাব্যস্ত হতেই তিনি শিশিরবাবু জীবনরঙ্গ দিয়েই মঞ্চ উদ্বোধন করলেন।'* আরও অবাক হবার মত ঘটনা হচ্ছে 'শ্রীরঙ্গমের' চাকা বন্ধ হয় ঐ একই নাট্যকারের লিখিত 'প্রশ্ন' নাটক দিয়ে। তারাবাবুর সুবাদেই শিশিরবাবুর বাসাতে গতায়াত ছিল। যার ফলে 'আলমগীর' নাটকে 'দুখীর ইমান' চরিত্রে ৬৩টি প্রদর্শনীতে অভিনয় করেন বালির অধিবাসী রঞ্জিতকুমার বন্দোপাধ্যায় (ব্যবহারজীবী মন)। প্রসিদ্ধ অভিনেতা কানু বন্দোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিতে রঞ্জিতবাবু দীর্ঘদিন অভিনয় করেছিলেন শিশিরকুমারের দলে বালির আর এক অভিনেতা ছিলেন—তিনি হচ্ছেন সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়। ১৯৪৫ সালে 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে সুবোধবাবু রাসবিহারী ও ইংরাজ সৈন্যের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। শিশিরবাবুর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর সঙ্গে অভিনয় করে গেছেন। অভিনয়ের ফাঁকে তিনি 'নটরাজ শিশিরকুমার' নামে একটি বই লিখেছেন। সুবোধবাবুর সুগঠিত দেহ আজও চোখে পড়ার মত

আলোচনান্তে দেখা যাচ্ছে যে নাটকে শখের দল জেলার মধ্যে শিবপুরেই প্রথম চালু হয়। আরও সুখের খবর যে বাংলাদেশে প্রথম মহিলা নাট্যকার জন্মেছিলেন এই হাওড়া জেলার শিবপুর গ্রামে। তাঁর নাম কামিনীসুন্দরী দেবী। তাঁরই হাতে রচিত 'উর্বশী' (১৮৬৬) ও 'ঊষা' (১৮৭১ সালে) প্রকাশিত হয়।[৪৩] এই দুটি নাটকই তিনি 'দ্বিজতনয়া' ছদ্মনামে লিখেছিলেন।[৪৪] পঞ্চাশের দশকে হাওড়ার একটি নামকরা নাট্যসংস্থা হচ্ছে 'নটনাট্যম'। প্রতিষ্ঠাতা বিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রেরণায় সিনেমা পরিচালক বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায় নাট্য নির্দেশনায় ক্লাবটির ভিত সুদৃঢ় করেন। বর্তমানে নাট্যকার জগমোহন মজুমদারের পরিচালনায় সংস্থাটির সুনাম জেলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। সাঁত্রাগাছির রমেন লাহিড়ী নাট্যকার ও পরিচালক হিসেবে আজ একজন প্রতিষ্ঠিত প্রতিভা। আর এক নাট্যকার ও পরিচালক হচ্ছেন শিবপুরের অরুণ মুখোপাধ্যায়। তাঁর 'চেতনা' নাট্য গোষ্ঠী আধুনিক বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে নূতন চেতনার সৃষ্টি করে চলেছে। তাঁর রচিত ও পরিচালিত 'জগন্নাথ' ও 'মারিচ সংবাদ' অগণিত দর্শকের সানন্দ-সম্বর্ধনা লাভে সক্ষম হয়েছে।

---

* মণি বাগচি ভুলবশতঃ ১৯৪২য়ের ১০ই জানুয়ারী লিখেছেন। সঠিক হল ১৯৪১ সালের ২৮শে নভেম্বর

ছয়ের দশকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে (১৯৬৫) হাওড়ায় শৈল্পিক' নামে একটি নাট্যগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। দীর্ঘদিন ধরে নানা ধরনের ও নানা রসের নাটক অভিনয় করে জেলার সৌখিন নাট্যজগতে একটি স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। শৈল্পিকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি একটি শিক্ষক-শিক্ষিকা আধিক্য যুক্ত নাট্যগোষ্ঠী। তাই হয়তো এঁদের অভিনীত নাটকগুলিও বিষয়গুণে বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। মামুলি নাটকাভিনয়ে গা না ভাসিয়ে মানুষের বাহ্যিক ও আত্মিক সমস্যা নিয়েই এঁরা বেশী নাটক মঞ্চস্থ করে থাকেন। সত্তরের দশকের শেষ দিকে নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের বাজপাখি, লাঠি, ভূত ও সুন্দর প্রভৃতি নাটক করে এঁরা যথেষ্ট সাধুবাদ পেয়েছেন। 'লাঠি' অভিনয়ের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়ে একাধিকবার পুরস্কৃতও হয়েছেন শৈল্পিক গোষ্ঠী। এঁদের আর এক সার্থক সৃষ্টি 'দমন' নাটকাভিনয়। নানা ঘাট ঘুরে এরা স্থিতিলাভ করেছে মধ্য হাওড়ার 'শিশু মঙ্গল'-এ।

১, ৫, ৮, ১১, ১২, ১৩ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৪র্থ)—ডঃ অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়

২. প্রাচীন কবি সংগ্রহ ১ম খণ্ড—সম্পাদিত গোপালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়

৩, ৭. ঈশ্বরগুপ্ত রচিত কবি জীবনী—ডঃ ভবতোষ দত্ত

৪. বঙ্গভাষার লেখক—হরিমোহন মুখোপাধ্যায় এবং প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ (১)—গোপালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত।

৬ নব্য ভারত (পৌষ)—১৩১১।

৯ হুগলী জেলার ইতিহাস—সুধীরকুমার মিত্র।

১০ প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ—গোপালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়

১১ কবি জীবনী—ডঃ ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত।

১৪, ১৬ ১৭ উনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালী কবি ও বাংলা সাহিত্য—নিরঞ্জন চক্রবর্তী

১৫ ৪৩. নগর হাওড়া—অলোককুমার মুখোপাধ্যায়।

১৮, ১৯, ২২, ৩৯ সেকালের হাওড়া—যাত্রা, নাটক ও নাট্যকার—তারাপদ সাঁতরা—প্রফুল্ল বর্ষ শতবর্ষ স্মরণিকা।

২০, ২১ নাটক অবরোধে অকথিত কাহিনী—ডঃ পূর্ণেন্দু নাথ—প্রফুল্লকমল বর্ষ শতবর্ষ স্মরণিকা

২৩, ২৪, ২৫ হাওড়ার গৌরব কাহিনী—সলিল মিত্র।

২৬. লোকসংস্কৃতির আলোকে হাওড়া—ডঃ পাঁচগোপাল ভট্টাচার্য

২৭, ২৮, ২৯, ৩০. পুরাতন প্রসঙ্গ—বিপিনবিহারী গুপ্ত (২য় সংস্করণ)

৩১, ৩২. মাসিক বসুমতী—১৩৩৬ সাল।

৩৩. সংসদ বাঙ্গালী চরিত্রাভিধান।

৩৪. আমেরিকার ডায়েরী—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য।

৩৫. মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য—থিয়েটার ও অন্যান্য প্রসঙ্গ সম্পাদনা "দিব্যনারায়ণ ভট্টাচার্য"।

৩৬. গোবর্দ্ধন সঙ্গীত সমাজ স্মরণী কথা ও কাহিনী ১৯৪৮।

৩৭. শালিখার ইতিবৃত্ত—হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩৮. শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ—নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

৪০. বালির নাট্যচর্চা—সৌমেন্দু ঘোষ—বালি গ্রামের রঙ্গচর্চা

৪১. বালি গ্রামের ইতিহাস—নলিন চন্দ্র মিশ্র।

৪২ বালি গ্রামের রঙ্গচর্চা—নাট্যচর্চার আঙিনায় বালির মানুষ—অঞ্জন মুখোপাধ্যায়

৪৪. হাওড়া শহর কত পুরাতন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ—ডঃ অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়।

সিনেমা—নির্বাক ও সবাক

চিত্ত বিনোদনের জন্য আর এক নান্দনিক সংযোজন হল সিনেমা—যাকে প্রথমে বলা হত বায়োস্কোপ। এদেশে বায়োস্কোপের আবির্ভাব হ'ল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের শেষার্ধে বা বিংশ শতাব্দীর একদম শুরু থেকেই। যাত্রা থিয়েটারের শিল্প নৈপুণ্য ও তার নান্দনিক শিল্পবোধ পরিশীলিত হয়ে সিনেমায় তা তিলোত্তমায় পরিণত হয়েছে। সিনেমা বিষয়ক গবেষক নিশীথ কুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে—'আমাদের দেশে এই শিল্পের প্রদর্শন শুরু হয় ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে—প্রথমে বোম্বাই তারপর কলকাতায়। তিনি আরও লিখেছেন—কলকাতায় প্রথম যে ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শন চালু করেন তিনি হচ্ছেন বাঙ্গালী—নাম হীরালাল সেন।[১]

আজকের মত সেদিনের সিনেমা কিন্তু সবাক ছিল না। তথাপি বাংলা দেশের সিনেমা জগতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে কি নির্বাক কি সবাক চলচ্চিত্রে যাঁরা স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যেও প্রথম শ্রেণীর পরিচালক, ক্যামেরাম্যান ও অভিনেতা-অভিনেত্রী রয়েছেন এই হাওড়ারই অধিবাসী। বিস্মৃতপ্রায় সেই সব কলাকুশলীদের অবদান খুঁজে পেতে দেখা যাবে তাঁদের প্রচেষ্টা ছিল কত গৌরবের ও প্রশংসার।

আজকের মত নয়—তখনকার দিনে বায়োস্কোপ ছিল নির্বাক। কিন্তু নির্বাক হলেও সেই বায়োস্কোপ মানুষের কাছে ছিল এক অবসর বিনোদনের লোভনীয় বস্তু। ভারতে এই নির্বাক চলচ্চিত্রের এক নম্বর নির্মাতা ছিলেন বিখ্যাত জে. এফ. ম্যাডান এণ্ড কোম্পানী। এই ম্যাডানরা ছিলেন জাতিতে পার্শী। বোম্বের অধিবাসী হলেও ভাগ্যান্বেষণে কলকাতায় আসেন। সামান্য পুঁজি নিয়ে বায়োস্কোপ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। এখনকার মত কোন স্থায়ী প্রেক্ষাগৃহও ছিল না। তাই ম্যাডান কোম্পানী কলকাতার গড়ের ময়দানে প্রথম তাঁবু গাড়লেন ১৯০৪-৫-এ। ভিড় করে মানুষ তাঁবুতে বায়োস্কোপ দেখতে আসত। দু'তিন বছর যেতে না যেতেই ১৯০৭ সালে ধর্মতলায় হগ সাহেবের বাজারের কাছে 'এলফিনষ্টোন পিকচার প্যালেস' নাম দিয়ে স্থায়ী চিত্রগৃহ নির্মাণ করেন এই ম্যাডান সাহেব। ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না হওয়ায় হাওড়াতেও তাঁরা চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। অমৃতবাজার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হল—

Howrah Cinema

Talkal Ghat Road,

Management—J. F. Madan & Co, Friday at 6 & 9-30 P. M. এই হাওড়া সিনেমাই আজকের বঙ্গবাসী সিনেমা। প্রচুর অর্থ লাভ হওয়ায় কোম্পানী

নিজেরাই দেশী ছবি তোলার উদ্যোগ নেন। তাদের সঙ্গে ছিলেন হাওড়ার জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সে যুগে জ্যোতিষবাবু ছিলেন বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক। ম্যাডান কোম্পানী তাঁর পরিচালনায় নির্বাক ও সবাক চিত্র তৈরী করে ধনকুবেরে পরিণত হয়েছিলেন। জ্যোতিষবাবুর প্রথম নির্বাক চিত্র হচ্ছে 'সতীলক্ষ্মী'। 'সে যুগে তাঁর হিট্ পিকচার ছিল 'জয়দেব'। বইটি থেকে ম্যাডান কোম্পানী তখনকার দিনে সাত লক্ষ টাকা মুনাফা করেছিল।'[২] এই বইটির কথা সবিস্তারে বলা হচ্ছে এজন্য যে, পরবর্তী যুগে এই বইটি ইতিহাস তৈরী করতে সাহায্য করেছিল। সেই ইতিহাস জানলে হাওড়াবাসী মাত্রই গৌরবান্বিত বোধ করবেন। 'জয়দেব' নাটকটি তখনকার দিনে মঞ্চেও অভিনীত হত। কিন্তু চলচ্চিত্রে বইটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। 'জয়দেবে'র ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় করেন শালিখার তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাধিকার ভূমিকায় যে বালিকাটিকে জ্যোতিষবাবু খুঁজে বার করেছিলেন তার জন্য তো সারা বঙ্গবাসী মাত্রই আজ শ্লাঘাবোধ করেন। জ্যোতিষবাবুর নিজের কথায়ই তা ব্যক্ত করা হল—'রাধিকার ভূমিকায় যে ছোট্ট মেয়েটিকে আমি চিত্রে নামাই, আজ সে ভারতের একজন নামজাদা অভিনেত্রী। যে ছোট মেয়েটিকে আমি রাধিকার ভূমিকায় অভিনয় করিয়েছিলাম সে না হ'লে আমার 'জয়দেব' বোধ হয় প্রকৃত সুষম ও সৌন্দর্য হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়েই প্রকাশ পেত। ৮-৯ বছরের মেয়েটিকে দেখলেই মনে হয় কি সুন্দর এর রূপ—অথচ কি সরল গঠন, পিঠ ছাওয়া থোকা থোকা কাল চুলের রাশ—বড় বড় নীলাভ আঁখি তাতে বিদ্যুতের ছটা ফুটে রয়েছে। অথচ যে দেখে তার আর দৃষ্টি ফিরাতে চায় না। তখনই মেয়েটির মুখ দেখে আমি ব'লে দিয়েছিলাম—মেয়েটির ভেতর ইস্পাত আছে—সান দিলে খুব ধারাল হবে। একে গড়ে তুললে আর্টের পুতুল গড়া হবে না—প্রতিমাই গড়া হবে। লোকে আমার কথা শুনে সেদিন হেসেছিল—তারা বল্লে শ্রীকৃষ্ণের কাছে রাধা! (শ্রীকৃষ্ণ হয়েছিল রেণুবালা যার আর এক নাম ছিল 'সুখ') আমি এই মেয়েটিকে হাওড়া শহরের কোন এক স্থান থেকে সংগ্রহ করি।'[৩]

জ্যোতিষবাবুর জ্যোতিষের ন্যায় ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পরিণত হওয়ায় হাওড়াবাসী মাত্রই উৎফুল্ল হবেন। কারণ এই জ্যোতিষবাবু দীর্ঘ দিন শালিখায় রামলাল মুখার্জী লেনে বাস করেছেন। ঐ আট বছরের মেয়েটির নাম কিন্তু এখনও বলা হয়নি। ইনিই হচ্ছেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের অতুলনীয়া অভিনেত্রী শ্রীমতী কানন দেবী। জ্যোতিষবাবু নিজের লেখাতেই বলেছেন—'আমি জানিনা ভারতে আর কেউ সংখ্যায় আমার মত এত অধিক ছবি তোলবার সুবিধা পেয়েছেন কিনা।' তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি ছবি তোলায় close up, Semi close up, Mid shot ও Long shot-এর প্রবর্তন করেন। Shot-Division-এরও প্রচলন তিনিই করেন এদেশে প্রথম।[৪] হাওড়া সিনেমারও (অধুনা বঙ্গবাসী) তিনি ম্যানেজার ছিলেন। বাংলা চলচ্চিত্রে তিনি 'দাদু' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। কাননদেবী তাঁর 'সবারে আমি নমি' গ্রন্থে জ্যোতিষবাবু সম্পর্কে লিখছেন—'জয়দেব চিত্রে রাধার ভূমিকায়

আমার শিল্পী জীবন শুরু হল।...আমার ওপর বিধাতার অসীম করুণা যে একেবারে প্রথমেই জ্যোতিষ বাবুর মত হৃদয়বান মানুষের কাছে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছি। উনি যেমন স্নেহপ্রবণ ছিলেন, তেমনি ছিলেন নিয়মশৃংখলার প্রতি কঠোর। আদরের সঙ্গে শাসন করতে ভুলতেন না।'

পাঠক জেনে হয়তো বিস্মিত হবেন যে 'জয়দেব' ছবিতে অভিনয় করার জন্য ন'দশ বছরের বালিকা শিল্পী সেদিন বেতন পেয়েছিলেন হাতে মাত্র পাঁচ টাকা। কানন দেবী নিজের জবানীতেই বলেছেন—'আমার কাছে তখন উহা লক্ষ টাকার সমান। পরে জেনেছিলাম আমার প্রকৃত বেতন ধার্য হয়েছিল পঁচিশ টাকা। সে বাকি টাকাটা নাকি দেওয়াও হয়েছিল। কিন্তু আমার হাতে এসে পৌঁছেছিল পাঁচ।'[৫] বালিকা কাননকে সিনেমা লাইনে নিয়ে এসেছিলেন শালিখার এক [illegible] সিনেমা অভিনেতা তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের দারিদ্র্যের করুণ অবস্থা দেখে।

একবার 'নূরজাহান' ছবি তুলতে গিয়ে জ্যোতিষবাবু শোন ব্রীজের ওপর থেকে পড়ে গিয়ে প্রায় দেড় বছর শয্যাশায়ী ছিলেন। সে সময় নাকি কাননদেবী তাঁকে অর্থ সাহায্য করে কৃতজ্ঞতা দেখিয়েছিলেন। কাননদেবীর জন্ম [illegible] হাওড়া শহরে হাড়কাটা লেনের এক নিষিদ্ধ বস্তিতে।[৬] 'সবারে আমি নমি' গ্রন্থে কাননদেবী লিখছেন—'আমার পিতা রতনচন্দ্র দাস কলকাতার এক সাহেবী অফিসে কাজ করতেন। কুঅভ্যাসের ফলে আয়ের চেয়ে ব্যয়ই বেশী ছিল। [illegible] মোটা অঙ্কের ঋণ রেখে যান। আমার মা বাবার বিবাহিতা স্ত্রী নন। [illegible] শুনেছি। কোনটা ঠিক জানি না।' এই জ্যোতিষবাবু শেষ জীবনে [illegible] মধুসূদন বিশ্বাস লেনে থেকেই মৃত্যুবরণ করেন।

এই ম্যাডানরা যখন [illegible] থেকে ব্যবসা তুলে [illegible] প্রবাসী-বঙ্গবাসী ধনাঢ্য ব্যক্তি [illegible] চামেরিয়া ও [illegible] ঐ কোম্পানীটির এক [illegible] অংশ কিনে নেন। [illegible] রাধা ফিল্ম [illegible] এবং মতিবাবু ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানী তৈরী করেন। রাধা ফিল্মের [illegible] হল এই জন্যই যে এদেশে বাংলার সঙ্গে হিন্দী, তামিল ও তেলেগু ছবি নির্মাণে এরা অন্যতম অগ্রদূত ছিলেন। চামেরিয়ারা হাওড়া মাছের বাজারের কাছে চামেরিয়া হাউসে (বর্তমান ভীমসেন হোটেল) দুপুরুষ ধরে বাস করে গেছেন। রাধা ফিল্মের কথা একটু বেশী করে বলতে হচ্ছে এজন্য যে ১৯৩৩ সালে তাঁদেরই প্রযোজিত 'শ্রীগৌরাঙ্গ' ছায়া ছবিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার ভূমিকায় কাননবালাকে ফিল্ম জগতে প্রতিষ্ঠিত করল। সম্মান ও প্রতিষ্ঠা দুইই যেন তিনি পেয়ে গেলেন। কাননদেবী তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে বলছেন—শুধু অভিনয়েই বলব কেন? গানের [illegible] যেন রাতারাতি একটা বিরাট কিছু হয়ে যাবার সম্মান পাওয়া এই প্রথম।

১৯৩৫ সালে 'মানময়ী গার্লস স্কুল' মুক্তি পাওয়ার পর কাননদেবীর দুঃখ রজনী অবসান হল। শিল্পী একই গ্রন্থে লিখছেন—'রূপবাণী'তে পর পর দশ সপ্তাহ হাউস ফুল হয়ে ছবিটি অভিনন্দিত হল। গান—অভিনয় দুইই চিত্ত রসিকদের

সত্যিকারের অভিনন্দন ও প্রশংসা পেল এবং তার চেয়েও বড় কথা আমার শিল্পীসত্তা প্রকৃত সম্মান ও গৌরব স্বীকৃতি পেল 'মানময়ী গার্ল'স স্কুলেই'। বড়ই আনন্দের কথা এই যে এই ছায়াছবিতেই 'ফার্ণাণ্ডেজ' চরিত্রে যিনি কাননদেবীর পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করে আজও দর্শক চিত্তে অম্লান হয়ে আছেন সেই জানকী বল্লভ ভট্টাচার্য ছিলেন হাওড়া বালির প্রবীণ অধিবাসী।

কিশোরী কানন যৌবনে হলেন কাননবালা—আর অভিনয় মাহাত্ম্যে পরবর্তী-কালে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে হয়ে উঠলেন কাননদেবী। হাওড়ার এক অখ্যাত পল্লী থেকে তুলসীবাবু যে মেয়েটিকে তুলে এনে জ্যোতিষবাবুর হাতে সপে দিয়েছিলেন সেই মণিকাঞ্চন যোগের জন্য শুধু হাওড়াবাসী নয়, বঙ্গবাসী মাত্রই শ্লাঘাবোধ করবেন।

নির্বাক যুগের এক সুদর্শন অভিনেতা ছিলেন হাওড়ার শালকিয়ার প্রাচীন বাসিন্দা ৺কান্তিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। একদিকে জমিদার নন্দন তার উপর আবার সিনেমায় নামা—এটা জমিদার পিতা শিব গোপালের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব না হলেও কান্তিভূষণ নির্বাক চলচ্চিত্রে দীর্ঘ বার বছর (১৯২৭—৩৯) পর্যন্ত অভিনয় করে

গেছেন। কান্তিভূষণের প্রথম নির্বাক ছবি 'চণ্ডীদাস' (১৯২৭)। ১৯৩০ সালে শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' নির্বাক ছবিতে নায়কের ভূমিকায় কান্তিভূষণ আর নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী শান্তাকুমারী। অন্যান্য নির্বাক বইয়ের মধ্যে 'শাস্তি কি শান্তি', 'জীবনপ্রভাত', 'নিয়তি' প্রভৃতি বইতে তিনি অভিনয় করে সে যুগে প্রশংসা পেয়েছিলেন। একদিকে যেমন বিখ্যাত নট দানীবাবু, অহীন্দ্র চৌধুরী, যোগেশ চৌধুরী, শিশির ভাদুড়ী ও দুর্গাদাস ব্যানার্জী প্রভৃতির সঙ্গে অভিনয়ে সক্ষম হয়েছিলেন তেমনি নায়িকা ও সহযোগী শিল্পী হিসেবে পেয়েছিলেন পেসেন্সকুপার, রিনি স্মিথ ও শান্তাকুমারীর মত নির্বাক যুগের কিংবদন্তী অভিনেত্রীদের। চিত্র শিল্পী হিসেবেও

কান্তিবাবুর খ্যাতি ছিল। এ বিষয়ে তাঁর হাতেখড়ি হয় শান্তিনিকেতনে শিল্পী অসিত হালদারের কাছে। সুখেরই বিষয় সবাক যুগের 'শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী' চিত্রে জনপ্রিয় নায়ক উত্তমকুমারের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল বন্ধুবৎ। কান্তিপুত্র গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্ধুত্বের টানে উত্তমকুমারের 'শালকিয়া হাউসে' অবাধ গতায়াত ছিল।

নির্বাক ও সবাক যুগের আর এক ক্যামেরাম্যানের কথা হাওড়াবাসী ভুলেই যেতে বসেছেন। তিনি হচ্ছেন শালিখার বিভূতি দাস। বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান ননীগোপাল সান্যালের কাছে তাঁর ছবি তোলার হাতেখড়ি। ১৯৩৭ সালে মধু বসুর পরিচালনায় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলিবাবা' নাটকের চলচ্চিত্রে রূপ দেওয়া হল। সে যুগে এটি হিট্ ছবি ছিল। এ ছবির আলোক চিত্র অত্যন্ত প্রশংসনীয় হয়। আর ঐ আলোক চিত্র গ্রহণ করেন শালিখার বিভূতি দাস ও গীতা ঘোষ। নিশীথকুমার মুখার্জী তাঁর বাংলার চলচ্চিত্রকার গ্রন্থে লিখছেন—'আলিবাবা চিত্রে আলোকচিত্র গ্রহণ করেছিলেন বিভূতি দাস ও গীতা ঘোষ। উভয়ের আলোকচিত্র গ্রহণ খুবই প্রশংসনীয় হয়েছিল।' ১৯৩৮ সালে 'অভিনয়', 'ঠিকাদার', 'জীবনসঙ্গিনী' ও 'পরশমণি' প্রভৃতি ছবিতেও তিনি কৃতিত্বের ছাপ রেখে গেছেন। 'তপোভঙ্গ' ছবিতে বিভূতিবাবু পরিচালক হিসেবে নিজ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

সিনেমায় অভিনয় করা বিশেষ করে মেয়েদের পক্ষে যেন একটা সামাজিক অপরাধ। প্রকৃতপক্ষে তখনকার দিনে শিক্ষিত ভদ্র-ঘরের বাঙ্গালী মেয়েরা সিনেমার অভিনয়ে আসতেন না। এমনকি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েও কোন শিক্ষিতা বাঙ্গালী মেয়েকে পাওয়া যায় নি। তবে 'স্টেটসম্যান' কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে কয়েকজন শ্বেতকায়া সুন্দরী মহিলা এই কাজে যোগ দেন। তাঁদের মধ্যে খ্যাতনাম্নী ছিলেন পেসেন্স-কুপার, রিনি স্মিথ, আইরিশ গ্যাসপার, মিস হিপোলাইট, ভায়োলেট কুপার প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে রিনি স্মিথকে ভারতীয় নাম দেওয়া হয় সীতাদেবী, আইরিশ গ্যাসপার হন সবিতাদেবী, মিস হিপোলাইট হন ইন্দিরাদেবী ইত্যাদি।

এইসব ইউরোপীয় ও এ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলাদের বাংলা চলচ্চিত্রে নায়িকা করারও চমকপ্রদ ইতিহাস আছে। একদা ধীরেনবাবুকে কলকাতার রাস্তায় সুন্দরী নায়িকার খোঁজে ঘুরে বেড়াতে হত। সিনেমাজগতে এই ধীরেনবাবুই ডি. জি. নামে সমধিক খ্যাত। এ সম্বন্ধে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হচ্ছে।

একদিন ধীরেনবাবু মোটর নিয়ে ধর্মতলা স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছেন। রাস্তার পাশেই একটি বালিকা বিদ্যালয়ের সবে ছুটি হয়েছে। ভিড়ের মধ্যেই একটি মেয়ের সৌন্দর্য ধীরেনবাবুর চোখ কেড়ে নিল। মেয়েটি বাঙ্গালী না হলেও মুখে কিন্তু সুন্দরী বাঙ্গালী মেয়ের ছাপ রয়েছে। গাড়িটি আস্তে চালিয়ে ধীরেনবাবু তার পিছু নিলেন। তারপর ঐ রাস্তায়ই একটি বাড়িতে মেয়েটি ঢুকে গেল। পরদিন সকালে ধীরেনবাবু ঐ বাড়িতে গিয়ে মেয়েটির মায়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁর উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করলে ভদ্রমহিলা ধীরেনবাবুর উপর ভীষণ রেগে গেলেন। সেদিন নিরাশ হয়ে

ফিরে এলেও কিছুদিন পর আবার তিনি ঐ ভদ্রমহিলারই বাড়ি যান। এবার কিন্তু ধীরেনবাবু তাঁর মেয়েকে চাইলেন না—তিনি মেয়ের মাকেই তাঁর কোম্পানীতে স্টীল ফটোগ্রাফার হিসেবে নিয়োগ করতে চান। ভদ্রমহিলা সানন্দে সে কাজ গ্রহণ করেছিলেন। উল্লেখ্য, ঐ ভদ্রমহিলা আগে একটি দৈনিক ইংরেজী কাগজের ফটোগ্রাফার ছিলেন। এর কিছুদিন পরে ভদ্রমহিলা ধীরেনবাবুকে ফিল্মে তাঁর মেয়েকেও নায়িকার ভূমিকায় নামতে নিজেই মত দেন। এই সুন্দরী নায়িকার নাম ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে—তিনি হচ্ছেন মিস আইরিশ গ্যাসপার—আর মায়ের নাম হল—ম্যাডাম ইসমে।

নির্বাক যুগের ছবিতে এইসব বিদেশী নায়িকাদের নিয়ে ছবি তুলতে তেমন কোন অসুবিধা হয়নি। কারণ ভাষা ছিল সেখানে গৌণ। আকার ইঙ্গিত ও সৌন্দর্যের মহিমায় নির্বাক ছবিকে তখন তাঁরা মাতিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু সবাক ছবি প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে (১৯৩১ সাল) ভাষা একটি বিরাট অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়। সেরকম একটি ঘটনার কথাই এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। 'ঠিকাদার' নামে একটি ছবির কাজ হাতে নিয়েছেন বিভূতি দাস মশায়। নায়িকা হিসেবে মনোনীত করেছেন মিস গ্যাসপারকে। এই গ্যাসপারই হলেন সবিতাদেবী। কিন্তু বাংলা কথা বলানো নিয়ে বিভূতিবাবু মহা ফ্যাসাদে পড়লেন। তাই সবিতাদেবীকে বাংলা শেখানোর ভার দিলেন তাঁর অনুজপ্রতিম প্রফুল্ল মিত্রকে। তাঁরই কাছে বাংলা শিখে মিস সবিতা ১৯৩২, ২৫-শে ফেব্রুয়ারী রেডিওতে প্রথম রবীন্দ্র সংগীত গাইলেন। গানটি ছিল—'না, না গো না কোর না ভাবনা।' এই প্রফুল্লবাবু শালিখায় তথা হাওড়াতে প্রবীণদের কাছে নানু মিত্র নামেই সমধিক পরিচিত। নানু মিত্র ছিলেন একাধারে ফটোগ্রাফার, রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইয়ে, ভাল পিয়ানো বাজিয়ে এবং একজন উঁচুদরের প্রযুক্তিবিদ। তিনিই মিস সবিতাকে বাংলা কথা ও রবীন্দ্র সংগীত শেখাতেন। মিস সবিতা পরবর্তীকালে ইংলণ্ডে গিয়ে ঘর সংসার করেছিলেন। সেখান থেকে বিভূতিবাবুকে যে চিঠি দিয়েছিলেন তাতে তাঁর ওপর মিস সবিতার আন্তরিক শ্রদ্ধার ভাবই ফুটে ওঠে। সেই চিঠিটি দেখার সৌভাগ্য হয়েছে বিভূতিবাবুর স্ত্রীর কাছ থেকে।

এই নানু মিত্র প্রসঙ্গেও দুচার কথা বলা দরকার বলে মনে হচ্ছে। তখনকার দিনে হিন্দুস্থান রেকর্ডে নানু মিত্রের গান ঘরে ঘরে গীত হত। রেকর্ডের এক পিঠে ছিল রবীন্দ্রনাথের 'নূপুর বেজে যায় রিনি রিনি' এবং অপর পিঠে ছিল—'প্রখর তপন তাপে।' এ ছাড়া অন্য রেকর্ডও ছিল। যতদূর জানা যায়, হাওড়া জেলা থেকে তিনিই কলকাতার রেডিওতে প্রথম রবীন্দ্র সংগীত (গান আমার যায় ভেসে যায়) পরিবেশন করেন—সালটি ছিল—১৯২৯, অক্টোবর মাস। স্মরণ করা যেতে পারে যে ১৯২৭-এর ২৬-শে আগস্ট রেডিও স্টেশনের জন্ম। প্রফুল্ল মিত্র সম্বন্ধে যে বক্তব্য প্রকাশ করা হল তারও যাথার্থ প্রমাণ করবে সাহিত্য তপস্বী বিমলকুমার মিত্রের লেখায়। তিনি লিখছেন—'বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সোজা বাড়িতে না গিয়ে চলে যাই

অক্রূর দত্ত লেনে। সেখানে চণ্ডীবাবুর রেকর্ডিং কোম্পানীর গানের আড্ডা। সেখানে গিয়ে বসি—সেখানে তখন সায়গল, রামকিষণ মিশ্র, নিতাই মতিলাল, শচীনদেব বর্মন, রবীন্দ্র সংগীত বিশারদ স্ফীতদেহ হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, বেহালা বাদক ভোম্বলদা, অনিল বাগচী, প্রফুল্ল মিত্র, সজনী মতিলাল, অনিল বিশ্বাস, পান্না ঘোষ আর প্রশান্ত মহালনবীশের ভাই বুলা মহালনবীশের সঙ্গে মিশে সংগীতের জগতের সংগে একাকার হয়ে যাই।···অনুপম ঘটক আমার বন্ধু। তার সুবাদেই আমি সেখানে একটা বাঁধা আসন পেয়েছি। অনুপম ঘটক আর প্রফুল্ল মিত্রকে নিয়ে রাত দেড়টা পর্যন্ত কার্জন পার্কের ঘাসের ওপর বসে আজে-বাজে গল্প করে সময়টা কাটিয়ে দিই। প্রফুল্ল মিত্র খুব রসিক মানুষ। হিন্দুস্থানের সমস্ত স্টুডিওটা প্রফুল্ল বলতে অজ্ঞান। এদিকে নিজে ভালো মুভি ক্যামেরাম্যান, আবার চণ্ডীবাবুর রেফ্রিজারেটার খারাপ হয়ে গেলে তাও সারিয়ে দেয়। আবার কখনও পিয়ানো নিয়ে বসে পড়ে—'নূপুর বেজে যায় রিনি রিনি গান রেকর্ড করে। রেকর্ড করে—'বন্ধু হে, চলো চলো।'[৬] এ ছাড়া প্রমথেশ বড়ুয়ার Dark Room In-charge হিসেবে প্রফুল্ল মিত্রের নিয়োগ প্রমাণ করে তাঁর যোগ্যতার কথা। যতদূর জানা যায় ১৯৩৪-৩৫ সালে প্রফুল্ল মিত্র Royal Photography Society of London-এর সদস্য হিসেবে মনোনীত হওয়ার দুর্লভ সম্মান হাওড়াবাসীর পক্ষে খুবই গৌরবের কথা।

'আলিবাবা' ছবিতে···ক্যামেরাম্যান বিভূতি দাসের কথা ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে। কিন্তু মধু বসুর এই ছবিতে মধ্য-হাওড়ার আর এক অভিনেতা ছিলেন যাঁর নাম হচ্ছে বিভূতি গঙ্গোপাধ্যায়। শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় স্বয়ং আলিবাবার ভূমিকায় এবং ফাতিমার ভূমিকায় সুপ্রভা মুখার্জীর সঙ্গে অভিনয় করে বঙ্গবাসীর কাছে তখনকার দিনে প্রশংসা পেয়েছিলেন। 'জজ সাহেবের নাতনি' বইতেও প্রশংসনীয় অভিনয় করে-ছিলেন।

এরপরই যাঁর কথা মনে পড়ে তাঁর নাম হচ্ছে তুলসী চক্রবর্তী। মঞ্চে বা ছবিতে এই মানুষটি এলেই ছোট-বড় সব দর্শকের মনেই আনন্দের লহরী বয়ে যেত। সবাই অপেক্ষা করে থাকতো ঐ বড় বড় চোখ করে কখন একটি মজাদার কথা বলে ফেলবেন। যদি না কান খাড়া করে রাখা হয় তবে ঐ কথার রসাস্বাদন থেকেই বঞ্চিত হতে হবে। এই তুলসীবাবু অনেক ছবিতে ও মঞ্চে অভিনয় করে বঙ্গবাসীকে আনন্দ দিয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর সেরা অভিনয় ছিল—'সাড়ে চুয়াত্তর'। সত্যজিৎ রায়ের 'পরশ পাথর' ছবিতে তিনি অনবদ্য অভিনয় করে আজও দর্শকদের মনে জাগরিত হয়ে আছেন।

পরশুরামের একটি মহৎ সাহিত্য কাহিনীকে মহত্তর করে তুললেন সত্যজিৎবাবু এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। কমেডিয়ান তুলসী চক্রবর্তীর অসাধারণ অভিনয় তাকেই করে তুলল মহত্তম। আর এই ছবিটি কেবল ভারতীয়দেরই অনিন্দ্য প্রশংসা লাভ করে ক্ষান্ত হয়নি—আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভে যে কটি বাংলা ছবি সক্ষম হয়েছিল

তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি এই 'পরশ পাথর।' 'তেমন হাসির ছবি কই' প্রবন্ধে রবি বসু লিখছেন—পঞ্চাশের দশক বাংলা হাসির ছবির স্বর্ণযুগ—কারণ এই দশকেই এমন কয়েকজন অভিনেতার সন্ধান পেলাম যাঁদের কমেডি অ্যাকটিং তুলনাবিহীন! পুরানো যুগের তুলসী চক্রবর্তী, নৃপতি চ্যাটার্জী, হরিধন মুখার্জি, নবদ্বীপ হালদার প্রভৃতির পাশে পেলাম ভানু ব্যানার্জি, জহর রায়, সত্য ব্যানার্জি ও অজিত চ্যাটার্জি প্রমুখকে।[৭] এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই—'পরশ পাথরে' অভিনয়ের জন্য মাত্র দেড় হাজার টাকা তুলসীবাবুকে দেওয়া হয়েছিল। অশোক মান্না তাঁর এক প্রবন্ধে লিখছেন—'পুরস্কার-টুরস্কার যা পেয়েছেন সবই থিয়েটার থেকে। সিনেমায় কিছু পাননি। তবে সত্যজিৎ রায়ের 'পরশ পাথর'-এ অভিনয়ের জন্য দেড় হাজার টাকা পেয়েছিলেন। তুলসীবাবু দু'হাজার চেয়েছিলেন। ওঁরা বলেছিলেন, আমরা নতুন, অত দিতে পারব না।'[৮] ১৯৬১ সালে তুলসীবাবু মধ্য-হাওড়ার রাজবল্লভ সাহা লেনের পাশের গলিতে নিজভবনে মৃত্যুবরণ করেন।

পূর্বসূরীদের অনুসরণ করে হাওড়ার কয়েকজন প্রযোজক বাংলা ছায়াছবিতে উন্নতমানের ছবি প্রযোজনা করে বঙ্গবাসীর প্রশংসাধন্য হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে চিত্র প্রযোজনায় প্রথমেই নাম করতে হয় জগৎবল্লভপুরের সত্যনারায়ণ খাঁ মহাশয়ের কথা। তাঁরই—'চণ্ডীমাতা ফিল্মস্'-এর প্রযোজনায় বহু হিট করা ছবি বঙ্গবাসীকে আনন্দ ও শিক্ষা দিয়েছে। ইন্দ্রজিৎ সিং প্রযোজিত 'দেবী চৌধুরানী', নির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযোজিত ত্রৈলঙ্গ স্বামী, তরণী সেন বধ ও বীরেশ্বর বিবেকানন্দ, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য প্রযোজিত 'শ্যামলী', 'পণ্ডিতমশাই', 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'সাধক বামাক্ষ্যাপা', তারু মুখার্জীর 'সৎভাই', ষাটের দশক পর্যন্ত মন মাতানো ছবি ছিল। এঁরা সকলেই হাওড়া শালিখার অধিবাসী। সাঁত্রাগাছির জয়ন্ত ভট্টাচার্য ও সুপরিচালক ইন্দর সেনের নামও স্মরণ রাখার মত। সাঁত্রাগাছির এক শিশুশিল্পী মাষ্টার বিভুর (ভট্টাচার্য) অনবদ্য অভিনয় সে যুগে বাংলা চলচ্চিত্রে ঘরে ঘরে আলোচিত হত।

কোন ছবির সাফল্যের জন্য নেপথ্য সঙ্গীতের প্রভাব বলার অপেক্ষা রাখে না। এরকম নেপথ্য সঙ্গীতে যাঁরা তাঁদের অনুপম কণ্ঠ দিয়ে বাংলা ছবিকে পুষ্ট করেছেন তাঁদের মধ্যে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অসংখ্য রেকর্ডসহ বহু ছবিতে ধনঞ্জয়বাবু প্লে-ব্যাক করেছেন। কিন্তু শৈলজানন্দের 'শহর থেকে দূরে' হিট বইতে ধনঞ্জয়ের গানের তুলনা হয় না। সে যুগে পথে-ঘাটে-বাটে সর্বত্রই মুখে মুখে গুঞ্জরিত হত। 'রাধে ভুল করে তুই চিনলি না তোর প্রেমিক শ্যাম রায়'-এর মতন মন মাতানো গানে সমৃদ্ধ 'শহর থেকে দূরে' ছিল সুপারহিট ছবি। 'পঞ্চাশের দশকে সাধক রামপ্রসাদ ছবিতে ধনঞ্জয়বাবু পঁচিশখানা গান গেয়েছিলেন—যা ভারতীয় চলচ্চিত্রে একটা রেকর্ড।[৯] ঢুলি ছবির অনবদ্য গানগুলির সুর আজও যেন কানে বাজে। ধনঞ্জয়বাবুর প্রথম রেডিও গানের (১৯৩৮) সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব ১৯৮৭

সালে উদযাপিত হয় তাঁর শিষ্য ও গুণগ্রাহীদের দ্বারা। এই পঞ্চাশ বছরে সিনেমাতে প্রায় হাজার খানেক বাংলা গান, হাজারখানেক বেসিক বাংলা গান আর আরও অন্য ধরনের বেশ কিছু গানের এক সম্পন্ন ভাণ্ডার শ্রোতার হাতে তুলে দিয়েছেন শিল্পী গত পঞ্চাশ বছরে।[১০]

ধনঞ্জয়বাবুরই সহোদর ভাই পান্নালাল ভট্টাচার্য আর এক গানের রাজা। তাঁর শ্যামাসঙ্গীতের গানগুলি বাঙালীমাত্রেরই প্রাণে দোলা জাগায়। পান্নালালের গান সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে ধনঞ্জয়বাবু বলেন—'ওর সঙ্গে আমার কোন তুলনা হতে পারে না।' এহেন গায়ক দু'ভাই-ই বালি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। যদিও এঁদের জন্মস্থান ছিল হাওড়া ধাড়সা গ্রাম। পরে মাতুলালয়ে বালি গ্রামে এসে বড় হন। তাঁদের সঙ্গীত শিক্ষার মূলে ছিলেন বড়দাদা প্রফুল্ল ভট্টাচার্য।

শ্যামা সঙ্গীত জগতে বাংলার দুই দিকপাল শিল্পী ধনঞ্জয় ও পান্নালাল ভট্টাচার্যের ভাবে দীক্ষিত হয়ে আজও বঙ্গবাসীকে ভক্তি সংগীত শুনিয়ে যাচ্ছেন তিনিও বালিরই সন্তান—নাম হীরালাল সরখেল। হীরালালবাবুর মেজ দাদার কাছে একদিন ধনঞ্জয়বাবু এলে তাঁর গলায় শ্যামা সঙ্গীত শুনে মোহিত হয়ে যান। প্রথম জীবনে গণনাট্যের সঙ্গে যুক্ত হলেও ষাটের দশক থেকে ভক্তিগীতি জগতে চলে আসেন। একাধিক বইতে প্লে-ব্যাক করেন। প্রায় শতাধিক রেকর্ডও করেছেন। 'কুম্ভমেলা' ছায়াছবিতে তাঁর হিটগান ছিল 'মা বলে আর ডাকবো না মা'। ধনঞ্জয়-বাবুর সুরে যে গানটি হীরালালের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় তা হলো—'ভগবান তুমি এখনো' গানটি।

সিনেমার প্লে-ব্যাক সিঙ্গারদের যাঁরা রসদ যোগান সেইসব গীতিকারদের কথাই এবার আলোচনা করা যাক। হাওড়া তথা বাঙলা দেশে প্রথম সারির গীতিকারদের মধ্যে রয়েছেন হাওড়ার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। শালকিয়ায় চার পুরুষের বাস। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাক যুগের নায়ক কান্তিভূষণের একমাত্র তনয়। গান লেখার ঝোঁক স্কুল জীবন থেকেই। গান লেখার জন্য শরীর খারাপের অজুহাতে বাবাকে বলে দিদির বাড়ি ঘাটশিলায় স্বাস্থ্যোদ্ধারের নামে একমাস কাটান। পঁচিশটি গান লিখে শালকিয়ায় আবার ফিরে এলেন। তারপরই হাফপ্যান্ট পরে লুকিয়ে সোজা গার্ষ্টিন প্লেসে ট্রামে করে গিয়ে রেডিওর ডিরেক্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ। 'গান-গুলিতো ভালই হয়েছে—কিন্তু এগুলি কি তোমার লেখা?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। আর জিজ্ঞেস করারই তো কথা—কারণ ছেলেটি তখন পড়ে মাত্র ক্লাস নাইনে। গোঁফের রেখা পর্যন্ত তখন দেখা দেয়নি। 'সত্যি কথা বলছি—সবকটিই আমিই লিখেছি। বিশ্বাস না হয় বলুন—আপনার সামনেও একটি অন্য গান লিখে দিচ্ছি' —ছাত্র পুলক হলপ করে বলল। পরে অবশ্য পুলকবাবুর একটি গান রেডিও কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করলেন। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান লেখার গুরু বিশিষ্ট রবীন্দ্র সংগীত গায়ক হিমাংশু ঘোষের সুরারোপিত ঐ গানটি রেডিওতে সেদিন গাইলেন খ্যাতনামা ছড়ার গায়ক সনৎ সিংহ মহাশয়। গানটির কলিগুলি আজও পুলকবাবু

মুখস্থ করে রেখেছেন, যেমন—একবার শুধু বলগো মনে রেখেছি। অপর পিঠে ছিল —তোমারই অশেষ লীলা, আমারো হৃদয় ভরে। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখার মত যে, যেহেতু পুলকবাবু ছিলেন তখন নাবালক তাই রেডিওর নিয়মানুযায়ী সেই গানটি পুলকবাবুর নামে প্রচার করা যায়নি। এই ঘটনাটি বলতে বলতে হিমাংশুবাবুর মুখে কি না-ই প্রশান্তির ছাপ সেদিন দেখা গিয়েছিল। সংগীত জগতে তাঁর যেন শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি গীতিকার পুলক।* পুলকবাবু হাজার চারেক গান লিখলেও তাঁর হিট গান ছিল মান্না দে-র কণ্ঠে 'সে আমার ছোট বোন, বড় আদরের ছোট বোন'। এরজন্য তিনি রয়েলটি পেয়েছেন মোট ছেচল্লিশ হাজার টাকা। 'বাংলা গানের ক্ষেত্রে এটি একটি রেকর্ড''—বললেন পুলকবাবু। এই গানটি রচনার পেছনেও যে ইতিহাসটি আছে তা উল্লেখ করার মত। খ্যাতনামা বোম্বাইয়ের গায়ক মান্না দে র সঙ্গে পুলকবাবু হৃদ্যতা ও অন্তরঙ্গতা প্রশ্নাতীত। একদিন মান্না বললেন—'পুলক পশ্চিমী ঢঙে 'ব্যালাড সং' লেখ। তবে দেখো যেন পুরোপুরি বাঙালীর সুখদুঃখের কথা তাতে থাকে।' মান্নাদার কথামত লিখেও ফেললাম। মান্নাদার খুব পছন্দও হল। প্রাণ দিয়ে তিনি সুর দিলেন এবং গাইলেন। এই গানটি যখন গ্রামেগঞ্জে শহরে লক্ষকণ্ঠে গুঞ্জরিত হচ্ছে তারই মাঝে প্রায়ই ফোনে পুলকবাবুকে সহৃদয় শ্রোতারা জানতে চাইতেন যে তাঁর ছোট বোনটি কি সত্যই ক্যান্সারে মারা গেছে? পুলকবাবুর নিজের কথা—'মান্নাদাকেও শ্রোতারা জানতে চাইতেন আমার ছোট বোনটি কি শেষ পর্যন্ত ক্যান্সারে মারা গেছে না বেঁচে আছে।' পাঠকরা জেনে রাখুন পুলকবাবুর কোন ছোট বোন ছিল না। তথাপি গীতিকারের চরম সার্থকতা এখানেই যে তিনি অপরের ছোটবোনের দুঃখের সংগে একাত্ম হতে পেরেছেন।

এরপরই আর এক খ্যাতনামা সুরকার ও গীতিকারের নাম এখানে উল্লেখ করার মত। তিনি হচ্ছেন হাওড়া-শালিখার অনল চট্টোপাধ্যায়। দুই পুরুষ ধরে শালিখায় বাস করলেও আদিবাস ছিল বরিশালের (বাংলাদেশ) সিদ্ধকাটি গ্রামে। পিতার নাম জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। কিশোর বয়স থেকে সাহিত্য রচনা করলেও কবিতার প্রতি আসক্তি ছিল প্রবল। সাহিত্য চর্চার সংগে সংগে সংগীত চর্চাও চলতে থাকে। তিনি সংগীতের প্রথম পাঠ লাভ করেন শালিখারই পঞ্চানন রায় নামে একজন সংগীত শিক্ষকের কাছে। এরপর যুবক বয়সে তিনি ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সংস্পর্শে প্রথমে সলিল চৌধুরী, পরে সুখেন্দু গোস্বামী, বিশিষ্ট সুরকার-গীতিকার জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও তারাপদ চক্রবর্তী প্রমুখ সংগীত শিক্ষকদের সান্নিধ্যে এসে উন্নততর সংগীত শিক্ষা ও রচনায় পারদর্শিতা লাভ করেন। পরে অবশ্য অনলবাবুর কবিতার রূপান্তর ঘটল গীতি-কবিতায় আর গীতিকার থেকে হয়ে উঠলেন প্রথম শ্রেণীর সুরকার।

---

*হিমাংশু ঘোষের সাক্ষাৎকার ৫. ২. ৮৯ সালে তাঁর শালিখা ধমতলার বাড়িতে।

অনলবাবু প্রথম গানের রেকর্ড করেন ১৯৫৪ সালে এইচ. এম. ভি-তে। তাঁরই কথায় ও সুরে গানটি সেদিন গেয়েছিলেন সুচিত্রা মিত্র। গানের বাণী ছিল—আজ বাংলার বুকে দারুণ হাহাকার, অপর পিঠে ছিল কোথায় সোনার ধান। ১৯৫৪ সালে প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় কলম্বিয়া রেকর্ডে অনলবাবুর সুরে গাওয়া গানটি সেই সময়ে সুরকার ও গায়িকার দুজনকেই শ্রোতাদের কাছে সম্মানের আসনে বসিয়েছিল। গানের প্রথম স্তবকটি এখনও অনেকের মুখেই শুনা যায়—

ছলকে পড়ে কলকে ফুলে
মধু যে আর রয় না।
চাঁপার বনে গান ধরেছে
ভিন দেশী কোন ময়না॥

এই গানটির সুরে এমনই ঠুংরী ও পল্লীগীতির অপূর্ব সংমিশ্রণ ছিল যে সুরের যাদুকর রবিশংকর ও আলী আকবর পর্যন্ত অনলবাবুকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেছিলেন—'একে শুধু ঠুংরী না বলে ফুংরীও বলব।' সুরকার হিসেবে শিল্পীর বেস্ট সেলার রেকর্ড ছিল তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া 'মধুমতী যায় বয়ে যায়' গানটি। গানটি ১৯৬৪ সালে এইচ. এম. ভি. রেকর্ড করে। শিল্পীর মুখের কথাই বলি—'শ্রীকান্ত-এর লেখা এই গানটিতে সুর দিয়ে ভাবলাম এটি যদি হেমন্ত, শ্যামল, সতীনাথ বা মানবেন্দ্র গায় তবে খুবই তৃপ্তি পাব। কিন্তু রেকর্ড কোম্পানির কর্তৃপক্ষ গাওয়ালেন তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে। তখন তরুণবাবু আমাদের হাওড়ার কালী ব্যানার্জী লেনেই থাকতেন। বহু বছর তিনি হাওড়ায় ছিলেন এবং বিয়েও করেন হাওড়ার মেয়েকেই। আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে হলেও রেকর্ড কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বলা সাহস ছিল না। পরে অবশ্য দেখলাম কর্তৃপক্ষের বিবেচনাই যথার্থ। প্রচুর সুনাম ও আর্থিক সম্মান দুই-ই তাতে পেয়েছি।' আর একটি গানের সুরও সত্তরের দশকের শেষ দিকে বাংলা গানের আসরকে মাতিয়ে দিত। সেটি হল শ্যামল গুপ্তের লেখা ও অনল চট্টোপাধ্যায়ের সুরে সন্ধ্যা মুখার্জীর গাওয়া—জলতরঙ্গ বাজে' গানটি। এছাড়া বেশ কয়েকটি ছায়াছবির যেমন 'পাশের বাড়ি', 'মহিলা মহল', 'বাঁশের কেল্লা' 'রিক্সাওয়ালা', 'বাড়ি থেকে পালিয়ে', 'গঙ্গা' প্রভৃতি বইতে তিনি সলিল চৌধুরীর সঙ্গে সহকারীরূপে কাজ করেছেন। মৃণাল সেনের 'রাত ভোর' ছবিতে তিনি ও অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় যুগ্মভাবে সুর সংযোজনা করে শ্রোতাদের মনে আজও জাগ্রত হয়ে আছেন।

আর একজন খ্যাতনামা সংগীতকার ও প্লে-ব্যাক সিঙ্গারের সম্বন্ধে দুচার কথা বলতেই হবে। তিনি হচ্ছেন বালি গ্রামের তথা হাওড়া জেলার আধুনিক গানের শিল্পী সনৎ সিংহ। দেশ স্বাধীন হওয়ার বছর থেকেই জনসমক্ষে গাইতে শুরু করেন। জীবনের প্রথম রেকর্ড (১৯৪৬)—মাটির বুকেতে নাই প্রেম। গানের হাতেখড়ি দাদা কিশোরী মোহন সিংহ-র কাছে। তারপর শিক্ষা ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও

পরে চিন্ময় লাহিড়ী। সনৎ সিংহ-র 'বাপুরাম সাপুড়ে, কোথা যাও বাপুরে' ঘুমপাড়ানি গানের মত বাংলার ঘরে ঘরে মা দিদিরা গেয়ে বাচ্চাদের মনে ছন্দের দোলা জাগিয়ে ঘুম পাড়াতেন। অনল চ্যাটার্জীর সুরে 'সরস্বতী বিদ্যাপতি তোমায় দিলাম খোলা চিঠি' তাঁর গলায় এক অনুপম ভাবরসে বঙ্গবাসীকে আপ্লুত করার শক্তি আজও রাখে। 'হংস মিথুন' ছায়াছবিতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে গাওয়া 'মান করে নয় রাগ করে আজ চলে গেছেন রাই' সঙ্গীত পিপাসু বাঙালী আজও ভোলেনি। সনৎবাবু বাংলার তথা ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে সাত সমুদ্র তের নদীর পারেও গুণমুগ্ধ শ্রোতাদের আহ্বান এড়াতে পারেননি। তাই ১৯৮১ সালে লণ্ডনে কমনওয়েলথ দেশের শিল্পী সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি যান। ১৯৮৩ সালে উত্তর আমেরিকায় তথাকার বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের আহ্বানে গান গেয়ে আসেন। তবে সনৎবাবুকে গানের রেকর্ড করাতে প্রথম সাহায্য করেন প্রফুল্ল ভট্টাচার্য (ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের দাদা) যাঁর কথা তিনি আজও স্বীকার করেন। সত্তরের দশকে হাওড়া-শালিখার আর এক উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের অভিনেতা ছিলেন শ্যামল ঘোষাল। একাধিক ছবিতে অভিনয় করলেও 'হেডমাষ্টার' ছবিতে প্রধান শিক্ষক ছবি বিশ্বাসের সঙ্গে নায়ক (প্রাক্তন ছাত্র) শ্যামলবাবুর কথোপকথন এখনও হয়তো অনেকের মনে থাকবে।

এতক্ষণ হাওড়ার যে সব প্রযোজক, পরিচালক, গীতিকার ও নেপথ্য সঙ্গীত-কারদের নিয়ে আলোচনা করা হল তাঁরা সবাই প্রবীণ, গুণে অতুলনীয় ও মানে উন্নত গোত্রীয়। কিন্তু এবারে যাকে নিয়ে অধ্যায়টি শেষ করা হবে তার আসল নাম মলয় ভট্টাচার্য।* শালকিয়ার মাটি তার ছিল কৈশোরের কিশলয়, যৌবনের উপবন হবার আগেই সরকারী আর্ট কলেজে পাশ করে পশ্চিম জার্মানীতে পাড়ি দেয়। শালকিয়া বেনারস রোডের ভট্টাচার্য বাড়ীর ছেলে মলয় আজ একজন উঁচু দরের সিনেমা পরিচালকরূপে সিনেমা জুরীদের দ্বারা বিবেচিত হয়েছে। মলয়ের নির্দেশিত 'কাহিনী' চলচ্চিত্রটি ১৯৯৫ সালে রিলিজ হয়। আর ১৯৯৬ সালে বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রাপকের জন্য বিচারকমণ্ডলী গঠিত হয়েছিল তাঁরা ঐ বছরে শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসাবে 'স্বর্ণকমল' পুরস্কারে মলয়কে ভূষিত করেছেন। সাধারণ দর্শকরা হয়তো ছবিটির নামও শোনেননি—দেখা তো দূরের কথা। 'স্বর্ণকমল' পুরস্কার হাওড়া-বাসী হিসাবে তিনিই প্রথম পেলেন। তবে এই ছবিটি করতে মলয়বাবুকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল পঁচিশ বছর। কারণ ভীষণ অর্থাভাব। দ্বিতীয় ছবির জন্য হয়তো আরও পঁচিশ বছর অপেক্ষা করতে হতে পারে—কারণ তাঁর ছবি সাধারণের জন্য নয়—বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত দর্শকের জন্য। আজ মলয় হাওড়া ছেড়ে কলকাতাতেই থাকছে।

* জীবনের প্রথম চলচ্চিত্রেই 'স্বর্ণকমল' পেল।

১. বাংলায় চলচ্চিত্রকার—নিশীথ কুমার মুখোপাধ্যায়।

২, ৩, ৪. দীপালি—রজত জয়ন্তী সংখ্যা ১৯৫৩।

৫. দেশ সাহিত্য সংখ্যা—১৩৮২।

৬. তেমন হাসির ছবি কই—রবি বসু—সাপ্তাহিক বর্তমান ১২. ১০. ৯১।

৭. প্রখ্যাত নটের স্ত্রী বড় কষ্টে বেঁচে আছেন—অশোক মান্না (সানন্দা—২৫শে জুলাই ১৯৯১)।

৮. ৯ আনন্দবাজার পত্রিকা—কলকাতার করচা সুবর্ণ জয়ন্তী ২৭. ৭. ৭৭।

হাওড়া জেলার বিশিষ্ট আধুনিক শিল্পী গায়কদের সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়টিতে কয়েকজন শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল যাতে আগামী প্রজন্মের কাছে তাঁরা বিস্মৃত হয়ে না যান। গান-বাজনার চর্চা আজও হয়—তবে নবাগতদের জেনে রাখা ভাল যে তাদের পূর্বসূরীরাও ছিলেন এক একজন সঙ্গীত জগতের দিকপাল।

কালীপদ পাঠক—বাংলার সঙ্গীত জগতে টপ্পা গানের কথা উঠলেই প্রথমেই যাঁর কথা মনে পড়ে তিনি হচ্ছেন রামনিধি গুপ্ত। অবশ্য ঐ নামের চেয়ে 'নিধুবাবু' নামেই তিনি বিশেষ পরিচিত। টপ্পা গানের ঘরোয়ানাই হচ্ছে পাঞ্জাব ও রাজস্থানের। টপ্পা গানের গায়নশৈলীর বৈশিষ্ট্যই হল তার 'জমজমাতান'। অর্থাৎ শীতকালে ভারতের উত্তর পশ্চিমাংশে উট নিয়ে মরুভূমি অতিক্রম করার সময় প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় গান গাইতে গিয়ে ঠোঁটের ভেতর থেকে যে ধরনের কম্পিত স্বর বা ধ্বনি বের হয় তাকেই 'জমজমাতান' বলা হয়। শাস্ত্রীয় গানের গবেষকরা বলেন যে উষ্ট্র পৃষ্ঠে মরুভূমি অতিক্রমের ক্লান্তিকর একঘেয়েমী অবস্থা দূর করাই হল টপ্পা গায়নশৈলীর মূল ভিত্তি। তবে এই গানের প্রবর্তক সোরী মিঞার গানে যে পাঞ্জাবী রুক্ষতা ও কাঠিন্য দেখা দিত বাঙ্গালী 'নিধুবাবু'র গলায় বাংলার পলিমাটিতে তা বহুলাংশে নমনীয় ও রমণীয় হয়ে ওঠে। আবার নিধুবাবুর টপ্পার ধারাকে যাঁরা বাংলাতে আরও পরিশীলিত করে তুলতে অগ্রণী হয়েছিলেন আচার্য কালীপদ পাঠক তাঁদের মধ্যে সবাগ্রে স্মরণীয়। জন্মসূত্রে শুধু নয় তিনি জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই মধ্য হাওড়ায় অতিবাহিত করেছেন। পাঠকজীর প্রথম টপ্পা গানের রেকর্ড প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালের, জুলাই মাসে গ্রামোফোন কোম্পানীর উদ্যোগে। গান দুটির এক পিঠে ছিল—আমার প্রেম রাখা দায় হল (গারা টপ্পা)—আর উল্টো পিঠে ছিল —আমারে কাঁদায়ে যাবে যদি যাও (সিন্ধুরা)। সঙ্গীতপ্রিয় টপ্পা বিলাসীদের মুখে ঐ সুর আজও হয়তো গুঞ্জিত হতে শোনা যাবে। অভিজ্ঞদের অভিমত—পাঠক মহাশয়ের উদাত্ত সুমধুর কণ্ঠস্বর ও স্পষ্ট উচ্চারণের অপরূপ গায়কী ভঙ্গীটি এক কথায় ছিল অসাধারণ। তদানীন্তন কালে গ্রামোফোন কোম্পানী যে প্রচার পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছিলেন তাতে লেখা ছিল—'হাওড়ার প্রসিদ্ধ গায়ক কালীবাবুর টপ্পা গান দুখানি আমরা প্রকাশ করিতেছি। আমাদের সঙ্গীতের ভিতর টপ্পা বড়ই মধুর জিনিষ এবং তা দু'একজন ব্যতীত আর কাহারও কাছে বড় শোনা যায় না। কালীবাবু এই টপ্পায় বিশেষ পারদর্শী। এই রেকর্ডখানি শুনিলে বেশ বোঝা যায়।'

এরপর ১৯৩৫-এ সেনোলা রেকর্ড কোম্পানী পাঠক মশাইকে দিয়ে দুটি নিধুবাবুর টপ্পা রেকর্ড প্রকাশ করেন। তাদের প্রকাশিত পুস্তিকায় যে কথাগুলি বিস্তারিত ভাবে লেখা হয়েছিল সেটাও তুলে দেওয়া হল কালীবাবুর অনন্য সাধারণ গায়কীকে বোঝবার জন্য। যেমন—'বর্তমান কালে বাংলা দেশে পাঠক মহাশয়ের তুল্য টপ্পা গায়ক খুঁজে পাওয়া সত্যই দুরূহ। টপ্পা গানের মধ্যে মন কেড়ে নেবার যে কি আবেদন থাকতে পারে, পাঠক মহাশয়ের গান না শুনলে বোঝা যায় না। অনেক সময় দেখা যায় যে আসরে বড় বড় গায়কদের গান যেমন লাগে, রেকর্ডে ঠিক তেমনটি হয় না। তার কারণ রেকর্ড প্রযোজনার একটা বিশেষ কায়দা আছে। পাঠক মহাশয়ের স্পষ্ট. সুমধুর এবং উদাত্ত কণ্ঠস্বর ও গাইবার অপরূপ ভঙ্গী পর্যন্ত সেনোলার এই রেকর্ডে হুবহু উঠেছে। আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, বহু সান্ধ্য আসরে, বহু নিভৃত অবসর বিনোদনের সময় এই রেকর্ডখানি সুরের অমৃত রসের পাত্রে আনন্দের সুধা এনে দেবে।'

পাঠকজীর কতিপয় সুযোগ্য শিষ্যদের মধ্যে হচ্ছেন চণ্ডীদাস মাল (বালি), গোপাল চট্টোপাধ্যায় (কদমতলা) ও রামকুমার চট্টোপাধ্যায় (কলকাতা) প্রমুখ।

হরেন্দ্রনাথ দত্ত—রবীন্দ্র সংগীতকে প্রথম যুগে যাঁরা প্রচারের জন্য অনলস চেষ্টা করে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে হরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম করলে অত্যুক্তি হবে না। ১৯০৬ সাল নাগাদ হাওড়া শিবপুরের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তিনি জন্মান। অল্প বয়স থেকেই সংগীতের উপর ভীষণ ঝোঁক ছিল। রবীন্দ্র সংগীত ছাড়াও মীরার ভজন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গান তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে। তদানীন্তনকালে তাঁর রবীন্দ্রনাথের সুরে 'বন্দেমাতরম' গানের রেকর্ড প্রাচীনদের কাছে এখনও আলোচনার বস্তু। ১৯২৫ থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যে তিনি অন্ততঃপক্ষে দশ-বারটি রবীন্দ্র সংগীতের রেকর্ড করেছিলেন। হিজ মাষ্টার্স গ্রামোফোন কোম্পানীর দৌলতে তখনকার দিনে হরেন্দ্রনাথের গলায় রবীন্দ্র সংগীতের রেকর্ড বাংলাদেশের ঘরে ঘরে গীত হতে শোনা যেত। তাঁর বিখ্যাত রেকর্ডগুলির মধ্যে ছিল—একলা ঘরে বসে বসে কি সুর বাজালে—উল্টো পিঠে—ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবি / দেখে যা-দেখে যা-দেখে যা'লো তোরা / আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে—ও আমার চাঁদের আলো প্রভৃতি। কিন্তু হাওড়াবাসীর দুর্ভাগ্য তিনি অকালেই মৃত্যুবরণ করেন।

রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—হাওড়া শিবপুরের আর এক বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ হলেন রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রথম জীবনে প্রসিদ্ধ বহরমপুরের গিরিজা শংকর চক্রবর্তী এবং পরে আগ্রার ওস্তাদ গোলাম আব্বাসের দৌহিত্র ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ এবং আতা হোসেনের কাছে হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সংগীতের তালিম নিয়েছিলেন। ১৯৩৫ সালে এলাহাবাদে নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনে প্রথম স্থান অধিকার করে বঙ্গবাসীর মুখোজ্জ্বল করেছিলেন। তিনি যে কত বড় সংগীতজ্ঞ ছিলেন তা ১৯৩৫ সালে তাঁর প্রথম রেকর্ডে সেনোলা (Senola) রেকর্ড কোম্পানী যে শিল্পী পরিচিতি ছেপেছিল তা থেকেই উদ্ধৃতি দেওয়া হল। কোম্পানীটি লিখছে—'বাংলাদেশে

সংগীতের এবং সুরের বিশুদ্ধতায় যে নবজাগরণ আসিতেছে সেনোলার এই রেকর্ডখানি তাহারই অগ্রদূত এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। প্রাণহীন কালোয়াতী ঢঙের পরিবর্তে প্রকৃত গুণী কিভাবে সুরের চরম বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া সংগীতকে মধুরতায় ভরিয়া তুলিতে পারেন যে মধুরতার স্পর্শে যে কোন মনকে অভিভূত করিবে তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইল এই রেকর্ডখানি।' ধূমকেতু সুলভ প্রতিভাসম্পন্ন এই শিল্পীর সুরমূর্ছনা হাওড়া তথা বঙ্গবাসীর হৃদয়গগন থেকে হঠাৎই হারিয়ে গেল কালের নির্মম পরিহাসে।

গোপাল চট্টোপাধ্যায়—আচার্য কালীপদ পাঠকের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করে টপ্পা গানে যাঁরা এ বঙ্গে যশস্বী হয়েছেন গোপাল চট্টোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে একজন। হাওড়া শহরে কদমতলা অঞ্চলে এই শিল্পীর জন্ম ১৯১৮ সালে। প্রবীণ এই শিল্পীর ছোট বয়সেই সংগীতের হাতেখড়ি হয় পিতা সুরেন্দ্রনাথের কাছে। পরে ১৯২৭ সালে মাত্র ন'বছর বয়সে টপ্পা বিশারদ কালীপদ পাঠকের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে 'আকাশবাণী'র শিল্পী হিসাবে নির্বাচিত হন। আজও সেই ধারা অক্ষুণ্ণ আছে। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠমাধুর্য ও সংগীত প্রতিভার উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছিল কৃষ্ণচন্দ্র দে (কানা কেষ্ট) ও জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামীর কাছ থেকে। তাঁর গান শোনার জন্য ওস্তাদ আমীর খাঁ ও বিশিষ্ট তবলাবাদক হীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী শিল্পীকে আসরে আপ্যায়ণ করেছিলেন। অশীতিপর এই শিল্পীর কণ্ঠে আজও তরুণোচিত অভঙ্গসুরের গলা শ্রোতাদের কাছে গর্বের বস্তু হয়ে আছে।

দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য—এবারে একজন যন্ত্রবাদকের নাম উল্লেখ করা হল যিনি মৃদঙ্গ বাজনায় একজন প্রবাদ পুরুষ হিসাবে বাংলাদেশ তথা সারা ভারতবর্ষে পরিচিত। তাঁর নাম হচ্ছে দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য। এই দুর্লভচন্দ্রও হাওড়া শিবপুরের বাসিন্দা ছিলেন। মৃদঙ্গ বাজনা পশ্চিমী ধ্রুপদী ঘরানায় শিক্ষালাভ করলেও দুর্লভবাবুর হাতে তা এক অপূর্ব সংগীত মাধুর্য লাভ করেছিল। এই সেদিন পর্যন্ত দুর্লভবাবুর দৌহিত্র ও তাঁর গুণমুগ্ধদের দ্বারা শিল্পীর স্মৃতিসভা উপলক্ষ্যে উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসর বসতো—কিন্তু তাও আজ বন্ধ হয়ে গেছে।*

চণ্ডীদাস মাল—বালি গ্রামের আর এক উল্লেখযোগ্য সংগীতজ্ঞ হচ্ছেন চণ্ডীদাস মাল। বালিতেই জন্ম ১৯৩০ সালে। প্রথম সংগীতের হাতেখড়ি হয় কিশোরীমোহন সিংহ-এর (সনৎ সিংহের দাদা) কাছে। তারপর বিভিন্ন ধরনের গানের অনুশীলনের জন্য রামচন্দ্র পাল, কালীপদ পাঠক, কৃষ্ণচন্দ্র দে (কানা কেষ্ট), জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ প্রমুখ গুরুদের কাছে শিক্ষালাভ করেন। ১৯৪৪ সালে প্রথম রেডিওতে গান করে আকাশবাণীর নিয়মিত শিল্পী হন। দেশ স্বাধীন হলে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দু'বছর পরেই অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৯৭৫ থেকে বেঙ্গল মিউজিক কলেজ, পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র এবং রাজ্য সংগীত একাডেমীতেও

---

* উপরিউক্ত তথ্যগুলির উৎস—ইঞ্জিনীয়ার সিদ্ধানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

সংগীত শিক্ষক হিসাবে কাজ করেন। একদা 'বালি নর্থ ক্লাবে' 'ভীষ্ম' নাটকে অভিনয়ে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত ভক্তিগীতি হচ্ছে—মা যার আনন্দময়ী সে কি নিরানন্দে থাকে ? / ইহকালে পরকালে মা তাকে আনন্দে রাখে। অপরটি হচ্ছে—নবমী নিশীথে উমা যাবে ফিরে।

অমিয়া ঠাকুর (রায়)—কলকাতার এমপায়ার থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মায়ার খেলা' অভিনয় হবে। পরিচালনা করছেন ঠাকুর বাড়ীর বিদুষী নারী সরলাদেবী। ১৯২৭ সাল, ১৭ই আগস্ট। ঠাকুরবাড়ির কে নেই! মঞ্চ সজ্জায় গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাজগোজে প্রতিমাদেবী ও পারুল ঠাকুর. অর্গানে ইন্দিরাদেবী, পিয়ানোয় মনীষাদেবী, বেহালায় কেবল 'তিমির হরণের দাদা মিহির কিরণ।'[১] সরলাদেবী 'প্রমদা'র ভূমিকায় বেথুন কলেজের একটি মেয়েকে নির্বাচিত করেছিলেন। তাঁর নির্বাচন সঠিক কিনা তা বাজিয়ে নেবার জন্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছেও মেয়েটিকে হাজির করানো হয়েছিল। এমনকি পূর্বনির্দ্ধারিত কর্মসূচী বাতিল করেও সেই মেয়েটির গান কবিগুরু শুনেছিলেন। প্রশান্ত মহালনবিশকে কবি নিজেই চিঠিতে লিখছেন—"প্রশান্ত, বৃহস্পতিবারে যাব ঠিক করেছিলুম, হয়ে উঠল না। সরলা বললেন···বেথুন কলেজে অমিয়া রায় বলে একটি মেয়ে আছে তার গলা ঝুনুর চেয়েও ভালো। তার বাপ কি রাজি হবেন? মেয়েটি ব্রাহ্ম ঘরের নয়। তার খবর জান কি না তাও জানিনে। ২৪ শ্রাবণ ১৩২৯।"[২]

অমিয়াকে সরলাদেবী কবির কাছে হাজির করে গান শোনাবার আগেই বললেন, 'গান ওর শেখা হয়ে গেছে—ওকে অঙ্গভঙ্গীগুলি কেবল দেখিয়ে দিন।' কবিও ভীষণ ব্যস্ত থাকায় তাই দেখিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন। বলা বাহুল্য 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যে অমিয়া রায়ের ভুয়সী প্রশংসা করে স্টেটসম্যান— ১৯.৮.২৭ লিখছে—**Miss Amiya Roy whose last song made a peculiarly plaintive appeal to the hearts of audience.**

এই 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যের মাধ্যমেই সুরেন্দ্রনাথ রায়ের (অমিয়া রায়ের পিতা) পরিবারের আলাপ-পরিচয় ঘটে ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে। আলাপচারিতা থেকে শেষে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হল। হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র হৃদিন্দ্রনাথের সঙ্গে অমিয়াদেবীর বিবাহ হয়। সেই থেকেই অমিয়া রায় ঠাকুর বাড়ির বউ হয়ে অমিয়া ঠাকুর নামে সুপরিচিতা। সুরেন্দ্রনাথ রায় ব্রাহ্ম না হলেও অমিয়াদেবীর বিবাহ ব্রাহ্ম মতেই হয়েছিল।[৩] অমিয়াদেবী পিতৃগৃহে বিয়ের আগে পর্যন্ত যেমন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের জন্য মুসলমান ওস্তাদের কাছে গান শিখতেন তেমনি ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি শিখতেন প্রধানত পিতৃবন্ধু যোগেন্দ্র কিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরে গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। শ্বশুর বাড়িতে গিয়েও কিন্তু গান শেখার ব্যাপারে কোন ব্যাঘাত ঘটেনি। কারণ শ্বশুর হিতেন্দ্রনাথ স্বয়ং হিন্দুস্থানী সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তাই বিয়ের পরেও ঠাকুর বাড়িতে অন্যদের সঙ্গে অমিয়াদেবীও যোগেন্দ্রবাবু ও গোপেশ্বরবাবুর কাছে গান শিখতেন। কবিগুরু কলকাতায় এসে

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে উঠলেই অমিয়া ঠাকুর তাঁর কাছে গান শেখার সুবিধা পেতেন। অমিয়া ঠাকুরের গলায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যে সব গানগুলি নাম করে শুনতে চাইতেন সেগুলি হচ্ছে—মরি লো মরি / সখী আঁধারে একেলা ঘরে / ওগো কাঙাল আমারে/ কি ধ্বনি বাজে গহন চেতনা মাঝে প্রভৃতি।

এই শেষের গানটির একটি ইতিহাস আছে। কি ধ্বনি বাজে প্রবন্ধে অমিয়া ঠাকুর নিজেই লিখেছেন—'রবিদাদামশাই খড়দহে গঙ্গাঁর ধারে এক বাসাবাড়িতে কিছুকাল বাস করেন। হঠাৎ একদিন ওখান থেকে গাড়ি পাঠিয়ে ডেকে পাঠালেন। দুপুরবেলা সবাই পৌঁছলাম।...কিছুক্ষণ কথা বলার পর একটা হিন্দী গান শুনতে চাইলেন। আমি গোপেশ্বর বাবুর কাছে শেখা পূরবী রাগে একটি খেয়াল গান গেয়ে শুনোলাম।...সিঁড়ি থেকে দু-তিন ধাপ নেমেছি সবে, এমন সময় আবার ডেকে পাঠালেন।...একটা ছোট কাগজ আমার সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন 'ওই হিন্দি গানটা থেকে একটি বাংলা গান করেছি।' কথাগুলি হিন্দী গানের সুরে বসিয়ে গাইতে বললেন। আমি বিমূঢ় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না অল্পক্ষণ মাত্র শুনে কি করে তিনি সমস্ত সুরটা মনে রাখলেন।' সেই গানটি হচ্ছে এই—

কি ধ্বনি বাজে
গহন চেতনা মাঝে।
কি আনন্দে উচ্ছ্বসিল
মম তনুবীণা গহন চেতনা মাঝে।
মন প্রাণহরা সুধা-ঝরা
পরশে ভাবনা উদাসীনা।

রবীন্দ্র সঙ্গীত গায়িকাদের মধ্যে অমিয়া ঠাকুরের একটা বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু আমাদের অধিকাংশের কাছে যেটা জানা নেই সেটা তাঁর নিজের লেখা দিয়েই শেষ করা হল। সেটা হচ্ছে এই রকম—জন্মেছিলাম কলকাতার বিডন স্ট্রীটে বেথুন কলেজের উল্টো দিকের এক বাড়িতে ১৯০৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে।...একটু বড় হয়ে চলে গিয়েছিলাম দিদিমার বাড়ি বেলুড়ে। ওখানেই থাকতাম আমরা। দাদামশাইয়ের ঠাকুরদা ছিলেন বর্দ্ধমান মহারাজার দেওয়ান। সেই সূত্রে তিনি সেখানে অনেক দেবোত্তর জমি পেয়েছিলেন। তাঁরই নামে ছিল দিদিমার বাড়ির রাস্তা। দিদিমার কোন ছেলে ছিল না, মা আর মাসিমা দুই মেয়ে। তাই মায়ের বিয়ের পর বাবা সুরেন্দ্রনাথ রায়ই ছিলেন তাঁর সব। বেলুড়ের বাড়ি থেকে বাবা ব্যারিষ্টারী করতে আসতেন কলকাতায়। বাড়ি থেকে হেঁটে লিলুয়া আসতে লাগত প্রায় পনেরো মিনিট। ওখান থেকে ট্রেনে করে হাওড়া।[8]...এখানে উল্লেখ করতে পারা যায় যে সুরেন্দ্রনাথের প্রথমা স্ত্রী ও এক শিশু পুত্র অকালেই মারা যান। সুরেন্দ্রনাথ তারপর ব্যারিষ্টারী পড়তে বিলেতে যান। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও লিখছেন—বাবা বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ করে ফিরে এলে মায়ের

সঙ্গে বিয়ে হয়। মা সুরেন্দ্রবালা ছিলেন খুব সুন্দরী। বেলুড়ের বাড়ির সেই প্রথম স্মৃতি এখনো স্বপ্নের মত দেখি। গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে কামাখ্যা চট্টোপাধ্যায়ের (দাদামশায়ের ঠাকুরদা) গলি। কি সুন্দর চকমিলানো বাড়ি। বাড়ির সামনে রাস্তার উল্টো দিকে শিবের মন্দির ও অনেকটা খালি জমি। মাঝে মাঝেই জেলে ডেকে বাবা পুকুরে মাছ ধরাতেন। মেয়েদের তখন বেলুড় মঠে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল না বলে কোনদিন সেখানে গিয়েছি বলে মনে পড়ে না। কি দুর্ভাগ্য! আমাদেরও মনে পড়েনি অমিয়া রায়কে যদি না তিনি নিজে থেকেই হাওড়ার সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগের কথা জানাতেন 'কি ধ্বনি বাজে' লেখার মাধ্যমে।

সতীশ অর্ণব - বেহালা নিবাসী সতীশ অর্ণব যুবক বয়স থেকেই শালিখায় বসবাস করে এখানেই পরলোকগমন করেছেন। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে তাঁর বেশ নামডাক ছিল। তাই শালিখার লোক তাঁকে ওস্তাদ পাঁচুবাবু বলে থাকতেন। বিখ্যাত সঙ্গীতকার গিরিজা শংকর চক্রবর্তীর কাছে ছিল তাঁর সঙ্গীতের হাতে খড়ি। পরে তিনি বাদল খাঁ সাহেবের কাছে তালিম নেন। পেশাতে তিনি ব্যাঙ্কের করণিক ছিলেন। সঙ্গীত ছিল তাঁর নেশা। তাঁর হাতে অনেক ছাত্র-ছাত্রী বিনা ব্যয়ে সঙ্গীত শিখেছেন। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে ছিলেন উমাশংকর চট্টোপাধ্যায়। পাঁচুবাবু শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চা করলেও তিনি ঠুংরীতে ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। এই ঠুংরী বিদ্যায় তিনি তালিম নিয়েছিলেন জদ্দনবাই-য়ের কাছে। এই জদ্দনবাই ছিলেন খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী নার্গিশের মাতৃদেবী। পাঁচুবাবুর জলসা-অনুষ্ঠান করার খুব ঝোঁক ছিল—কখন বড় কখনও বা ছোট। পাঁচুবাবুর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে সেকালে কিরূপ আসন ছিল তা কেশরীবাই ও পাকিস্তানের রসুনারা বেগমের পাঁচু বাবুর শালিখার বাড়িতে এসে ঘরোয়া জলসায় গান গাওয়া থেকেই বোঝা যায়। এই পাঁচুবাবুর সুযোগ্যা কন্যাই হচ্ছেন বেলা অর্ণব—যাঁর কথা পরে উল্লিখিত হয়েছে।

উমাশংকর চট্টোপাধ্যায় (শঙ্কুদা)—প্রথম জীবনে তিনি সতীশ অর্ণবের কাছেই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তালিম নেন। পরে তিনি কলকাতার বিখ্যাত শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকার সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও তালিম নেন। (এই সত্যকিঙ্কর বাবুর পুত্রই হচ্ছেন আবার সঙ্গীতকার অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। উমাশংকরবাবু অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর একজন নিয়মিত শিল্পী ছিলেন। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য পর্যন্ত উমাশংকর-বাবুর কাছে ওস্তাদী গানের তালিম নিতে শালিখায় আসতেন। শ্রীভট্টাচার্যের সহায়তায়ই উমাবাবু রানী রাসমণির বাড়িতে সঙ্গীত শিক্ষকের পদ লাভ করেছিলেন —এতে উমাবাবুর বিশেষভাবে আর্থিক সুবিধা হয়েছিল। উমাবাবু 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র' বইতে মিউজিক ডিরেক্টর ছিলেন। তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর শ্রুতিধর ছিলেন। যে গান একবার শুনতেন তা তিনি সহজেই তুলে নিতেন। বড়ে গোলামআলি খাঁ সাহেবের 'আয় না বালম কেয়া করু সজনী' তাঁর গলায় এক অপরূপ মাত্রা পেত। অজান্তে তিনি গাইলে মনে হতো খাঁ সাহেব নিজেই যেন

গাইছেন। ঐ গানটি টেপ এখনও পর্যন্ত শালিখার প্রাচীন বাসিন্দা জগবন্ধু ঘোষের পুত্র নীলমণি ঘোষের কাছে রক্ষিত আছে। এইভাবে তিনি আমীর খাঁ ও আব্দুল করিম খাঁ সাহেবেরও গান গাইতে পারতেন। দুঃখের বিষয় এহেন শিল্পী কঠিন দারিদ্র্যে মৃত্যুবরণ করেন।

বারাণসী বিশ্বাস (নসীদা)—শালিখার 'নসীদা' এক বিখ্যাত হারমোনিয়াম ও অরগ্যান বাজিয়ে ছিলেন। তাঁর এই কাজে গুরু ছিলেন পিলখানার সাজাহান মুন্সী নামে এক মুসলমান ওস্তাদ। পরে তিনি সঙ্গীতেও পারদর্শী হয়ে ওঠেন। বরাহনগরে দেবদত্ত স্টুডিওতে গৃহীত 'পথভুলে' ও 'রজনী' প্রভৃতি বইতে সুরারোপ করেছিলেন ('৪৫-৪৬ সাল)। একবার শালিখার 'নাট্য পীঠে' (বর্তমান পিকাডিলি সিনেমা) 'চন্দ্রগুপ্ত' থিয়েটার হচ্ছে। বিখ্যাত কে. সি. দে (কানা কেষ্ট) অভিনয় করবেন ঘোষণা করা হয়। অভিনয় দেখার জন্যে প্রচুর টিকিটও বিক্রি হয়েছে। কিন্তু অনিবার্য কারণবশতঃ কানা কেষ্টবাবু আসতে পারলেন না। সেদিন সবার অজান্তে বারাণসীবাবু সেই অভিনায়ংশে নেমে তাঁরই গানেতে আসর মাতিয়ে দিয়ে গেলেন। কেউই বুঝতেই পারলেন না যে সেদিন কে, সি, দে-র বদলে বারাণসী বিশ্বাস অর্থাৎ নসীবাবুই অভিনয় করে গেলেন। এই 'নসীদার' বাড়ি (এখনও তাঁর পুত্র আছেন) হচ্ছে নন্দীবাগানে কালীতলা মাটির কাছে।

প্রেমিক মহারাজ—'কালী কীর্তনে' অবিভক্ত বঙ্গদেশেও হাওড়া জেলার অবদান অনস্বীকার্য। তাই কালী কীর্তনের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলেই প্রথমে মনে পড়ে আন্দুলের 'প্রেমিক মহারাজ'-এর কথা। ওঁর আসল নাম মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। আন্দুল গ্রামে ১২৫১ সনে (ইং ১৮৪৪) ৪ঠা ফাল্গুন তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রামরতন ভট্টাচার্য ছিলেন সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও উচ্চমার্গের সাধক। সংস্কৃত কলেজে পাঠ শেষ করে মহেন্দ্র কবিরত্ন উপাধি লাভ করেন। স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান পণ্ডিতের কাজে নিযুক্ত হন। দশ বছর বয়সে বিবাহ হলেও সংসারে মোহাবিষ্ট না হয়ে ভগবৎ চিন্তায়ই দিন কাটাতেন। মহেন্দ্রের পিতার দুই স্ত্রী ছিলেন যথা নারায়ণী ও বৈষ্ণবী। কুলপ্রথামত প্রথম স্বীয় মাতার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন পরে মন্ত্রসংস্কারের জন্য বীরভূমের 'জটেমার' নিকট শাক্তাভিষিক্ত হন। এরও পরে কুলগুরু জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের কাছে পূর্ণাভিষিক্ত হয়ে 'বশিষ্ঠা-নন্দনাথ' নাম গ্রহণ করেন।[৫] মহেন্দ্রের যাবতীয় গানই ছিল কালীবিষয়ক ভক্তি-মূলক গান। তাই কালী-কীর্তন বলতে 'প্রেমিক মহারাজ'কেই বোঝায়। তবে যাত্রার পালা রচনার কাজেও তাঁর খ্যাতি ছিল সর্বজন স্বীকৃত। তিনি নল-দময়ন্তী, উত্তরা-বিলাপ, শল্য সংহার ও ভক্তিভাণ্ডার নামে কয়েকখানি নাটকও রচনা করে-ছিলেন। তৎকালে সম্ভ্রান্ত পরিবারে নলদময়ন্তী ও উত্তরা-বিলাপ খুবই অভিনীত হতো। তবে কালী কীর্তন সঙ্গীত রচনাই মহেন্দ্রনাথকে সাধারণের মধ্যে অমর করে রেখেছে। সরস্বতীর পুণ্য তটভূমি 'আন্দুল' গ্রাম আজ বিগত গৌরব, সরস্বতী নদীও আজ দীনা, ক্ষীণা—কিন্তু 'প্রেমিক মহারাজের' পুণ্য সঙ্গীত আজও

বঙ্গবাসীকে আনন্দ দান করে যাচ্ছে। 'আন্দুল কালী-কীর্তন সমিতি' তাঁরই হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান।

মহেন্দ্রনাথ দেবী মাহাত্ম্যের প্রশান্তরূপ ও উগ্ররূপ বর্ণনা করেই গানগুলি বাঁধতেন। তিনি গান রচনা করে কখনও নিজের নাম দিতেন না। তাই ভক্তদের উপরোধে কালীপ্রেমে বিভোর মহেন্দ্রের নামের বদলে 'প্রেমিক' নামে গান রচনা করতেন। সেই থেকে প্রেমিক মহারাজ নামেই তিনি সর্মাধিক প্রসিদ্ধ। প্রেমিক মহারাজের গানের সমস্ত সুরারোপ করতেন তাঁরই সুহৃদ কৃষ্ণ চন্দ্র মল্লিক। এই গান গাইবার জন্য শিবপুরে বাউল সম্প্রদায় গঠিত হয়। শিবপুরের শ্যামাচরণ পণ্ডিত ও জ্ঞানচন্দ্র ব্যানার্জী বাউল গান গেয়ে সে যুগে খুব খ্যাতিলাভ করেছিলেন। ১৮৮৪ সালে ঝুলন উৎসবে শিবপুরের এই দল দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে গান শোনাবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল।[৬]

শালিখায় প্রথম কালী-কীর্তনের দল করেন যতীন্দ্রনাথ ঘোষ (হলাবাবু), ডাঃ জীবনানন্দ মুখার্জীর বাড়ীতে। পরে তিনি 'বীণাপাণি ক্লাব কালীকীর্তন' দলে যোগ দেন। এই দল আজও সমানে চলেছে দুলালচন্দ্র ব্যানার্জীর বাড়িতে। বাবু-ডাঙ্গায় সত্যচরণ মুখার্জী 'শালিখা কালীকীর্তন সমিতি' নামে একটি দল গঠন করেন। এই দলটি অবিভক্ত বঙ্গদেশে মৈমনসিংহ জেলার নাটোরের মহারাজার বাটিতে গীতিনাট্যের মাধ্যমে 'পাণ্ডব গৌরব' (গিরিশচন্দ্রের) মঞ্চস্থ করেন। পালাটি এতই মনোজ্ঞ হয়েছিল যে নাটোরের মহারাজা দলটিকে একটি পাখোয়াজ দিয়ে পুরস্কৃত করেন—যা এখনো রক্ষিত আছে। আরও আনন্দের কথা বাবুডাঙ্গার মুখার্জী বাড়িতে (অলোকা সিনেমার মালিক) প্রবীণ ও নবীনরা মিলে সেই পাখোয়াজ বাজিয়ে আজও কালীর মহিমা কীর্তন করে যাচ্ছেন।

সুশীল করণ—শাস্ত্রীয় (classical) নৃত্যে হাওড়া শালিখার দুই নৃত্য শিল্পীর নাম উল্লেখ করার মত। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র সুশীল করণ তাঁর কলেজের অধ্যাপক অশোক শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছেই নৃত্যের শাস্ত্রীয় মুদ্রা প্রভৃতি শিক্ষালাভ করেন। ১৯৩৬-৩৭ সালে কলকাতার পাথুরিয়া ঘাটার বিখ্যাত ঘোষ বাড়িতে নিখিল বঙ্গ সংগীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতায় তিনটি বিভাগেই নৃত্যে যুবক সুশীল করণ প্রথম স্থান অধিকার করে সংবাদপত্রের শিরোনামে স্থান পেয়েছিলেন। পরে তিনি উদয়শংকরেরও স্নেহভাজন হয়েছিলেন।

বেলা অর্ণব—অপর এক মহিলা নৃত্যশিল্পীর নাম হচ্ছে বেলা অর্ণব। নৃত্যে তাঁর প্রথম গুরু হরেন নন্দী (খ্যাতনাম্নী গায়িকা গীতা দত্তের মেসোমশাই)। পরবর্তী সময়ে পিতা পাঁচু অর্ণব মেয়েকে কত্থক শেখাবার জন্য নাড়া বাঁধেন জয়পুর নিবাসী শোহনলাল মিশ্রের কাছে। তারপর জয়লালজির কাছে শিক্ষা। ১৯৫৬ সালে ভারত সরকারের বৃত্তি পেয়ে দশ বছর ধরে কত্থক নৃত্য অনুশীলন করেন পদ্মশ্রী শম্ভু মহারাজের কাছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ঐ বিভাগে তিনিই প্রথম সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। ভারত সরকার তাঁকে 'নৃত্য বারিধি'

উপাধি দিয়ে ভূষিত করেন। অদ্যাবধি পশ্চিমবঙ্গের কোন নৃত্যশিল্পী এই উপাধি পাননি। এরপরে তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হন। বিভিন্ন উচ্চপদে আসীন হয়ে বর্তমানে রবীন্দ্র ভারতীতে ফাইন আর্টস বিভাগে 'ডীন' পদে আসীন আছেন।

সুরেশ দত্ত—পুতুলনাচ ভারতের একটি প্রাচীন লোকশিক্ষা ও চিত্ত বিনোদনের অঙ্গ বিশেষ। সেই গ্রামীণ পুতুলনাচ আজও মানুষের উৎসাহ সৃষ্টি করে। কিন্তু আধুনিক আঙ্গিকে পুতুল নাচের যে বৈজ্ঞানিক রূপ পরিবর্তন হয়েছে তাতে হাওড়া জেলার শালকিয়ার সুরেশ দত্তের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। ১৯৮০ সালে পোল্যান্ডে যে আন্তর্জাতিক পুতুল নাচের আসর বসেছিল তাতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন সুরেশ দত্ত। একুশটি দেশের পুতুল নাচের দলের মধ্যে ক্যালকাটা পাপেট থিয়েটারের সুরেশ দত্ত শ্রেষ্ঠ শিল্পী বিবেচিত হয়ে নিজেই কেবল স্বর্ণ পদক গলায় পরেননি—বিজয়মাল্য পরিয়েছেন বঙ্গমাতা তথা ভারত মাতার গলেও। তাঁর 'আলাদীন' ও 'রামায়ণ' অসাধারণ সৃষ্টি।

যোগেশ দত্ত—সুরেশ দত্তেরই ভাই যোগেশ দত্ত মূকাভিনেতা হিসেবে আজ আর হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতেই নয়—ভারতের বাইরেও তিনি মূকাভিনয় করে বিশেষ গৌরব অর্জন করেছেন। ইতিমধ্যেই তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মূকাভিনয় করে প্রথম শ্রেণীর শিল্পী হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন। এঁদের দুজনেরই কৈশোরের কিশলয় ও যৌবনের উপবন ছিল হাওড়ার শালিখায়। বার্ধক্যের বারাণসী রূপে এখন কলকাতাকেই বেছে নিয়েছেন।

১, ২, ৩, ৪. কী ধ্বনি বাজে—অমিয়া ঠাকুর—দেশ ১৯৭৯।
৫. আমুল কালী কীর্তন ও বাউল গীতাবলী—তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য।
৬. নগর হাওড়া—অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়।

ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন

ইংরেজী শিক্ষার প্রচলনের পূর্বে এখানকার মন্দির ও মসজিদগুলিই ছিল অক্ষর পরিচয়ের কেন্দ্র। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যেখানে সংস্কৃত বা ধ্রুপদী ভাষার তেমন কোন চর্চা ছিল না সেখানেই অর্থাৎ শালিখা, হাড়িরা ও ঘুষুড়িতেই ইংরেজী শিক্ষার পত্তন হল সারা জেলার মধ্যে প্রথম। এর কারণই বা কি ? মনে হয়, এই অঞ্চলগুলি গঙ্গার তীরে অবস্থিত হওয়ায় এবং এখানে সমুদ্রগামী জাহাজের মেরামতী কেন্দ্র গড়ে ওঠায় বাণিজ্যিক জাহাজে বিদেশী লোক-লস্কররা শহরের এই অংশে থাকার উপযোগিতা বেশি করে উপলব্ধি করেছিল। তাই কয়েকজন মিশনারী পাদ্রী এই অঞ্চলে ইংরেজী ও মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রথম স্কুল প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। এর সঙ্গে ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্য অবশ্যই ছিল।

১৭৮৫ সালে জেলার প্রথম প্রাথমিক ইংরেজী স্কুল শুরু হয় বর্তমান কালেক্টরেট (হাড়িরা গ্রাম) অফিস প্রাঙ্গণে। এই প্রাথমিক বিদ্যালয়টির নাম ছিল **The Bengal Military Orphan Asylum.** বেঙ্গল আর্মি'র নিহত সৈনিক সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্যই মূলতঃ বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছিল। এই স্থানটি লেভেট (Levet) সাহেবের বাগান বাড়ি ছিল।[১] এখানে প্রায় পাঁচশ অসহায় ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ করত।[২] অবশ্য এই বিদ্যালয়টি ১৭৮২ সালে দক্ষিণেশ্বরে প্রথম স্থাপিত হয়েছিল। এই স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য ইংরেজ সরকার অর্থ সাহায্যও করতেন। এখানে মেয়েদের সূচীশিল্প শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। এই স্কুলের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ছিলেন রেভারেণ্ড ডেভিড ব্রাউন।[৩]

এদেশে শিক্ষাবিস্তারে শ্রীরামপুর মিশনারী সাহেবদের অবদানের কথা আমাদের জানা আছে। এই প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে **The Baptist Missionary Society** নামে একটি পাদ্রী সংস্থা ১৭৯৩ সালে জেলায় প্রথম এদেশীয় বালক-বালিকাদের জন্য দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে—একটি হাওড়ায় অপরটি শালিখায়।[৪] এই স্কুলগুলিকে 'বাজার স্কুল' বলা হত। পরে ১৮৩০ সালে ঐ সংস্থারই উদ্যোগে আরও দুটি বাংলা মাধ্যম স্কুল মনিটারিয়েল প্রথায় স্থাপিত হয়। এদের মধ্যে একটি ছিল এদেশীয় খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের ও অপরটি ছিল অ-খ্রীষ্টীয় ভারতীয়দের জন্য।[৫]

হাওড়ায় প্রথম বসবাসকারী **Statham** নামে জনৈক মিশনারী পাদ্রী ১৮২১ সালে এই শহরে একটি আবাসিক বিদ্যালয়ও স্থাপন করেছিলেন। যদিও সেটি কয়েক বছর যেতে না যেতেই উঠে যায়। এইভাবে ১৮২৪ থেকে ১৮২৭ সালের মধ্যে মিশনারীরা শালিখা, ঘুষুড়ি ছাড়া শিবপুর ও ব্যাঁটরাতেও বাংলা স্কুল গড়ে তোলেন। **Revd T. Morgan** নামে অপর এক পাদ্রী ঘুষুড়িতে একটি অবৈতনিক

স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেটিও ষোল বছর চলার পর বন্ধ হয়ে যায়।[৬] এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এসব স্কুলই ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই দুই পাদ্রীর স্কুলেই ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গি বালকেরাই কেবলমাত্র (বালিকারা নয়) পড়ত।[৭]

শুধু মিশনারীরাই নয়—এ দেশীয়রাও প্রাথমিক ইংরেজী স্কুল স্থাপনে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছেন। **C. N. Banerjee** তাঁর **An Account of Howrah—Past and Present** গ্রন্থে লিখেছেন—**Gouri Kanta Bhattacharjee established a school in Santragachi in 1800. Strictly speaking Gouri Kanta merely extended the benefits of the institution which had been founded by his father some thirty years ago.** সুতরাং দেখা যাচ্ছে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দেই সাঁত্রাগাছিতে গৌরীকান্ত ভট্টাচার্যের পিতা প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে বাংলা-ইংরাজী শিক্ষা চালু করেন। সামান্য ইংরেজী শিখলেও সরকারী চাকুরী লাভে সুবিধে হয়—এটা চিন্তা করেই তাঁরা হয়তো প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রসর হয়েছিলেন।

বালিগ্রামেও সেই সময় ডিংসাই পাড়ায় (১৮১০-১৫এর মধ্যে) একটি ইংরেজী স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পদ্মলোচন মুখোপাধ্যায়। গোকুলচন্দ্রের পুত্র পদ্মলোচন ১৭৭৮-এ বালিতে জন্মলাভ করেন। বাল্যশিক্ষা স্থানীয় পাঠশালায় হলেও ইংরেজী শিক্ষার জন্য কলকাতায় মামার বাড়িতে গিয়ে 'জানবাজার ফ্রি স্কুলে' ভর্তি হন। ইংরেজী শেখার সুবাদে বিদেশী সওদাগরী অফিসে চট করে চাকরী পান। পরে অবশ্য 'রেভিনিউ একাউণ্টস অফিসে' সরকারী চাকুরী নিয়ে খুব উঁচু পদে আসীন হন। তা সত্ত্বেও পদ্মবাবু জন্মভিটে বালিগ্রামকে ছাড়তে পারেননি। বালিতে এসে ডিংসাই পাড়ায় একটি অবৈতনিক ইংরেজী স্কুল খোলেন এবং সকাল সন্ধ্যায় একদল স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক নিয়ে পড়াতে থাকেন। প্রয়োজনে ছাত্রদের বইও কিনে দিতেন। ইংরেজ শাসক পদ্মলোচনের এই নিঃস্বার্থ সেবার জন্য তাঁকে 'লর্ড' আখ্যা দিয়েছিলেন। সেই থেকে বালির প্রাচীনদের কাছে তিনি 'লাটপদ্ম' নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। ১৮৪০এ তিনি পরলোক গমন করেন।*

এতক্ষণ সংক্ষেপে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির কথাই আলোচনা করা হল। জেলায় কবে কোথায় প্রথম ইংরেজী মাধ্যমিক স্কুল তৈরী হয়েছিল তা নিয়ে বিভিন্ন রকম মতামত ও তথ্য পাওয়া যায়।

জেলার প্রাচীনতম সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ও'ম্যালী সাহেব ও মনোমোহন চক্রবর্তী তাঁদের 'হাওড়া গেজেটিয়ার' (১৯০৯) গ্রন্থের ১৪০ পাতায় লিখেছেন—**The first Govt. aided English School was opened in 1845, on the application of nearly two hundred Hindu parents....Government granted a site of 2½ bighas to the east of the**

---

* স্থানীয় অঞ্চলে শিক্ষা বিষয়ক কাজে অনুসন্ধানরত শিক্ষক অঞ্জন মুখোপাধ্যায় তথ্যটির সন্ধান পান।

Salt office on the maidan. 'হাওড়া জেলা গেজেটিয়ারের' (১৯৭২) অপর লেখক অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও ঐ মন্তব্যকেই সমর্থন করেছেন। এই দুই লেখকেরই অনেক আগে ১৮৭২এ C. N. Banerjee তাঁর An Account of Howrah—Past and Present বইতেও লিখেছেন—On the 16th November 1845, the Magistrate of Howrah received one hundred and ninety applications from Hindu parents to open a Goverement School. He supported the application.... A house was hired for Rs. 60 a month.... Govt. contributed Rs. 5875 and a site of 2½ bighas to the east of the Superintendent of Salt Chowkeys in the Howrah Maidan.

অপরপক্ষে গোবর্দ্ধন সংগীত ও সাহিত্য সমাজের স্মারক গ্রন্থ (১৯৪৮) লিখছে —'১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পুরাতন নুন গোলার পূর্বে একটি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল স্থাপনের জন্য সরকারের কাছে দরখাস্ত পেশ করা হয়। গঙ্গার ধারে গোলাবাড়ী থানার পেছনে এই নুন গোলার অবস্থিতি আজও তার সাক্ষ্য বহন করছে।'

'৫০০ বছরের হাওড়া' গ্রন্থে (১৯৯২) গোবর্দ্ধন সংগীত ও সাহিত্য সমাজের মন্তব্যকে প্রামাণ্য তথ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু হাওড়া শহরের ইতিবৃত্ত এর লেখক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সেই বক্তব্যকে যুক্তিসঙ্গত উপায়েই খণ্ডন করে লিখেছেন—'যদি শালিখার মধ্যবিত্ত সমাজ শালিখাতেই সরকারি স্কুল স্থাপনার জন্য আবেদন করতেন, তাহলে চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কখনো তা উল্লেখ করতে ভুলতেন না (পৃষ্ঠা ২১)।' যদিও গোলাবাড়ির পূবে নুন গোলা ঘাট তখনও ছিল। প্রাচীনেরা আজও গোলাবাড়ী ফেরীঘাটের নাম 'নুনগোলা ঘাট' বলেই বলেন। সে যাই হউক এই নুনগোলা ঘাটে যে হাওড়া জিলা স্কুল (যার আগে নাম ছিল—The Government School of Howrah) শুরু হয়নি তা ও'ম্যালী সাহেব এবং সি, এন, ব্যানার্জী'র পরিবেশিত তথ্যটি (যথাক্রমে—a site of 2½ bighas to the east of the Salt office on the maidan এবং a site of 2½ bighas to the east of the Superintendent of Salt Chowkeys in the Howrah Maidan.) যথেষ্ট।

হাওড়া জিলা স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন একজন বিদেশী—যাঁর নাম ছিল আই, এফ, দেলানগার্ড (I. F. Delangerd)।[৮] অপরপক্ষে ঐ স্কুলেই প্রথম বাঙালী প্রধান শিক্ষক ছিলেন বিখ্যাত ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তিনি ১৮৪৯-১৮৫৬ পর্যন্ত ঐ পদে আসীন ছিলেন। নামী শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ এনামুল হক, লোকসাহিত্যের নামী অধ্যাপক মহম্মদ মনসুরউদ্দীন ও বিধুভূষণ ভট্টাচার্য (হুগলী হাওড়া ইতিহাসের লেখক) প্রমুখ কৃতী শিক্ষকগণ। অপরপক্ষে কৃতী ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন—নরসিংহ দত্ত (যাঁর নামে হাওড়ায় প্রথম কলেজ), চারুচন্দ্র সিংহ (হাওড়ার চেয়ারম্যান),

প্রসিদ্ধ ভাষাতাত্ত্বিক ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জী, রবীন্দ্রলাল সিংহ (প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী), ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যিক মণিশংকর মুখোপাধ্যায় (শংকর) প্রমুখ। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র সাঁত্রাগাছির মাখনলাল দে ১৮৯৯এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্বপ্রথম প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। পরে এই মাখনবাবুই নাগপুর সরকারী কলেজে প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োজিত হন। সুবর্ণবণিক সমাজের মধ্যে তিনিই ছিলেন নাকি প্রথম এম. এ.। পরে তিনি স্কুল ইনস্পেকটারও হয়েছিলেন। শেষ জীবনে তিনি সালকিয়ার হুগলী ডকের সামনে একটি বাড়ীতে জীবন কাটান।[৯]

এরপর যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির নাম বলা হচ্ছে সেটি বর্তমানে শালকিয়া এ, এস, হাই স্কুল নামে পরিচিত। এই স্কুলটি ১৮৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 'পুণ্য আমবারুণী' তিথিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।[১০] প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিদ্যোৎসাহী ক্ষেত্রমোহন মিত্র। তিনি ছিলেন হাওড়া কোর্টের একজন মোক্তার (যাঁর নামে ক্ষেত্র মিত্র লেন)। মাত্র পাঁচজন ছাত্র নিয়ে তিনি এই স্কুল শুরু করেন। ক্ষেত্রমোহন স্কুলের 'মধ্যমণি' হলেও তাঁর সঙ্গে অপর দুজন শালিখাবাসীর কথা শতবর্ষ স্মরণীতে কোথাও উল্লেখ নেই। অথচ স্কুল প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তাঁদের নাম সরকারী আবেদন পত্রে লেখা ছিল। অদ্যাবধি তাঁদের অনুল্লিখিত নাম দুটি হাওড়াবাসী বিশেষ করে শালিখাবাসীদের গোচরে আনা হল। তাঁরা হচ্ছেন পঞ্চানন বসু ও শ্যামাচরণ সরকার।[১১] প্রথমে এই স্কুলটির নাম ছিল **Sulkea Vernacular Free School.**

সালকিয়া এ. এস. হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবসের ভুল তারিখ একশো চল্লিশ বছর পরে অধ্যাপক প্রতাপ মুখোপাধ্যায় নামে জনৈক গবেষক সম্প্রতি তাঁর এক পুস্তকে প্রকাশ করেছেন। শ্রী মুখোপাধ্যায় তাঁর 'পর্বান্তরের বিষয় কলকাতা' (১৯৯৫) নামক গ্রন্থে লিখেছেন— ১৮৫৫ সালের বারুণী ছিল ১৬ই মার্চ, শুক্রবার (৪ঠা চৈত্র, ১২৬১)। পক্ষান্তরে সরস্বতী পুজা ও প্রতিমা নিরঞ্জনের দিন ছিল যথাক্রমে ২২শে জানুয়ারী, সোমবার (১০ই মাঘ, ১২৬১) ও ২৩শে জানুয়ারী মঙ্গলবার (১১ই মাঘ ১২৬১)। তিনি আরও লিখেছেন—স্কুল প্রতিষ্ঠার এই ভুল তারিখটি পরবর্তী সকল গ্রন্থেই অনুসৃত হয়েছে দেখা যায়। অনেকটা কাকে কান নিয়ে গিয়েছে মনে করে যেন না দেখেই কাকের পিছনে ধাওয়া করার মত অবস্থা আর কি!

শ্রী মুখোপাধ্যায় 'এই ভুল পরবর্তী সকল গ্রন্থেই অনুসৃত হয়েছে' বলে যা মন্তব্য করেছেন তাতে '৫০০ বছরের হাওড়া' (১৯৯২) এবং ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাওড়া শহরের ইতিবৃত্ত' (১৯৯৫) গ্রন্থ দুটিকে যে প্রকারান্তরে ইঙ্গিত করেছেন তা প্রতাপবাবুর সঙ্গে কথোপকথনেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ কথা স্বীকার করতে বাধা নেই যে উক্ত বিদ্যালয়ের শতবর্ষ স্মরণীটিই উভয় গ্রন্থের তথ্যের উৎস।

অপরপক্ষে সরকারী অনুদানের (**Grant-in-aid Sought**) জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ যে **Register of Information** তৈরী করে পাঠিয়েছিলেন তদানীন্তন ইনস্পেকটার

অব স্কুলস, সাউথ বেঙ্গল, Mr. H. Pratt. তাঁর চিঠিতে (৮০৪ নং ৮ই জুলাই ১৮৫৬) অনুমোদনের জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করেছিলেন, তাতেই স্কুল কর্তৃপক্ষ লিখছেন—'The school was established on the 24th January 1855.' সুতরাং প্রতাপবাবুর তথ্যই শতবার্ষিকী সংখ্যাটি অপেক্ষা আরও নির্ভুল উৎস

আরও একটি ভুল তথ্যের উপর প্রতাপবাবু পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। স্কুল শতবার্ষিকী সংখ্যাটিতে লেখা হয় উক্ত স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক হচ্ছেন Grecian Thowet (আসল বানান Thwaite) নামে জনৈক বিদেশী শিক্ষক। এটিও সঠিক তথ্য নয় বলে উক্ত গ্রন্থে শ্রীমুখোপাধ্যায় বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন একজন ভারতীয় যাঁর নাম ছিল উমেশচন্দ্র সরকার। মাহিনা কুড়ি টাকা। Grant-in-aid-Formএও তাই দেখানো হয়েছে।

তখনকার দিনে অবশ্য স্কুলের আভিজাত্য বাড়াবার জন্য বিদেশী প্রধান শিক্ষক নিয়োগের প্রবণতা ছিল। কিন্তু সালকিয়া স্কুলের বেলায় তেমনটি ঘটেনি। এ ব্যাপারেও প্রতাপবাবু তথ্য দিয়ে বলেছেন যে 'Grecian Thowet' কোন নাম নয় - এটি পদবীমাত্র। তাঁর আসল নাম হচ্ছে John Beaufoy Grisenthwaite. তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে (আগে হিন্দু কলেজ) অধ্যাপনার কাজ করতেন। যে কোন কারণেই হউক তাঁর চাকুরী চলে যায় ২৩শে মার্চ ১৮৫৫ সালে। এরপর ক্ষেত্রমোহনবাবু অন্যান্যদের সঙ্গে যুক্তি করে Grisenthwaiteকে শালকিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেন ১৮৫৬ সালের আগস্ট মাসের প্রথম দিকে। ফলে উমেশচন্দ্র সরকার স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৮৫৮ সালের প্রথম দিকেই Grisenthwaite সাহেবের মৃত্যু হয়। তারপর প্রধান শিক্ষক হন হীরালাল মুখোপাধ্যায়। কয়েক মাসের মধ্যে তিনিও বিদায় নিতে বাধ্য হলে T. H. Surgeon নামে আরও একজন শ্বেতাঙ্গ শালকিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন।*

'৫০০ বছরের হাওড়ায়' লেখা ছিল—শালকিয়া স্কুলের নাম অ্যাংলো-সংস্কৃত স্কুল কবে হল তার কোন প্রামাণিক তথ্য আজও পাওয়া যায়নি। শ্রীমুখোপাধ্যায় ঐ গ্রন্থে লিখেছেন— ১৮৬১ থেকে ১৮৭২ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Minutes', 'Calendar' গ্রন্থগুলিতে মুদ্রিত Entrance পরীক্ষার ফলের পৃষ্ঠায় শালকিয়া স্কুলকে কখনো 'Sulkea School', কখনো 'Sulkea Aided School', কখনো বা Sulkea A. V. School' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮৭৩ সালের Entrance পরীক্ষার ফলের পাতায় স্কুলটিকে সর্বপ্রথম 'Sulkea A. S. School' নামে উল্লিখিত হতে দেখা যায়। (Minutes 1873-74, p. 64)

আর একটি বিতর্কমূলক বিষয় আলোচনা করেই এই প্রসঙ্গের ইতি টানা হবে।

---

* এক্ষেত্রেও '৫০০ বছরের হাওড়া' এবং অসিতবাবুর বইয়ের তথ্যের উৎস একই।

এই দুটি স্কুলেরই Sent up Boys সম্বন্ধে ও'ম্যালি সাহেব এবং মনোমোহন-বাবু তাঁদের পূর্বোক্ত গ্রন্থে লিখেছেন—The school (Howrah Zilla School) began to send up students for the Entrance Examination in 1858, the year after the foundation of the University. (page 140). অপর পক্ষে অমিয়বাবুও তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে লিখেছেন—The school was removed to Chowrasta in Salkea and sent up students for the Entrance Examination at the University of Calcutta for the first time in 1859. মজার বিষয় হাওড়া জিলা স্কুলের দশ বছর পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েও শালকিয়া স্কুল জেলার স্কুলের মাত্র এক বছর বাদেই অর্থাৎ ১৮৫৯ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় বসে।

১৮৫৮ সালে জেলা স্কুলের প্রথম এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়ার তথ্যটিও প্রতাপবাবু ভুল বলে বর্ণনা করেছেন। এ ক্ষেত্রেও তিনি যা লিখেছেন তার হুবহু উদ্ধৃতি দেওয়া হল -হাওড়া স্কুল (বর্তমানের হাওড়া জিলা স্কুল) এবং শালিখা স্কুল থেকে ছাত্রেরা প্রথম Entrance পরীক্ষা দেয় যথাক্রমে ১৮৫৮ ও ১৮৫৯ সালে, চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত গ্রন্থের ৫৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত এই ভুল সংবাদ পরবর্তীকালে হাওড়া সম্পর্কিত গ্রন্থাদিতে নির্বিচারে গৃহীত হয়েছে। ১৮৫৮ সালে হাওড়া স্কুল থেকে কোন ছাত্রই প্রেরিত হয়নি। ১৮৫৯ সালের মার্চ এবং ডিসেম্বর দুবার Entrance পরীক্ষা হয়। মার্চ মাসের পরীক্ষায় হাওড়া স্কুল থেকে প্রেরিত ১১জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম বিভাগে অমৃতলাল পাল (পাইন ?), অম্বিকাচরণ সরকার (ঐ স্কুলেরই লাইব্রেরীয়ান) এবং দ্বিতীয় বিভাগে পূর্ণচন্দ্র বসু, রাজকুমার কুণ্ডু, কেদারনাথ দত্ত, কালীচরণ ঘোষাল, বিহারীলাল মিত্র এবং গিরীশচন্দ্র মিত্র উত্তীর্ণ হন। ডিসেম্বরের পরীক্ষায় ঐ স্কুলের আনন্দলাল ভাদুড়ী, যদুনাথ বসু, প্রসন্নকুমার দে এবং রসিকলাল দত্ত দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। (Minutes 1859, pp 26-34)।

পক্ষান্তরে, শালিখা স্কুল (Sulkea Aided School রূপে উল্লিখিত) থেকে ১৮৬১ সালের Entrance পরীক্ষায় প্রেরিত প্রথম পরীক্ষার্থীদের মধ্যে গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নেত্রগোপাল মল্লিক, উপেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায় এবং অনুকুল চট্টোপাধ্যায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। (Calendar 1862-63, pp 150—161)

প্রতাপবাবুর গবেষণালব্ধ এই তথ্যগুলি সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় দুটির কর্তৃপক্ষেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে—যাতে ভবিষ্যতে কোন স্কুল স্মরণীতে এই ভুল তথ্যগুলি পরিবেশিত না হয়। আর যদি বিপক্ষে সঠিক তথ্য থাকে তাও যেন উল্লেখ করা হয়। তাহলেই দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক ত্রুটিগুলির অবসান ঘটবে।

অনেক উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে শালকিয়া এ, এস, স্কুল ১৯৩৭ ও ১৯৪০ সালের সামান্য ব্যবধানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন বিদ্যালয়ের ছাত্র যথাক্রমে রামকৃষ্ণ ঘোষ ও পার্বতীকুমার

সরকার। পরবর্তী জীবনে রামকৃষ্ণ ঘোষ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারী হয়েছিলেন। আর ডঃ পার্বতীকুমার সরকার একজন আন্তর্জাতিক ভূগোলবিদ হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। ও'ম্যালী সাহেব ও মনোমোহন চক্রবর্তী তাঁদের গ্রন্থে এই স্কুলটি সম্বন্ধে লিখেছেন—**The first English School under Indian Management....** কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে জেলার মাধ্যমিক শিক্ষার ইতিহাস সংগ্রহে কাজ করতে গিয়ে দেখা গেছে এ মতের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

পক্ষান্তরে দেখা যাচ্ছে—'হাওড়া শহরের পশ্চিম প্রান্তে আন্দুল নামক গ্রামে একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপনার্থে আন্দুলরাজ রাজনারায়ণ বাহাদুরের বিরাট বাগানবাড়িতে একটি বিদগ্ধ ও বিত্তশালীদের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাতে 'সভাপতি মহারাজ বাহাদুরের প্রস্তাবানুসারে এবং তারকচন্দ্র ঘোষের পোষকতায় ইস্কুলের নাম আন্দুল একাডেমি রাখা হইল।'[১২] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮ জুলাই ১৮৩৮ (১৪ শ্রাবণ ১২৪৫) ঐ পুস্তকে আরও লিখেছেন—'বর্তমান বর্ষের ১১ জুলাই বুধবার বেলা তৃতীয় প্রহরের সময়ে আন্দুল গ্রামে শ্রীমন্মহারাজ রাজনারায়ণ বাহাদুরের সুখোদ্যান নামক স্থানের গৃহে ঐ আন্দুল এবং তন্নিকটবর্তী অনেকানেক গ্রামবাসী প্রধান ধনী-মানি-গুণী সকলে আগমন করত অভিনব বিদ্যালয় স্থাপনার্থে এক মহাসভা করিয়াছিলেন। ঐ সভায় শ্রীমন্মহারাজ রাজনারায়ণ বাহাদুর প্রভৃতির লিপ্যনুসারে শতাধিক সম্ভ্রান্ত সভ্যের সমাগম হইয়াছিল।'[১৩]

এই 'আন্দুল অ্যাকাডেমি' পরবর্তীকালে **Andul H. C. (Higher Class) English School** নামে পরিবর্তিত হয়েছিল কিনা তা নিয়ে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু **Andul H. C. (Higher Class) English School**টি যে বর্তমান মহিয়াড়ী কুণ্ডু চৌধুরী ইনস্টিটিউশন তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্কুলের পুরাতন প্রসপেক্টাসে যে সিলমোহর সহ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাওয়া যায় তাতে পরিষ্কার লেখা আছে—১৮৪১ খ্রীঃ আন্দুলরাজ রাজনারায়ণ রায় এবং মহিয়াড়ীর জমিদার জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিকের প্রচেষ্টায় মহিয়াড়ীতে **Andul H. C. (Higher Class) English School** নামে একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই স্কুলটির শতবর্ষ পালিত হতে পারেনি দুটি কারণে, যেমন—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও গ্রামীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। আরও উল্লেখ্য, একদা এই স্কুলেরই প্রধান শিক্ষক ছিলেন 'বাঙ্গালার বাঘ' স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেঠামশায় দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। মাসিক বেতন ছিল ২ টাকা।[১৪] আলোচনান্তে হাওড়া জেলার উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রাচীনত্বের ইতিহাস এতক্ষণে নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়ে গেল।

এরপর দেখা যাচ্ছে যে, জেলার গ্রামাঞ্চলের অন্যান্য অংশেও উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় গড়ে তোলার উৎসাহজনক সাড়া পড়ে গেল। বাগনানের খাদিনান গ্রামে ১৮৫৪ খ্রীঃ হেমচন্দ্র ঘোষের প্রচেষ্টায় তৈরী হল 'বাগনান হাই স্কুল'। ১৮৫৫ খ্রীঃ শহরে আরও দুটি ইংরেজী স্কুল একই বছরে স্থাপিত হল। এর মধ্যে শালকিয়া এ. এস. স্কুল ও বেলুড় হাইস্কুল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বেলুড় হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠা

হয়েছিল প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ঐকান্তিক চেষ্টায়। সঙ্গে ছিলেন কতিপয় খ্রীষ্টান মিশনারী ও কতিপয় বিদ্যোৎসাহী গ্রামবাসী।[১৫]

তাই হয়তো নলিনচন্দ্র সরকার 'বিদ্যালয়ের ক্রমবিকাশ বিবরণী'তে লিখেছেন— "প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ও বৈষ্ণব চূড়ামণি লালাবাবুর পূত পদরজস্পর্শে বেলুড় উচ্চ বিদ্যায়তন তীর্থে পরিণত হয়েছে।'[১৬]

ইতিমধ্যে জগৎবল্লভপুর হাই স্কুল গড়ে উঠল ১৮৪৯ খ্রীঃ। ১৮৫৬ খ্রীঃ বলুটি গ্রামে বলুটি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন উত্তরপাড়ার দানবীর জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। এইভাবে গড়ে উঠল গ্রামে ও শহরে অনেক স্কুল যার মধ্যে রয়েছে আমতা পীতাম্বর হাই স্কুল (১৮৫৭), রামকৃষ্ণপুর হাইস্কুল (১৮৬২), মেকলে (অধুনা বালি) বালিকা বিদ্যালয় (১৮৬৪), মুগকল্যাণ বয়েজ হাই (১৮৬৬), গড় ভবানীপুর আর. পি. ইনস্টিটিউশন (১৮৬৭), শিবপুর হিন্দু বালিকা (১৮৬৭), মহিয়াড়ী বাংলা (অধুনা হাই) স্কুল (১৮৬৮), শিবপুর দীনবন্ধু ইনস্টিটিউশন (১৮৭৪), রসপুর উচ্চ বিদ্যালয় (১৮৭৬), বি. কে. পাল ইনস্টিটিউশন (১৮৭৬-৭৭), রসপুর উচ্চ বালিকা (১৮৭৮), জয়পুর ফকিরদাস ইনস্টিটিউশন (১৮৮০), মাজু আর. এন. বসু হাই (১৮৮৩), উলুবেড়িয়া হাই (১৮৮৪), পানপুর শশিভূষণ হাই (১৮৮৫), রিভার্স টমসন স্কুল (অধুনা শান্তিরাম বিদ্যালয়) (১৮৮৫), নারিট ন্যায়রত্ন ইনস্টিটিউশন (১৮৮৫), ব্যাঁটরা মধুসূদন পাল চৌধুরী হাই (১৮৮৬), হাওড়া রিপন কলেজিয়েট (অধুনা অক্ষয় শিক্ষায়তন) (১৮৮৭), ঝিকিরা উচ্চ বিদ্যালয় (১৮৮৯), রাধাপুর উচ্চ বিদ্যালয় (১৮৯০), টাউন স্কুল (১৮৯০), বেলিলিয়াস ইনস্টিটিউশন (১৮৯১), মুগকল্যাণ গার্লস স্কুল (১৮৯৮)। উল্লেখ্য, মুগকল্যাণ হাইস্কুলেরও প্রধান শিক্ষক ছিলেন একজন শ্বেতাঙ্গ। শালকিয়া হিন্দু স্কুল ইউনিট-১ (১৮৯৯)।

উপরিউক্ত তালিকার উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে শহরাঞ্চলে মেকলে বালিকা এবং গ্রামাঞ্চলে রসপুর বালিকা বিদ্যালয় জেলায় মেয়েদের জন্য প্রথম উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের ইতিহাস সৃষ্টি করে আজও নজির হয়ে আছে। অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় 'হাওড়া শহরের ইতিবৃত্ত'-এ শিবপুর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়কে হাওড়া জেলায় এটি প্রথম ও প্রেসিডেন্সি বিভাগে দ্বিতীয় বালিকা বিদ্যালয় বলেছেন। এটি ঠিক নয়। যদিও ভারতীয় পরিচালনায় প্রথম ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় সাঁত্রাগাছিতে ১৮৬৩ খ্রীঃ—আজ সেটি নেই। আর একটি স্মরণ করার বিষয় এই যে মহিয়াড়ী বাংলা (হাই) স্কুলটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতেই প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশে বিদ্যাসাগর-প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গবিদ্যালয়'গুলির মধ্যে এটি অন্যতম। এরকম শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বালি (১৮৬৭), কুমারটুলী প্রভৃতি স্থানে। গড় ভবানীপুর আর. পি. ইনস্টিটিউশন বিদ্যাসাগরের উৎসাহ ও পরামর্শে

স্থানীয় জমিদার রামপ্রসন্ন রায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হাওড়া জেলায় ইংরেজী শিক্ষা প্রচলন বিদ্যাসাগরের উৎসাহ এর থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

Calcutta 5th September 1875

Baboo Ram Prosunno Roy of Keshi Chundra pur, Hoogly, has been known to me for several years past. He belongs to a respectable family and is an active intelligent Educated young man of amiable disposition and unexceptionable character.

Iswara Chandra Sarma

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রামপ্রসন্ন রায়ের উদ্দেশ্যে লিখিত 'প্রশংসা পত্রের' অনুলিপি

রিপন কলেজিয়েট স্কুল সম্বন্ধেও দু'চারটি কথা আলোচনা করা দরকার। এই স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে সুরেন্দ্রনাথের প্রভাব সমাজের সবক্ষেত্রেই যে কিরূপ ছিল তা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। হাওড়াতে তিনি এই স্কুলটি তৈরী করে যখন নিজেই পড়াতে লাগলেন তখন পাশের অন্যান্য স্কুলগুলিতে গেল গেল রব উঠে যায়। বিভিন্ন স্কুল থেকে ছেলেদের অভিভাবকরা ছাড়িয়ে নিয়ে সুরেন্দ্রনাথের স্কুলে ভর্তি করাতে লাগলেন। সবার মুখেই এক কথা স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথ যেখানে পড়াচ্ছেন সেখানে ছেলে পড়ানোই শ্রেয়ঃ। শালকিয়া এ. এস. স্কুলের নাম থাকা সত্ত্বেও ছেলেরা ছেড়ে গিয়ে রিপন স্কুলে ভর্তি হতে লাগল। তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিবরণী থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তিনি লিখছেন—**The Ripon Collegiate School was established at Howrah. The name of the founder (Sir Surendra Nath Banerjee) worked like a charm. Students from all quarters flocked to his school....the institution that suffered most was the Salkia A. S. School, the premier school of the district. Boys left the school by scores...Now the condition of the School can better be imagined than described. But it is a pleasure to note that some there were who were faithful among the faithless and clung fast to their Alma Mater.** কিন্তু যেটা সুরেন-বাবু লেখেননি সেটা হচ্ছে এই যে সেই সময় শালকিয়া স্কুলের প্রায় একাদিক্রমে

এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ফল অত্যন্ত শোচনীয় হচ্ছিল। এমনকি কোন কোন বছর স্কুল এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ছাত্রই পাঠাতে পারেনি। ১৮৯১ সালে রিপনের ১০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫ জন প্রথম বিভাগে, ৪ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ১ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। পক্ষান্তরে, শালিখা স্কুলের সকল ছাত্রই ফেল করে। (Minutes, 1891—92)।[১৭]

শুধু শালকিয়া এ. এস. স্কুলই নয়। খোদ সরকারী হাওড়া জিলা স্কুল পর্যন্ত নড়ে উঠল। যাতে সরকারী স্কুল থেকে ছেড়ে না যায় তার জন্য জিলা স্কুল ছেলেদের মাইনে কমিয়ে দিল। স্কুলটি হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির হাতে তুলে দিল আর্থিক দায়িত্ব বহনের জন্য। 'নগর হাওড়া' গ্রন্থের লেখক অলোক কুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন—'১৮৯০ সালেই সরকার তার ১২ই মার্চ তারিখের ১৮৮নং আদেশ বলে জেলা স্কুলের দায়িত্ব হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির হাতে দেয়। তিনটি শ্রেণীতে মাহিনার হারও কমিয়ে দেওয়া হয়।' সরকারের এই প্রতিহিংসাপরায়ণ কাজের বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথ সরকারী দপ্তরে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। যদিও শেষ পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথকে কাবু করতে পারা যায়নি। এই স্কুলেরই ১৯১০ সালের দুই কৃতী ছাত্র হচ্ছেন Logic বইয়ের লেখক বিখ্যাত ভোলানাথ রায় এবং অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য। এছাড়া বিচারপতি সুশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, জাতীয় শিক্ষক সুধাংশু-শেখর ভট্টাচার্য, প্রাক্তন পুলিশ সুপার রাঘবেন্দ্র ব্যানার্জী ও নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বি. পি. কৈরালাও আছেন।

এবারে আসা যাক বিদেশী চার্চ কর্তৃক পরিচালিত St. Thomas' Church School সম্বন্ধে। এই স্কুলটি ১৮৬০ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত হলেও আজও পর্যন্ত তার নিজ অস্তিত্ব মর্যাদার সঙ্গে বজায় রেখে চলেছে। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রেভারেণ্ড ডঃ উইলিয়াম স্পেন্সার। ভারতে ১৮৫৮ খ্রীঃ মহারানী ভিক্টোরিয়া ঘোষণাপত্র জারী হবার পরের বছরই অর্থাৎ ১৮৫৯ খ্রীঃ হাওড়া চ্যাপেলের প্রধান হয়ে এদেশে আসেন। এখানে আসার বছর দেড়েকের মধ্যেই তিনি ১৮৬০ খ্রীঃ এই ইংরেজী স্কুলটি স্থাপনা করেন।[১৮] স্কুলটি এদেশে বসবাসকারী ইউরোপীয় ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সন্তানদের শিক্ষা দেবার জন্য স্থাপিত হলেও আজ এখানে সবধর্ম সবজাতির জন্যই তার দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে।* জেলার হিন্দীভাষী স্কুলের মধ্যে শালকিয়া সত্যনারায়ণ মাধব মিশ্র বিদ্যালয় (১৯৯০) তার প্লাটিনাম জয়ন্তী পূরণ করল। সাঁত্রাগাছির কেদারনাথ ইনস্টিটিউশন (১৯২৫) শতবর্ষে পা না দিলেও একটি উল্লেখযোগ্য বিদ্যালয়। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৯২০-তে) ঐ স্কুলের শিলান্যাস করেছিলেন।[১৯] কোনা স্কুলটি ১৮৭৮ সালে প্রতিষ্ঠা হলেও ১৯৭৮ সালে হাই স্কুলে উন্নীত হয়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের

---

* O' Malley & M. Chakravorty লিখছেন—St. Thomas' School was opened in 1864.

বিষয় বালি বারাকপুর জুনিয়ার হাইস্কুলটি ১৮৬৪ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত হয়ে শতবর্ষ পরেও সাবালকত্ব লাভ করেনি। তাই জুনিয়ার স্কুলই থেকে গেল। ইতিমধ্যে আরও অনেক স্কুলই শতবর্ষে পা দিয়েছে। স্থানাভাবে তাদের আলোচনা সম্ভব হল না বলে দুঃখিত।

জেলার শতবর্ষের ইংরেজী হাইস্কুলগুলির নাম উল্লেখ করলেও এদের মান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে হাওড়া জেলা স্কুলের ছাত্র মাখনলাল দে ১৮৯৯ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম হন. শালকিয়া এ. এস. স্কুলের ছাত্র রামকৃষ্ণ ঘোষ ও পার্বতী কুমার সরকার যথাক্রমে ১৯৩৭ ও ১৯৪০ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ১৯৩৬ সালে ব্যাঁটরা মধুসূদন পাল চৌধুরী স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী।।

অপরপক্ষে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে হাওড়ার বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন (১৯২২) স্থাপিত হয়েও ১৯৫০ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন দেবীচরণ খাঁ। আর ১৯৮০ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন ঐ স্কুলেরই ছাত্র বরুণ চক্রবর্তী। ১৯৯১ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় চতুর্থ / পঞ্চম স্থান লাভ করে বিদ্যালয়ের ছাত্র কিংশুক পালধি। সে উচ্চ মাধ্যমিকেও ৭ম হয়।

এছাড়া পুরাতন হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষাগুলিতে এই স্কুল থেকে টেকনি-ক্যাল গ্রুপে প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ হয়ে যাঁরা জেলায় এক নতুন নজির সৃষ্টি করেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন যথাক্রমে দেবব্রত হোড় (১৯৬৫), অরুণকুমার চক্রবর্তী (১৯৬৭) এবং মলয় মুখোপাধ্যায় (১৯৬৮)।[৭] এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুধাংশু শেখর ভট্টাচার্য ভারত সরকার কর্তৃক 'জাতীয় শিক্ষক'রূপে National Teacher ১৯৬৩ সালে জেলার মধ্যে প্রথম পুরস্কৃত হন।

স্কুলেরই অপর এক প্রধান শিক্ষক ব্রজমোহন মজুমদার ১৯৯৫ সালে আবার 'জাতীয় শিক্ষক'-এর পুরস্কার লাভ করেন। জেলার মধ্যে একই স্কুল থেকে দুবার 'জাতীয় শিক্ষকের' পুরস্কার লাভ এক নতুন নজির হয়ে থাকল। এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়ে আছেন—ইতিহাসবিদ ডঃ নিমাইসাধন বসু, হোমিও চিকিৎসক ডাঃ ভোলানাথ চক্রবর্তী, প্রাক্তন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক শংকরীপ্রসাদ বসু, বিজ্ঞানী ডঃ রবীন্দ্রনাথ ঘোষ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), কানপুর আই. আই. টি-র প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডঃ দেবীচরণ খাঁ, বোস ইনস্টিটিউট ও খড়্গপুর আই. আই. টি-র ডিরেক্টর ডঃ দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য প্রমুখ।

জেলার গ্রামাঞ্চলের মাধ্যমিক স্কুলগুলির মধ্যে ১৯৯৫ সালেই আর এক প্রধান শিক্ষক 'জাতীয় শিক্ষক' রূপে পুরস্কৃত হন—তাঁর নাম সুচন্দন পোড়েল। উদং উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। জেলার গ্রামাঞ্চলের মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে তিনিই প্রথম জাতীয় শিক্ষকের সম্মান পেলেন।

শালকিয়া হিন্দু হাইস্কুলের ছাত্র সুচিত্র খাঁ ১৯৬০ সালে হায়ার সেকেণ্ডারী

পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান (কলা বিভাগে) অধিকার করে বিদ্যালয়ের সুনাম বৃদ্ধি করেছেন। এক্ষেত্রে একটি গ্রামের স্কুলের কৃতিত্বও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। শিবপুর বোটানিকেল গার্ডেনের কাছে থানা মাকুয়া মডেল হাইস্কুলের ছাত্র প্রণব বিশ্বাস ১৯৬৯ সালে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে জেলার নাম উজ্জ্বল করে রাখতে সাহায্য করেছেন।

হাওড়া জেলার শতবর্ষের স্কুলগুলির ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে কিছু কিছু বিদ্যালয় তদানীন্তনকালে বিদেশী শাসকদের নামে নামাঙ্কিত হয়েছিল। হয়তো উদ্দেশ্য ছিল রাজানুগ্রহ লাভে সুবিধা হবে বলে। সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করেই হয়তো সংগঠকরা এটা করেছিলেন। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর আবার সেইগুলি দেশীয় সংগঠকদের বা মনীষীদের নামে পুনরায় নামাঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু যে স্কুলটি আজও সাম্রাজ্যবাদীদের অন্যতম প্রতিনিধির নামে চলছে সেটি হচ্ছে 'ঝাঁপড়দহ ডিউক ইনস্টিটিউশন'। ইহার প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৬৮। গ্রামের দুইজন হিতৈষী ব্যক্তি ব্রজনাথ সরকার ও শ্যামাচরণ দত্ত গ্রামে একটি মিডল ইংলিশ বিদ্যালয় গঠন করেন। ১৯০২ সালে ঐ বিদ্যালয়টি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। 'আমাদের বিদ্যালয়—ঝাঁপড়দহ ডিউক ইনস্টিটিউশন' প্রবন্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামী দুঃখহরণ ঠাকুর চক্রবর্তী লিখছেন—...'উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হলে তদানীন্তন হাওড়ার জেলাশাসক স্যার ফ্রেডারিক উইলিয়াম ডিউক আই. সি. এস, সি. আই. ই-এর নামানুসারে ঝাঁপড়দহ ডিউক ইনস্টিটিউশন নাম ধারণ করে।' সেই থেকে আজও পর্যন্ত ঐ নামটিই রয়ে গেছে। এটা বড়ই বিস্ময়কর মনে হয়। বিদ্যালয়টির উন্নতিসাধনে ডিউক সাহেবের কোন অবদান ছিল কিনা তার কোন উদাহরণ দুঃখহরণবাবু উল্লেখ করেননি। অথচ ধনাঢ্য, বিদ্যোৎসাহী এমনকি একজন গ্রাম্য সামান্য বিত্তশালী সূত্রধর পর্যন্ত বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য ও ভূমিদান করে গেছেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি আরও লিখেছেন—এই বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসেন দক্ষিণ ঝাঁপড়দা গ্রামের একজন দরিদ্র সূত্রধর বৃত্তিজীবী হরিদাস দাস। তিনি বর্তমান বিদ্যালয়ের তলস্থ পাঁচশ কাঠা জমি দান করেন।' অপরপক্ষে এই বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক যথাক্রমে সনৎকুমার সিংহ ও গোষ্ঠবিহারী মুখোপাধ্যায় সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। বিপ্লবী বসন্তকুমার ঢেঁকিও এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। বিশিষ্ট কম্যুনিষ্ট নেতা তারাপদ দে (তারাপদ মাষ্টার) ও সন্তোষ ব্যানার্জী এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন এবং দীর্ঘদিন স্থানীয় অঞ্চলে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন। তাঁদের নজরও কিভাবে এড়িয়ে গেল সেটাই ভাববার বিষয়। দেরীতে হলেও বর্তমান সমাজপতিদের এটা ভেবে দেখার মত বিষয়।

কলেজীয় শিক্ষা ক্ষেত্রেও হাওড়া জেলার ইতিহাস কম গৌরবময় নয়। যদিও সেই গৌরবের পুরো কৃতিত্বই ইংরেজ মিশনারীদের। উচ্চশিক্ষা প্রসারে বিশপ মিডলটনের কাজে উৎসাহ যোগাবার জন্য ১৮২০ সালে তদানীন্তন সরকার তাঁকে

বাষট্টি বিঘা জমি দান করেন।[২১] ১৮২০ সালে বিশপস্‌ কলেজের নির্মাণকার্য্য শুরু হলেও শিক্ষাদান শুরু হয় ১৮২৪ সালে।[২২] এই কলেজেই একদা মধুকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮৪৩-৪৪ থেকে ১৮৪৮ খ্রীঃ) ছাত্র হিসেবে পড়াশুনা করেন। আর রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই কলেজেই অধ্যাপনা করেন ১৮৫২ থেকে ১৮৬৮ খ্রীঃ পর্যন্ত। এখানেও মধুসূদনের ছাত্রজীবন কম ঘটনাবহুল নয়।

বিশপস্‌ কলেজের নিয়ম ছিল, এদেশীয় ছাত্র খ্রীষ্টান হলেও ঐ কলেজে পড়ার অধিকার পাবে না। অথচ মাইকেল মধুসূদন খ্রীষ্টান হবার পরে হিন্দু কলেজ ছেড়ে বিশপস্‌ কলেজে ভর্তি হতে চান। কিন্তু কলেজের নিয়ম ছিল প্রধান অন্তরায়। এই ব্যাপারে জনৈক মহেশচন্দ্র ঘোষের দৃষ্টান্ত মধুসূদনকে ঐ কলেজে পড়তে বিশেষ সাহায্য করেছিল। 'ঊনবিংশ শতাব্দীর নবচেতনায় হাওড়ার ভূমিকা' নামক পুস্তিকায় অচল ভট্টাচার্য লিখছেন—"১৮৩২ খ্রীঃ ২৭শে আগস্ট বিশপস্‌ কলেজের কাউন্সিলের একটি বিশেষ অধিবেশন হয়।...মহেশচন্দ্র ঘোষ নামে হিন্দু কলেজের জনৈক ছাত্র খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে বিশপস্‌ কলেজে ভর্তি হতে চান। এর আগে কোন দেশীয় ছাত্রকে বিশপস্‌ কলেজে ভর্তি করা হয়নি—কেউ ভর্তি হতে চায়নি। অনেক যুক্তি তর্কের সিঁড়ি ভেঙে কলেজ কাউন্সিল অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলেন এবার থেকে কলেজে দেশীয় ছাত্রদেরও ভর্তি করা হবে।...মধুসূদন হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে উদ্যোগী হয়েছেন এই সংবাদে কলকাতা শহরে যথেষ্ট চাঞ্চল্য দেখা দেয়। পিতা রাজনারায়ণ পুত্রের এই কাজে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একদল লাঠিয়াল পর্যন্ত সংগ্রহ করেছিলেন।" কিন্তু মোল্লার দৌড় ঐ পর্যন্তই। অপরপক্ষে নগেন্দ্রনাথ সোম তাঁর 'মধুস্মৃতি' গ্রন্থে লিখছেন—'কলকাতার মিশন রোর 'ওল্ড মিশন চার্চে' মধুসূদন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। গির্জার সামনে সৈন্য মোতায়েন রাখা হয়েছিল পাছে কোন গণ্ডগোল হয়।'

যাই হোক কলেজে ঢুকেই মধুসূদন দেখলেন সেখানে সাদাকালোর বর্ণের পার্থক্য অনুযায়ী পোশাকেরও পৃথকীকরণ করা হয়েছে—যেটা মধুসূদনকে প্রতিবাদী করে তোলে। তিনি ইউরোপীয় ছাত্রদের মত কলেজীয় পোশাক পরে কলেজে এলে অধ্যক্ষ তাঁকে উহা পরতে নিষেধ করেন—কারণ তিনি ইউরোপীয় নন। মধুসূদন এর প্রতিবাদ করে একদিন এক অদ্ভুত ভারতীয় পোশাক পরে কলেজে আসেন। তাতে কর্তৃপক্ষ আরও বেকায়দায় পড়েন। তাই নগেন্দ্রনাথ ঐ গ্রন্থেই যা লিখেছেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি লিখেছেন—'কর্তৃপক্ষ তাকে ইংরেজদের মত পোশাক পরতে অনুমতি না দেওয়ায় তিনি কারুকার্যখচিত রঙিন শালের রুমাল ও উকিলের ন্যায় শালের পাগড়ি মাথায় দিয়ে কলেজে এলেন। শেষে মধুকে ইংরেজ বালকদের পোশাকই পরতে অনুমতি দেন।' এরকমই ছিল মধুসূদনের মর্যাদা বোধ।

মধুসূদনের বিপ্লবী মনের পরিচয় মেলে এই কলেজে ছাত্র হিসাবে থাকার সময়ে আরও একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে। নগেন্দ্রনাথবাবুর উক্ত গ্রন্থ থেকেই উদ্ধৃতি দেওয়া

হল। 'তৎকালে বিশপস্ কলেজে ছাত্রদের ভোজের ব্যাপারে সমারোহ হইত। নির্দিষ্ট ঘণ্টাধ্বনি হইলে য়ুরোপীয় ও দেশীয় ছাত্ররা হলের টেবিলে একত্র বসে ভোজন করত। আহারের পূর্বে প্রত্যেক ছাত্রকে পরিমিত মদের 'পেগ' দেওয়া হত। তারপর ছাত্রবৃন্দ আহারে বসতো। একবার বিশপস্ কলেজে নৈশভোজে ছাত্রদের ভোজনের প্রাক্কালে য়ুরোপীয় ছাত্রদের মদ্য বণ্টন করতে করতে মদ শেষ হয়ে যায়। দেশীয় ছাত্রদের সেদিন আর মদ দেওয়া হল না। তেজস্বী মধু স্টুয়ার্ডের নিকট আপনার প্রাপ্য মদের দাবি করলেন। সেদিন তিনি আর কাউকে দিতে পারলেন না — কারণ ভাণ্ডারে আর মদ ছিল না। মধু রেগে আহারের পূর্বেই টেবিলের উপর গ্লাস আছড়াইয়া চূর্ণ করিয়া উঠিয়া গেলেন। স্টুয়ার্ড অধ্যক্ষকে জানালেন। ফলে বিশপস্ কলেজে ছাত্রদের মদ্যপান রীতি বন্ধ হইল।' ছাত্রজীবনের এই চ্যালেঞ্জীং এটিটিউড মাইকেলের পরবর্তী জীবনেও লক্ষ্য করা যায়। মাইকেলের জীবনে এই কলেজের প্রভাব সম্বন্ধে বিশিষ্ট অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী তাঁর 'মাইকেল মধুসূদন' গ্রন্থে লিখছেন—এইখানেই তাঁর প্রতিভার ভিত্তি স্থাপনের সূত্রপাত। এই সময়ে তিনি গ্রীক, ল্যাটিন ও সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করেন। ফারসী আগেই শিখেছিলেন।

পরে এই কলেজটি কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। ঐ বাড়িতেই আজকের বি. ই. কলেজ চলছে। যদিও এই বি. ই. কলেজ সর্বপ্রথমে চালু হয়েছিল ১৮৫৬ খ্রীঃ বর্তমান রাইটার্স বিল্ডিংস-এ। পরে ১৮৮০ খ্রীঃ কলকাতা থেকে বি. ই. কলেজ শিবপুরে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৯৩ সালে এই কলেজটিকে **Deemed University** বলে ভারত সরকার স্বীকৃতি দিয়েছেন।

এর পরই ভারতীয় তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় জেলার সর্বপ্রথম কলেজ হচ্ছে নরসিংহ দত্ত কলেজ। দানবীর বেলিলিয়াস সাহেবের বাগান বাড়ির ঘরেতে এই কলেজটি ১৯২৩ খ্রীঃ স্থাপিত হয়।

যদিও ক্লাস শুরু হয় ১৯২৪-এ। অমিয় কুমার ব্যানার্জী তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে লিখেছেন—**Narasingha Dutta College of Howrah city was established in 1923 and received its affiliation from the University of Calcutta for conducting classes in Intermediate Arts in the same year, the classes, however, started in 1924 when the college was permitted by the University to hold classes in the Intermediate Science course as well.** এই কলেজটির ইতিহাস একটু বর্ণনা দেওয়া ভাল কারণ নেপথ্যে থেকে যিনি এই সম্পত্তিটি দান করে গেছেন তা কম চমকপ্রদ নয়। ব্যাঁটরার বিখ্যাত দত্ত পরিবারের সন্তান নরসিংহ দত্ত। তিনি বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী ও 'নোটারী পাবলিক' পদেও আসীন ছিলেন। সোপার্জিত অর্থে তিনি প্রচুর সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। তাঁরই সময়ে ব্যাঁটরায় এক ধনবান বিদেশী ব্যবসায়ী বাস করতেন—তাঁর নাম ছিল আইজ্যাক রাফেইল বেলিলিয়াস (**Isaac Raphail Belilios**)। প্যালেস্টাইন থেকে এদেশে ব্যবসা করতে এসেছিলেন। সিঙ্গাপুরে

পশম-চালান করে ও বিদেশ থেকে সুগন্ধি দ্রব্য এদেশে এনে প্রচুর ধনের মালিক হন। তাঁরই স্ত্রীর নাম ছিল রেবেকা বেলিলিয়াস। বেলিলিয়াস রোডের উপর তিরিশ-চল্লিশ বিঘা জমির এই বাড়িটি পুকুর, পরিখা, পশুশালা ও মূল্যবান বৃক্ষ দ্বারা সুশোভিত ছিল। নরসিংহবাবুর পরিবারের সঙ্গে এই দম্পত্তির খুব সুসম্পর্ক ছিল। দুঃখের বিষয় ঐ দম্পতির কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাই ঐ সম্পত্তি দেখাশুনার সমস্ত ভার দিয়ে যান নরসিংহ পুত্র সুরঞ্জন দত্তকে। উল্লেখ্য, রেবেকার বসতবাটিই আজকের 'নরসিংহ দত্ত কলেজ'। আর ঐ পার্ক রক্ষনাবেক্ষণের ভার দেওয়া হয় হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিকে এক চুক্তি পত্রের মাধ্যমে। এই কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। দীর্ঘদিন ধরে এখানে কেবল ইণ্টারমিডিয়েট আর্টস কোর্স পরানো হত—১৯৬১ সালে বি. এ ও ১৯৪৬-এ বি. এসসি. পড়াবার অনুমতি পায়। আনন্দের কথা আজ পশ্চিমবঙ্গে এটি একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজের অন্তর্গত। এই উন্নতির মূলে যে সমস্ত অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁদের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেনের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। কৃতী ছাত্র, অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ছিলেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রের প্রিয় ছাত্র। তাঁরই আমলে (১৮৯৫-১৯৭০) এই কলেজের বিভিন্ন শাখার প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধি চোখে পড়ার মত। উল্লেখযোগ্য অধ্যাপকদের মধ্যে হরিপদ ভারতী ও কবি জীবনকৃষ্ণ শেঠের নাম করা যায়।

এই প্রসঙ্গে হাওড়া জেলার প্রথম মহিলা কলেজ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। কর্মে নিষ্ঠা, সঙ্কল্পে অটুট ও নিঃস্বার্থ সমাজ সেবার আদর্শ থাকলে কোন বাধাই যে অন্তরায় হয়ে প্রগতির পথকে রুদ্ধ রাখতে পারে না তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ হাওড়ার প্রথম মহিলা কলেজ 'হাওড়া গার্লস কলেজ'। পশ্চিমবঙ্গের মহিলা কলেজগুলির মধ্যে আজ এটি প্রথম সারির কলেজ হলেও বাহান্ন বছর আগে-এর সূতিকাগৃহ ছিল শিবপুরের এক ধনাঢ্য ব্যক্তির (পান্নালাল মুখার্জীর) বৈঠকখানায়। তখন বিনা পারিশ্রমিকে পড়াতেন দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় ও হরিপদ ভারতীসহ কয়েকজন অধ্যাপক।[২৩] অসৌচান্তে উহা শিবপুর ভবানী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাতঃকালীন বিভাগে স্থানান্তরিত হয়ে অধ্যাপক বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের অধ্যক্ষতায় চলতে শুরু করল ১৯৪৬ সালে। সাংগঠনিকনেতা বিজয়কৃষ্ণের দুই সহচর ছিলেন পান্নালাল মুখার্জী ও পুলিন বিহারী হালদার। ১৯৪৭ সালেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজরূপে উহাকে অনুমোদন দিলেন। এর মূলে ছিল কংগ্রেস নেতা অধ্যাপক বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের প্রশাসনিক কাজের অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা সমাজ কল্যাণের কাজে প্রয়োগ করার শুভ ইচ্ছা। অনুমোদন লাভের পরেই ১৯৪৯-৫০ চার্চ রোডের বর্তমান স্থানে কলেজ স্থানান্তরিত হয়। দীর্ঘদিন ধরে কলেজটি আর্টস পড়ালেও বর্তমানে এটি একটি প্রথম শ্রেণীর মহিলা কলেজে (আর্টস, সায়েন্স ও কমার্স) পরিণত হয়েছে। কিন্তু এর পেছনে যে সব কৃতী ও আদর্শবাদী অধ্যাপকদের অবদান অবিস্মরণীয় তাঁরা হলেন দুর্গাদাস চ্যাটার্জী, হরিপদ ভারতী, কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী, বিনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার

বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত কুমার ঘোষ (দর্শন-অধ্যাপক) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে কবি জীবনানন্দ দাসকে অধ্যাপকরূপে পেয়ে ছাত্রীরা ধন্য হয়েছিল। বালিকাদের বি. এড. পড়ার ব্যবস্থা করে যেতেও ভোলেননি কলেজের প্রধান স্থপতিকার অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য। তাই তাঁর মহাপ্রয়াণের পর সঙ্গত কারণেই কলেজটির নাম বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজরূপে নামাঙ্কিত করে গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজার সার্থক কাজই করা হয়েছে। শিবপুর দীনবন্ধু কলেজও তাঁর একটি অমর কীর্তি।

এরপর বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের অধীনে বেলুড় বিদ্যামন্দির (১৯৪০-৪১), আমতা রামসদয় কলেজ (১৯৪৬) প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে জেলার গ্রামে ও শহরে আরও কিছু সংখ্যক কলেজ স্থাপিত হয়—যেমন শিবপুর দীনবন্ধু কলেজ (১৯৪৮), উলুবেড়িয়া কলেজ (১৯৪৮-৪৯), বাগনান কলেজ (১৯৫৮), শ্যামপুর সিদ্ধেশ্বরী মহাবিদ্যালয় (১৯৬৪), সাঁকরাইলের প্রভু জগবন্ধু কলেজ (১৯৬৪), লালবাবা কলেজ (১৯৬৪), পুরশ কানপুর কলেজ (১৯৬৬)। সাম্প্রতিককালে কানাইলাল ভট্টাচার্য কলেজ (১৯৮০) ও বাঁকড়ায় আজাদ হিন্দ কলেজও তৈরী হয়েছে। জগৎবল্লভপুরের শোভারাণী ও আমতা জয়পুর কলেজের প্রতিষ্ঠা গ্রামে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আরও সুযোগ ঘটিয়ে দিয়েছে। কৌতূহল জাগতে পারে যে উচ্চশিক্ষা প্রসারে হাওড়া জেলার উদ্যম এত দেরীতে শুরু হল কেন? মনে হয়, কলকাতার সান্নিধ্যই হাওড়াকে এই প্রয়োজন মেটাতে ততটা উদ্যোগী হতে বিরত রেখেছে। প্রসঙ্গত, এই একই কারণে স্বাধীনতার আগে তদানীন্তন ২৪-পরগণা জেলায়ও কোন কলেজ স্থাপিত হতে পারেনি।

একটি অজানিত অথচ চমকপ্রদ ঘটনা পরিবেশন করে পরিচ্ছদটির উপসংহার টানা হচ্ছে। কালে এটি একটি ঐতিহাসিক নজির হিসেবে উল্লিখিত হবে বলে মনে হয়। ঘটনাটি ঘটেছিল শালকিয়া এ. এস. স্কুলের দশম-শ্রেণী কক্ষে। ১৯৩৬ সাল। সুনীল চন্দ্র সরকার নামে জনৈক শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য স্নাতক হয়ে স্কুলে যোগ দিয়েছেন। তখনকার দিনে দশম শ্রেণীতে বাংলা সিলেকসনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নির্ঝরিণী' নামে একটি কবিতা পাঠ্য ছিল। শ্রীসরকার ঐ কবিতাটি পড়াতে গিয়ে যে ব্যাখ্যা করলেন তার প্রতিবাদ হল ঐ শ্রেণীর মুষ্টিমেয় মেধাবী ছাত্রর কাছ থেকে। এদের প্রতিবাদের কারণ ছিল—উক্ত কবিতাটির ব্যাখ্যা স্কুলের তদানীন্তন জনৈক প্রবীণ ও খ্যাতনামা বাংলা-শিক্ষক নীলরতন আঢ্যের ব্যাখার বিপরীত ছিল বলে। বলা বাহুল্য, সেই যুগে ঐ স্কুলে উক্ত প্রবীণ শিক্ষকের বাংলা-সাহিত্য জ্ঞানের গভীরতা সম্বন্ধে ছাত্ররা সন্দেহাতীত ছিল। ফলে যুবক ও নবীন শিক্ষক সুনীলবাবুর ব্যাখ্যাটি তাদের মনঃপূত হল না। সুনীলবাবুও মহাবিপদে পড়লেন। প্রবীণদের সঙ্গে বাদানুবাদে না গিয়ে সোজা বিশ্বকবিকেই এক পত্রাঘাত করলেন। পাঠকের অবগতির জন্য সুনীলবাবু ও রবীন্দ্রনাথের দুটি চিঠিই ছেপে দেওয়া হল।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমার বিনীত প্রণাম গ্রহণ করবেন। আপনার একটি কবিতা সম্বন্ধে ছাত্র ও শিক্ষক মহলে কিছু উদ্বেগ, কলহ ও অস্বাচ্ছন্দ্যের সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাপারটা সামান্য হলেও হয়ত আপনার সামান্য একটু মনোযোগের অযোগ্য নয়। এই ভেবে এ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সাহসী হলুম।

কবিতাটি হ'ল 'নির্ঝরিণী'—Calcutta University Matriculation পরীক্ষার্থীদের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। কবিতাটি স্কুলের ছেলেদের জন্যে নির্বাচনে কর্তৃপক্ষ বিবেচনা শক্তির পরিচয় দিয়েছেন কিনা, সে আলোচনা করবো না। তবে আমি নিজে জানি, ঐ কবিতাটির ব্যাখ্যা নিয়ে বহু স্কুলেই শিক্ষকদের মধ্যে মতদ্বৈধ ঘটেছে। বাজারের Notes Makers-রা তো কবিতাটি 'শেষের কবিতা' থেকে উদ্ধৃত এই অজুহাতে কবিতাটিকে প্রেমের কবিতা বলে ব্যাখ্যা করেছেন। অনেক শিক্ষক শুনতে পাই এই কবিতাটির সঙ্গে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' জড়িত ক'রে এমনও বলেছেন যে ও কবিতাটি হচ্ছে নির্ঝরের সমুদ্র যাত্রার তুলনা। এ অর্থ করবার কোনও সঙ্গত কারণ আমি তো দেখি না। অবশ্য এ বিষয়ে কোন উৎকণ্ঠা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে না।

শুধু আমার নয়, অসংখ্য শিক্ষক ও ছাত্রের সুবিধার জন্য এই আমার নিবেদন যে, এ বিষয়ে আপনার কাছ থেকে একটু নির্দেশ পেলে কৃতার্থ হবো।

প্রার্থনা করি আপনার স্বাস্থ্য যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। ইতি—প্রণত—

সুনীল চন্দ্র সরকার
৩৩, জেলিয়াপাড়া লেন, সালকিয়া, হাওড়া
তাং ১৭ই এপ্রিল, ১৯৩৬

এই চিঠি পেয়ে বিশ্বকবি যে উত্তর দিয়েছিলেন তাও ছেপে দেওয়া হল।

সুনীলচন্দ্র সরকার
৩৩, জেলিয়াপাড়া লেন, শালকিয়া, হাওড়া

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

'শেষের কবিতা' গ্রন্থে 'নির্ঝরিণী' কবিতার বিশেষ উপলক্ষ্যে বিশেষ অর্থ ছিল। তার থেকে বিশ্লিষ্ট করে নেওয়াতে তার একটা সাধারণ অর্থ খুঁজে বের করা দরকার হয়। আমার মনে হয় সেটা এই যে, আমাদের বাইরে বিশ্ব প্রকৃতির একটি চিরন্তনী ধারা আছে, সে আপন সূর্য চন্দ্র আলো-আঁধার নিয়ে সর্বজনের সর্বকালের। জ্যোতিষ্ক লোকের ছায়া দোলে তার ঝরণার ছন্দে। জীবনে কোনো বিপুল প্রেমের আনন্দে এমন একটা পরম মুহূর্ত আসতে পারে যখন আমার চৈতন্যের নিবিড়তা আপনাকে অসীমের মধ্যে উপলব্ধি করে—তখন বিশ্বের নিত্য উৎসবের সঙ্গে মানব-চিত্তের উৎসব মিলিত হয়ে যায়, তখন বিশ্বের বাণী তাঁরই বাণী হয়ে উঠে।

ইতি—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫ই বৈশাখ ১৩৬৩

এই চিঠিকে কেন্দ্র করে 'নির্ঝরিণী' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় ৩রা ভাদ্র, ১৩৪৩ সাল নিজ ব্যাখ্যা নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করেন ঃ

'শেষের কবিতা'য় নায়িকাকে সম্বোধন করে উপন্যাসের নায়ক বলছে, তুমি ঝর্ণার মতো, তোমার চিত্তের প্রবাহ স্বচ্ছ, বিশ্বের আনন্দ-আলোক তার মধ্যে অবাধে প্রতিফলিত হয়। তোমার সেই নির্মল হৃদয়ে আমার ছায়া পড়ুক, আমার চিন্তা তোমার হৃদয়ে দোলায়িত হতে থাক, তোমার মনে প্রতিবিম্বিত আমার ছবিটিকে বাণী দাও, তোমার প্রেমের যে বাণী নিত্যকালের। অর্থাৎ তোমার ভালোবাসার চিরন্তনতায় তাকে সার্থক করো; সত্য করো।

তোমার অন্তরে পড়ছে আমার ছায়া, তার সঙ্গে মিলেছে তোমার আনন্দের দীপ্তি, তারই উপলব্ধিতে আমার অন্তরতম কবি উল্লসিত। পদে পদে তোমার আনন্দের ছটায় আমার প্রাণে করে ভাষার সঞ্চার। আমার মন জাগে তোমার ভালোবাসার প্রবাহ-বেগে, তার প্রেরণায় আমার যথার্থ স্বরূপকে জানি। তোমাতেই পাই আমার প্রকাশরূপিণী বাণীকে।'

এক কথায়, এই কবিতার মর্মার্থ এই যে, অন্যের আনন্দের মধ্যে নিজেকে যখন প্রতিফলিত দেখি তখন নিজের আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রকাশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

এই কবিতার অর্থ সম্বন্ধে কবির নিজস্ব ব্যাখ্যা প্রকাশিত হওয়ায় ব্যাপারটি এখানেই শেষ নয়।

কিন্তু এর ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ রকম একটি জটিল কবিতাকে স্কুলের অপরিণত ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাঠ্যতালিকাভুক্ত ক'রে যে সুবিবেচনার পরিচয় দেননি (যা সুনীলবাবু সন্দেহ প্রকাশ করেও মন্তব্য করেননি) তা তাঁরা নিজেরাই বুঝতে পারেন। আনন্দের কথা অবশেষে ঐ কবিতাটিকে পাঠ্যতালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়।

শুধু হাওড়া জেলায়ই নয় সম্ভবত বঙ্গদেশেই এটা এক অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। এই সুযোগে সুনীলবাবুর সঙ্গে বিশ্বকবির পরিচয় গাঢ় হয় এবং কবির আহ্বানে তিনি স্কুল ছেড়ে বিশ্বভারতীতে শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। আমৃত্যু সেখানে যুক্ত থেকে শেষ জীবনে 'বিনয় ভবনের' (বি. টি. কলেজ) অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। আর যে মেধাবী ছাত্ররা সুনীলবাবুর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে অতৃপ্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে রামকৃষ্ণ ঘোষ পরের বছর (১৯৩৭) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে নিজে তৃপ্ত হন এবং হাওড়া তথা শালিখাবাসীকেও তৃপ্তিদান করেন। অপর দুজন ছিলেন শীতলচন্দ্র পোড়েল ও সুশীলকুমার গাঙ্গুলী (সলিসিটর)।

১, ৩, ২১, ২২. L.S.S.O. Malley & M. Chakravorty—Howrah District Gazetteer 1909.

২. C. N. Banerjee—An Account of Howrah—Past & Present.

৪, ৬, ৭, W. B. District Gazetteers (Howrah)—Amiya K. Banerjee.

৫, ৮, ২৩. হাওড়া শহরের ইতিবৃত্ত—অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৯. স্মারক গ্রন্থ গোবর্দ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ ১৯৪৮।
১০. শালকিয়া এ. এস. স্কুল—শতবর্ষ স্মরণী (১৯৫৫) পৃষ্ঠা ১১।
১১, ১৭. পর্বান্তরের বিষয় কলকাতা—প্রতাপ মুখোপাধ্যায়।
১২, ১৩. সংবাদপত্রের সেকালের কথা (২য় খণ্ড)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৪. আশুতোষ স্মৃতিকথা—ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন।
১৫. বেলুড় উচ্চ বিদ্যালয় পত্রিকা—নব পর্য্যায় ১৯৮৩।
১৬. বেলুড় উচ্চ বিদ্যালয় শতবর্ষ জয়ন্তী উদ্বোধন উৎসব ১৯৫৬।
১৮. St. Thomas' Church School—125th Anniversary Volume.
১৯. হীরক জয়ন্তী স্মরণিকা ১৯৮৫ সাল—কেদারনাথ ইনস্টিটিউশন।
২০. বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ১৯৭২ সাল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের রাজনৈতিক জীবনের অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘটনা। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ প্রত্যক্ষভাবে তদানীন্তন বঙ্গদেশের সামাজিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন হ'লেও অপ্রত্যক্ষভাবে তা জাতীয় আন্দোলনকেই সাহায্য করেছিল। এই আন্দোলন সারা দেশের হ'লেও হাওড়ার অবদান এ ব্যাপারে স্মরণ করার মত।

'তারকেশ্বরের মঠ' বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে অতি পরিচিত নাম। শিবের পুজোর জন্য সেখানে বিভিন্ন রাজ্যের লোকেরা উপস্থিত হ'লেও একথা বাস্তব সত্য যে, বাঙ্গালীর লালন-পালনেই আজও তারকেশ্বর মঠ সজীব হ'য়ে আছে। কিন্তু এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, এতে বাঙ্গালীর কোন দান ও চিন্তা নেই। এই মঠ স্থাপন উত্তর ভারতের 'দশনামী শৈব' সম্প্রদায়ের মোহান্তবাদের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে মোহান্তবাদীদের কোন সম্পর্কই নেই। তাই বিনয় ঘোষ তাঁর পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি গ্রন্থে বলেছেন—'প্রকৃতপক্ষে মোহান্ত কালচার বাংলার বাইরে থেকে অ-বাঙ্গালীরা আমদানী করেছে।'

'দশনামী' সাধুদের সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা এখানে আবশ্যক। শংকরাচার্য বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম থেকে বেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণার্থে সারা ভারতে চারটি মঠ তৈরী করেছিলেন। সেগুলি হচ্ছে শৃঙ্গগিরি মঠ, সারদা মঠ, গোবর্ধন মঠ ও যোশী মঠ। শংকরাচার্যের চারজন প্রধান শিষ্যের আবার দশজন শিষ্য ছিলেন। এই দশজন মোহান্ত থেকেই দশনামী সম্প্রদায়ের উদ্ভব। অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'-এর ২য় ভাগে বলেছেন, "এই চার মঠাচার্য্যের দশজন শিষ্য থেকে পরবর্তীকালে প্রচলিত দশনামী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে।"

তারকেশ্বরের মঠ প্রতিষ্ঠা করেন পশ্চিম ভারতের একজন রাজার ভ্রাতা—নাম তাঁর রাজা ভারামল্ল সিং।[১] অত্যাচারী পাঠান দস্যুদের অত্যাচারে তিনি বঙ্গদেশের এই অঞ্চলে এসে আশ্রয় নেন। ভারামল্লের একটি পয়স্বিনী ছিল। জনশ্রুতি তাঁর ভাই ঐ গাভীটিকে নিয়ে বনে চরাতে যেতেন। মজার ব্যাপার হল, গাভীটি যখনই একটি শিলাখণ্ডের ওপর এসে দাঁড়াতো তখনই তার বাঁট থেকে দুধ গড়াতে শুরু করতো। রাজা নিজেও ওই ব্যাপারটি একাধিক দিন লক্ষ্য করেন। কিন্তু বহু চেষ্টা ক'রেও ঐ শিলাখণ্ডটি তোলা গেল না। পরে স্বপ্নাদিষ্ট হ'য়ে তিনি সেখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। 'মোহান্ত' নামধারী এক সন্ন্যাসী এসে পুজো ক'রতে লাগলেন।[২] পুজারী মাধব গিরির সময়ে এখানে এক কুৎসিত ঘটনা ঘটে। জনৈক নবীনের স্ত্রী এলোকেশী নামে এক অসামান্যা সুন্দরী স্বামীর সঙ্গে তারকেশ্বরে পুজো দিতে আসেন। মাধব গিরির লোক তাকে মঠের ঘরে নিয়ে যায়। স্ত্রীকে

উদ্ধার করা অসম্ভব ভেবে তিনি বঁটি দিয়ে স্ত্রীর গলা নিজেই কেটে দেন। বিচারে তাঁর চরম দণ্ড হ'ল এবং মাধব গিরিরও ছ'মাস জেল হয়।

মাধব গিরির পরেই মোহান্ত হলেন তাঁরই শিষ্য সতীশ গিরি। মোহান্ত এঁদের উপাধি হ'লেও মোহের অন্ত কিন্তু এঁদের তখনও হয়নি। অপরপক্ষে ঘটনা এই কথাই প্রমাণ করবে যে, ওঁরা মোহের প্রতিই আসক্ত ছিলেন। ফলে কোর্ট কাছারী হয়েছে অনেক। আদালতের রায়ও তাই প্রমাণ করে। সতীশ গিরিও ধোয়া তুলসী-পাতা ছিলেন না। প্রথম জীবনে এই সতীশ গিরি জমিদারের দারোয়ান ছিলেন। শোনা যায়, তিনি এক সময় স্টেশনের পানিপাঁড়ের কাজও করেছেন। এহেন ব্যক্তি গুরুদেবের মৃত্যুর পর মঠের বিপুল সম্পত্তির মালিক হ'য়ে পড়লেন। এই সতীশ গিরির বিরুদ্ধে জনসাধারণের নানা অভিযোগ ছিল। এমনকি নারী-ঘটিত ব্যাভিচারেরও অভিযোগ ছিল। তদানীন্তন বিদেশী ইংরেজ সরকার এসব দেখে শুনেও চুপ ক'রে থাকতেন। কিন্তু এমনই এক মারাত্মক ঘটনা ঘটলো এই সতীশ গিরিকে নিয়ে যার বিরুদ্ধে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে গর্জে উঠল সারা বঙ্গদেশ। ঘটনাটি হ'ল এই—

১৯২৩ সাল। হাওড়ার এক উকিলবাবু তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে তারকেশ্বরে তীর্থ করতে যান। সতীশ গিরির লোকেরা ঐ ভদ্রমহিলাকে একটি ঘরে তালা দিয়ে রেখে ভদ্রলোককে অন্যত্র নিয়ে যায়। ভদ্রমহিলা সমূহ বিপদের আশংকা বুঝতে পারলেন। হঠাৎ তিনি ঐ ঘরেই একটি দা দেখতে পান। সেটি দিয়ে পিছনের বাঁশের বাতা কেটে কোনক্রমে স্টেশনে এসে পেঁছান। দুজন সাহেব শিকার ক'রে ফেরার পথে সেই সময় তারকেশ্বর স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন। ভদ্রমহিলা তাঁদের পায়ে ধ'রে তাঁদেরকে বাঁচাবার জন্য কাকুতি মিনতি করতে থাকেন। সাহেব দু'জন তাঁর স্বামীকে অবশ্য উদ্ধার ক'রে আনেন। সংবাদপত্রে এই সংবাদ প্রকাশে বঙ্গদেশে সোরগোল পড়ে যায়। 'ব্রাহ্মণ-সভার' জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তি শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী নিজে তারকেশ্বরে যান এবং ঘটনাটি সত্য ব'লে জানতে পারেন। বিশুদ্ধানন্দ স্বামী ও সচ্চিদানন্দ স্বামী এই অন্যায় রুখতে এগিয়ে এলেন। দুই স্বামীজী 'ব্রাহ্মণ-সভাকে' এ কাজে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁরা এলেন না—এলেন না দুর্নীতি দূরীকরণে বিদেশী শাসকও। তাই ১৯২৪ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সতীস গিরিকে পদচ্যুত ক'রতে এগিয়ে এলেন। দেশবন্ধু তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে তিনি সেখানে সরেজমিনে তদন্ত ক'রে আসেন। এই উপলক্ষে ১৩৩১ সালে ১লা আষাঢ় কলকাতার মির্জাপুর পার্কে (বর্তমান শ্রদ্ধানন্দ পার্ক) এক বিরাট সভা হয়। এই সভায় বাংলার যুবশক্তিকে সত্যাগ্রহের সামিল হ'তে দেশবন্ধু আহ্বান জানান। ইংরেজ রাজপুরুষরা এই আন্দোলনকে Colossal Hoax ব'লে আখ্যা দিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য চিত্তরঞ্জনেরই জয় হয়।

এই আন্দোলন সংগঠনে হাওড়ার অধিবাসীদের এক বিশেষ অবদান আছে—যেটা

অনেকের কাছেই অজ্ঞাত। ঐ আন্দোলনকে জয়যুক্ত করার জন্য শালকিয়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও পৌর কমিশনার বনওয়ারীলাল রায়ের নেতৃত্বে এখানে একটি কমিটি গঠন করা হয়। স্বামী সচ্চিদানন্দ ও বিশ্বানন্দ স্বামী (এঁরা উভয়েই পশ্চিমা সাধু) বনওয়ারীলাল রায়ের ক্ষেত্র মিত্র লেনস্থ বাড়িতে থেকে (আর্য সমাজের বিপরীত দিকে একতলা বাড়িটি) এই আন্দোলনকে সফল ক'রতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। শালকিয়া থেকে যেসব সত্যাগ্রহীরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ শম্ভুচরণ পাল (হাওড়া বার্তার সম্পাদক), সুধীর মজুমদার (বড়বাগান) এবং বাবুডাঙ্গার উপেন চৌধুরী। ব্যাঁটরার হৃষীকেশ অধিকারী ও অজিত দাস এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাদণ্ড ভোগ করেন।

হাওড়ার প্রান্ত সীমায় হুগলীর নতিবপুরে জন্মালেও বলাই চন্দ্র সিংহ হাওড়া শহরকে বেছে নেন দেশ সেবার কেন্দ্র হিসাবে। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে 'মহাবীর দল'-এর তিনি সম্পাদক নিযুক্ত হন। বলাইবাবুর সঙ্গেই এই আন্দোলনে যোগ দেন মধ্য হাওড়ার সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপ্লবী পুলিনবিহারী রায় (অমরাগড়ী), নগেন ব্যানার্জী, বালিচকের কার্তিক চন্দ্র পাত্র, বটকৃষ্ণ রায় ও কদমতলার অনাদি মুখার্জী ও মধ্যহাওড়ার বিষ্ণু ভট্টাচার্য। এঁরা সকলেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের এই সত্যাগ্রহে কর্মী সংগ্রহ করে ও নিজেরা গ্রেপ্তার বরণ করে মোহান্তের কামিনী-কাঞ্চনের মোহভঙ্গে সহায়তা করেছিলেন। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন আবার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একজন ডান হাত। এই সত্যাগ্রহে তাঁর দান ভোলা যাবে না।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে বালির অধিবাসীদের সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ উল্লেখ করার মত। প্রথম শ্রেণীর নেতারা প্রথম দিকে গ্রেপ্তার বরণ করায় পরে সত্যাগ্রহীদের যোগান দেওয়া চিন্তার বিষয় হয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে বালি কংগ্রেসের কর্মী মোহিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ভার পড়ল নিয়মিত সত্যাগ্রহী যোগান দেওয়া। এই প্রসঙ্গে 'অভিনন্দন—অঞ্জলি' স্মারকগ্রন্থে সুধাকর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন—'প্রতিদিন পাঁচজন করে সত্যাগ্রহী কারাবরণ করে—এই ভাবে প্রায় পনের দিন মোহিতকুমার তাঁর সত্যাগ্রহী ছাত্রদের মোহান্তের অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পাঠান এবং প্রত্যেকেই হন ছমাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত।' দণ্ডিতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কানাই পাঠক, তারাকুমার মুখার্জী, বনবিহারী ব্যানার্জী, ঘোষপাড়ার প্রবোধ ঘোষ প্রমুখ। পরে এরা সকলেই গ্রামের শিক্ষা বিস্তার ও সামাজিক উন্নতি বিধানে যথাযোগ্য ভূমিকা নিয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।

বলা বাহুল্য, চিত্তরঞ্জন দাশের এই আন্দোলনকে অর্থ দিয়ে সাহায্য ক'রতে হাওড়ার সাধারণ মানুষের সঙ্গে বারবণিতারা পর্যন্ত রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। বাড়ি বাড়ি গান গেয়ে তাঁরা অর্থ সংগ্রহে বার হ'তেন। সে গানের বাণী আজও মুষ্টিমেয় বিদগ্ধজনের মুখে মুখে ধ্বনিত হ'তে শোন যায়—

ভিক্ষা দাও গো ভিক্ষা দাও গো
এসেছি ভিক্ষা করিয়া সার,
তারকেশ্বর ভেসেছে পাপেতে
করিছে সবাই হাহাকার।
সচ্চিদানন্দ বিশ্বানন্দ গুণাধার
রুধিলে দানে কারাবরণে
করিছে দেশের পাপ সংহার।

এই আন্দোলন চালানোর জন্য তদানীন্তন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির খ্যাত-নাম্নী নেত্রী বীণা দাস পর্যন্ত শালিখায় সভা ক'রে এখানকার অধিবাসীদের অত্যাচার, অনাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সামিল হ'তে আবেদন জানিয়েছিলেন।

অবশ্য সকলেরই জানা আছে শেষ পর্যন্ত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আন্দোলনই জয়যুক্ত হয়েছিল। সতীশ গিরির বিরুদ্ধে যে মামলা হয় তাতে তাঁর পরাজয় ঘটে। সতীশ গিরি মোকদ্দমায় জেতার জন্য নিজেকে তান্ত্রিক ব'লে দাবি করেছিলেন। কিন্তু হুগলীর জেলা-জজ মিঃ কে. সি. নাগ যে রায় দেন তাতে তিনি সেই দাবিকে অস্বীকার করেন। বিচারপতি শ্রীনাগ তাঁর রায়-দানে বলেন—**Their learned discourses on the Hindu Shastras established beyond doubt that the Dashnami Sannyasis are Vedic Sannyasis—and that the Mathadhari Sannyasis belonging to school of Shankaracharya are Vedic and not Tantric Sannyasis, that the Tarakeswar Math is governed by the Shankaracharya School of Thought, that the Mohaunt of the Tarakeswar Math···is a Mathadhari Dashnami Sannyasi.**[8]

এই রায় থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, দশনামী সাধুরা আসলে বৈদিক সন্ন্যাসী।

১, ২, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—সুধাকৃষ্ণ বাগচি।
৩. বালি সাধারণী সভা—শতবার্ষিক স্মারক গ্রন্থ
৮. পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ।

কৃষক আন্দোলন

১৯৩০ সালে গান্ধীজির আইন অমান্য আন্দোলন ও একই বছরে মাষ্টারদা সূর্য সেনের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অপরাধে ইংরেজের কারাগারে বহুশত নেতৃবৃন্দসহ বিপ্লবী ও কংগ্রেস কর্মীরা বন্দী হয়ে আছেন। গান্ধীজির ডাণ্ডি অভিযানের প্রভাব জনগণের মধ্যে এক নতুন জোয়ার আনলেও ইংরেজের দমন নীতির ফলে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। একই ভাবে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের সশস্ত্র আন্দোলনও ইংরেজের হাতে দমিত হতে বেশী সময় লাগলো না। ফলে ইংরেজের কারাগারগুলি সংগ্রামী দেশকর্মীদের দ্বারা পরিপূর্ণ। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসও তখন দুই উপদলে বিভক্ত—একদল সুভাষচন্দ্রের পক্ষে আর এক দল যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সমর্থক। হাওড়া জেলা কংগ্রেসের বিশিষ্ট সংগঠক ও পরিচালক হচ্ছেন হরেন্দ্রনাথ ঘোষ। তাঁরই উৎসাহে ও সাংগঠনিক ক্ষমতায় হাওড়া শহরে অনেক জাতীয়তাবাদী ক্লাবও গড়ে ওঠে। তিনি যুব শক্তিকে একত্রিত করে স্বদেশ সেবার ব্রতে অনুপ্রাণিত করে তোলেন। হরেন্দ্রনাথ ছিলেন আবার সুভাষ পন্থী। সুতরাং তাঁর নেতৃত্বে হাওড়া জেলা কংগ্রেসের বেশীর ভাগ সদস্যই সুভাষ বসুর অনুগামী হওয়া স্বাভাবিক। ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসের অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় হরেন্দ্র নাথের শক্তি হাওড়ায় আরও সুদৃঢ় হল। কিন্তু ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসে দ্বিতীয়বার সভাপতিপদে দাঁড়াতে গান্ধীজি সুভাষচন্দ্রকে মানা করেন। সেবারে তিনি পট্টভী সীতারামিয়াকে কংগ্রেস সভাপতিরূপে প্রার্থী করতে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যেই ডান ও বামপন্থী গরিষ্ঠসংখ্যক সদস্যদের ইচ্ছানুসারে সুভাষচন্দ্র আবার প্রার্থী হয়ে গান্ধীজীর মনোনীত প্রার্থী সীতারামিয়াকে অধিক ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। তার পরের ইতিহাস সবারই প্রায় জানা আছে। সুভাষচন্দ্রকে তিন বছরের জন্য কংগ্রেস থেকে সাসপেণ্ড করা হয়। প্রতিবাদে তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে আপোষ-হীন সংগ্রাম চালানোর উদ্দেশ্যে 'ফরওয়ার্ডব্লক' নামে একটি দল গঠন করেন। বলা বাহুল্য, বাংলা দেশের অধিকাংশ কংগ্রেস কর্মীই তখন সুভাষচন্দ্রের পক্ষে যোগ দেন। হরেন্দ্রনাথ হাওড়া জেলা কংগ্রেসের কাণ্ডারী হওয়ায় জেলার অধিকাংশ নেতা ও কর্মীই সুভাষচন্দ্রের পক্ষে চলে যান।

কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এই দলে যোগদান করার আগেই হরেন্দ্রনাথ শহর কেন্দ্রীক কংগ্রেসকে উলুবেড়িয়া শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক সংগঠন ও গ্রামের কৃষিজীবীদের মধ্যে জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগঠন গড়ে তুলতে সফল হয়েছিলেন।

এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে ডাণ্ডি অভিযান ও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার

লুণ্ঠনের পর জেলেতে বিপ্লবীদের মধ্যে ইংরেজ সরকার অন্যান্য বইপত্রের সঙ্গে বিশেষ করে মার্কসবাদের চিন্তাধারা বিষয়ক প্রচুর বইপত্র বিলি করেছিলেন। সোভিয়েট দেশের বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক আদর্শ অনেকের মনে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল।

ফরওয়ার্ড ব্লক গঠিত হওয়ার আগে হরেন্দ্রনাথই হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির কর্ণধার ছিলেন। তাঁরই নির্দেশনায় গ্রামে জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস কর্মীদের তিনি চাষীদের হয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে আহ্বান জানান। ঐ কাজে হাওড়া জেলার গ্রামীণ কর্মীদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন নিতাই মণ্ডল, বিভূতি ঘোষ (নানু), তারাপদ মজুমদার, সত্যচরণ দাস, সুজন সরকার, ইন্দু চৌধুরী, মনোরঞ্জন রায় প্রমুখ।

উল্লেখ্য, হাওড়া জেলার বেশীর ভাগ কংগ্রেস নেতা ও কর্মী হরেন্দ্রনাথের অনুগামী হলেও কতিপয় বিপ্লবী কর্মী হরেন্দ্রনাথেকে মেনে নিতে পারেননি। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বিপ্লবীদের কেউ কেউ মার্কসীয় মতবাদে প্রভাবান্বিত হয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন। যদিও তাঁরা প্রথমে কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই শ্রেণী সংগ্রামের পথে অগ্রসর হওয়ার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। কিছু কংগ্রেস কর্মী অবশ্য হরেন্দ্র বিরোধী হওয়ায় তাদের সঙ্গেও যোগ দেন।

ছাত্র আন্দোলনের জেলার প্রথম সারির নেতা ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ সমর মুখার্জী। তিনি সেই সময় সুভাষ পন্থীদের পক্ষে ছিলেন। কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগদানের আগে পর্যন্ত তিনি আমতা কংগ্রেসের সম্পাদক এমনকি উলুবেড়িয়া মহকুমা কংগ্রেস কমিটিরও সম্পাদক ছিলেন।

কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার ও ফরওয়ার্ড ব্লক গঠনের সঙ্গে সঙ্গে হরেন্দ্রনাথ সদলবলে কংগ্রেসকর্মীদের নিয়ে সুভাষচন্দ্রের দলে যোগ দিলেন। হরেন্দ্রনাথ চাষীদের হয়ে আন্দোলনের ভার দিলেন আমতা গ্রামের ছেলে নিতাই মণ্ডলকে। সুভাষচন্দ্রের 'হলওয়েল মনুমেণ্ট' অপসারণে গ্রাম থেকে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহে নিতাই মণ্ডলের অবদান স্মরণীয় হয়ে আছে। সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তারের পর স্বেচ্ছাসেবকের অভাবে ঐ আন্দোলন প্রায় ভেস্তে যেতে বসে। কারারুদ্ধ হরেন্দ্রনাথ তখন নিতাই মণ্ডলকেই স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের গুরু দায়িত্ব দিয়েছিলেন। নিতাইবাবু উলুবেড়িয়া ও আমতার বিভিন্ন গ্রাম থেকে সাইকেলে ঘুরে ঘুরে স্বেচ্ছাসেবক যোগান দিতেন কলকাতায়। সেই সময় গ্রামের রাস্তায় নিতাইবাবুকে দেখলেই লোকেরা বলতেন ঐ 'ছেলেধরা' আসছে। প্রকৃতপক্ষেই সেদিনের ঐ আন্দোলনে অন্যান্য জেলা থেকে স্বেচ্ছাসেবক যোগ দিলেও হাওড়া জেলা থেকেই সিংহ ভাগ সরবরাহ করেছিলেন এই নিতাইবাবু। যার জন্য সুভাষচন্দ্র বলতেন—'হাওড়া আমার লাল দুর্গ।'

গ্রামে কংগ্রেসের কাজ করতে গিয়ে নিতাই মণ্ডলের চোখে পড়ল চাষীদের উপর জমিদারের অত্যাচার, প্রতারণা ও ঠকবাজীর কারবার। গ্রামে তখন 'কুৎ প্রথা' ও 'বাবুদী প্রথা' বলে দুটি জিনিষ বর্তমান ছিল। এই প্রথা দুটির একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

'কুৎ প্রথায়' জমির মালিক জমিদার। প্রজা ভাগচাষী মাত্র। প্রজা বৎসরান্তে খাজনা দেবে এবং উৎপন্ন ফসলের ভাগও দেবে। এই ভাগ নির্দ্ধারণ করতেন জমিদারের কর্মচারীরা, কোন এক ভাল জমির বিঘা পিছু উৎপাদনের গড় হিসাব করে। এই হিসাব করে উৎপাদনের হার ঠিক করাকেই বলা হত 'কুৎ প্রথা'। ফলে জমিদারের নির্দ্ধারিত হারে ফসলের ভাগ দিতে গিয়ে চাষীকে জমিদারের খামার থেকে ন্যূনতম অংশ নিয়েই ফিরে আসতে হত—পরিশ্রমের মূল্য বা মুনাফা তো দূরের কথা।

অপরপক্ষে, 'বাবুদী প্রথা' অনুযায়ী জমিদার উৎপন্ন ফসলের একটা মোটা অংশ 'বাবুদী' অর্থাৎ সেলামী হিসাবে পাবেন। বাকি ফসল আধা-আধি হত জমিদার ও চাষীর মধ্যে। এখানেও সেই জমিদারের লোকেদের মর্জির উপর নির্ভর করতে হত। এই লোকেদের বলা হত 'কয়াল'। এই বেতনভুক কর্মচারীরা আবার চাষীর অংশ থেকে তাদের খোরাকী বাবদ একটা অংশ কেটে নিতো। তার উপর ছিল আবার চাষীকে ঠকাবার জন্য ওজনের কারসাজি। ফলে চাষীকে সব শেষে চিটে ধানের কিছু অংশ নিয়েই বাড়ী ফিরতে হত। সে কি দুঃসহ অত্যাচার ও বঞ্চনা!

১৯৩৮ সাল। চাষীদের এই দুঃসহ অবস্থা নিতাই মণ্ডল ও তাঁর সহকর্মীদের করে তুললো বিদ্রোহী। নিতাই মণ্ডল, তারাপদ মজুমদার, সত্য দাস, মনোরঞ্জন রায় প্রমুখ কংগ্রেসী নেতারা (পরে ফরওয়ার্ড ব্লক) গিয়ে হাজির হলো সারদার মাঠে। মাঠে রাত্রিতে হ্যাজাক জেবলে চাষীদের নিয়ে সভা করে মুখার্জী জমিদার বাড়ীতে বিক্ষোভ দেখানো হল। কি! এত বড় আস্পর্দা? জমিদারের নির্দেশে লাঠিয়ালরা 'নিতাই মণ্ডল ও তারাপদ মজুমদার'কে মাটিতে গর্ত করে গলা পর্যন্ত পুঁতে রাখলো। পরে চাষীরা গিয়ে সংঘবদ্ধ ভাবে তাঁদেরকে বাঁচায়।[১] এমনি আর এক অত্যাচারী ও ইংরেজ প্রভু প্রেমিক জমিদার ছিলেন বাকসি হাটের মালিক জনৈক আলি। তাঁরও অত্যাচারের কাহিনী চাষীদের পাগলা করে দিয়েছিল। বাকসী বাজারে পিকেটিং চলছে মদের দোকানে ও বিদেশী পণ্য বিক্রয়ের বিরুদ্ধে। সেখানেও নিতাইবাবু দলবল নিয়ে হাজির। জমিদার আলির উপস্থিতিতেও বাকসীর হাটে চাষীদের পিকেটিং বন্ধ করা গেল না। উপায়ান্তর না দেখে অবশেষে নৌকায় ভর্ত্তি পণ্যদ্রব্য নদীর অপর পার দ্বীপতুল্য 'পারবাকসীতে' পুলিশের সাহায্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হয়।

এমনি ভাবে হাইতপুর, পাইক বাসা, ঝিকিরা নকুবাড়ির রায় জমিদার, জয়পুরের বসু জমিদার, জমিদার সংঘের সভাপতি ভবানীপুরের জমিদার সকলে চাষী পীড়নে একই কায়দায় সিদ্ধহস্ত ও ইংরেজপ্রভু ভজনায় রত ছিলেন। বাঁকড়োর বারমাঠে অনাবাদী জমিকে চাষীরা এমন জমিতে পরিণত করলো যে তা দেখে জনৈক মান্না ও মুখার্জী জমিদারদের খুব লোভ হল। লাঠিয়াল পাঠিয়ে জমিদারবাবুরা লাঙ্গল দিয়ে গায়ের জোরে চাষ করতে গেল। বেঁধে গেল গণ্ডগোল। খবর পেয়ে নিতাই মণ্ডল, সত্য দাস ও মনোরঞ্জন রায় চাষীদের পাশে গিয়ে বন্ধু হয়ে দাঁড়াল। জমিদারের লেঠেলরা ধরে নিয়ে গেল তিনজনকেই। কিন্তু সত্য দাস লাঠিয়ালদের

হাত থেকে ঐ লাঠি ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেল। শেষে এক বন্ধুর সঙ্গে যুক্তি করে তার খড়ের গাদায় কে বা কারা আগুন ধরিয়ে দিল। থানায় ডাইরি হল। পুলিশ এল—ঘটনা স্থলে জমিদারের পিতলে বাঁধানো লাঠিও পুলিশ দেখতে পেল। বুঝতে তাদেরও দেরী হল না—কাজটা কারা করেছে। পুলিশ জমিদার বাবুর কাছারীর ঘরে আবদ্ধ নিতাই ও মনোরঞ্জনবাবুকে উদ্ধার করলো। নিতাইবাবু ও তাঁর দলবলের লোকেদের কাছেও জমিদাররা বুদ্ধিতে পরাজয় বরণ করলো। এহেন কৃষক দরদী নেতা গ্রামেরই ছেলে ছিলেন নিতাই মণ্ডল। তাঁর নামে কানুপাটের এক প্রধান রাস্তাকে 'নিতাই মণ্ডল সরণী' নামকরণ করে গ্রামবাসীরা তাঁদের প্রিয় নেতার প্রতি যথার্থই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। পথিপার্শ্বে একটি মর্মর আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তাঁকে প্রতি বছর স্মরণ করা হয়। উলুবেড়িয়া ও শ্যামপুরেও চলে বিভূতি (নানু) ঘোষের নেতৃত্বে একই আন্দোলন।

এই সময় হাওড়ার কৃষক আন্দোলনে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতৃত্বের সঙ্গে জেলার কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বের রেষারেষি দেখা যায়। তখনকার হাওড়ার অধিকাংশ ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা ও কর্মী কিন্তু আসলে ছিলেন কংগ্রেস কর্মী। হরেন ঘোষ সুভাষ পন্থী হওয়ায় হাওড়ার কংগ্রেস কর্মীরা ফরওয়ার্ড ব্লকেই বেশী চলে যায়।

হাওড়ায় মার্কসবাদী পন্থায় কৃষক আন্দোলনের প্রথম পথ দেখান মদন দাস। তিনি প্রথম জীবনে কংগ্রেস কর্মী হিসাবে ১৯৩০ সালে আইন অমান্য করে কলকাতার চেতলায় কারাবরণ করেন। কলকাতার আশুতোষ কলেজে বি, এ, পাশ করে মুক্তি আন্দোলনে যোগ দেন। হিজলী জেলে ছ'মাস থাকার পর মুক্তি লাভ করেন। জেলেতেই মার্কসবাদী চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে প্রথমে তিনি শ্রমিক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। মেটিয়াবুরুজ থেকে গঙ্গার পশ্চিম পারে এসে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জীর সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলন করতে শুরু করেন হাওড়া রাজগঞ্জের চটকলের শ্রমিকদের স্বার্থে। ঐ পথ ছেড়ে তিনিও হাওড়ার গ্রামের জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত করতে মনস্থ করেন। ১৯৩৯ সালে হাওড়ার জুজারসাহতে কৃষক সমিতির উদ্যোগে যে প্রথম কৃষক সম্মেলন হয়েছিল তার প্রথম সম্পাদকও ছিলেন তিনি নিজে। গ্রামের জমিদারদের হাত থেকে বঞ্চিত কৃষক সমাজকে শ্রেণী সংগ্রামের আদর্শে সংঘবদ্ধ করার জন্য ডোমজুড়, বেতাই-জয়ন্তী, বড় মহরা, কুরিট, বলরামপুর, চাকপোতা, কোটালপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলে মদন দাস পায়ে হেঁটে কৃষকদের সংগঠন গড়ে তুলতে লাগলেন। মদন বাবুর পৈতৃক বাড়ী হুগলীর আকনা গ্রামে হলেও মাতুলালয় আমতার খিলায়। হাওড়ার গ্রামাঞ্চলই ছিল তাঁর যৌবনের সংগ্রামের লীলাক্ষেত্র ও বার্দ্ধক্যের বারাণসী।

'শ্রেণীসংগ্রামের' ভিত্তিতে 'কুৎ প্রথা' ও 'বাবুদী প্রথা'র বিরুদ্ধে একদিকে ছিলেন মদন দাস ও বিরুদ্ধবাদী নিতাই মণ্ডল। সমর্থকদের ঝগড়া প্রায়ই চরমে গিয়ে পৌঁছাতো। সমর মুখার্জী (প্রাক্তন সাংসদ) লিখছেন—'১৯৪০ সালে একটি ঘটনা ঘটে আমতা থানার সোনামুই গ্রামে। এই গ্রামে তখন কৃষক সমিতি

গঠিত হয়েছে এবং জমিদারদের সঙ্গে কিছু সংঘর্ষও শুরু হয়েছে। এই গ্রামে আগে যারা কংগ্রেসের সমর্থক ছিল তাদের একটি বড় অংশ কৃষক সমিতিতে যোগ দিয়েছে। এই গ্রামে আগে প্রভাব ছিল ফরওয়ার্ড ব্লকের নানু ঘোষ ও তাঁর দলবলের। কিন্তু কৃষক সমিতির প্রভাব বাড়ার ফলে ওদের প্রভাব কমে যায়। জমিদাররা কৃষক সভার কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা করে হয়রানী ও সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা করে। নানু ঘোষের লোকেরা গ্রামে যেয়ে কৃষক সভা ও কম্যুনিষ্ট পার্টির এক দিকে যেমন কুৎসা প্রচার শুরু করে—অপরদিকে প্রলোভন দেখায় যে কৃষক সভা ছেড়ে দিলে খ্যাতনামা উকিল বরোদা পাইনের সাহায্যে মামলা লড়ে তারা সকলকে খালাস করিয়ে আনবে। নানু ঘোষদের প্রচার ছিল—কম্যুনিষ্টরা ও কৃষক সভা কংগ্রেস বিরোধী। অবশেষে গ্রামের লোকেদের নিয়ে একটি সভার আয়োজন করা হল। আমাদের তরফে ছিলাম কমঃ মদন দাস, ডাঃ কেশব সরকার, অনন্ত মাঝি ও আমি। ডাঃ কেশব সরকার সভাপতিত্ব করেন।...মদন দাস ও আমি কৃষক সভার গুরুত্ব ও কংগ্রেসের সঙ্গে তার পার্থক্য ও সম্পর্ককে শ্রেণী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করি। ...তারাপদ ও নানু উভয়েই সভায় তাঁদের বক্তব্য রাখে। সে বক্তব্য ছিল প্রধানতঃ ব্যক্তিগত আক্রমণ ও অরাজনৈতিক—যেমন 'সমর মুখাজী' আরামে থাকে, সুন্দর চেহারা, আইন পাশ করে ওকালতি করবে, তার মক্কেল চাই। তাই কৃষকদের মধ্যে সমিতি করে তাদের মামলায় জড়িয়ে নিজের আয় বাড়াতে চায়। আর ডাঃ কেশব সরকার ডাক্তার হিসাবে তাঁর আয় বাড়ানোর জন্য কৃষক দরদী সেজেছে। সেজন্য এইসব সুবিধাবাদী লোকেদের কৃষকরা যেন বিশ্বাস না করে। সেখানে ওরা গ্রামে থেকে কৃষকের জন্য লড়ে পুলিশের ও জমিদারের অত্যাচার সহ্য করছে তাই তারাই হচ্ছে আসল কৃষক দরদী প্রভৃতি।'[২]

সমরবাবুর লেখাতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে ফরওয়ার্ড ব্লকের তথা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ কখনই কৃষক আন্দোলনকে শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বে বিচার করতেন না—সংস্কারমূলক আন্দোলনেই তখন তাঁরা বিশ্বাস করতেন। আর তাঁরাই যে আগে সেই কুপ্রথা দূর করে কৃষকদের ন্যায্য পাওনা আদায়ে আন্দোলন শুরু করেছিলেন তাও প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু নির্ভীক, কৃষকদরদী ও সর্বহারাদের নেতা মদন দাসের অসীম সাহস, সাংগঠনিক ক্ষমতা ও সংবেদনশীল মন গ্রামের কৃষক সমাজের কাছে তাঁকে আদৃত করে তুলেছিল। আর তাঁরই সঙ্গে ছিল যোগ্য সহকর্মী হিসাবে দুলালচন্দ্র মাজী, কার্তিক সেনাপতি, জয়কেশ মুখাজী (প্রাক্তন বিধায়ক), অনন্ত মাজী, তারাপদ মাষ্টার (প্রাক্তন বিধায়ক), নিতাই ভাণ্ডারী, পীতবসন দাস, দুঃখহরণ চক্রবর্তী, সমর মুখাজী, বারীন কোলে (প্রাঃ বিধায়ক) প্রমুখ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনই হচ্ছে তখন মূল রাজনৈতিক আন্দোলন অর্থাৎ ইংরেজ তুমি ভারত ছাড়। তাই স্বাধীনতা লাভের মূল আন্দোলন সামনে থাকায় কৃষক আন্দোলন পার্শ্ব-চরিত্ররূপেই থেকে যায়। এরই মধ্যে ১৩৫০ সালের (ইং

১৯৪৩) ইংরেজ শাসকের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ মানুষের মনে এক বিভীষিকাময় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। ১৯৪৫ সালে বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিতে—ইংরেজের জয় হলেও ভারতীয় নৌ সেনাদের বিদ্রোহে কিন্তু ইংরেজরা প্রমাদ গুণতে লাগলো। এরই অব্যবহিত পরে ১৯৪৬ সালের ষোলই আগস্টে মুসলীম লীগের আহ্বানে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'কে উপলক্ষ করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা ভাবলে আজও অনেকেরই রাতের ঘুম ছুটে যাবে।

এহেন অবস্থায়ই ভাগচাষীদের দুর্দশার লাঘব করবার জন্য ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে গ্রামে গঞ্জে শুরু হল তেভাগা আন্দোলন। এই আন্দোলন প্রথমে শুরু হয় দিনাজপুরে (অধুনা বাংলাদেশ) সেপ্টেম্বর মাস, ১৯৪৬-এ। পরে ইহা ছড়িয়ে পড়ে রংপুর, যশোহর, জলপাইগুড়ি, মৈমনসিংহ, চব্বিশ পরগণা, মালদহ ও মেদিনীপুরে। আমাদের হাওড়া জেলাকেও এই আন্দোলনের ধাক্কা সামলাতে হয়েছে। ১৯৪০ সালের ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায়, ৭৫ লক্ষ কৃষিজীবী পরিবারের মধ্যে ৩০ লক্ষ পরিবারের জমিতে প্রজাস্বত্বের অধিকার ছিল না। তারা ছিল হয় মজুরীজীবী অথবা ভাগচাষী।[৩] 'বাবুদী প্রথার' ও 'কুৎ প্রথার ব্যাখ্যা' আগেই করা হয়েছে। সুতরাং ভাগচাষীদের উহা দিতে গিয়ে যে তাদের কিভাবে নিঃস্ব করে দেওয়া হত তাও আলোচনা হয়েছে। তাই তেভাগা আন্দোলনের আওয়াজ তোলা হল উৎপাদিত ফসলের ভাগচাষী পাবে তিন ভাগের দুইভাগ। প্রচলিত নিয়মের বদলে জোতদারের খামারে বা মাঠে ধান তোলার বদলে ভাগচাষীদের মিলিত খামারে ফসল তুলতে হবে। আওয়াজ তোলা হল—জান কবুল আর মান কবুল / আর দেবো না আর দেবো না / রক্তে বোনা ধান গো।

কৃষক নেতা শ্যামাপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে তেভাগা আন্দোলনে জোতদারের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে ১৯৪৭ সালের ৬ই জানুয়ারী শ্যামপুর থানার জামিরা গ্রামের কৃষক প্রাণকৃষ্ণ মান্না (৪০) প্রাণ দান করেন। হাওড়া জেলা কৃষক আন্দোলনে প্রথম শহীদ হন তিনিই।[৪] মদন দাস ও শ্যামাপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ১৯৪৮ সালে জগৎবল্লভপুর থানার হাটাল, সন্তোষপুর, ইসলামপুর, সাঁকরাইলের মাশিলা এই আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে কৃষক রমণীসহ মোট ষোলজন মৃত্যুবরণ করেন। এর মধ্যে হাটালের ৬ জনই কৃষক রমণী। আর মাশিলার তিনজন মহিলাসহ মোট আটজন। এ ছাড়া পানপুর গ্রামেও দু'জন কৃষক পুলিশের গুলিতে প্রাণ দেয়।[৫] এইভাবে বিভিন্ন গ্রামে তেভাগা আন্দোলন পার্টির নির্দেশে ও পরিচালনায় চলতে লাগল। অপরপক্ষে কৃষক কর্মীরা চায়ের দোকানে ছোরা ও রিভলবার নিয়ে হঠাৎ পুলিশের উপর আক্রমণ করে ২ জন পুলিশকে হত্যা করে—একজন মারাত্মকভাবে আহত হয়—আর একজন পালিয়ে যায়। ৩টি রাইফেলও উধাও হল।[৬]

১৯৪৮ সালে রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বে-আইনী ঘোষণা করলেন। মদন দাস আত্মগোপন করে গ্রামে গ্রামে চাষীদের মধ্যে মিশে গিয়ে আন্দোলনকে জোরদার করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে

আন্দোলনের গুরুত্ব অনুভব করে ১৯৪৯ সালে সরকার অবশেষে বর্গাদার অর্ডিন্যান্স জারি করলেন এবং পরের বছর বর্গাদার আইন পাশ হয়। ঐ আইন দ্বারা বিবাদের মীমাংসার জন্য একটি সালিশী বোর্ডও গঠন করা হল। বোর্ডে জোতদার ও ভাগচাষী প্রতিনিধি—সমান সংখ্যায় ছিল। তথাপি সরকারী আমলাদের সহযোগিতায় আইনের ফাঁক ফোঁকর দিয়ে ভাগচাষীদের হয়রানি ও ঠকানোর চেষ্টা অব্যাহতই ছিল। ১৯৫০ সাল। পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের খবর অনুযায়ী মদন দাসকে ধরবার জন্য এক বিরাট পুলিশ বাহিনী আমতার দামোদর নদী পারে গিয়ে হাজির। বেতাই-জয়ন্তী বনের মধ্য থেকেই বোমা ছুঁড়ে ও বন্দুকের আওয়াজ করে পুলিশকে খড়ি বন থেকে রুখে দিল। সালিশী বোর্ডের অনেক আইনগত সিদ্ধান্তই ভাগচাষীদের মিছিমিছি হয়রানি করার জন্য জারি করা হত। মদন দাস তারও সুরাহা করবার জন্য হাওড়া ও উলুবেড়িয়া কোর্টে হাজির হতেন। কৃষি আইনের ধারাগুলি তিনি ব্যক্তিগত চেষ্টায় পড়াশুনা করে উকিলবাবুদের কাজে সহায়তা করতেন। প্রবীণ কৃষক নেতা আব্দুল্লা রসুল (পরে মন্ত্রী হন) মদন দাস সম্পর্কে লিখেছেন—'কৃষক ও কৃষি সংক্রান্ত যত আইনের বই হত তা সবার আগে তিনি সংগ্রহ করতেন ও পড়তেন। আমাদের কোন কোন সময় কিছু জানতে হলে তাঁর কাছ হতে জানতাম এবং তিনি তা সহজে বলে দিতে পারতেন।'[৭] এ ব্যাপারে মদনবাবুকে যাঁরা বিনা পারিশ্রমিকে আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে আইনী সাহায্য হাওড়া ও উলুবেড়িয়া কোর্টে দিতেন তাঁরা পার্শ্বচরিত্র হলেও কম সাহায্য করেননি—উল্লেখ্যদের মধ্যে হচ্ছেন আইনজীবী অনিল সরকার, অসিত সরকার, অধ্যাপক অজিতকুমার দাস, নরেন পাড়ুই ও জগৎমোহন দাস প্রভৃতি।

হাওড়ার গ্রামে উত্তর ও মধ্য ভাগে মদন দাসের নেতৃত্বে জোরদার তেভাগা আন্দোলন আগেই শুরু হয়েছিল। বাগনান ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলন একটু দেরীতেই শুরু হয় কারণ ১৯৫০-৫১ পর্যন্ত পার্টি নিষিদ্ধ থাকায় নেতারা অনেকেই জেলে বন্দী ছিলেন। তাই ১৯৫২ সালে স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই এখানে তেভাগা আন্দোলন গড়ে ওঠে। নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন জ্ঞানব্রত চক্রবর্তী, অমল গাঙ্গুলী ও অমর মান্না প্রমুখ। তারাপদ সাঁতরা (অন্যতম দায়িত্বশীল কর্মী) লিখছেন—'বাগনান থানা এলাকায় মানকুর, বাকসী, কল্যাণপুর, বড়াবাড়, টেঁপুর, হিজলোক, সামতা, খালোড়, খাদিনান ও মাঙ্গালপুর প্রভৃতি গ্রামে দুশো থেকে আটশো বিঘে জমির এমন সব মালিক জোতদার ছিলেন—যাঁরা কোনক্রমেই চাষীর ন্যায্য প্রাপ্য না দেওয়ার জন্য ছিলেন বদ্ধপরিকর।'[৮]

অপরপক্ষে দুঃখহরণ ঠাকুর চক্রবর্তী লিখছেন—বাগনান থানার খাজুরাটি গ্রাম ছিল কৃষক আন্দোলনের অন্যতম ঘাঁটি। সারা এলাকারই মুখিয়া কৃষকদের পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে। খাজুরাটি গ্রামের এক পাট ক্ষেতের মধ্যে এক কুঁড়েতে লুকিয়ে

ছিলেন খাজুরাটির কৃষ্ণ হাজরা, বাইনানের দীনু সাউ, নিতাই আদক, অসিত গাঙ্গুলি, উমাশংকর গাঙ্গুলী, শিবশংকর গাঙ্গুলী, সাবসিটের আনসার আলি প্রমুখ। তারিখটা ছিল ১৯৪৯, ৮ই জুলাই। ...পুলিশের আগমন টের পেয়েই বাইনান গ্রামের ঐ দলে বসন্ত রায়* পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ে। পুলিশ পাল্টা গুলি চালালে বসন্ত রায় মারা যায়।**

ভাগচাষীদের জোতদারের বিরুদ্ধে সংগঠিত করে মানকুর গ্রামের প্রায় আটশো বিঘা জমির জনৈক জোতদারের বিরুদ্ধে প্রথম দাবি আদায়ের আন্দোলন শুরু হয়। এরপর বাকসি প্রভৃতি গ্রামেও একইপ্রকারের চলে দীর্ঘ লড়াই। ইতিমধ্যে পার্টি থেকে প্রস্তাব নেওয়া হল বাগনানেই পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সমিতির সম্মেলন হবে। তেভাগা আন্দোলনের প্রভাবে নতুন করে চাষীদের মধ্যে ইতিমধ্যেই উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৫৩ সালে এই সম্মেলনের প্রধান হোতা ছিলেন জ্ঞানব্রত চক্রবর্তী ও অমল গাঙ্গুলী। বাগনানের এক মাঠে ঐ সম্মেলন হয়। সম্মেলনের প্রস্তুতি পর্ব প্রায় শেষ। সম্মেলনের দুদিন বা একদিন আগে সকালবেলা এক চায়ের দোকানে প্রাতঃরাশ সারতে সারতে জ্ঞানবাবু অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মারা যান। সারা বাগনানে শোকের ছায়া নেমে আসে। এতদ্ সত্বেও সম্মেলন হল—প্রকাশ্য সম্মেলনে জেলার ও পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে প্রচুর সংখ্যায় কৃষকরা এসে হাজির হল। নেতৃবৃন্দ আশাতীত সাড়া পাওয়ায় অত্যন্ত উৎফুল্ল। অমল গাঙ্গুলীর কথায়—'সেদিন যেমন জ্ঞানদার মত ত্যাগী ও আদর্শবান নেতার বিয়োগ ব্যথায় ব্যথিত তেমনি তাঁরই চেষ্টায় অভাবনীয় জনসমাবেশে আমরা উজ্জীবিত হয়ে উঠি। আমাদের প্রত্যাশা ছিল হয়তো দশ থেকে পনেরো হাজার লোক হবে—কিন্তু দাঁড়ালো প্রায় ষাট থেকে সত্তর হাজার।' জ্ঞানবাবুর স্মৃতিচারণ করতে করতে অমল বাবুর চোখ ঝাপসা হয়ে উঠে। তাঁরই সান্নিধ্যে এসে তিনি বেশি করে মার্কসীয় মতবাদে আসক্ত হয়ে পড়েন। দায়িত্বশীল কর্মী থেকে কয়েক বছরের মধ্যেই অমলবাবু নেতৃপদে আসীন হন। এর মূলে কিন্তু ছিল তেভাগা আন্দোলনে চাষীদের প্রতি তাঁদের নিঃস্বার্থ লড়াই। এব্যাপারে অমলবাবুর অন্যতম সহকর্মী তারাপদ সাঁতরার নাম সঙ্গত ভাবেই উল্লেখ করা যেতে পারে। যেটা বর্তমান কালের অনেক কৃষক নেতা বা কর্মীরই অজানিত। জেলার তেভাগা আন্দোলনের হোতা মদন দাস যেমন মাঠ থেকে শুরু করে কোর্ট পর্যন্ত চষে বেড়াতেন তেমনি বাগনান ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের ভাগচাষীদের পক্ষে আইনগত ভাবে সওয়াল-জবাব করার ভার দেওয়া হয়েছিল তারাপদ বাবুর উপর। আরও উল্লেখ্য, এরজন্য গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাওয়া বাবদ তারাপদবাবু কোনদিনই চাষীদের কাছ থেকে সামান্যতম পাথেয়ও গ্রহণ করেননি। আজকাল দেখা যায় শ্রমিক স্বার্থে বিভিন্ন কাজ করার বিনিময়ে মোটা অংকের মাসোয়ারার ব্যবস্থা রয়েছে—রয়েছে ট্যাক্সি ও গাড়ীতে যাতায়াতের জন্য

---

* এমেনবেরীর ধর্মঘটী শ্রমিক ছিলেন

** লোকবন্ধু—পঃ বঃ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ হাওড়া জেলা—১ম বর্ষ ১৯৯৭

ইউনিয়ন থেকে বরাদ্দীকৃত অর্থ। তারাপদবাবু নিজেই লিখছেন—'ছ' মাইল—আট মাইল দূরত্বে অবস্থিত ভাগচাষ বোর্ডগুলিতে আমি নিয়মিত পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করেছি। ফোর্ড কোম্পানীর পুরাতন মোটর গাড়িতে অবশ্য যাতায়াতের সুযোগ ছিল—কিন্তু উপযুক্ত গাড়ি-ভাড়ার অভাবে সেই সুযোগও গ্রহণ করতে পারিনি। সামান্য ছ'আনা থেকে আটআনা গাড়িভাড়ার জন্য কোন কৃষকের কাছে হাত পাততে চাইনি।'* অথচ তারাপদবাবুও অত্যন্ত সাধারণ ঘরের গ্রামের ছেলে ছিলেন। আজ তিনি ইতিহাস গবেষণায় বিদগ্ধ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও সেদিনের সেই নিষ্ঠা ও আদর্শ তাঁর বৃথা যায়নি বলেই মনে হয়।

১৯৫৭ সালে বাগনান কেন্দ্র থেকে অমলবাবু কম্যুনিষ্ট প্রার্থী হিসাবে বিধান-সভায় নির্বাচিত হন। কিন্তু পরবর্তীকালে দলে আদর্শের দ্বন্দ্বে তিনিও দোলায়িত হতে থাকেন। দলের নির্দেশে তাঁকে একটি কঠিন ও ঘৃণ্য কাজের নায়ক হতে হয়েছিল। সেটি হচ্ছে তাঁরই বড়দাদা বিমলবাবুকে হত্যা করা। বিমলবাবু তখনকার দিনে বাগনানের একজন নেতৃস্থানীয় কংগ্রেস-সেবী ছিলেন। পেশায় ছিলেন হোমিও চিকিৎসক। হত্যার দায়ে অমলবাবুকে ও অন্যদের সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু প্রমাণের অভাবে তখন সবার সঙ্গে তিনিও মুক্তি পান। অমলবাবু তাঁর শেষ জীবনে লিখে গেছেন যে বিমলবাবুর স্ত্রী অর্থাৎ বৌদিও বিচারালয়ে সাক্ষ্য দেন যে তাঁর দেওর ঐ ঘৃণ্য কাজ করতে পারেন না। কিন্তু বিবেকের দংশন তাঁকে কুঁড়ে কুঁড়ে খেয়েছে। তাই জীবন সায়াহ্নে 'সূর্যস্নান' গ্রন্থে অমলবাবু নিজের কৃতকর্মের কথা স্বীকার করে প্রায়শ্চিত্তের চেষ্টা করে গেছেন। পরবর্তীকালে তিনি ও তারাপদ বাবু উভয়েই দলত্যাগ করেন। যদিও অমলবাবুকে পার্টি-বহিষ্কার করেছিল বলেই দাবি করা হয়। এরপর এঁরা দুজনেই গ্রামোন্নয়ন তথা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও গ্রাম্য সংস্কৃতি উদ্ধারের কাজেই নিজেদের নিয়োজিত করেন। তাঁদের অমর সৃষ্টি বাগনানের কাছে 'আনন্দ নিকেতন।' আনন্দ নিকেতনের দর্শনীয় বস্তু হচ্ছে গ্রামীণ সংগ্রহ-শালা (যাদুঘর)। গ্রাম বাংলার বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের নমুনাসহ লোক শিল্প ও সংস্কৃতির এমন সুন্দর রক্ষণশালা বিরল।

হাওড়ায় 'কুং প্রথা' ও 'বাবুদী প্রথা' দূরীকরণে যেমন ভোলা যাবে না নিতাই মণ্ডল ও তাঁর সহকর্মীদের তেমনি সুসংগঠিত দীর্ঘস্থায়ী কৃষক আন্দোলনের (তেভাগাসহ) অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে ভোলা যাবে না মদন দাস ও তাঁর সহকর্মীদের। তাই হাওড়া আমতা রোডের নাম 'মদন দাস সরণী'তে নামাঙ্কিত করে হাওড়ার গ্রামীণ মানুষ নিজেদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। 'মদনদা স্মরণে' স্বাধীনতা সংগ্রামী দুঃখহরণ ঠাকুর (চক্রবর্তী) লিখিত প্রবন্ধের উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে মনে করি। তিনি লিখছেন—'বিধানসভা নির্বাচনে জয়কেশদার (মুখার্জী) ফরম পূরণ করার প্রয়োজেনে হাওড়ার ১১নং ধর্মতলা লেনের জেলা পার্টি অফিসে গেছি। মদনদা বুঝিয়ে দিচ্ছেন। তার আগে থেকেই হাই প্রেসার প্রভৃতি রোগে তিনি ভুগছিলেন। জিজ্ঞাসা করলাম—কেমন আছেন?

সখেদে বললেন—আর ভাই, দেশটা সোভিয়েট হওয়া দেখে যেতে পারলাম না।[১০] ১৯৭২ সালে তিনি মারা যান। সোভিয়েট তথা কম্যুনিস্ট দুনিয়ার আজ যে কি হাল হয়েছে তা মদন দাস দেখতে পেলে হয়তো তাঁর দুঃখের সীমা থাকতো না।

এতক্ষণ কৃষক আন্দোলন বিশেষ করে তেভাগা আন্দোলনে রাজনৈতিক দলের কর্মীদের কার্যকলাপই বিশেষ করে তুলে ধরা হল। কিন্তু তেভাগা আন্দোলনের সমর্থনে কবি, সংগীত-শিল্পী এমনকি চিত্রশিল্পীরাও যে সংগ্রামী কৃষকদের মনে কিরূপ আশার সঞ্চার করেছিলেন, তা আমরা অনেকেই ভুলে গেছি। ১৯৫৩ সালের বাগনানে কৃষক সম্মেলনের কথা আগেই বলা হয়েছে। তাতে বিখ্যাত শিল্পী সোমনাথ হোড়ের আঁকা স্বাধীনতাপূর্ব তেভাগা আন্দোলন বিষয়ক এক শিল্প প্রদর্শনী হয়েছিল। প্রদর্শনীটি যে জনচিত্তে ভীষণ উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা জ্ঞানব্রত চক্রবর্তী মশায় উনিশ বছরের এক আনকরা নূতন শিল্পীকে দিয়ে সম্মেলনের যে তোরণদ্বার নির্মাণ করিয়েছিলেন তাও উল্লেখ করার মত। তোরণদ্বারটি নির্মিত হয়েছিল পশ্চিম বাংলার কুঁড়ে ঘরের আদলে। উহাকে দৃষ্টি নন্দন করবার জন্য তোরণের দুই স্তম্ভে দুটি চাঁদমালা ঝুলিয়ে দেওয়ায় শিল্পী প্রশংসিত হওয়ার বদলে বুর্জোয়া শিল্পী বলে সমালোচিত হয়েছিলেন। সম্মেলনের অক্লান্ত কর্মী তারাপদ সাঁতরা লিখছেন—"কিন্তু দুঃখের কথা, সে সময়ে কতিপয় গোঁড়া মার্কসবাদী কৃষক কমরেড তার এই চাঁদমালা টাঙানোকে ধর্মভিত্তিক বুর্জোয়া সংস্কৃতির নমুনা বলে সমালোচনা করতেও ছাড়েননি।"[১১] এখনও এই বুর্জোয়া শিল্পীর নাম বলা হয়নি। পরবর্তীকালে এই বুর্জোয়া শিল্পীই কিন্তু তেভাগা আন্দোলনের ওপর পর্যায়ক্রমে ছবি ও লেখনী ধারণ করে বামপন্থীদের আসরে একজন প্রথম সারির শিল্পীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। ইনিই হচ্ছেন বাগনান থানার নাকোল গ্রামের অধিবাসী প্রখ্যাত শিল্পী ও কলকাতা বিষয়ক অভিজ্ঞ লেখক পূর্ণেন্দু পত্রী। প্রচ্ছদপট চিত্রণে এক বাক্যে যিনি সকলের কাছে পরিচিত সেই পূর্ণেন্দু পত্রী। যদিও বুর্জোয়া সংস্কৃতির সেই চিত্রাঙ্কন শৈলীগুলি আমৃত্যু ব্যবহার করতে তিনি ভোলেন নি। তবে কি তিনিই খাঁটি বামপন্থী না যাঁরা সেদিন বঙ্গ সংস্কৃতির মাঙ্গলিক প্রতীক চাঁদমালার মধ্যে ধর্মের জুজু দেখতে পেয়েছিলেন তাঁরা প্রকৃত বামপন্থী?

১. বিপ্লবী হরেন্দ্রনাথ ঘোষ—অমিয় ঘোষ—সম্পাদনা ডাঃ শিশির কর।
২. মদনদাসের সঙ্গে কয়েকটি দিন—সমর মুখার্জী এম. পি.—স্মারক গ্রন্থ—মদন দাস স্মৃতি কমিটি।
৩. তেভাগা আন্দোলন—নরহরি কবিরাজ—পশ্চিম বঙ্গ, তেভাগা সংখ্যা ১৪০৪।
৪. পশ্চিমবঙ্গ—তেভাগা সংখ্যা ১৪০৪, পঃ বঃ সরকার।
৫, ৬. কৃষক আন্দোলনে হাওড়া—জয়কেশ মুখার্জী—ব্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরী শতবর্ষ স্মারক।
৭. স্মারক গ্রন্থ—কমরেড মদন দাস স্মৃতিরক্ষা কমিটি।
৮, ৯, হাওড়া জেলায় তেভাগা আন্দোলন—তারাপদ সাঁতরা, অনুষ্টুপ ১৯৯০ শারদীয়।
১০. স্মারক গ্রন্থ—কমরেড মদন দাস স্মৃতিরক্ষা কমিটি।
১১. কৌশিকী বিশেষ সংখ্যা—১৯৯৭।

বিপ্লবী আন্দোলন

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মত-পার্থক্য ও বিরোধ এক বিশেষ অধ্যায়। চরমপন্থীদের অন্যতম নেতা মহারাষ্ট্র কেশরী বালগঙ্গাধর তিলকই ইংরেজ শাসককে বলেছিলেন, **Swaraj is my birth-right, I must have it.**' চরমপন্থীদের মধ্যে থেকে আবার সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ আন্দোলন শুরু হল যার ফল হল সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা। মহারাষ্ট্রের সুসন্তান বাসুদেব ফাড়কে (ফাদ্‌কে) ও চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় এই আন্দোলন শুরু করলেও বঙ্গদেশে তা সংগঠিতভাবে শুরু করলেন অরবিন্দ, বারীন্দ্র, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, রাসবিহারী বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও কানাইলাল দত্ত প্রমুখ মৃত্যুঞ্জয়ী বীররা।

তবে একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনই হচ্ছে বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা-পর্ব। বঙ্গদেশের সর্বত্র স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার বইতে শুরু করে। কারণ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা কাল ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত নরমপন্থীদের প্রেয়ার, প্লিজ ও প্রোটেষ্টের (থ্রি পি) কথা অনেকেরই জানা আছে। তাই ইংরেজের অত্যাচারের জবাব দেবার জন্য প্রয়োজন হল 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' জ্ঞানে আত্ম বলিদানে সংকল্পবদ্ধ যুবক-বৃন্দের।

বিপ্লবীদের অস্ত্র ও হাতিয়ার সংগ্রহের জন্য চাই অর্থ। সেই অর্থ সংগ্রহের জন্যই স্বদেশী ডাকাতির পরিকল্পনা নিল বিপ্লবীরা। এই ধরনের ডাকাতির মধ্যে 'হাওড়া গ্যাং কেস' একটি উল্লেখযোগ্য মামলা। দেশের বিভিন্ন অংশে ডাকাতি হলেও এই মামলার পীঠস্থান ছিল হাওড়ার শিবপুর। 'বিপ্লবীর জীবন স্মৃতি' গ্রন্থে যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখছেন—'এই মামলায় সরকারী মতলবে আসামীদের ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপে ভাগ করা হয়—যেমন কৃষ্ণনগর গ্রুপ, হলুদবাড়ি গ্রুপ, রাজসাহী গ্রুপ, শিবপুর গ্রুপ, খিদিরপুর গ্রুপ, মজিলপুর গ্রুপ, যুগান্তর গ্রুপ এবং ছাত্রভাণ্ডার গ্রুপ।' ১৯০৯ সালে ইংরেজ পুলিশ দার্জিলিং থেকে ললিতমোহন চক্রবর্তী নামে জনৈক ব্যক্তিকে রাজসাক্ষী হিসাবে ডায়মণ্ডহারবার কোর্টে তোলেন। তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিভিন্ন ডাকাতিতে বিপ্লবীদের নাম বলে দেন। যে বত্রিশ-জনের নাম তিনি বলেছিলেন তাঁদের মধ্যে ননীলাল সেনগুপ্ত, যতীন্দ্র নাথ, নরেন ভট্টাচার্য (এম. এন. রায়), শরৎ মিত্র, কেশব দত্ত, তারানাথ চৌধুরী, চারু ঘোষ, সুরেশ মিত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ললিতবাবু আরও বলেন যে হাওড়া ও সন্নিহিত জায়গায় ডাকাতির নায়ক হচ্ছেন ননীলাল সেনগুপ্ত। আর তাঁর পেছনে

আছেন মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ মুখাজী । এমনকি এই ষড়যন্ত্রে যতীন্দ্রনাথের আইনজীবীর ছোট মামা ও তাঁর মুহুরীকেও জড়ানো হয়।[১] ললিতবাবু আরও বলেন যে পুলিশের গোয়েন্দা নন্দলাল ব্যানার্জীকে যতীন্দ্রনাথই ষড়যন্ত্র করে হত্যা করিয়েছেন। এই গ্যাং কেসের তদন্তের ভার পড়েছিল পুলিশ ইন্সপেক্টার শামসুল আলমের ওপর। ইতিপূর্বে আলিপুর বোমার মামলার তদন্তের সময় বারীন্দ্র ও উল্লাস কর শামসুল আলমের ওপর ভীষণ রুষ্ট হয়েছিলেন। তাই তাঁকে ১৯১০ সালে জানুয়ারীতে কলকাতা হাইকোর্টের সিঁড়িতে রিভলভারের গুলিতে হত্যা করে বীরেন্দ্র দত্তগুপ্ত নামে এক বিপ্লবী বালক। পুলিশের জালিয়াতি ও কারচুপিতে সে স্বীকার করে যে বাঘা যতীনের প্ররোচনায় সে আলমকে হত্যা করে। লালবাজার লকআপে কয়েকদিন থাকার পর তাঁকে তাঁর দুই মামাসহ মুহুরী নিবারণ মজুমদারকে হাওড়া জেলে পাঠানো হয়। ১৯১০ সালে জুলাই মাসে হাওড়ার ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ননীগোপাল সেনগুপ্ত এবং আরো ৪৫ জন অভিযুক্ত আসামীকে কলকাতা হাইকোর্টের স্পেশাল ট্রাইবুনালে বিচারের জন্য সোপর্দ করেছিলেন।[২] হাইকোর্টের স্পেশাল ট্রাইবুনালে এই মামলা এক বছর চলে। ১৯১১ সালের ১৯শে এপ্রিল মামলার রায় বের হয়। সরকার পক্ষ থেকে মামলায় বলা হয় দশম জাঠ রেজিমেন্টের সজ্জন সিং, চুনাই হাবিলদার ও রামগোপালকে একাধিকবার টাকা দিয়ে শিবপুরে ভুটান মুখার্জীর বাড়িতে আনা হয়েছিল। এ কাজের দায়িত্বে ছিলেন নরেন চ্যাটার্জি, শরৎ মিত্র ও ননীগোপাল সেনগুপ্ত।[৩] হাইকোর্ট এই গল্প অবিশ্বাস্য মনে করেছিলেন। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'হাওড়া শহরের ইতিবৃত্তে' লিখছেন—যদিও হাইকোর্ট এ ঘটনা বিশ্বাস করেননি, কিন্তু অরুণচন্দ্র গুহ মহাশয় করেছেন। কার (Ker) সাহেবও (Political Trouble in India) বইতে স্বীকার করেছেন যে হাওড়া গ্যাঙের নেতা ননীগোপাল সেনগুপ্ত কেল্লার ১০ম জাঠ বাহিনীর কোন কোন সিপাইকে এই আন্দোলনে টেনে আনবার চেষ্টা করেন। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে হাওড়া গ্যাং কেসে ভুটান মুখার্জী, নরেন চট্টোপাধ্যায়, ননীগোপাল সেনগুপ্ত, অতুল মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবোধ দত্ত প্রমুখ শিবপুরের অধিবাসী ছিলেন। আর কালিপদ চক্রবর্তী, উপেন্দ্রনাথ দে, প্রমুখ ছিলেন সাঁত্রাগাছির বাসিন্দা। হাওড়া গ্যাং কেসের স্পেশাল ট্রাইবুনালের প্রধান বিচারপতি ছিলেন লরেন্স জেনকিন্স। ব্যারিস্টার জে. এন. রায় যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর পক্ষ সমর্থন করেছিলেন।[৪]

সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা ইংরেজকে তাড়াতে হলে চাই আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও গোপনে উহার শিক্ষাদান কেন্দ্র। এ ব্যাপারে আত্মোন্নতি সমিতি, যুগান্তর পার্টি ও মুক্তিসংঘ কলকাতায় গড়ে উঠল। বিভিন্ন সেবামূলক কাজ ও সবল দেহের জন্য ব্যায়াম সমিতিও গড়ে উঠল। তারই ভেতর দিয়ে চলল ইংরেজ বিতাড়নের গোপন কার্যকলাপ। যদিও কলকাতায় এই সব কেন্দ্র গড়ে ওঠে তথাপি হাওড়ার যুব সমাজের কেউ কেউ তার প্রেরণায় আকৃষ্ট হয়ে দেশমাতৃকার মুক্তি সাধনে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে।

এই রকমই একটি দুঃসাহসিক কাজ করেছিল হাওড়া জেলার রসপুর গ্রামের শ্রীশ চন্দ্র মিত্র। ডাক নাম ছিল হাবু। 'মাতামহ শ্রীকণ্ঠ নিয়োগী বালক হাবুকে কলকাতার বহুবাজারস্থিত নিজ বাটিতে রাখিয়া পালন করেন।'[৫]

হাবু বহুবাজারের 'আত্মোন্নতি সমিতির' সভ্য হয়ে শরীরচর্চা ইত্যাদি করতে থাকে। সমিতির বিপ্লবী নায়ক বিপিন চন্দ্র গাঙ্গুলী ও অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাজে হাবু বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। দেশমুক্তির কাজে সেও অংশীদার হতে চায়। ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ইংরেজ যুদ্ধে খুবই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই বিপ্লবীরাও এই সুযোগে বিপ্লবাত্মক কাজের জন্য অস্ত্র যোগাড়ে প্রবৃত্ত হন। সুযোগও এসে গেল নেহাতই আচমকা।

শ্রীশ চন্দ্র তখন ডালহৌসী অঞ্চলে প্রসিদ্ধ অস্ত্র ব্যবসায়ী মেসার্স আর. বি. রডা কোম্পানীতে কাজ করেন। শ্রীশ চন্দ্র কর্মী হিসাবে গোপন সূত্রে জানতে পারেন যে তিব্বতের দালাই লামা (মতান্তরে) নেপাল সরকারের অর্ডার মত জার্মানী থেকে পঞ্চাশটি জার্মান মসার পিস্তল (Mauser Pistol) ও ৪৬০০ রাউণ্ড কার্তুজসহ বহু অস্ত্র কাষ্টম হাউসে এসেছে। ঐ অস্ত্রগুলি কাষ্টম হাউস থেকে খালাস ক'রে রডা কোম্পানীর ঘরে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব পেয়েছে শ্রীশ চন্দ্র মিত্র।

দেশপ্রেমিক শ্রীশ চন্দ্র (হাবু মিত্র) বিপ্লবীদের কাজে অস্ত্র সংগ্রহে সাহায্য করার জন্য ১৯১৪ সালে ২৬শে আগস্ট দুপুর বেলা তিনি বিপিন গাঙ্গুলী, অনুকূল মুখার্জী, হরিদাস দত্ত, খগেন দাস, শ্রীশ চন্দ্র পাল প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই অস্ত্রশস্ত্র লুটের ব্যাপারে প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। রডা কোম্পানীর গুদাম-সরকার শ্রীশ চন্দ্র মিত্র পরিকল্পনামত কোম্পানীর গুদামে যথারীতি মাল তুললেও···দশ পেটি মাল আর কোম্পানীর ঘরে না তুলে বিপ্লবীদের হাতে তুলে দিতে সাহায্য করেন। এই ঘটনার পর শ্রীশচন্দ্রবাবু কালবিলম্ব না করে বন্ধু শ্রীশ চন্দ্র পালকে নিয়ে প্রথমে রংপুর (অধুনা বাংলাদেশ) পরে আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় পার্বত্য উপজাতি বীরেন রাভারের বাড়িতে যান। 'সেখান থেকে আমার (হরিদাসবাবুর) ছোট ভাই ৺যামিনীকান্ত দত্ত ও নীলকমল বৈরাগীর সঙ্গে বীরেন রাভারের বাড়িতে যান। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া আসাম বর্ডার পার হইয়া চীনদেশে যাইবার সময় সীমান্ত-রক্ষী-পুলিশের গুলিতে প্রাণত্যাগ করেন। বীরেন রাভারকে পুলিশ ধরে। বীরেন রাভার মহাশয় বলেন, পথ দেখাইয়া দিবার জন্য কিছু তাঁহাকে অর্থ দেওয়া হয়। সেই কারণে তিনি তাঁহাকে পথ দেখাইয়া দিতে আসেন। ইহা ব্যতীত তিনি অন্য কিছু অবগত নন।'*

বলা বাহুল্য, এই রডা কোম্পানীর অপহৃত পিস্তল ও কার্তুজ ব্যবহৃত হয়েছিল দেশের বিভিন্ন বিপ্লবীদের আখড়ায়। তার মধ্যে হাওড়া জেলার ডোমজুড়ের

* এই তথ্যটি জানা যায় হরিদাস বাবু (দত্ত) ২৫মে, ১৯৬৮ সালের এক সাক্ষাৎকারের লিখিত বিবরণের ভিত্তিতে। উল্লেখ্য রডা কোম্পানীর অস্ত্র চুরির ব্যাপারে তিনি ছিলেন গাড়ির গাড়োয়ান। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন প্রবীণ ও বিদগ্ধ ব্যক্তি রসপুরের পাঁচুগোপাল রায়।

দফরপুর ও শালকিয়ার নামও উল্লেখ আছে। রডা কোম্পানীর অস্ত্র লুটের ঘটনা যে ব্রিটিশ সরকারকে কি রকম ভাবিয়ে তুলেছিল তা মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার সম্পর্কিত রিপোর্ট থেকে বোঝা যায়। রিপোর্টের একাংশে বলা হয়েছে—'৫০টা মসার পিস্তল বাঙ্গালা গভর্নমেণ্টকে প্রায় অচল করে তুলেছিল।' সিডিসন কমিটির রিপোর্টেও বলা হয়েছে—**This arms theft was an event of greatest importance in the development of revolutionary crime in Bengal.**

বিপ্লবীর জীবনস্মৃতি গ্রন্থে বিপ্লবীবীর যাদুগোপাল মুখার্জী লিখছেন—এই মসার পিস্তলগুলি বিপ্লবীদের প্রকৃতই শক্তি বৃদ্ধি করে এবং দেশে চাঞ্চল্য ও উৎসাহের সঞ্চার করে। অস্ত্রের ক্ষুধায় কর্মীরা কত ক্লেশ ভোগ করছিল—রডার অস্ত্র লুণ্ঠন দুর্ভিক্ষের দিনে যেন মস্ত এক আশ্চর্য সংগ্রহ। এখানে বিপিনদার মহত্ত্ব বর্ণনাতীত।

মনে রাখতে হবে এত বড় দুঃসাহসিক কাজের প্রধান রূপকার ছিলেন আমতা থানার রসপুরের বীর সন্তান শ্রীশ চন্দ্র মিত্র ওরফে হাবু মিত্র। হাওড়াবাসী তার জন্য গর্ব করতে পারেন। শুধু তাই নয়—'বালেশ্বরে বুড়িবালামের তীরে এই মশার পিস্তল ও কার্তুজ লইয়া সঙ্গীসহ যুদ্ধ করিতে করিতে যতীন্দ্র নাথ মুখার্জী (বাঘা যতীন) যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়ে বালেশ্বরের হাসপাতালে নীত হন।'[৬]

এই প্রসঙ্গে এক বঙ্গললনার কথা না বললে ইতিহাস রচনায় ত্রুটি থেকে যাবে। সেই বঙ্গললনার নাম ননীবালা দেবী। এই ননীবালা বালি গ্রামের (দক্ষিণপাড়া) সূর্যকান্ত ভট্টাচার্য (ব্যানার্জী)-এর কন্যা। বালিকা বয়সেই বিধবা হন। আগেই বলা হয়েছে, রডা কোম্পানীর পিস্তল ও কার্তুজ দেশের বিভিন্ন অংশে বিতরিত হয়েছিল। তার মধ্যে কলকাতার 'শ্রমজীবী সমবায়' অন্যতম। এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক রামচন্দ্র মজুমদার এবং সুধাংশু মুখার্জী পুলিশের হাতে অতর্কিতে গ্রেপ্তার হন। ফলে তাঁদের লুকিয়ে রাখা অস্ত্রের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। উক্ত বিধবা ননীবালা ১৯১৫ সালে রামবাবুর স্ত্রী সেজে প্রেসিডেন্সী জেলে সধবার বেশে তাঁর সঙ্গে দেখা করে অস্ত্রের সন্ধান জেনে আসেন। কিন্তু চন্দননগরে বিপ্লবী-আস্তানায় পুলিশকে প্রতারিত করার জন্য একজন সধবা গৃহিণীর একান্ত দরকার। উত্তরপাড়ার বিপ্লবী অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে ননীবালা সেই কাজ করতে রাজী হন। 'চন্দননগরের আস্তানায় তখন আত্মগোপন করে যাঁরা থাকতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিপ্লবী নায়ক ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, অতুল ঘোষ, মন্মথ বিশ্বাস, সতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী প্রভৃতি।'[৭] এ সম্বন্ধে আরও জানা যায় 'স্বাধীনতা আন্দোলনে আমাদের জেলা' (হাওড়া) লেখক দুঃখহরণ ঠাকুর চক্রবর্তীর এক নিবন্ধে। তিনি লিখছেন—'পুলিশ পরে সব বুঝতে পেরে ননীবালা দেবীর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করে কাশী থেকে পেশোয়ার যাবার পথে ননীবালাকে গ্রেপ্তার ক'রে ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে প্রেসিডেন্সী জেলে আনে। সেখান থেকে 'ইলিসিয়াম রো'-তে এনে অশালীন জিজ্ঞাসাবাদ করায়

ননীবালা স্পেশাল সুপারিনটেন্ডেণ্ট মিঃ গোণ্ডির গালে চড় মারেন। পুলিশ তাঁকে 'ষ্টেট প্রিজনার' করে। ননীবালা দেবীই বাংলাদেশে প্রথম মহিলা ষ্টেট প্রিজনার।[*] একথা জেনে শুধু বালি নয়, হাওড়া নয়, বঙ্গবাসী মাত্রই গর্বিত হবেন।

এই ননীবালা ছিলেন বিপ্লবী অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের সেজ পিসীমা। তাই 'যুগান্তর' বিপ্লবী মহলে তিনি 'সেজ পিসীমা' নামেই সুপরিচিতা ছিলেন। দু'বছর কারাভোগের পর ১৯১৯ সালে ননীবালা জেল থেকে মুক্তি পেলেন। এর পরের ঘটনা খুবই বেদনাদায়ক। বীরাঙ্গনা ননীবালার মুক্তির পর তাঁর পিতা ননীবালাকে নিয়ে বালিতে ফিরে আসেন। কিন্তু সেদিন বালির মানুষ পুলিশের ভয়ে ননীবালাকে ঘর ভাড়া দিতে অস্বীকার করেন। বাধ্য হয়ে উত্তর কলকাতার এক পল্লীতে একটি ছোট্ট ঘরে তাঁকে ঘর ভাড়া নিতে হয়। 'স্বাধীনতা সংগ্রামের মঞ্চে ভারতের নারী' গ্রন্থে লেখিকা কৃষ্ণকলি বিশ্বাস লিখছেন—'জেল থেকে মুক্তি পেলেন তিনি (ননীবালা)। কিন্তু মাথা গোঁজবার ঠাঁই পেলেন না এই বীর নারী। পুলিশের ভয়ে কেউ তাঁকে আশ্রয় দিতে রাজী হলেন না। তাঁর বাবা কলকাতায় একটা ছোট্ট ঘর ভাড়া করে দেন। সেখানে তিনি দীর্ঘদিন দীনভাবে জীবনযাপন করেন।' দেশ স্বাধীন হলে ১৯৫০ সালে তাঁকে রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে রাজ্য সরকার ভাতা মঞ্জুর করেছিলেন। ১৯৬৭ সালে ঐ মহান নারীর জীবনাবসান হয়।

উড়িষ্যায় বুড়ীবালামের তীরে বাঘা যতীনের নেতৃত্বে সশস্ত্র খণ্ডযুদ্ধ হয়েছিল তার ইতিহাস আমাদের অনেকেরই জানা। কিন্তু বুড়ীবালামের তীরে যাবার আগে বাঘা যতীন যে তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে হাওড়ার বাগনান স্টেশনের ধারেই অবস্থিত বাগনান হাই স্কুলে আশ্রয় নিয়েছিলেন তার খবর ক'জনেরই বা জানা আছে! এই আশ্রয় দাতাই ছিলেন বিপ্লবী দলের অন্যতম কর্মী বাগনান হাই স্কুলের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক অতুল সেন। গোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সপ্তশিখা' পুস্তকে লিখছেন—'যতীন্দ্রনাথ কলিকাতায় বিশ্বস্ত সহযোগিগণকে আগামী বিপ্লবের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা সম্বন্ধে বুঝাইয়া দিয়া বালেশ্বরে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে রহিলেন চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন ও যতীশ। এই পঞ্চবীর প্রথমে বাগনানে পরে বাগনান স্কুলের হেডমাষ্টার বিপ্লবী অতুল সেনের সহায়তায় কয়েকদিন কাটাইলেন বাগনান স্কুলের বোর্ডিংয়ে; তারপর তাঁরা চলিলেন বালেশ্বরের অভিমুখে।'

এই অতুল সেন কে ছিলেন এবং কিভাবেই বা তিনি বাঘা যতীনকে রূপনারায়ন পার করিয়ে দিয়েছিলেন তার কথা একটু বলা খুবই দরকার। কারণ 'যুগান্তর' পার্টির কার্যকলাপে বাগ্নানের একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল যার প্রধান কাণ্ডারী ছিলেন বিপ্লবী প্রধান শিক্ষক অতুল সেন মহাশয়। ১৯১৫ সাল। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন বাগনান হাইস্কুলের তদানীন্তন সম্পাদক জাঁদরেল জমিদার হেমচন্দ্র ঘোষ—একজন যোগ্য প্রধান শিক্ষক প্রয়োজন। এই বিজ্ঞাপন দেখেই 'যুগান্তর পার্টি' তার সদস্য অতুলবাবুকে পাঠালেন ঐ পদে প্রার্থী হবার জন্য। অতুলবাবুর পুঁথিগত বিদ্যার কথা ছাড়াও তাঁর সুগঠিত সুশ্রী দেহ ও ব্যক্তিত্ব আত্মম্ভরী জমিদার হেমচন্দ্র

ঘোষ মশায় পর্যন্ত সমীহ করে চলতেন। বাগনানে কটক রোডের ওপর সেই সময় এক মার্কিন মিশনারী ডাক্তার মেমসাহেব ছিলেন। তিনি নিঃখরচায় গ্রামের অসহায় লোকেদের সেবা করে তাদের 'মা' বলে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। অতুলবাবুও ঐ মেমসাহেবের সঙ্গে যোগ দিয়ে সেবার ব্রতে ব্রতী হলেন। অচিরেই অতুলবাবু শুধু গ্রামবাসীদের কাছেই নমস্য হলেন না, জেলা প্রশাসনের উৰ্ব্বতন কর্তৃপক্ষেরও বিশেষ আস্থাভাজন হয়ে উঠেন। এইভাবে অতুলবাবু গ্রামবাসীদের সেবার মধ্য দিয়েই দেশের মুক্তি আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করার স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়েন। তাই স্কুলের কতিপয় ভাল ছাত্রকে বিনা পয়সায় পড়িয়ে ভাল রেজাল্ট করার জন্য 'বোর্ডিং-এ' রাখার পরিকল্পনা করলেন। লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে ব্যায়াম চর্চা, লাঠি ও ছুরি খেলা এমনকি পরে বন্দুক চালনাও শেখানো হল। নিজেরও একটি লাইসেন্স করা বন্দুক ছিল। এর আগেই বাগনানের তিন যুবক প্রভাত ভট্টাচার্য, চন্দ্রকান্ত সামুই ও সনৎ চক্রবর্তী ক্ষুদিরামের ফাঁসির পর থেকেই বিদেশীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। অতুলবাবুর মত প্রধান শিক্ষকের স্নেহচ্ছায়ায় তাঁরা খুঁজে পেলেন মনের মানুষকে। খুব ভোরে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে চলে যেতেন বন্দুক চালানো শিখতে রূপনারায়ণের ধারে। ঐ তিন বন্ধু ছাড়াও স্কুলের সতীশচন্দ্র সিংহ, ফেলুরাম চক্রবর্তী, ভূধর বিশ্বাস, লক্ষ্মণ চন্দ্র রায় ও হরেকৃষ্ণ দাস প্রভৃতি যোগ দিয়েছিলেন। অস্ত্র সংগ্রহের জন্য ডিহি মণ্ডল ঘাটে এক জমিদার বাড়িতে ডাকাতির পরিকল্পনা সার্থক হয়। বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ছদ্মবেশে মেটিয়াবুরুজে কেল্লার মেরামতি কাজ পেয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল কেল্লার সব খোঁজ খবর নেওয়া এবং কিছু অস্ত্র সংগ্রহ করা। সেখানেও অতুলবাবু বাগনানের নিজের ছেলেদের পাঠিয়েছিলেন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। সেই সময় বাগনানে ভুবনচন্দ্র সামুই মহাশয়ের দোকানে 'শ্রমজীবী' সম্প্রদায়ের কাপড়ের একটি দোকান খোলা হল। এই দোকানের মাধ্যমেই বিপ্লবীদের কাজকর্ম চলতো। রডার কোম্পানীর 'মশার পিস্তল' লুটের কথা আগেই বলা হয়েছে। পাচার হওয়া পিস্তলের মধ্যে পাঁচটি পিস্তল অতুলবাবুর ছাত্র প্রভাত, চন্দ্র ও সনৎ-এর হাতেও এসে পৌঁছেছিল। সুতরাং অস্ত্র লুটের পর বাগনান হাই স্কুলে বার বার তল্লাসী চলে। কিন্তু অতুলবাবুর সুচতুর পরিকল্পনায় পুলিশের চেষ্টা প্রতিবারই ব্যর্থ হয়। পুলিশ জানতে পেরেছে যতীন্দ্রনাথও (বাঘা যতীন)-এর মধ্যে আছেন। পুলিশের হাত থেকে যতীন্দ্রনাথকে নিরাপদে রাখতে অতুলবাবুর নিরাপদ আশ্রয় বাগনানকেই বেছে নেওয়া হল। অতুলবাবুর যোগ্য ছাত্র বিপ্লবী সনৎ চক্রবর্তী মৌড়ীগ্রাম স্টেশন থেকে বাঘা যতীন, চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জনসহ পাঁচজনকে বাগনান স্টেশনে না নামিয়ে মাহিষরেখা পোলের কাছে নামিয়ে পাঁচজন স্বেচ্ছাসেবকের সাইকেল প্রহরায় নিরাপদে তাঁদের বাগনানে আনা হল। তারপর তাঁদের উড়িষ্যার বালেশ্বরে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হল। বাগনান হাই স্কুলেরই হেড পণ্ডিত শ্যামবাবুর পরিকল্পনামত বাঘা যতীনকে বর সাজিয়ে, পণ্ডিত মশাই পুরোহিত

সেজে আর ছেলেরা বরযাত্রী ও পাল্কীর বেয়ারা সেজে ঐ পঞ্চবীরকে রূপনারায়ণের নৌকোতে তুলে দেওয়া হল। নৌকো ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চবীরদের জানানো হল শেষ নমস্কার। এর পরের ঘটনা তো প্রায় সবারই জানা।

অতুলবাবুসহ সতীশ, প্রভাত, হরেকৃষ্ট, সনৎ প্রমুখ বিপ্লবীরা একে একে গ্রেপ্তার হন। কিন্তু বাগনানের সেই 'শ্রমজীবী কাপড়ের দোকানটি আজ না থাকলেও সেই স্থানটি রয়েছে পুরোনো বিপ্লবীদের পাদস্পর্শে পুণ্যস্থান হিসাবে—যেখানে একাধিক রাত কাটিয়েছেন বিপ্লবী ভূপতি মজুমদার, মাখনলাল সেন, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, অমর মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।* উলুবেড়িয়া অঞ্চলে বাঘা যতীনের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন উলুবেড়িয়ার বিভূতি ঘোষের (নানু ঘোষ) পিতা অতুল ঘোষ।

বাংলাদেশের বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের নেতৃত্বে যেমন ছিলেন বাঘা যতীন তেমনি উত্তর ভারতের বিপ্লবাত্মক কাজের নেতৃত্ব নিয়েছিলেন রাসবিহারী বসু। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আমীরচাঁদ, বালমুকুন্দ, অবোধবিহারী, বলীরাজ ও ভাই পরমানন্দ। ১৯১৪ সালের মাঝামাঝিতে কাশীতে এসে তিনি মিলিত হলেন বিপ্লবী সংগঠক শচীন সান্যাল, নগেন দত্ত (গিরিজাবাবু), বিভূতি হালদার ও নলিনী মুখার্জীর সঙ্গে। এই সময় আমেরিকা থেকে 'গদ্দর-পার্টি'র এক মারাঠী যুবক সদস্য বিষ্ণুগণেশ পিংলে ভারতে আসেন। ইতিমধ্যে আমেরিকা থেকে কয়েক হাজার শিখকে বিপ্লবী দলের লোক বলে 'কোমাগাতামারু' জাহাজে করে বজবজে জোর করে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং অনেকে ইংরেজ পুলিশের হাতে মারা গেলেন। পিংলে ভারতে এসে রাসবিহারীবাবুর সঙ্গে দেখা করেন। রাসবিহারীবাবু পিংলে ও শচীনবাবুকে নিয়ে পাঞ্জাবে কাপুরথালায় এক গোপন বৈঠকে বসেন। তাতে পাঞ্জাবের বিপ্লবী নেতা কর্তার সিং, ভাই পরমানন্দ, মুলো সিং ও অমর সিং প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ঠিক হল ভারতীয় সেনা বাহিনীতেও সিপাহী বিদ্রোহের মত সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো হবে। দিনক্ষণ স্থির হল ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৫-তে। দুঃখের বিষয় এই গোপন সংবাদ রাসবিহারী বসুরই বিশ্বাসী অনুচর কৃপাল সিং ইংরেজের কাছে ফাঁস করে দেওয়ায় ইংরেজের ওপর আঘাত হানার দিন এগিয়ে এনে করা হল ১৯শে ফেব্রুয়ারী। বলা বাহুল্য, ইংরেজ গোয়েন্দাবাহিনী কর্তার সিং-সহ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে ফাঁসির মঞ্চে ঝুলিয়ে দিলেন। রাসবিহারী বাবুর মাথার দাম ইতিমধ্যেই ইংরেজ সরকার এক লক্ষ টাকা ঘোষণা করেন। সুতরাং উপায়ন্তর না দেখে তিনি ছদ্মবেশে নাম পালটিয়ে জাপানে যাবার মনস্থির করেন। এ সবই পাঠকের হয়তো জানা আছে। কিন্তু যে ঘটনাটি এখনও স্বল্প জানিত সেটি হচ্ছে এই যে জাপানে যাবার আগে

---

* এই অংশের সমস্ত তথ্যের উৎস হচ্ছে—'অগ্নিযুগের বাগনান' নামে একটি পুস্তিকার সংকলক—চণ্ডীদাস ঘোষ—উলুবেড়িয়া মহকুমা স্বাধীনতা সংগ্রামী সংঘ। বইটি সংগ্রহ করে দিয়েছেন দেশকর্মী—বিনয় কৃষ্ণ চক্রবর্তী।

প্রস্তুতি হিসাবে তিনি হাওড়ার আন্দুল-মৌড়ির কোলড়া গ্রামে বোনের বাড়ি এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সাহিত্যিক ও গবেষক নারায়ণ সান্যাল তাঁর 'আমি রাসবিহারী বসুকে দেখেছি' গ্রন্থে লিখছেন—এই গ্রামের (কোলড়া) সুবিখ্যাত সরকার পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা আজ ইতিহাসের বিষয়ীভূত। ৺মন্মথনাথ সরকার (যিনি ছিলেন তাঁর কনিষ্ঠা ভগ্নীর দেবর) মহাশয়ের বাটিতে বিপ্লবী রাসবিহারী কয়েকবার এসেছেন। তাঁর শেষ বারের মত ভারত ত্যাগের কয়েকদিন পূর্বে তিনি এখানে এসেছিলেন ও পুলিশ বেষ্টনীর দৃষ্টি এড়িয়ে চলে যান। স্বাধীনতা সংগ্রামী দুঃখহরণ ঠাকুর চক্রবর্তী তাঁর 'স্বাধীনতা সংগ্রামে হাওড়া জেলা'* প্রবন্ধেও লিখেছেন—কাটলিয়া (ডোমজুড়) গ্রামে রাসবিহারী বসুর মামার বাড়ি এবং এখানে তাঁর আসা-যাওয়ার যোগাযোগ ছিল—এই সংবাদ পাই। ঐ পরিবারের আত্মীয়া বর্ষীয়সী শ্রীযুক্তা মেনকা চৌধুরীর (স্বামী ৺নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী) সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। ১৯৮১ সালে শ্রীযুক্তা চৌধুরী বলেছিলেন তাঁর বয়স ৮২। রাসবিহারী বসুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা কি জানতে চাওয়ায় তিনি বলেছিলেন—'আমার ছোট মাসীমার বোনপো হলেন রাসবিহারী।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রাসবিহারী বসুর একমাত্র বোন সুশীলা দেবীর শ্বশুরবাড়ি ছিল কোলড়া গ্রামে এবং ওঁনার মামা-বাড়ি ছিল অনতিদূরে কাটলিয়া গ্রামে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসাবে পি, এন, ঠাকুর ছদ্মনাম নিয়ে তিনি জাপান যান। খিদিরপুর থেকে জাহাজে ওঠার আগে পর্যন্ত তিনি মামাবাড়িতেই লুকিয়ে ছিলেন। রাসবিহারী বসুর জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে ১৯৮৬ সালে। হাওড়াবাসীর গর্বের বিষয় দেশ ত্যাগ করার আগে শেষ পদচিহ্ন পড়েছিল এই হাওড়ারই একটি গ্রামে। মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু স্মৃতি সংরক্ষণ সমিতি কোলড়া গ্রামে 'সরকার-ভবনের' সীমানায় একটি স্মৃতি ফলক প্রতিষ্ঠা করে ইতিহাসকে ধরে রাখার সফল চেষ্টা করেছেন বলে হাওড়াবাসী গর্বিত।

ভারতে বৈপ্লবিক আন্দোলনের পর্যালোচনা করার জন্য ইংরেজ সরকার একটি কমিটি তৈরী করেছিলেন—এই কমিটিই কুখ্যাত রাওলাট কমিটি নামে খ্যাত। সরকারকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে দমনমূলক আইন প্রবর্তনে সুপারিশ করলেন এই রাওলাট সাহেব। সেই সুপারিশগুলির মধ্যে ছিল সরকার বিরোধী ব'লে যাদেরই সন্দেহ হবে তাদেরই বিনা বিচারে খুশিমত গ্রেপ্তার এবং অন্তরীণ করা যাবে। এমনকি তাদের গতিবিধির ওপরেও নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরামর্শ দেওয়া হয়। জুরী ছাড়াই রাজনৈতিক মামলাগুলি বিচার করার ক্ষমতা বিচারককে দেওয়া এবং ঐ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল না করতে দেওয়ার ক্ষমতাও গ্রহণ করতে সরকারকে সুপারিশ করা হয়। সরকার বিরোধী কোন পুস্তিকা রাখাও দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করার কথা রিপোর্টে বলা হয়। জনগণের প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও রাওলাট

* সান্ধ্য দৈনিক—বিবরণ—১৯৮২, ২৫ ও ২৬ জুন।

আইন প্রবর্তিত হল। স্বভাবতঃই এই আইনটি গান্ধীজীর কাছে প্রকাশ্যে এক‍ চ্যালেঞ্জের চেহারা নিয়ে হাজির হ'ল।

এর বছর খানেক আগেই গান্ধীজীর নেতৃত্বে বিহারের চম্পারণের নীল চাষীরা তিন কাঠিয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়ে নির্যাতিত চাষীরা ইংরেজ প্রবর্তিত ব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ করল। ১৯১৮ সালেই গুজরাটের কইরা জেলাতে অজম্মাহেতু 'নো ট্যাক্স' আন্দোলনে ইংরেজের রক্তচক্ষু স্তিমিত হল। ঐ একই সালে আমেদাবাদের কাপড়ের মিলের শ্রমিকদের মজুরী শতকরা ৩৫ ভাগ বাড়াতে মালিকদের বাধ্য করেছিলেন।[৯]

পর পর জনগণের সংগ্রামে জয়ী হবার দৃষ্টান্তে রাওলাট সাহেবের দমনমূলক প্রস্তাবগুলি কিছুতেই গান্ধীজীর পক্ষে তথা ভারতীয়দের পক্ষে হজম করা সম্ভব নয়। তারই ফলশ্রুতি হল জালিয়ানওয়ালাবাগের মর্মান্তিক শোচনীয় ঘটনা। রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের যে ঢেউ সারা ভারতে দেখা দিয়েছিল তার ধাক্কা হাওড়া জেলাতেও এসে লেগেছিল। বিপ্লবাত্মক কার্যাবলীর প্রাণকেন্দ্র হিসেবে শালিখার বাবুডাঙ্গা অঞ্চলে ডোমপাড়া লেনের (বর্তমান গঙ্গাধর ভট্টাচার্য লেন) তারিণী ঘোষের বাড়িটি বেছে নেওয়া হয়েছিল।

একতলা এই বাড়িটির পাশেই ছিল অধর কুণ্ডুর দোতলা বাড়িটি। ১৯১৬ সাল। রাত্রি ৯টা কি ১০টা হবে। হঠাৎ পুলিশের গাড়ি বাবুডাঙ্গা রোড, বাড়ুজ্যে ঘাট ও হালদার পার্কের (তখন হালদার পুকুর) কাছে এসে জমা হয়েছে। তদানীন্তন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (পরে পুলিশ কমিশনার) চার্লস টেগার্ট সাহেব বিরাট পুলিশবাহিনী নিয়ে ঘিরে ফেললেন ডোমপাড়া লেনের সেই বাড়িটি। একে রাত তার ওপর আবার গোরা পুলিশের আগমন। ফলে ডোমপাড়া লেনের সকলেই ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে উঠল। দরজা ভাঙ্গা হলো কুণ্ডুর বাড়ি। প্রহার করা হলো অধরবাবু ও তাঁর শ্যালককে। প্রহারের কারণ কিছুই বুঝতে পারলেন না অধরবাবু। কিন্তু বিনা প্রতিবাদে প্রহার সহ্য করতে হলো। পুলিশের একটিই মাত্র কথা, "বিপ্লবীরা কোথায় বল্।" এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ঐ বাড়ির পাশেই একতলা বাড়িটিতে (তারিণী ঘোষের বাড়ি) একদল বিপ্লবী বাস করতেন। এই বিপ্লবীরাই হচ্ছেন বাঘা যতীনের দলের লোক। বিপিন গাঙ্গুলী এবং বাঘা যতীনও এই বাড়িতে আসতেন। এই বাড়িতে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, যাদুগোপাল মুখার্জী, যুগলকিশোর মণ্ডল প্রমুখ বিপ্লবীবৃন্দ। এই বাড়িটি ছিল রাজনৈতিক আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের একটি আড্ডা। সেদিন কেউ কেউ এ বাড়ি থেকে পালাতে সক্ষম হলেও উল্লাস কর টেগার্টকে একবার সম্মুখ সমরে দেখে নিতে চাইলেন। শুরু হলো উল্লাস করের রিভলবারের গর্জন। প্রত্যুত্তরে গোরা পুলিশেরও বন্দুক চলল। বেঁধে গেল এক খণ্ডযুদ্ধ। কিন্তু টেগার্ট তাঁর ব্যূহ রচনা এমনভাবেই করেছিলেন যাতে বিপ্লবীরা পালাতে না পারে। কিছুক্ষণ গুলি বিনিময়ের পর উল্লাসকর ঝাঁপ

দিয়ে পুকুরে পড়েন। উদ্দেশ্য ছিল সাঁতরে অপর পাড়ে গিয়ে উঠবেন। কিন্তু উল্লাস কর গ্রেপ্তার হলেন পুলিশের হাতে। প্রচণ্ড প্রহার করা হ'ল তাঁকে। রিভলভারটি পাওয়ার জন্য পরদিন ঐ পুকুরে জাল পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য রিভলভারটি পাওয়া যায়নি।'* বলা বাহুল্য, উল্লাসকরের বিরুদ্ধে মামলা হয়। এঁদের মধ্যে যুগলকিশোর মণ্ডলও পরে ধরা পড়েন। এই ঘটনার পর থেকে শালিখার বাবুডাঙ্গা অঞ্চলে বিপ্লবাত্মক কাজকর্ম বেশ জোর গতিতে চলতে লাগল। শালকিয়ার বিপ্লবী-ঘাঁটির সঙ্গে উল্লাস করের যুক্ত হওয়ার কারণও ছিল। উল্লাস কর প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন। তদানীন্তন কালে ঐ কলেজের বেশির ভাগ ইংরেজ অধ্যাপকই ভারতীয়দের বিশেষ ক'রে বাঙ্গালীদের সম্পর্কে ক্লাসে বিরূপ মন্তব্য করতেন বলে শোনা যেতো। প্রতিবাদ অবশ্য দু'চারজন স্বজাত্যাভিমানী তেজী ছাত্রই করতেন। সুভাষচন্দ্রের প্রতিবাদের কথা আমাদের অতি পরিচিত ঘটনা। কিন্তু উল্লাস করও যে অনুরূপ প্রতিবাদ আগেই করেছিলেন তা আমাদের অনেকেরই অজ্ঞাত। আর সেই প্রতিবাদ করতে গিয়েই উল্লাসকর কলেজ ছেড়ে বিপ্লবী কর্মে যোগদান করেন। পরে শালকিয়ার বিপ্লবী ঘাঁটির সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ঘটে। এই প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'হুগলী জেলার ইতিহাস' প্রবন্ধে মাসিক বসুমতী পত্রিকায় ১৩৪২ সালে লিখেছেন: "১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে শিবপুর কলেজে কৃষি শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হয়েছিল। দ্বিজদাস দত্ত (উল্লাস কর দত্তের পিতা) এই কৃষি বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন (এখন উঠে গেছে)। উল্লাস কর প্রেসিডেন্সীর ছাত্র ছিলেন। তিনিও ঐ কলেজের অধ্যাপক ডঃ রাসেলকে বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্যের জন্য প্রহার করেন এবং 'বন্দেমাতরম্' ব'লে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসেন। পরে College-এ Poster দিয়েছিলেন House to let. Apply to Lord Curzon. এরপর তিনি বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসে Shibpore-এ থাকেন।"

বিপ্লবী নায়ক রাসবিহারী বসুর উদ্যোগে সারা ভারতব্যাপী যে বিপ্লবী চিন্তার ঢেউ উঠেছিল তার সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে বাবুডাঙ্গা অঞ্চলে হেরম্ব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র বিজন বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে ভারতমাতার শৃঙ্খলমোচনে উৎসর্গ করেন। ইংরেজ পুলিশের কাছে এ খবর প্রকাশ হ'তেই ১৯১৬ সালে বাবুডাঙ্গার এক বাড়ি থেকে বিজনবাবুকে গ্রেপ্তার করা হয়। তখন তাঁর বয়স মাত্র পনের। দু'বছর কারাবাসের পর কৈশোরোত্তীর্ণ বিজন ১৯১৮ সালে মুক্ত হন। কিন্তু এতে তিনি ভীত ও নিরুৎসাহিত না হ'য়ে জোর কদমে দেশসেবায় নেমে পড়েন। বিপ্লবী কার্যকলাপের সংগঠনকে আরও জোরদার করায় ইংরেজের কোপদৃষ্টি আবার তাঁর ওপরে পড়ে।

১৯২১—২২ সালে বিজন ব্যানার্জীর নেতৃত্বে বাবুডাঙ্গার অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় ও বিজয় মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে উপেন চৌধুরী, সতীশ ঢ্যাং, বীরেন ব্যানার্জী, সন্তোষ গাঙ্গুলী, সুধাংশু চৌধুরী, গৌর দাস, জীতেন চ্যাটার্জী, ডাঃ মলিন চ্যাটার্জী প্রমুখ ব্যক্তিরা একটি প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করেন। এই

---

* বিপ্লবী বীরেন ব্যানার্জী ও সন্তোষ গাঙ্গুলীর জবানীতে এই তথ্য জানা যায়।

কেন্দ্রকে কেন্দ্র ক'রেই চলতো বিপ্লবী কাজকর্ম। তারপর কেন্দ্রটি স্টলকার্ট লেনে উঠে আসে। পরিচালনার ভার পড়ে ডাঃ মলিন চ্যাটার্জী, ডাঃ জীবনানন্দ মুখার্জী ও বিজয় মুখার্জীর ওপর।

ইত্যবসরে বালি, উত্তরপাড়া, ডোমজুড়, মধ্য হাওড়া, তারকেশ্বর, জনাই, দক্ষিণ ও উত্তর কলকাতা, দক্ষিণেশ্বর, ব্যারাকপুর প্রভৃতি কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ চললো শালিখা কেন্দ্রের। বিপিন গাঙ্গুলীর চেষ্টায় অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হ'ল। ফরিদপুরের (বাংলাদেশ) বিপ্লবী নরেন সাহা ঘুষুড়ি নস্করপাড়া রোডের একটি দেয়াশলাইয়ের কারখানায় যুক্ত ছিলেন। এসবই গোপন কর্মকাণ্ড চলতো প্রকাশ্য কেন্দ্রে। তবে প্রত্যেকেই ছদ্মনাম ব্যবহার করতো।

ইতিমধ্যে সরকারীভাবে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হ'ল। বিজনবাবু আত্মগোপন ক'রে বালিতে (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে, ধোপা পাড়ায় আশ্রয় নেন। বিপ্লবী বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলীর সঙ্গে বিজনবাবুর পরিচয় ঘটে। বিপিনবাবুর 'আত্মোন্নতি সমিতি'র শাখা সারা বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে। শালকিয়া বাবু-ডাঙ্গায়ও তার একটি শাখার জন্ম হ'ল যুবক বিজনবাবুর উদ্যোগে। 'আত্মোন্নতি সমিতি'র সঙ্গে বিপিন চন্দ্র গাঙ্গুলীর নাম বিশেষভাবে জড়িত থাকলেও উহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নিবারণ ভট্টাচার্য ও সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 'জাগরণ ও বিস্ফোরণের' লেখক কালীচরণ ঘোষ লিখছেন—"১৮৯৭ সালে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে আত্মোন্নতি সমিতি প্রতিষ্ঠা হয়। গোড়ায় উদ্যোক্তা ছিলেন নিবারণ ভট্টাচার্য ও সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পরে ১৯০৫ সালে সেবা ও শিক্ষা ছেড়ে উহা বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। বিপিনচন্দ গাঙ্গুলী, অনুকূল মুখোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রমুখের দ্বারা পরিচালিত হয়।"

উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে, এই ধরনের সমিতির মাধ্যমেই সে সময়ে বিপ্লবী কাজকর্ম ও দেশসেবা হ'তো—ইংরেজ পুলিশের চোখ এড়াবার জন্য। বিজনবাবুর আহ্বানে এই সমিতিতে যোগ দিলেন বীরেন ব্যানার্জী, সন্তোষ গাঙ্গুলী, গৌরমোহন দাস, সতীশচন্দ্র ঢাং, সুধাংশু চৌধুরী, লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ (সকলেই শালকিয়ার) ও ডোমজুড়-পার্বতীপুরের গোষ্ঠবিহারী মুখার্জী। আর এঁদের সঙ্গে ছিলেন ডোমজুড়ের বসন্ত ঢেঁকী, আশুতোষ ভট্টাচার্য, ধীরেন মুখার্জী ও বালি-উত্তরপাড়ার চৈতন্যদেব চ্যাটার্জী প্রমুখ বিপ্লবীরা। এই বসন্ত ঢেঁকীই ১৯২৪ সালে পুলিশের চর শিশির ঘোষকে হত্যা করার জন্য বোমা ছোঁড়েন। কলকাতার মীর্জাপুর স্ট্রীটে শিশিরবাবু 'স্বদেশী বস্ত্রালয়' নামে একটি দোকান দেন। তখনকার দিনে এই রকম নামাঙ্কিত দোকান থেকেই দেশসেবকরা বস্ত্রাদি খরিদ করতেন। এই ভাবে শিশির-বাবু বিপ্লবীদের গোপন কথা বন্ধু সেজে জেনে নিয়ে পুলিশকে পাচার করতেন। এটা জানতে পারায় বসন্ত কুমার ঢেঁকী তাঁকে লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়েন। যদিও শিশিরবাবুর সহকারী প্রকাশ বণিক নিহত হয়।[১] বসন্তবাবুর প্রাণদণ্ডের আশঙ্কা থাকলেও শেষ পর্যন্ত জুরীদের বিচারে তিনি কয়েক বছরের কারাদণ্ড ভোগ করেন।

এই দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে বিখ্যাত 'বিগ ফাইভের' (Big Five) তুলসী গোঁসাই তদানীন্তন প্রিভি-কাউন্সিলে কেশবচন্দ্র সেনের পৌত্র ব্যবহারজীবী সুনন্দ সেনকে দিয়ে বসন্তবাবুর হয়ে মামলা লড়েছিলেন। আর বহু আন্দোলনে জড়িত ও মান্দালয় প্রভৃতি জেলে দণ্ডিত আশুতোষ ভট্টাচার্য আজও (৯৭ বছর) ডোমজুড়ের বাড়িতে জরাগ্রস্ত হলেও জীবিত আছেন।

বিজন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে শালকিয়ার বাবুডাঙ্গায় যেমন আত্মোন্নতি সমিতি গড়ে উঠেছিল তেমনি মধ্য হাওড়ায় হরেন্দ্রনাথ ঘোষের বড়দা সুরেন্দ্রনাথ ঘোষও অনুশীলন সমিতির শাখা গড়ে তোলেন। এখানেও বোমা তৈরী হত। শিবপুরে ডাঃ বেণী দত্তের বাড়িতে যুগান্তর পার্টির সদস্য প্রাক্তন মন্ত্রী বিনয় চৌধুরীও বেণী দত্তের ভাইপো অগম দত্তের বাড়িতে আশ্রয় নিতেন। আর বিপিন গাঙ্গুলীও আত্মগোপন করতেন বেণী দত্তের বাড়িতে।

ইতিমধ্যে ১৯২৩-২৪ সালে **East Bengal Railway**-তে রেল কোম্পানীর আঠারো হাজার টাকা যাচ্ছিল। বিপ্লবী কাজে অস্ত্রশস্ত্র যোগাড়ের জন্য অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, সূর্য সেন (মাষ্টারদা) ও দেবেন দে (পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী ছিলেন) ঐ ট্রেন আক্রমণ ক'রে পুরো টাকা লুঠ করেন। পুলিশের গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য ওঁরা ওখানে থেকে পালিয়ে আস্তানা নেন প্রথমে দক্ষিণেশ্বরে, আহিরীটোলায় ও পরে বাবুডাঙ্গাতে। কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার (১৯২৫) জনৈক আসামী ও চট্টগ্রামের বিপ্লবী গণেশ ঘোষকে বাবুডাঙ্গার মন্মথনাথ খাঁয়ের (মনা খাঁ) বাড়িতে কয়েকদিনের জন্য রাখা হয়েছিল। আর এঁদের দেখাশুনার ভার পড়েছিল 'আত্মোন্নতি সমিতি'র শালিখা শাখার সদস্য বিজন ব্যানার্জী, বীরেন ব্যানার্জী, সন্তোষ গাঙ্গুলী প্রমুখ বিপ্লবীদের ওপর। মনে রাখতে হবে, বিজনবাবুই ছিলেন শালিখার বিপ্লবী আন্দোলনের নায়ক। পুলিশ শালিখা কেন্দ্রের বিপ্লবীদের খুঁজে বেড়াতে থাকে। তাই পুলিশের গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য উপরিউক্ত বিপ্লবীরা বিভিন্ন আড্ডায় ছড়িয়ে পড়লেন। প্রথমে তাঁরা গেলেন 8 নম্বর শোভাবাজার স্ট্রীটের এক বাড়িতে—তারপর সেখান থেকে দক্ষিণেশ্বরের বাচস্পতি পাড়ায়। বিপ্লবী দেবেন দে ছিলেন বাবুডাঙ্গার সুরমণি চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। ১৯২৩ সালে বিজন ব্যানার্জীর নেতৃত্বে শালিখায় যে গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে তার কাজকর্ম পুরোদমে চলতে থাকে। 'আত্মোন্নতি সমিতির' শালিখা শাখার ওপর ভার পড়ে বোমা তৈরীর জন্য এক হাজার লোহার খোল তৈরী করার। এই শাখার সদস্যরা এই কাজের ভার সানন্দে নিয়েছিলেন। কারণ এঁদের সভ্য লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ ও গৌরচন্দ্র দাস কারখানায় কাজ করতেন। বেনারস রোডের এক কারখানায় ওই খোল ঢালাই হলো। আর জি. টি. রোডের সত্য কুণ্ডুর কারখানায় (শালকিয়া ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কোঃ) তা ছেঁদা করা হয়। সন্দেহ হ'লেও সত্যবাবু বেশি জিজ্ঞাসাবাদ না ক'রে কাজটা ক'রে দিয়েছিলেন। আর এই বোমার প্রথম পরীক্ষা হয়েছিল ডোমজুড়ের গুহের মাঠে। এই বোমার ফরমুলো বার করেছিলেন চুঁচুড়ার হরি নারায়ণ চন্দ। হরিনারায়ণবাবু নিজে একজন রসায়নবিদ্

ছিলেন। তাঁর টি. এন. টি. (Tri-Nitro-Toluene) ফরমুলাটি অত্যন্ত কার্যকরী ছিল। এই খোলগুলির কিছু ডোমজুড়ে, কিছু উত্তরপাড়ায়, কিছু কলকাতায়, অল্পকিছু মধ্য হাওড়ায় ও বাকিগুলি শালিখায় ভাগ করা হয়। শালিখার হাজরা বাড়িতে ও জগবন্ধু ঘোষের বাড়িতে, সতীশচন্দ্র ঢ্যাং এবং গৌরচন্দ্র দাসের হেফাজতে ঐ বোমাগুলি রাখার ব্যবস্থা করা হয়। মির্জাপুর বোমার মামলায় শালিখায় তৈরী বোমা ব্যবহার করা হয়েছিল। চৈতন্যদেব চ্যাটার্জীর মতে এই বোমা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনেও ব্যবহৃত হয়েছিল। বসন্ত ঢেঁকির আসামী হিসেবে পাঁচ বছরের জন্য জেল হয়। শালিখার বোমার মামলায় বীরেন ব্যানার্জী ও বিজন ব্যানার্জী বাড়ি থেকে পালিয়ে আত্মগোপন করে। এই সময়েই আর এক উল্লেখযোগ্য ডাকাতির খবর হল ধর্মতলা স্ট্রীটে শাঁখারীটোলা পোষ্ট অফিস আক্রমণ। পোষ্ট অফিসের টাকা লুট করতে গিয়ে পোষ্ট মাষ্টারকে খুন করেন বরেণ ঘোষ। বরেণবাবুর বাড়ি ছিল মধ্য হাওড়ার আচার্যপাড়া লেনে। প্রথমে ফাঁসির হুকুম হলেও পরে তাঁর সদ্য বিবাহিত জীবনের কথা বিচার করে মানবিক কারণেই বিচারক তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেন।*

১৯২৭ সালে শালকিয়া-বোমার মামলায় ধরা পড়েন বাবুডাঙ্গার সতীশচন্দ্র ঢ্যাং, গৌরমোহন দাস এবং উভয়ের পাঁচ বছর করে জেল হয়। এ সময় বিপ্লবীরা ডাকাতির পথ ছেড়ে দিয়ে নিজেরাই ঘর থেকে টাকা এনে অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় ক'রতে লাগলেন। এ কাজে বিত্তবান পরিবারের সন্তানরাও পিছিয়ে রইলেন না। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, উত্তরপাড়ার বিত্তবান ঘরের ছেলে ধ্রুবেশ চ্যাটার্জী সাবালক হ'য়ে তাঁর সম্পত্তির অংশ বিক্রি ক'রে তখনকার দিনে সাড়ে এগার হাজার টাকা বোমা তৈরী ও অন্য অস্ত্রশস্ত্র কেনার জন্য দান করেছিলেন।

এরপরই হলো দক্ষিণেশ্বরের বোমার মামলা। ১৯২৫ সাল, ১০ই নভেম্বর। এই মামলায় ধরা পড়েন বীরেন ব্যানার্জী, রাজেন লাহিড়ী, (কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার আসামী) হরি নারায়ণ চন্দ, নিখিল ব্যানার্জী, অঙ্কুর মুখার্জী, চৈতন্যদেব চ্যাটার্জী (নন্দুদা), ধ্রুবেশ চ্যাটার্জী (তিনজনই উত্তরপাড়ার) প্রমুখ বিপ্লবীরা। বিচারে রাজেনবাবুর ফাঁসী হয়। বীরেনবাবুর পাঁচ বছর জেল হয়। ১৯২৬ সালে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে স্পেসাল সুপারিনটেনডেণ্ট রায় বাহাদুর ভুপেন চ্যাটার্জীকে হত্যার অপরাধে বীরেন ব্যানার্জী, অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদরঞ্জন সেন (ফাঁসী হয়) প্রমুখের ফাঁসীর হুকুম হয়। বীরেনবাবু হাইকোর্টের আপীল ক'রে ফাঁসীর হুকুম থেকে রেহাই পান। পাঁচ বছর জেল ভোগের পর ১৯৩০ সালে তিনি ছাড়া পান। কিন্তু পুলিশ পরক্ষণেই আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে। এরপর ছাড়া পান ১৯৩৮ সালে।

শালিখার বিপ্লবীদের আড্ডায় উত্তরপাড়ার প্রসিদ্ধ চাটুজ্জ্যে বাড়ীর সন্তানরা যেমন অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, চৈতন্যদেব চ্যাটার্জী, ধ্রুবেশ চ্যাটার্জী ও ঐ অঞ্চলের অঙ্কুর

* বিপ্লবী কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই তথ্যটি জানান।

মুখাজী প্রমুখ বিপ্লবীদের যোগাযোগের সূত্র সন্ধানে জানতে পারা যায় যে, বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীর বোনের সঙ্গে বাবুডাঙ্গার প্রসিদ্ধ মুখার্জী বংশের যোগীন্দ্রনাথ মুখার্জীর বিয়ে হয়। তাঁরই পুত্র ছিলেন শঙ্করলাল মুখার্জী (হাঃ মিউঃ ভাইস চেয়ারম্যান)। সেই সূত্রেই অমরেন্দ্রনাথ প্রমুখের এই অঞ্চলের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ গাঢ় হ'য়ে ওঠে। চৈতন্যদেব চ্যাটার্জী অবশ্য আর একটি সূত্রের কথা অর্থাৎ শিল্পী সুধাংশু চৌধুরীর বন্ধুত্বের কথাও উল্লেখ করেছেন। স্বদেশপ্রেমের অপরাধে যোগীন্দ্রনাথ মুখার্জীর হাতে গরম Hand Press দিয়ে জলে তাঁর হাত ডুবিয়ে রাখার ঘটনা প্রবীণদের অনেকেরই জানা আছে।

সশস্ত্র আন্দোলনে দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলা একটি বড় ঘটনা। এ ব্যাপারেও শালিখার বিপ্লবীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। দুমকার কাছে বোমা বিস্ফোরণ নিয়ে ঐ মামলা করেন ইংরেজ শাসক। বিভিন্ন জায়গা থেকে সন্দেহবশতঃ কয়েকজনকে ধরা হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুরেন ভট্টাচার্য ও বীরেন ভট্টাচার্য (দুভাই), বিজন ব্যানার্জী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (বাবু), লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ (তিনজনই শালিখার), তেজেশ ঘোষ (জলপাইগুড়ির জনৈক চা বাগানের মালিকের ছেলে)। এই মামলা সরকার পক্ষ দুমকা সাবজেলে চালানো নিরাপদ নয় ভেবে দেওঘর কোর্টে নিয়ে যান। তাই এ মামলার নাম হয় 'দেওঘর ষড়যন্ত্র' মামলা। বিচারে বিজনবাবু ও লক্ষ্মীবাবুর জেল হয়। স্মরণ করা যেতে পারে যে, এই মামলা ১৯২৯ সালে দেওঘর কোর্টে ওঠে। বিচারপতি স্বভাবতঃই ইংরেজ। আসামীপক্ষের উকিল ছিলেন প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী নিশীথ সেন (মেয়র), দেশনেতা বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, ব্যারিস্টার এ. সি. মুখার্জী। আসামীরা নিজেরাই দোষ স্বীকার করায় মামলার কোন মেরিট নেই ভেবেই চূড়ান্ত সওয়ালের দিন ঐ তিনজন ব্যবহারজীবীই কোর্টে দাঁড়াতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। অবশেষে তাঁদেরই জুনিয়ার শালিখার বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী জগন্নাথ পোড়েল মশায় আইনের অনুশাসনের ওপরে মানবিকতারও যে একটা দিক আছে তা স্মরণ করিয়ে দিলে বিদেশী বিচারকের হৃদয়ও নড়ে উঠে। ফলে শাস্তির মাত্রা কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল।

১৯২৫ সালে দক্ষিণেশ্বরের বোমার মামলায় শালিখার সন্তোষ গাঙ্গুলী ও উত্তরপাড়ার চৈতন্যদেব চ্যাটার্জী আত্মগোপন ক'রে কটকে এক দেয়াশলাইয়ের কারখানায় কাজ করতে থাকেন। এই কারখানাটি ছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভাই সুরেশ বসু মশায়ের। সেখানে ঐ যুবকদ্বয় অমল সাহা (চৈতন্যদেব) ও বিমল সাহা (সন্তোষ গাঙ্গুলী) নাম নিয়ে কাজ ক'রতে থাকেন। শুধু তাই নয়। ঐ কারখানার চীফ কেমিস্ট নরেন সাহা যখন তাঁদের পারিশ্রমিকের কথা তোলেন তখন তাঁরা শিক্ষানবীশ কালে বিনা পারিশ্রমিকেই কাজ ক'রতে রাজী হন। বলা বাহুল্য, বসুজায়া এই সংবাদ শুনতে পেয়ে প্রতিদিন ঐ যুবকদ্বয়ের জন্য দুপুরের খাবার কারখানায় পাঠিয়ে দিতেন। অবশ্য বেশী দিন তাঁদেরকে সেখানে থাকতে হল না। নেতা

বিজনবাবুর নির্দেশে আবার তাঁদেরকে শালিখায় ফিরে আসতে হয়। শালিখায় ফিরে আসার পরই সন্তোষ গাঙ্গুলী গ্রেপ্তার হন। সন্তোষ গাঙ্গুলী ও তারকেশ্বরের শচীন ঘোষ হাজারীবাগ জেলেতে ১৮ দিন অনশন করেন।

১৯২৮ সাল। সাইমন কমিশনকে ভারতে পাঠান হ'ল এদেশীয়দের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অভাব অভিযোগের যাথার্থ অনুসন্ধান করার জন্যে। ভারতীয় প্রতিনিধি বিহীন এই কমিশনকে ভারতবাসী অভ্যর্থনা জানিয়েছিল 'কালো পতাকা' দিয়ে। চরমপন্থী নেতাদের অন্যতম নায়ক লালা লাজপত রায়ের নেতৃত্বে লাহোরে যে বিক্ষোভ মিছিল বেরিয়েছিল সেই মিছিলেই পুলিশের লাঠির ঘায়ে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। লাহোরের সহকারী পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সাণ্ডার্সের লাঠির আঘাতে যাদের শরীরের রক্তকে টগবগিয়ে তুলেছিল ভগৎ সিং তার মধ্যে প্রধান। এই ভগৎ সিংয়ের সঙ্গে বটুকেশ্বর দত্তের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে। বর্ধমানের এক গ্রামের ছেলে বটুকেশ্বর। কিন্তু গ্রামের সংশ্রব ছেড়ে যুবক বটুকেশ্বর এলো শহরে। সেই শহরটিই হচ্ছে হাওড়া শহরের শালিখা অঞ্চল। এই বটুকেশ্বর ছিলেন বর্তমান শালিখার অতুল ঘোষ লেনে বঙ্কু দত্তের বাড়িতে (ডাঃ প্রকাশচন্দ্র আঢ্যের পুরাতন বাড়ির পিছনে)। বঙ্কুবাবু ছিলেন বটুকেশ্বরের পিতৃব্য। ভগৎ সিংয়ের কাছেই বটুকেশ্বরের রিভলভার ছোঁড়ার শিক্ষা। যুবক বটুকেশ্বর বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হ'লেও সঙ্গীতচর্চায় তাঁর খুব ঝোঁক ছিল। উপেন্দ্রনাথ মিত্র লেনের মোড়ের মুখে **Jolly Friends' Association and Concert Party** নামে একটি ক্লাব ছিল। বটুকেশ্বর হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান করতে ভালবাসতেন। বটুকেশ্বরের বয়স তখন ১৯-২০ হবে। হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান পার্টির সদস্য ভগৎ সিং লালাজীর (লালা লাজপত রায়) হত্যাকারী অত্যাচারী সাণ্ডার্সকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হলেন না আরও সাহসিকতাপূর্ণ কাজ করবার তিনি পরিকল্পনা করলেন। এই কাজে তাঁর প্রধান সঙ্গী ছিলেন বটুকেশ্বর দত্ত। ভগৎ সিংয়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী বটুকেশ্বর শালিখার বাড়ি থেকে বাড়ির কাউকে না জানিয়ে দিল্লী রওনা হন। দিল্লী যাবার আগে বটুকেশ্বর কয়েকদিন হাওড়ার খুরুট রোডে (বর্তমান নেতাজী সুভাষ রোড) হরি বিরাজ আশ্রমে আত্মগোপন করে ছিলেন। তাঁকে দেখা-শুনার দায়িত্বে ছিলেন মধ্য হাওড়ার বিপ্লবী কর্মী কানাইলাল ব্যানার্জী, হাবী দত্ত, গণেশ মিত্র ও দুলাল চন্দ্র ঘোষ (মিণ্টান্ন বিক্রেতা)। একথা বলেন স্বয়ং ৯০ বছরের কানাইবাবু। তারপরের ঘটনা আমাদের প্রায় সকলেরই জানা। ৮ই এপ্রিল, ১৯২৯ সাল। নয়াদিল্লী অ্যাসেম্বলী হাউসে কুখ্যাত 'ট্রেড ডিসপিউট' বিল আলোচিত হচ্ছে। যে মুহূর্তে সভাপতি বিলটিকে গৃহীত হল বলে ঘোষণা করলেন সঙ্গে সঙ্গে দর্শক গ্যালারী থেকে এক বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন বোমা হলের মেঝেতে ভগৎ সিং ছুঁড়লেন। কয়েক সেকেণ্ড পরেই অনুরূপ আর একটি বোমা ছুঁড়লেন বটুকেশ্বর দত্ত। দু'জনে পলায়নের কোন চেষ্টা না করে বীরের মত ধরা দিলেন ইংরেজ পুলিশের হাতে। ফল দু'জনেরই মৃত্যু। তবে সেই মৃত্যু ছিল তাঁদের

পায়ের ভৃত্য। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বটুকেশ্বরের খুড়তুতো দাদা শ্যামাপদ দত্ত তখনকার দিনে কলকাতা পুলিশের একজন সাব্-ইনসপেক্টর ছিলেন।*

বটুকেশ্বর দত্ত প্রসঙ্গে অমিয় ঘোষের 'বিপ্লবী হরেন্দ্রনাথ ঘোষ' প্রবন্ধটিও লক্ষ্য করার মত। তিনি লিখেছেন—'হাওড়ার অমৃত পাইন লেনের বাসিন্দা বিপ্লবী গণেশ মিত্র 'সেবা সংঘ' ও 'হাওড়া ভলান্টিয়ার্স'' সংস্থার সদস্য সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় (সোনা), জীবন মাইতি (কম্যুনিষ্ট নেতা) প্রমুখ হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এক সময়ে বটুকেশ্বর দত্ত বেশ কিছুদিন হাওড়ায় আত্মগোপন করেছিলেন। বর্তমান নেতাজী সুভাষ রোড ও চিন্তামণি দে লেনের সংযোগস্থলে (পুরাতন খুরুট রোড) যে তিনতলা পুরানো বাড়িটি যা 'হরি বিরাজ আশ্রম' হোটেল বলে পরিচিত সে বাড়িটির উপরতলায় তিনি ছিলেন। স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীরা তাঁকে দেখাশোনা করতেন।'

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী ছিলেন বিপ্লবী যতীন দাস। চৌষট্টি দিন অনশন করে ১৯২৯, ১৩ই সেপ্টেম্বর লাহোর জেলে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর শবদেহ হাওড়া স্টেশনে পৌঁছলে প্রথমে হাওড়া টাউন হলে রেখে হাওড়াবাসীর সঙ্গে জেলার বিপ্লবী কর্মীরাও শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান।

১৯৩০ সাল। ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামে ঘটল এক হাড় কাঁপানো ঘটনা। সূর্য সেনের (মাষ্টারদা) নেতৃত্বে ইংরেজ সরকারের চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করলেন বিপ্লবীরা। মাষ্টারদার সঙ্গে উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে ছিলেন অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী, লোকনাথ বল, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার সহ আরও অনেকে। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর বিপ্লবীরা জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে বন্দুকের লড়াই চালিয়ে যান। সেখান থেকে মাষ্টারদা ইংরেজ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে আসেন হাওড়া শহরে। প্রথমে কিছুদিন বাউড়িয়া চটকলে শ্রমিকের কাজ করেন—পরে শালকিয়ায় বাবুডাঙ্গার মনা খাঁর বাড়ি এবং বেলুড়ে একটি ইঁটখোলায়ও আত্মগোপন করে ছিলেন।

এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করার মত। 'আত্মোন্নতি সমিতি'র পরিচালক বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলী প্রায়ই হাওড়ায় আসতেন তাঁর মামা হাওড়া কংগ্রেসের সভাপতি কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। কারণ ছিল একটাই—কিছু অর্থ সাহায্য চাই। হাওড়াতে বিপিনবাবুর উৎসাহে 'আত্মোন্নতি সমিতির' (অনুশীলন সমিতি) শাখা সংগঠন বেশ ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্যায়ামচর্চা ছাড়াও সবকটি কেন্দ্রেই স্বদেশী আন্দোলনের জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের ট্রেনিং দেওয়া হত। বিপিনচন্দ্র তাঁর মামা শরৎচন্দ্রের কাছে সমিতির কাজের জন্য অর্থ সাহায্য পেলেও শরৎচন্দ্র কিন্তু জেলার সব দলের বিপ্লবীদের কাজেই উৎসাহ দিতেন সাধ্য মত অর্থ দিয়ে। বিপিন-চন্দ্রের হাওড়ায় আনাগোনার সুবাদে শিবপুরেও অনুশীলন সমিতির শাখা গড়ে

---

* বটুকেশ্বরের শালিখায় বাস ও ভকৎ সিংয়ের সঙ্গে বিপ্লবী কাজের এই মূল্যবান তথ্যটি দিয়ে হাওড়ার বিপ্লবী আন্দোলনকে বহুল পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে সাহায্য করেছেন তদানীন্তন স্বদেশকর্মী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী শালিখা দেশবন্ধু ব্যায়াম সমিতির অন্যতম সংগঠক নরসিংহ ভকৎ।

ওঠে। শিবপুরে বিপ্লবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ডাঃ বেণী দত্ত, অগম দত্ত, জীবন মাইতি, প্রবোধ বসু প্রমুখ। সাঁত্রাগাছির ভোলানাথ দাস (আর এস পি); মধ্য হাওড়ার ছিলেন—গণেশ মিত্র ও তাঁর ভাই নিমাই মিত্র, কানাইলাল ব্যানার্জী, বলাই সিংহ, কার্তিক দত্ত, দানু বসু, জ্ঞান ব্যানার্জী ও দুলালচন্দ্র ঘোষ। মহিলাদের মধ্যে ছিলেন লাহোর প্রবাসী খ্যাতনাম্নী সুনীতি দেবীর কন্যা মায়া মুখার্জী। বহুবাজারে এক বাড়িতে ডিনামাইটসহ ধরা পড়েন। নিমাইবাবু ও মায়াদেবী পুলিশ কর্তৃক অকথ্যভাবে অত্যাচারিত হন—ফলে নিমাইবাবু পাগল হয়ে যান। আর এক উল্লেখযোগ্য বিপ্লবী ছিলেন পুলিন রায়। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় পাঁচ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

এই ১৯৩০ সালেই ১৬ই মে হাওড়া বাজে শিবপুরের ৫১নং বাড়িতে পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টার ফণীন্দ্রমোহন দাশগুপ্তের বাড়িতে শেষ রাত্রিতে জানালা দিয়ে একটি রাসায়নিক বোমা ছোঁড়া হয়েছিল। এই কাজে লিপ্ত ছিলেন শিবপুর কালী ব্যানার্জী লেনের দুই যুবক যথা মনোমোহন অধিকারী ও ভবানন্দ ব্যানার্জী। বিপ্লবী হৃষিকেশ দত্ত একটি নতুন ফরমুলায় বিস্ফোরক বোমা বানিয়েছিলেন পুলিশ খতম করার জন্য। সেটি পরীক্ষা করার ভার পড়েছিল ভবানন্দ ও মনোমোহনের ওপর। উভয়েই পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। হাওড়া ম্যাজিস্ট্রেটের ট্রাইবুন্যালে উভয়েই স্বীকার করেন যে তাঁরাই এই বোমা ছুঁড়েছিলেন। বিচারে তাঁরা দণ্ডিত হন। দণ্ডিত আসামীরা পরে কলকাতা হাইকোর্টে আপীল করে প্রখ্যাত আইনবিদ সন্তোষ কুমার বসুর মাধ্যমে। আপীলে তাঁরা বলেন যে পুলিশী অত্যাচারে তাঁরা স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য হন। স্বেচ্ছায় তাঁরা স্বীকারোক্তি করেননি। কিন্তু হাইকোর্ট তাঁদের ঐ বক্তব্য মানেননি। পরন্তু হাইকোর্ট রায় দেন—'দণ্ডিত আসামীদের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা ছিল মারাত্মক ধরনের বিস্ফোরক পদার্থ দিয়ে নতুন ধরনের বোমা তৈরী করে সেই বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পুলিশ খতম করা। অপরাধের গুরুত্ব বিচার করে ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড মোটেই গুরুদণ্ড নয়।'[১১]

পরিশেষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেই এই অধ্যায়টির ইতি টানা হবে। আগেই বলা হয়েছে, হিন্দুস্থান সোসালিষ্ট রিপাবলিকান পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন চন্দ্রশেখর আজাদ ও ভগৎ সিং প্রমুখ। জ্ঞানী জৈল সিং ঐ দলের একজন সদস্য ছিলেন। ভগৎ সিং-এর ফাঁসির পর পুলিশের গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য তিনি কলকাতায় আসেন। সেই সময় মধ্য হাওড়ার বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জী লেনের ৪৩/১নং বাড়িতে তাঁকে গোপনে রাখার ভার পড়েছিল বিপ্লবী কানাইলাল ব্যানার্জীর উপর। কানাইবাবুরা জৈল সিংহকে এক পশ্চিমা দারোয়ানের হাতে লেট্টি বা চাপাটি তৈরী করে দু'রাত আপ্যায়িত করেছিলেন। জৈল সিং রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন হাওড়া জেলা বিপ্লবী পরিষদের পক্ষ থেকে কানাইবাবু রাষ্ট্রপতির আমন্ত্রণে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দিল্লী যান ১৯৮২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর।* সাক্ষাতে পুরনো দিনের সেই

* সেই আমন্ত্রণপত্র দেখার সৌভাগ্য হয়েছে।

কথা জানালে রাষ্ট্রপতি কানাইবাবুকে আলিঙ্গন করেন এবং জিজ্ঞেস করেন তাঁর কি চাওয়ার আছে। কানাইবাবু বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যাতে শেষ বয়সে ভারতদর্শন রেলযোগে বিনা ভাড়ায় করতে পারেন তার জন্য ফ্রি পাশের ব্যবস্থা করতে এক লিখিত আবেদন জানান। অত্যন্ত সুখের কথা পরবর্তীকালে সেই ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার চালু করেছেন। আজ স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যে সারা দেশে ঐ সুযোগ লাভ করেছেন এটা কানাইবাবুর প্রচেষ্টায় ও রাষ্ট্রপতি জৈল সিং-এর সদিচ্ছাতেই সম্ভব হয়েছে বলে কানাইবাবুর দাবি।

এক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণীয় যে শিবপুর, মধ্য হাওড়া, ডোমজুড় ও শালকিয়ায় বিপ্লবী আন্দোলনের বিভিন্ন কেন্দ্র ও ক্ষেত্র হলেও বালিতে কিন্তু অগ্নিযুগে বা তার পরেও প্রথম শ্রেণীর বিপ্লবী গ্রাম থেকে বেরিয়ে আসেনি। তবে বালি সে যুগে অনেক আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়ে, অসুস্থদের সেবা করে ও গোপন সংবাদ আদান-প্রদান করে বিপ্লবীদের কাজে সাহায্য করেছে তদানীন্তন বালির যুব সমাজ সম্বন্ধে সেটা বলতেই হবে। এই রকম একটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল মোহিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে—যার নাম ছিল 'বাণী মন্দির'। এই কাজে উল্লেখযোগ্য সাহায্যকারীরা ছিলেন রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ দাস, বীরেন দত্ত, শৈলেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় ও সতীশ চক্রবর্তী। এর কারণ ব্যাখ্যা করে 'বালি সাধারণী সভা' তার শতবার্ষিক স্মারক গ্রন্থে লিখেছে—'চাকুরীজীবী নিম্নবিত্ত পরিবারের সংখ্যা বালিতে অধিক। বে-পরোয়া হইয়া আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়া সেজন্য অধিকাংশ লোকের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।' মন্তব্যটি খুবই ভেবে দেখার মত।

ভারতের মুক্তি আন্দোলনে হাওড়া জেলার বিপ্লবাত্মক ভূমিকা স্মরণ করাব মত। দেশ আজ স্বাধীন। ভারত মাতার শৃংখল মোচনে সারা দেশের সঙ্গে হাওড়াও যে তার সাধ্যমত অংশ নিতে পেরেছে এতে হাওড়াবাসী মাত্রই গৌরবান্বিত। সে সব মৃত্যুঞ্জয়ী বীররা আজ হয়তো অনেকেই আমাদের মধ্যে নেই। তবে যাঁরাও বা আছেন তাঁদেরও আমরা ভুলতে বসেছি—বর্তমান অত্যুগ্র জাগতিক সুখভোগের মধ্যে।

---

১. ৪. সপ্তশিখা—গোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়।

২, ৩, ১১. আদালতের আঙিনায়—চিন্ময় চৌধুরী।

৫, ৬. স্মারক গ্রন্থ—বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র মিত্র (হাবু)—পাঁচুগোপাল রায়

৭. স্বাধীনতা সংগ্রামে হাওড়া জেলার সেনানীবৃন্দ—সম্পাদনা প্রফুল্ল দাসগুপ্ত।

৮. শতবর্ষের আলোকে—হাওড়া জেলা পরিষদ ১৯৮৬।

৯. স্বাধীনতা সংগ্রাম—অমলেশ ত্রিপাঠি, বিপান চন্দ্র ও বরুণ দে।

১০. স্বাধীনতা আন্দোলনে আমাদের জেলা—দুঃখহরণ ঠাকুর চক্রবর্তী—"সান্ধ্য বিবরণ" দৈনিক পত্রিকা—হাওড়া

অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন

ইতিপূর্বেই আমরা দেখেছি যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে হাওড়া জেলার কংগ্রেস কর্মীদের তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কিভাবে সম্পর্ক স্থাপন হল। আন্দোলনের মধ্য দিয়েই যেমন সংগঠন মজবুত হয় তেমনি মহৎ ব্যক্তিত্বের ছোঁয়াচ সংগঠনে নতুন মাত্রা সংযোজন করে। বলা বাহুল্য, হাওড়া জেলার কংগ্রেস কর্মী তথা জেলাবাসীর সঙ্গে দেশবন্ধুর সেই সম্পর্ক আরও অন্তরঙ্গতায় পর্যবসিত হল তদানীন্তন হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে।

১৯২৪ সাল। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির এই নির্বাচনে কংগ্রেস রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রথম অবতীর্ণ হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে সেই নির্বাচন পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছিলেন। এজন্য দেশবন্ধুকে হাওড়া শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে বক্তৃতা করতে হয়েছিল—করতে হয়েছিল অনেক নাম করা বাড়িতে ঘরোয়া বৈঠক। হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটি ইতিমধ্যেই (১৯২১) গঠিত হয়েছে।[১] সেই কমিটির প্রথম সভাপতি ছিলেন মধ্য হাওড়ার নামী বাসিন্দা অমৃতলাল পাইন (ব্যবহারজীবী বরদাপ্রসন্ন পাইনের পিতা) এবং জেলা সম্পাদক ছিলেন রামকৃষ্ণপুরের প্রাচীন বাসিন্দা বীরেন বসু। শালকিয়া অঞ্চলের কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয় ১৯২৬-২৭ সালে। এই কমিটির তালিকা পূর্ণাকারে যোগাড় করা সম্ভব হয়নি। তবে প্রবীণ রাজনৈতিক কর্মী ও 'হাওড়া বার্তা' সম্পাদক ডাঃ শম্ভুচরণ পালের স্মৃতিচারণে জানা যায় যে শালকিয়া আঞ্চলিক কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ছিলেন খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী (ভাইস চেয়ারম্যান), সম্পাদক ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, সহঃ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ—ডাঃ শম্ভুচরণ পাল। উল্লেখে অত্যুক্তি হবে না যে ১৯২৪ সালের হাওড়া পৌর নির্বাচনে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে কংগ্রেস পৌর বোর্ড লাভ না করলেও তিনি জেলার কংগ্রেস কর্মীদের মনে স্বদেশী আন্দোলনের নতুন জোয়ার বহাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তথাপি এ কথা অস্বীকার করার উপায় ছিল না যে তৎকালীন হাওড়া কংগ্রেসের কর্তৃত্ব সমাজের কতিপয় বিত্তশালী শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড এওয়ার্ড অনুযায়ী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও গান্ধীজীর সঙ্গে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। তাতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেসের মধ্যেই 'স্বরাজ্য দল' নামে একটি উপদল গড়ে উঠেছিল। স্মরণ করা যেতে পারে যে স্বরাজ্য দল সিন্ধু ও বঙ্গদেশ ছাড়া তদানীন্তন ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল। হাওড়া জেলায় 'স্বরাজ্য

দলে'র প্রভাবই সর্বাধিক ছিল। কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জেলা কমিটির সভাপতি ছিলেন।[২] কিন্তু চিত্তরঞ্জনের ১৯২৫ সালে আকস্মিক মৃত্যুতে আবার সবাই কংগ্রেসের মূলস্রোতে ফিরে আসেন। মধ্য হাওড়ার পঞ্চাননতলা রোডের নির্মল মিত্র ও শৈলেন মিত্র (উভয়েই ব্যবহারজীবী) ছিলেন দেশবন্ধুর ডান হাত।

১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন ১৯২২ সালে প্রত্যাহৃত হওয়ায় সারা দেশের ন্যায় হাওড়া জেলায়ও কর্মীরা যেন ঝিমিয়ে পড়েন। কিন্তু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অমৃতলাল পাইনের পুত্র বরদা প্রসন্ন পাইন জেলা কংগ্রেসে সম্ভাবনাময় নতুন রক্ত সঞ্চালনের দিকে দৃষ্টি দিতে চাইলেন। এই সময়েই বিদেশ প্রত্যাগত বিশেষ কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষিত যুবক হরেন্দ্র নাথ ঘোষ দেশমাতৃকার সেবায় ইংল্যাণ্ড থেকে দেশে ফিরে এসেছেন। ফলে হরেন্দ্রনাথকেই জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক করা হলো ১৯২৬-এ।

অসহযোগ আন্দোলনে হাওড়া জেলার গ্রামের মানুষও পর্যন্ত অংশ গ্রহণ করেন। 'স্বাধীনতা আন্দোলনে আমাদের জেলা' প্রবন্ধে দুঃখহরণ ঠাকুর চক্রবর্তী লিখছেন—১৯২১ খ্রীঃ ঝোড়হাটের পুলিন ব্যানার্জী সাঁকরাইল থানার মধ্যে প্রথম অসহযোগ আন্দোলন করে জেলে যান। তিনি যেমন ঐ থানার মধ্যে প্রথম সত্যাগ্রহী, তেমন আলিপুর কোর্টের আইনজীবীদের মধ্যেও প্রথম সত্যাগ্রহী। শুধু তাই নয়—তিনি আরও লিখেছেন—হাওড়া জেলার প্রথম মহিলা সত্যাগ্রহী হলেন তাঁরই স্ত্রী করুণাময়ী দেবী।

১৯২১ সালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে বালি গ্রামের যুবকরা ঝাঁপিয়ে পড়লেও—এর মূলে ছিলেন ঐ গ্রামেরই এক গঠনকর্মী—তাঁর নাম ছিল নলিন চন্দ্র মিশ্র। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় নলিন চন্দ্রের উদ্যোগে বালি গ্রামে এক বিরাট স্বদেশী সভা করা হয়েছিল। তাতে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বাগ্মী বিপিন চন্দ্র পাল ও হিতবাদী সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ সর্বপ্রথম ঐ গ্রামে স্বদেশী বীজ বপন করেন।[৩] বালির যুবকদের নিয়ে নলিনবাবু স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সমাজসেবার কাজও সমান ভাবে চালিয়ে যেতেন। তাই গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে বালির যুব সমাজ তাঁর নেতৃত্বে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ছাত্ররা দলে দলে আন্দোলনে যোগ দিল। চরকা ও তকলি কাটা চালু হল ঘরে ঘরে। সঙ্গে চলল মাদক দ্রব্য ও বিলাতী বস্ত্র বর্জনের আন্দোলন। রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ যুবকবৃন্দের নেতৃত্বে গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে গান্ধীজীর অসহযোগের বাণী পৌঁছে দেবার কাজ চলতে লাগলো। তারপর লবণ আইন ভঙ্গে গান্ধীজীর 'ডাণ্ডি অভিযান' শুরু হলে বালিতেও সেই আন্দোলনের ঢেউ লাগলো। তদানীন্তন ছাত্র নেতা রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (আইনজীবী) নেতৃত্বে স্কুল-কলেজের ছাত্ররা আন্দোলন করল। গ্রেপ্তার হলেন রণজিৎ বাবু ও শতাধিক ছাত্ররা। মদের দোকানে পিকেটিং ও বিলেতী বস্ত্র বর্জনের দাবিতে আন্দোলন

করতে গিয়ে পুলিশের হাতে নিগৃহীত ও দণ্ডিত হলেন বরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারক বন্দ্যোপাধ্যায়, বংশীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিশির গাঙ্গুলী এবং পতিত পাবন পাঠক প্রমুখ। বালির কংগ্রেস কর্মীরা কেবল বিদেশী দ্রব্য বর্জনের শ্লোগান দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। গান্ধীজী 'ডাণ্ডী অভিযানে' গ্রেপ্তার হলে জাতীয়নেতা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রতিষ্ঠা করলেন 'Buy Swadeshi' লীগ। বালির কর্মীরা সেই আদলে এখানে প্রতিষ্ঠা করলেন—'স্বদেশী জিনিষ কেনবার সমিতি।' যার সভাপতি ছিলেন পাঠকপাড়ার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (নন্তুবাবু) এবং সম্পাদক ছিলেন মোহিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।[8] এ ছাড়া ১৯২১ খ্রীঃ ২৪শে ডিসেম্বর ব্রিটিশ যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসের কলকাতায় আসার দিন ছিল। সেদিন কলকাতার সঙ্গে হাওড়ায়ও হরতাল পালিত হয়। জনতার রোষ এত তুঙ্গে উঠেছিল যে সেদিন পুলিশকে গুলি চালাতেও হয়।

হরেন্দ্রনাথের নতুন নেতৃত্বে হাওড়া জেলা কংগ্রেস পেল নতুন শক্তি। কারণ বিলেতে থাকাকালীন হরেন্দ্রনাথ একাধারে যেমন ব্রিটিশ শ্রমিক দলের সংস্পর্শে থেকে শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েছিলেন তেমনি কম্যুনিষ্ট শ্রমিক নেতা রজনী পাম দত্তের সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয়েও পরামর্শ করতেন। ফলে তিনি কংগ্রেসের কাজকে গ্রামে ছড়িয়ে দেবার জন্য কংগ্রেস নেতা বিপিন বসু, গুরুদাস দত্ত (বেণী দত্তের ছোট ভাই) ও ননী ভট্টাচার্য প্রমুখ কয়েকজনকে নিয়ে হাওড়ার গ্রামে (লণ্ঠন-লেকচারের মাধ্যমে) প্রচার কার্যে ব্রতী হলেন। গ্রামের লোকের উৎসাহ যেন তাঁদেরকে আরও বেশি করে উৎসাহিত করতে থাকে।

কংগ্রেসের পতাকাতলে যুবশক্তিকে সংগঠিত করে তোলার জন্য হরেন্দ্রনাথ তাঁর দাদা সুরেন্দ্রনাথ, কংগ্রেস নেতা অজিত মল্লিক, হাওড়া কোর্টের বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী ধীরেন সেন, সন্তোষ ঘোষাল (বাগনান) ও গৌরমোহন রায় প্রমুখের সহযোগিতায়, 'হাওড়া সেবা সংঘ' গড়ে তুললেন। উদ্দেশ্য, ব্যায়াম চর্চার মাধ্যমে যুবকদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করা। সামরিক কায়দায় বাদ্যযন্ত্র শিক্ষার জন্য তিনি 'হাওড়া ভলাণ্টিয়াস'' নামে একটি অসামরিক ব্যাণ্ড পার্টিও তৈরী করেছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই যে হাওড়া জেলায় একই সঙ্গে বিপ্লবাত্মক ও অহিংসা আন্দোলন পাশাপাশি সমান তালে চলেছে।

১৯২৮ সালে সারা ভারতে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয় তাতে হাওড়া জেলাও পেছিয়ে ছিল না। হরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে পথে পথে 'কালো পতাকা' নিয়ে কংগ্রেস কর্মীরা শোভাযাত্রা করেছিল। এর পরের ঘটনাটি আরও উল্লেখযোগ্য। ঐ সালেই কলকাতার পার্কসার্কাস ময়দানে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসছে। সভাপতি (তখন অবশ্য বলা হত রাষ্ট্রপতি) হয়ে আসছেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু। হাওড়া স্টেশন থেকে কংগ্রেস সভাপতিকে রাষ্ট্রীয় সভাপতির মর্যাদায় শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হবে পার্কসার্কাস ময়দানে।

তারজন্য বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে শিক্ষিত করে তোলা হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবকদের সর্বাধিনায়ক হয়েছেন স্বয়ং সুভাষচন্দ্র বসু। হাওড়া জেলার হাজার হাজার যুবক সেদিনের ঐ শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করে এবং শৃঙ্খলাবোধের উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ব্রিটিশ শাসকদের সম্ভ্রম কেড়ে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। পরদিন সাম্রাজ্যবাদী শাসকের তদানীন্তন মুখপত্র The Statesman পত্রিকাও সুভাষচন্দ্রের সাংগঠনিক প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসায় ছিল পঞ্চমুখ। সেদিনের এই বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সাজাবার দায়িত্ব পেয়েছিলেন হাওড়া জেলার 'উনসানি গ্রামে'র কংগ্রেস কর্মী নারায়ণ দাস দে।[৫]

এই ১৯২৮ সালের ২৮শে মার্চ হাওড়ার বামুনগাছি রেলের ওয়ার্কশপে পুলিশের গুলি চালনায় তিনজন শ্রমিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিরাট উত্তেজনা। তার জন্য রেল শ্রমিকদের মধ্যে বিরাট অশান্তি ছড়িয়ে পড়লো অণ্ডাল, আসানসোল ও অন্যান্য বড় রেল স্টেশনে। বিভাগীয় তদন্তে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষই দোষী সাব্যস্ত হল।

১৯২৯ সালে লাহোর-কংগ্রেসের অধিবেশন হয় কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে। এই অধিবেশনে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করল। দিকে দিকে নতুন করে আবার আন্দোলনের ঢেউ উঠলো। ১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ গান্ধীজীর নেতৃত্বে লবণ সত্যাগ্রহ শুরু হল ডাণ্ডি অভিযানের মাধ্যমে। সঙ্গে রইল বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও মদের দোকানের সামনে পিকেটিং। হাওড়া জেলার কংগ্রেস কর্মীরাও বসে রইলেন না।

হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার শিবগঞ্জে নদীর মোহনায় লবণ তৈরী করে ইংরেজের লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কংগ্রেস কর্মীরা। হাওড়া শহর থেকে তিনটি দল তিনদিন ধরে যাত্রা করলো শিবগঞ্জ অভিমুখে। 'প্রথম দলটি ৪ঠা এপ্রিল পদব্রজে যাত্রা করল অধ্যাপক বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে। এই দলে ছিলেন সাতাশ জন সত্যাগ্রহী। পরের দিন ৫ই এপ্রিল দ্বিতীয় দলটি পদব্রজে যাত্রা করল তদানীন্তন পৌর কমিশনার বিজয়কৃষ্ণ হাজরার নেতৃত্বে। এ দলে ছিলেন সাঁইত্রিশ জন সত্যাগ্রহী। সর্বশেষ দলটি পদব্রজে যাত্রা করল কানাইলাল ঘোষের (এডভোকেট) নায়কত্বে।[৬] এই অভিযাত্রীরা বিভিন্ন গ্রামের মধ্য দিয়ে যখনই অগ্রসর হতেন তখনই গ্রামবাসীরা এসে মালা, চন্দন ও শংখধ্বনি করে তাঁদের যাত্রার সাফল্য কামনা করতেন। যতই অভিযাত্রীরা এগুতে থাকতেন ততই শোভাযাত্রীর সংখ্যাও বেড়ে যেত। শিবগঞ্জ, নুন্টিয়ার হাট, বাক্সীর হাট, শশাটি, কমলপুর, শ্যামপুর প্রভৃতি স্থানে শত শত সত্যাগ্রহী পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন। খালনার বিশিষ্ট সত্যাগ্রহী ছিলেন উমাশংকর রায় ও দুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

অধ্যাপক বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে যে সব সত্যাগ্রহীরা শিবগঞ্জে গিয়েছিলেন সেদিন মুগকল্যাণের পল্লীভারতীতে তাঁদেরকে সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়। পাঠাগারের কর্মীরা সত্যাগ্রহে শরিক হওয়ায় পাঠাগারের দরজায় পড়ল ইংরেজ পুলিশের তালা। পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে মুগকল্যাণ ও বাঁটুল গ্রামের ভূজঙ্গ পাণ্ডে, অনঙ্গমোহন

পাণ্ডে, ক্ষিতীশ দত্ত, কানাই সামন্তসহ তরেণ ঘোষ, গণেশ দাঁ, মণি বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাই দে, ফণী মাঝি, বিজনবিহারী দত্ত প্রমুখ কারাদণ্ড ভোগ করেন। পল্লীভারতী পাঠাগারের তদানীন্তন সম্পাদক ডাঃ রমেশচন্দ্র পালের নেতৃত্বে ঐ সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

১৯৩১ সালে ১৬ই মার্চ তারিখে ঐ এলাকার রাজবন্দীরা জেল থেকে মুক্তি পেলে গ্রামের লোকেরা তাঁদেরকে যে আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা জানিয়েছিলেন তারও সংবাদ তদানীন্তন 'বঙ্গবাণী' দৈনিক পত্রিকায় এইভাবে লিখেছিলেন—'স্বেচ্ছাসেবকগণ দমদম জেল থেকে মুক্ত হইয়া গত ১১ই মার্চ এখানে পৌঁছিয়াছেন।। ১। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চক্রবর্তী ২। সুকুমার মিত্র ৩। গিরিজা পাল ৪। বিমল পাল ৫। বৈদ্যনাথ ঘোষ ৬। তরেণ ঘোষ ৭। দুর্গা চক্রবর্তী ৮। প্রবোধ দাস ৯। শ্রীদাম ভৌমিক ১০। সত্য গিরি ১১। ফণী মাজি ১২। গণেশ দাঁ ১৩। ধীরেন মিত্র ১৪। কানাই সামন্ত ১৫। অনঙ্গ পাণ্ডে ১৬। কার্তিক দে ১৭। বনমালী ঘোষ ১৮। বিজনবিহারী দত্ত ১৯। জলধর রায়।
নারী সমিতি ও জনসাধারণ বিশেষভাবে ইঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করেন।'

শিবগঞ্জের নদীর ধারে তাঁবু খাটিয়ে সত্যাগ্রহীরা নুন তৈরী শুরু করলে গ্রামের লোকের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। ঐ নুন আবার গ্রামবাসীর মধ্যে বিক্রি ক'রে গান্ধীজীর আইন অমান্যের বাণী তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। পুলিশ অবশ্য নুন তৈরীর কাজে বাধা দেয়নি। সত্যাগ্রহীরা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে কি রকম সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন তার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায় মুগকল্যাণের 'পল্লীভারতী গ্রন্থাগারের' শতবর্ষ স্মরণিকা পাঠে। 'স্মরণিকাটি' লিখছে—'হাওড়ার জননেতা অধ্যাপক (শেষ জীবনে অধ্যক্ষ হন) বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে যেসব সত্যাগ্রহী পদব্রজে শিবগঞ্জ গিয়েছিলেন লবণ সত্যাগ্রহ করতে, গ্রামবাসী তাঁদের সেদিন পল্লীভারতী ভবনে বিপুল সম্বর্ধনা দিয়েছিলেন। এই উপলক্ষে এক বিশাল জনসমাবেশ হয় ও স্থানীয় এলাকায় বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।'[৭]

এরপর শুরু হল বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও মদের দোকানে পিকেটিং। কর্মীদের ট্রেনিং দেবার জন্য শহরে ও গ্রামে শিক্ষা-কেন্দ্র খোলা হল। বালি, বেলুড়, শালকিয়া, হাওড়া ময়দান হয়ে আমতলা প্রভৃতি স্থানে মদের দোকানে পিকেটিং শুরু হল। গ্রামে বাগনান, উলুবেড়িয়া, বাকসী, বাঙ্গালপুর, আমতা, মাজু, বড়গাছিয়া, ডোমজুড় প্রভৃতি স্থানেও গাঁজা ও মদের দোকানে পিকেটিং চলতে থাকে।

১৯৩০ সালের ২৩শে এপ্রিল মঙ্গলবার হাওড়া হাটে বিদেশী বস্ত্র বিক্রির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালে পুলিশ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশ লাঠি চালিয়ে সত্যাগ্রহীদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে দলের নায়ক অধ্যাপক বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্যকে গ্রেপ্তার করে এবং বাকিরা লাঠির আঘাতে আহত হন। এঁদের মধ্যে পরবর্তীকালে যাঁরা বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বা আছেন বিপিনবিহারী বসু, কার্তিক চন্দ্র দত্ত (চেয়ারম্যান), বৃন্দাবন বসু, ভোলানাথ চ্যাটার্জী, শান্তি দাশগুপ্ত (অধ্যক্ষ),

মনোমোহন রায় ও সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। বালিতে ছিলেন অরুণ ব্যানার্জী, তারক ব্যানার্জী, শিশির গাঙ্গুলী, বরুণ ব্যানার্জী, বংশীগোপাল ব্যানার্জী, রতনমণি চ্যাটার্জী ও মোহিত ব্যানার্জী প্রমুখ। শালকিয়ার ছিলেন ইন্দুভূষণ মুখার্জী, শংকরলাল মুখার্জী, পুণ্য মিত্র প্রমুখ। রামতলার শংকর মঠেও পুলিশ জহর কুণ্ডুসহ ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করে। মধ্য হাওড়ার বিশিষ্ট সমাজসেবী বনবিহারী বসুর অনুজ বিপিনবিহারী বসু ছিলেন অন্যতম সত্যাগ্রহী। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম' গানটি সত্যাগ্রহীদের দিত নতুন প্রেরণা। এই গানটি গাইবার অপরাধে তাঁকে একাধিকবার কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। এর প্রতিবাদে হাওড়া পৌরসভার তদানীন্তন চেয়ারম্যান বরদাপ্রসন্ন পাইন, কংগ্রেস নেতা প্রবোধচন্দ্র বসু ও ভোলানাথ রায়ের নেতৃত্বে হাওড়া কোর্ট ও জেল চত্বরে বড় প্রতিবাদ মিছিলও বার করা হয়।

এদিকে ১৯৩০ সালের মে মাসে গান্ধীজীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এই সংবাদে সারা ভারতে হরতাল আহ্বান করা হয়। হাওড়া জেলা তাতে অংশ গ্রহণ করে তদানীন্তন মার্টিন রেল বন্ধ করে দেয় সত্যাগ্রহীরা। ফলে পুলিশের ব্যাপক সন্ত্রাস ও ধরপাকড় শুরু হয়। ধরা পড়লেন স্বয়ং হরেন্দ্রনাথ ঘোষ। শাস্তি হল পনের মাসের জন্য কারাদণ্ড। পুলিশ বেলিলিয়াস পার্কের ট্রেনিং ক্যাম্পে হানা দিয়ে নেতা সুধাংশু চ্যাটার্জী সহ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। সাঁত্রাগাছি ও শঙ্কর মঠের ক্যাম্পের সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে কেদারনাথ ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক মন্মথনাথ দাস সহ হরিপদ রায়চৌধুরী, সতীশচন্দ্র মিত্র, প্রফুল্ল চৌধুরী ও অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।[৮]

এই সময় উলুবেড়িয়াতে ছাত্র ও যুবকদের নেতৃত্ব দিতে দেখা যায় ফণীন্দ্রনাথ হাজরা ও বিভূতি (নানু) ঘোষকে। গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ১৯৩০ সালের ৬ই মে এখানে হরতাল পালিত হয়। বিদেশী বর্জন, উলুবেড়িয়া কোর্টে বিক্ষোভ প্রদর্শন, আবগারি ও মদের দোকানে সত্যাগ্রহ, স্বাধীনতা দিবস (২৬শে জানুয়ারী) পালন প্রভৃতি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার অপরাধে সন্তোষ ঘোষাল, সুনীল (পেনা) ঘোষাল, বিভূতি (নানু) ঘোষ, অবনী বসু, তারাপদ (পচা) দাস, সুনীল (নেনু) মুখার্জী, সরোজ বসু, অরবিন্দ গায়েন, অমূল্য সাহা, শরৎ (নন্দ) দে, কার্তিক অধিকারী, ফণীন্দ্র, ভূজেন্দ্র ও জীতেন্দ্র হাজরা ভ্রাতৃত্রয়সহ সবাই গ্রেপ্তার হন। আন্দোলনের নেতা হিসাবে বিভূতিভূষণ আচার্যকে চিহ্নিত করে সরকার তাঁর ওপর হাওড়া জেলা ত্যাগের আদেশ জারী করেন। এই আদেশ অমান্য করায় শীঘ্রই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। যা হোক, কোন কারণে আটক ব্যক্তিদের কয়েকজনকে পুলিশ মুক্তি দিলেও সুনীল ঘোষাল, বিভূতি আচার্য, ফণীন্দ্রনাথ হাজরা, বিভূতি ঘোষ, তারাপদ দাস, কার্তিক অধিকারী, অবনী বসু, জীতেন্দ্রনাথ হাজরা প্রমুখকে মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। এঁদের কেউ কেউ আবার একাধিকবার গ্রেপ্তার ও দণ্ডিত হয়েছিলেন।

গ্রামাঞ্চলেও পিকেটিং সমান তালে চলতে থাকে। আমতায় মদের দোকানে

পিকেটিং হয়। পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন বুদ্ধদেব মুখার্জী, সমর মুখার্জী (প্রাক্তন সাংসদ), শংকর চ্যাটার্জী প্রমুখ। এই আন্দোলনে জয়পুরের মুরারী মোহন, অনাথ কুমার মণ্ডল, সিয়াগোড়ীর কানাইলাল রায়, আমতার নবীন কুমার চক্রবর্তী ও সারদার শরৎ চন্দ্র ওঝা এবং খালনার ঋষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ও যোগ দেন।

উলুবেড়িয়ার বিশিষ্ট আইনজীবী অমৃতলাল হাজরা তাঁর বাড়ীর বৈঠকখানায় কয়েকটি তাঁত বসিয়ে ছেলে ও বৌমাদের দিয়ে চরকা ও তকলিতে সুতো কেটে কাপড়, গামছা ও তোয়ালে ইত্যাদি তৈরী করেন। তাঁর ইঞ্জিনিয়ার ছেলে মনীন্দ্র নাথ হাজরা জেলা বোর্ডের সরকারী চাকরী ছেড়ে নিজের শোয়ার ঘরে তাঁত বসিয়ে কাপড় বুনতে থাকেন। নিজেদের তৈরী বস্ত্রাদি বিভিন্ন গ্রামে নামমাত্র মূল্যে ফেরি করতেন। অমৃতবাবুর বড় ছেলে লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক নগেন্দ্রনাথ হাজরা তকলি দিয়ে সুতো কাটতেন ও বিদেশী বস্ত্র বর্জন করে নিজেদের তৈরী জামা-কাপড় পরতেন। নানু বাবু একবার আণ্ডার গ্রাউণ্ডে চলে গেলে ইংরেজ সরকার তাঁর মাথার জন্য সাড়ে সাত হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন।

বাইনানে পিকেটিং হয় বিভূতি ঘোষের (মোক্তার) নেতৃত্বে। এই বিভূতিবাবু পরিচালিত ক্যাম্পেই বাগনানের স্বেচ্ছাসেবকরা ট্রেনিং নিত। পরে তিনি কম্যুনিষ্ট দলে যোগ দেন। শ্যামপুরে পিকেটিং চলে মধু বেরার নেতৃত্বে। বাকসির হাটে নেতৃত্ব দেন কংগ্রেস নেতা বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। গড়ভবানীপুরের অর্ধেন্দুশেখর চৌধুরী (ইন্দ্র) ও কৃষক নেতা নিতাই মণ্ডল ও তারাপদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কেবল পিকেটিং করেই হাওড়াবাসী আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেননি—অনেকে সরকারী স্বায়ত্তশাসনশীল সংস্থা থেকে পদত্যাগ করে ইংরেজ বিতাড়নে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। এমনকি অনেক গ্রাম 'নো ট্যাক্স' আন্দোলনেরও সামিল হয়েছিল—যেমন মাজু, শ্যামপুর প্রভৃতি অঞ্চল। পাঠকের কাছে আশ্চর্য লাগবে যে শহরে ও গ্রামে সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলনে এতক্ষণ যাবৎ কোন মুসলমান নেতার নাম পাওয়া গেল না। বস্তুত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা তখন সাধারণতঃ কংগ্রেসের আন্দোলনে তেমন আসতো না। কিন্তু জুজারসার এক সাধারণ দর্জি শেখ আব্দুল মজিদ জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য করে এই আন্দোলনে যোগ দেন। দারিদ্র্য ও ধর্মের গোঁড়ামি তাঁকে মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি।

গান্ধীজীর লবণ আইন সত্যাগ্রহের জোয়ারে সারাদেশই তখন উত্তাল। সেই ঢেউ সেদিন শালকিয়া এ. এস. স্কুলের ক্লাস ঘরেও এসে লেগেছিল। ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক নীলরতন বসু ক্লাসে তখন Ivanhoe পড়াচ্ছেন। হঠাৎ কয়েকটি ছেলে স্কুলে ঢুকে গা ঢাকা দিয়েছে। গোলাবাড়ীর বাঘা দারোগা বৃন্দাবন দত্তও স্কুলের ভেতর ঢুকে পড়েন। নীলরতনবাবুর পড়া থেমে গেছে। ছাত্ররা প্রমাদ গুণছে—এই বুঝি একটা অঘটন ঘটে! প্রধান শিক্ষক

সুরেন্দ্রনাথ মুখাজী' তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে দীপ্ত কণ্ঠে বৃন্দাবনবাবুকে বলেছিলেন—'বিদ্যালয় ছুটি হ'লে রাস্তা থেকে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করবেন'। বৃন্দাবনবাবুকে সেদিন কাউকে না ধ'রেই বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করতে হয়েছিল। এই সুরেনবাবু সম্পর্কে প্রাচীনরা প্রশংসায় আজও পঞ্চমুখ। কিন্তু তিনি যে একজন সক্রিয় বিপ্লবী দলের কর্মী ছিলেন তা অনেকেরই কাছে অবিদিত। শালকিয়া এ. এস. স্কুলের শতবার্ষিকী স্মরণীতে (১৯৫৫) সম্পাদক মশায় পাদটীকায় লিখছেন—'স্বদেশী যুগে 'অনুশীলন দলে'র কার্যে তিনি (সুরেন্দ্রনাথ) সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

১৯৩১ এবং ৩২ সালে বিলেতে রাউণ্ড টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় দেশে আবার আন্দোলন শুরু হ'ল। এবারও শালকিয়ার স্বদেশীকর্মীরা বসে রইলেন না। এবার আন্দোলনের পুরোভাগে রইলেন অনুকূল চন্দ্র শেঠ ও ইন্দুভূষণ মুখাজী। সঙ্গে ছিলেন শঙ্করলাল মুখাজী, নন্দলাল মোহন্ত, ব্রজলাল মোহন্ত, সুধীর মাইতি, মুরারী মোহন দে, পূর্ণচন্দ্র মিত্র ও হরিসাধন মুখাজী প্রমুখ কর্মীরা। বামুনগাছি থেকে যোগ দিলেন সুধাংশু শেখর মুখাজী, কৃষ্ণচন্দ্র ভাণ্ডারী, কানাইলাল ঘোষ, সিন্ধুমণি কুমার, কালীকৃষ্ণ দাস, নিতাইচন্দ্র বেলেল, গোবিন্দলাল দেঁরেল, রামপদ বেরা, রামপদ ঘোষ ও নগেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ সত্যাগ্রহীরা। অনুকূলবাবু, ইন্দুবাবু ও শংকরবাবু পরবর্তী কালে হাওড়া পৌরসভার কমিশনার ও ভাইস চেয়ারম্যান হন। মুরারীবাবু এখনও (১০০) সুস্থ আছেন। শংকরবাবু বিধান সভার সদস্যও নির্বাচিত হন।

সত্যাগ্রহ আন্দোলনে শালিখার ইতিহাস আরও উজ্জ্বল হ'য়ে আছে মহিলা সত্যাগ্রহীদের অংশ গ্রহণে। বাঁধাঘাটে বিলেতী বস্ত্র বহ্ন্যুৎসব ক'রতে গিয়ে সুকুমারী দেবী (ইন্দুবাবুর বোন) ও কুমোদিনী দাসী (কালীকৃষ্ণবাবুর ঠাকুমা) পুলিশ কর্তৃক নিগৃহীতা হ'য়ে গ্রেপ্তার বরণ করেন।

অনুরূপভাবে হাওড়াতেও মহিলা সত্যাগ্রহী বাহিনী গড়ে উঠেছিল; তাতে বিশেষ উল্লেখ্য মহিলা সত্যাগ্রহী ছিলেন শিবপুরের সুষমা মুখোপাধ্যায় ও সুরমা মুখোপাধ্যায়। এঁরা ছিলেন শিবপুরের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা সুশীলকুমার মুখাজীর ভগিনীদ্বয়। তাঁরা ১৯৩০, ১৯৩২ ও ১৯৩৩ সালে আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার বরণ করেন। সুষমাদেবী তদানীন্তন কালে বীণা দাস, শান্তি দাস ও কল্যাণী দাসের সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনে মহিলাদের সংগঠিত করেন। ১৯৩০ সালে দমদম বেঙ্গল ফ্লাইং (বে-সামরিক) ক্লাবের প্রথম মহিলা সভ্যা হিসেবে তিনিই প্রথম ভারতীয় মহিলা বৈমানিক ছিলেন।[৯] তিনি ১৯৮৪ সালে জানুয়ারী মাসে ৭৪ বছর বয়সে মারা যান। জোড়হাটের পুলিন ব্যানাজীর সহধর্মিণী করুণাময়ী দেবীর কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি স্বামীর পাশে এসে আবার ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনেও যোগ দেন।

আইন অমান্য আন্দোলনে হরেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৯৩০-এ ২৫শে জুলাই গ্রেপ্তার

হন। প্রেসিডেন্সী জেলে তাঁকে রাখা হলো। জেলে কয়েদী পোষাক না পরা, জেল সুপারকে সেলাম না দেওয়া পরন্তু 'বন্দেমাতরম' বলার জন্য তাঁদের উপর অত্যাচার চলতে লাগলো। জেলেতে অনশন চলতে থাকে এক টানা ৩৭ দিন। ফলে হরেন্দ্রনাথকে জেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে বহরমপুর জেলে হরেন্দ্রনাথকে চালান দেওয়া হয়। সেখানেও একই অবস্থা চলতে থাকে। ব্যাপারটা সুভাষ চন্দ্র বসুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু ঐ জেলে ঢোকার অনুমতি না পাওয়ায় সুভাষচন্দ্র আইন ভেঙে সেখানে সভা করেন এবং গ্রেপ্তার হন। এবার হরেন্দ্রনাথকে আবার দমদম সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেও চলে অনশন। ইতিমধ্যে গান্ধী-আরউইন চুক্তি সাক্ষরিত হওয়ায় সত্যাগ্রহীদের অনেকেই মুক্তি পান—যার মধ্যে হরেন্দ্রনাথও ছিলেন।

সেপ্টেম্বর মাসে হিজলী জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর পুলিশী গুলিতে সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ত নিহত হন। তাঁদের মৃতদেহ হাওড়া টাউন হলে আনা হলে এক শোক সভায় শ্রদ্ধা জানান হয়।

১৯৩১-৩২ সালে বিলেতে গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় গান্ধীজী আবার গ্রেপ্তার হলেন। প্রথম শ্রেণীর কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে অনেকেই পর পর গ্রেপ্তার হলেন। সুতরাং এবার আন্দোলনকারীদের ধরে হিজলী জেলে পাঠানো হল। ১৯৩৩ সালে গান্ধীজীকে ইংরেজ সরকার মুক্তি দিলেন। আইন অমান্য আন্দোলন ক্রমেই স্তিমিত হয়ে গেল।

এর পরের ইতিহাস হচ্ছে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জেলা কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন। একটানা ১৯২৬-৩৫ সাল পর্যন্ত সভাপতি ছিলেন। এবার সভাপতি হলেন হরেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং জেলা সম্পাদক হলেন সুশীল মুখোপাধ্যায়।

এই প্রসঙ্গে হাওড়ার ছাত্রদের কথা না বললে অধ্যায়টির অঙ্গহানি হয়ে যাবে। সমাজের অন্যান্য মানুষদের সঙ্গে ছাত্ররাও এতে সমান ভাগে ভাগ নিয়েছিল। তখনকার দিনেও ছাত্র সমাজ দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল—যদিও তাদের লক্ষ্য ছিল অভিন্ন। একদল ছিল সেনগুপ্ত পন্থী (যতীন্দ্রনাথ) ও অপরটি ছিল সুভাষ পন্থী। সেনগুপ্ত পন্থী ছাত্র সংঠনের নাম ছিল অল বেঙ্গল স্টুডেণ্টস এসোসিয়েশন (এ বি এস এ) আর সুভাষ পন্থীর নাম ছিল বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল স্টুডেণ্টস এসোসিয়েশন (বি পি এস এ)। প্রথমে কৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায় সেনগুপ্ত পন্থী হলেও পরে তিনি সুভাষ পন্থী হয়ে যান। অপরপক্ষে বালির রণজিৎ ব্যানার্জী, শীতাংশু ব্যানার্জী, মোহিত ব্যানার্জী, রামকৃষ্ণপুরের রবীন্দ্রলাল সিংহ (প্রাঃ মন্ত্রী) এরা সকলেই সেনগুপ্ত পন্থী হয়ে সত্যাগ্রহে অংশ গ্রহণ করেন। সুভাষ পন্থী ছাত্র নেতা সমর মুখার্জী (প্রাঃ সাংসদ), বিনয় রায় (প্রাঃ কাউন্সিলার), সুজন সরকার ও সুহৃদ বিশ্বাস এঁরাও সত্যাগ্রহে অংশ নিয়ে গ্রেপ্তার বরণ করেন।

১৯৩৯ সালে 'হলওয়েল মনুমেণ্ট' স্মৃতি স্তম্ভের অপসারণ সুভাষচন্দ্রের জীবনের এক উল্লেখযোগ্য সংগ্রাম। এই সংগ্রামে জাতীয় নেতৃবৃন্দ তেমন সহযোগিতার হাত

বাড়িয়ে দেন নি। সেদিনের সংগ্রামে হরেন্দ্রনাথ ঘোষ হাওড়া থেকে অবিরাম স্বেচ্ছাসেবক পাঠিয়ে সুভাষচন্দ্রকে সাহায্য করেছিলেন। এই কাজে তাঁর ডানহাত ছিলেন নিতাই মণ্ডল। এ ছাড়া নানু ঘোষ, তারাপদ মজুমদার, ইন্দভূষণ মুখার্জী, সুজন সরকার ও সুহৃদ বিশ্বাস প্রভৃতিও সাহায্য করেছিলেন। উলুবেড়িয়া থেকে তারাপদ দাস ও শান্তি বসুও হাতুড়ি দিয়ে হলওয়েল মনুমেণ্ট ভাঙ্গার অপরাধে কারাদণ্ড ভোগ করেন। অবশেষে সুভাষ চন্দ্রেরই জয় হল। তাই তিনি প্রায়ই বলতেন—'হাওড়া আমার দুর্গ।'

অপরপক্ষে বীরেন ব্যানার্জী, গণেশ মিত্র, বিভূতি মুখার্জী, জীবন মাইতি প্রমুখ ব্যক্তিগণ বকসার ও দেওলী বন্দী শিবিরে ছিলেন। গান্ধীজীর মতবাদ ত্যাগ করে মার্কসীয় মতবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা কম্যুনিষ্ট দলে যোগ দেন। বীরেন ব্যানার্জী, অরুণ চ্যাটার্জী, কমল বড়াল ও নিরঞ্জন চ্যাটার্জী প্রমুখের চেষ্টায় হাওড়ায় কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠিত হল—যার প্রথম সম্পাদক ছিলেন বিভূতি মুখার্জী ও দ্বিতীয় সম্পাদক সমর মুখার্জী (প্রাঃ সাংসদ)।*

---

* সমরবাবু একদা উলুবেড়িয়া মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেওয়া পর্যন্ত জেলা কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন।

১. স্বাধীনতা সংগ্রামে হাওড়া জেলার সেনানীবৃন্দ—সম্পাদনা প্রফুল্ল দাসগুপ্ত।

২. শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন ১৯২৬—৩৫ পর্যন্ত।

৩. ১৩৩০ সালে বালি সাধারণ পাঠাগার কর্তৃক নলিন চন্দ্রের প্রথম স্মৃতিসভায় প্রচারিত জীবনী।

৪. বালি সাধারণী সভা—শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ।

৫. স্বাধীনতা আন্দোলনে আমাদের জেলা—দুঃখহরণ ঠাকুর চক্রবর্তী।

৬,৮. বিপ্লবী হরেন্দ্রনাথ ঘোষ—অমিয় ঘোষ—সম্পাদনা—ডঃ শিশির কর।

৭. শতবর্ষ স্মরণিকা—পল্লীভারতী—মুগকল্যাণ।

৯. দৈনিক বসুমতী ১৩ই জানুয়ারী—১৯৮৪।

শ্রমিক আন্দোলন

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে রেলওয়ের প্রতিষ্ঠা হল। একদিকে উহা যেমন ভারতের গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ধ্বংস করল তেমনি বিলেতী বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্য আমদানি করে ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্র কায়েম করার কাজও দ্রুত হাসিল করল। এর দ্বারা ভারতের দূর দূরান্ত থেকে শিল্পের কাঁচা মাল দ্রুত সংগ্রহ করে ভারতের তিন প্রধান বন্দরের (কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ) মাধ্যমে ইংলণ্ডে চালান দেওয়ার পথও সুগম হল। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ পুলিশ ও সেনাদলের গমনাগমনের দ্রুততা বাড়িয়ে প্রয়োজনমত ভারতীয়দের প্রতিরোধ আন্দোলনও দমন করার পথ সুগম হল। এক কথায় ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থার কায়েমী স্বার্থ দৃঢ় করার পক্ষে এটা একান্তই প্রয়োজন ছিল। তাই ১৮৫৩ সালে ভারতে প্রথম রেলওয়ের প্রবর্তক লর্ড ডালহৌসী তাঁর প্রতিবেদনে লিখেছেন—**The great social, political and commercial advantages to be gained from connecting the three Presidency cities.**[১]

বলা বাহুল্য, ভারতের শ্রমজীবী আন্দোলনের বীজ রোপিত হয়েছিল রেলওয়ের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। যদিও ইতিপূর্বেই বাংলাদেশে ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লব হেতু মেশিনের প্রবর্তন হয়েছে—গড়ে উঠেছে পাট ও কাপড়ের মিল। ভারতের প্রথম পাটের কল তৈরী হল হাওড়া জেলারই পাশের জেলা হুগলীতে।[২] ১৮৫৪ সালে ভারতের প্রথম পাটকল প্রতিষ্ঠা হল রিষড়ায় 'অকল্যাণ্ড' নামে জনৈক নৌবিভাগের কর্মচারীর উদ্যোগে। যার বর্তমান নাম ওয়েলিংটন জুট মিল। তারও আগে ভারতে প্রথম কাপড়ের মিল গড়ে উঠেছিল এই হাওড়া জেলায়ই। ১৮১৭ (মতান্তরে ১৮২২) সালে উলুবেড়িয়া মহকুমায় 'বাউড়িয়া কটন মিল' নামে কাপড়ের কলটি গড়ে ওঠে। এইভাবে বাংলায় ও বোম্বাইতে যথাক্রমে পাটকল ও কাপড়ের কল অধিক সংখ্যায় অল্প কয়েক বছরের মধ্যে গড়ে উঠলো। ফলে শ্রমিকের সংখ্যাও প্রভূত পরিমাণে বেড়ে যেতে লাগলো।

আস্তে আস্তে অপরাপর শিল্পের মধ্যে কয়লা, চা ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ উত্তোলনের জন্যই ইংরেজরা বাণিজ্যিক প্রয়াস শুরু করে দিল।

শুধু কলেকারখানায় কেন—ইংরেজরা কৃষিতেও ঔপনিবেশিক বাণিজ্যে মুনাফা লোটার জন্য কৃষিজীবী গ্রামবাসীদের উপরও অত্যাচার শুরু করে দিল। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে চাষীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেই দেখা দিল 'নীল বিদ্রোহ।' কৃষিজীবী লোকেদের এই বিদ্রোহকে অমর করে রেখেছেন দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'নীল দর্পণ' নাটকে ও হরিশ মুখার্জীর "হিন্দু প্যাট্রিয়ট"-এ। অবশ্য এইভাবে সংঘবদ্ধ বিদ্রোহ বা আন্দোলন শিল্পক্ষেত্রে এত তাড়াতাড়ি না হলেও কিন্তু বেশি দেরী লাগলো না। কারণ বিদেশীদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মুনাফা—ভারতকে শোষণ

করে, ভারতীয় শ্রমিককে বঞ্চিত করে কি করে এ দেশ থেকে টাকা ইংলণ্ডে নিয়ে যাওয়া যায় সেটাই ছিল তাদের মূলমন্ত্র। সুতরাং শ্রমিকদের সঙ্গে যে অর্থনৈতিক সংঘাত দেখা দেবে তাতে আর আশ্চর্যের কি!

শ্রমিকদের মজুরীর কথা বাদ দিলেও কাজের সময়-সীমার তেমন কোন নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। মালিক শ্রেণী তখন সারা বিশ্বেই শ্রমিকদের দিনে ইচ্ছামত বার তের ঘণ্টা করে খাটাতো। আমরা জানি তারই প্রতিবাদে এবং দিনে আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে ১৮৮৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'হে মার্কেটে'র শ্রমিকরা এক রক্তাক্ত সংগ্রামে লিপ্ত হয়। কিছু শ্রমিকের জীবন উৎসর্গের ফলে পুঁজিপতিরা আট ঘণ্টা কাজের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন। তাই ১৮৯০ সাল থেকে ১লা মে তারিখটি বিশ্বের 'শ্রমিক দিবস' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটলেও তাদের দেশের শ্রমিকরা কিন্তু এই দিবসটি শ্রমিক দিবস হিসেবে আজ আর পালন করে না।

কিন্তু পাঠক জেনে পুলকিত হবেন যে শিকাগো শহরে 'হে ডে'-র আগেই ভারতের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত হাওড়া স্টেশনের রেল মজুররা আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে প্রথম ধর্মঘট করেছিল। সালটি ছিল ১৮৬২, মে মাস।

তদানীন্তন 'সোম প্রকাশ' পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়—'সম্প্রতি হাবড়ার (তখন হাওড়াকে হাবড়া বলা হত) রেলওয়ে স্টেশনে বারশ মজুর কর্মত্যাগ করিয়াছে। তাহারা বলে লোকোমোটিভ ডিপার্টমেণ্টের মজুরেরা প্রত্যহ আট ঘণ্টা কাজ করে কিন্তু তাহাদিগকে দশ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হয়। কয়েক দিবসাবধি কার্য স্থগিত রহিয়াছে। রেইলওয়ে কোম্পানী মজুরদিগের প্রার্থনা পূরণ করুন—নচেৎ লোক পাইবেন না।'

'সোম প্রকাশ' কেবল সংবাদ দিয়েই ক্ষান্ত ছিল না। সম্পাদকীয় প্রবন্ধে জোরালো ভাষায় কুলীদের দাবি সমর্থন করেছিল।

ভাবতেই অবাক লাগে যে ১৮৫৪ সালে হাওড়া স্টেশনে রেল চালু হবার আট বছরের মধ্যেই আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে হাওড়া স্টেশনের শ্রমিকরা বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনে এক ঐতিহাসিক নজির সৃষ্টি করেছিল। সেই অর্থে হাওড়ার রেল শ্রমিকদের ঐ বীরত্বপূর্ণ লড়াই মে দিবসের সমপর্যায়ভুক্ত হওয়া উচিত। সঙ্গে সঙ্গে সোম প্রকাশের সম্পাদক শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ[৩] মহাশয়ের ঐ সংবাদ ছাপাবার দূরদর্শিতা ও আন্দোলনকে সমর্থন করে লেখনী পরিচালনা করার অসীম সাহস বিশেষভাবে স্মর্তব্য।

যদিও এই ধর্মঘটের আগে গঙ্গার অপর পাড় কলকাতাতে ১৮২৩ সালে পাল্কী বেহারাদের ও ১৮৫৩ সালে কলকাতার নদী পরিবহনের কুলীরাও ধর্মঘটের সামিল হয়েছিল। তবে এগুলি ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক অসংগঠিত প্রচেষ্টা। যার ফলে ১৮৬২ সালে হাওড়া স্টেশনের রেলওয়ে কুলীদের এই সংগ্রাম ছিল আধুনিক শিল্প শ্রমিকদের সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের এক নতুন সোপান।

এরপরই ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও শ্রমিক ধর্মঘটের ঘটনা ঘটতে লাগলো বিশেষ করে শিল্প নগরী বোম্বাই শহরে। অবশ্য এই কাজে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা (১৮৮৫ সাল) জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে শ্রমিকদের মধ্যেও প্রেরণা যোগাতে থাকে। রেলের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশের সুতোকলের শ্রমিকরাও আন্দোলনের পথে পা বাড়াতে শুরু করল।

হাওড়া শহরের ঘুষুড়ী অঞ্চলে 'ঘুষুড়ী কটন মিলে'র মালিকপক্ষ কারবারে লোকসান হচ্ছে এই অজুহাতে শ্রমিকদের মজুরী কমাতে চাইলেন। ফলে ১৮৮১ সালে সুতোকলের শ্রমিকরা ধর্মঘটের সামিল হয়ে তার প্রতিবাদ করে—যদিও প্রতিরোধে তারা সমর্থ হয়নি। একই কারণে ঐ মিলে আবার ধর্মঘট হয় ১৮৯০ সালে। সেবারও শ্রমিকদের ভাগ্যে একই ফল জুটেছিল।[৪]

এরপর ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলের হাওড়া শাখাতে আর একটি রেল শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছিল যার ঐতিহাসিক মূল্যায়ন হওয়া উচিত জাতীয় মর্যাদার প্রশ্নে। সেজন্য এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ আজকের শ্রমিকদের কাছেও দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে থাকবে। ১৯০৬ সাল। জুলাই মাস। তদানীন্তন ব্রিটিশ মালিকাধীন ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলের কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে সাদা ও কালো চামড়াভেদে মজুরী নির্ধারণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বণ্টনে প্রবৃত্ত হলেন। এরই প্রতিবাদে হাওড়া স্টেশন থেকে আসানসোল পর্যন্ত রেল শ্রমিকরা রেল চলাচল বন্ধ করে দিল। মাইনে বৃদ্ধি ছাড়াও যে ভারতীয়রা আত্মমর্যাদা রক্ষার দাবিতে শ্রমিক ধর্মঘট করে রেলের চাকা বন্ধ করে দিতে পারে তা এই ধর্মঘটীরা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। তাদের প্রধান দাবি ছিল 'নেটিভ' কথাটি তুলে দিয়ে 'ভারতীয়' শব্দটি রেলের সব আইন কানুনে চালু করতে হবে। এটা কি কম শ্লাঘার ব্যাপার! এই ধর্মঘটটি চলেছিল জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত।[৫] এই ধর্মঘট অবশ্য বিদেশী শাসকদের পুলিশী নির্যাতনে ভেঙে যায় এবং অনেক প্রবীণ-স্থায়ী রেলকর্মীরা নেতৃত্ব দেওয়ার অপরাধে কর্মচ্যুতও হয়েছিলেন।

হাওড়ার রেল কর্মীদের এই ধর্মঘট আর এক দিক দিয়ে বিশেষ যুগান্তকারী ছিল। তা হচ্ছে 'দি ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন' নামে একটি সমিতির প্রতিষ্ঠা। প্রকৃতপক্ষে এটি রেলে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে অগ্রদূত হিসাবে পরিচিত। ১৯০৬ সালের এই ধর্মঘটটি রেলের কর্মীদের মধ্যে সারা দেশে এমনই উদ্দীপনা ও আশার সঞ্চার করেছিল যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও বাগ্মীপ্রবর বিপিনচন্দ্র পাল পর্যন্ত কলকাতায় রেলকর্মীদের এক সভায় আন্দোলনের সমর্থনে প্রস্তাব পাশ করিয়ে ধর্মঘটী রেল কর্মীদের প্রতি সমর্থন জানান। ধর্মঘটী রেল শ্রমিকদের এই অর্থনৈতিক আন্দোলন দেশের জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপূরক হয়ে ওঠে। ১৯০৬ সালের রেল ধর্মঘটই পরবর্তী বছরে ভারতের অন্যান্য রেলপথের কর্মীদের মধ্যেও সাহস এনে দিল। ফলে ১৯০৭ সালে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের রেলকর্মীরা ধর্মঘটের আহ্বান জানালো। এই ধর্মঘটটিকে ভারতের বৃহত্তম রেল ধর্মঘট বলে

আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। আর এই ধর্মঘটের সমস্ত উৎসাহ, সাহস ও প্রেরণার মূলে ছিল ১৯০৬ সালের হাওড়া স্টেশনের ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলের কর্মীদের বীরত্ব-পূর্ণ আন্দোলনের ফলশ্রুতি। ১৯০৬ সালের ধর্মঘটের ফলে যেমন সুতোকলের কর্মীদের কাজের অবস্থার উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয় তেমনি ১৯০৭ সালের রেলের এই ধর্মঘটের ফলে মিঃ মোরিগনের নেতৃত্বে ফ্যাক্টরী লেবার কমিশন নামে একটি কমিশন তৈরী হয়। ঐ কমিশনের সুপারিশে শ্রমিকদের কাজের সময়ের হার কমাতে বলা হলেও ভারতীয় ও বিদেশী মালিকদের তীব্র বিরোধীতায় তা মানা সম্ভব হয়নি। যদিও ১৯০৭ সালের ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলের দশদিন ব্যাপী (১৮ই নভেম্বর—২৮শে নভেম্বর) এই ধর্মঘট কলকাতা ও হাওড়াকে ভারতের অন্যান্য শহর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। বিখ্যাত রুশ-ভারত বিশেষজ্ঞ মিঃ এ. এল. লেভোস্কি এ সম্পর্কে লিখেছিলেন—**It was a serious blow to the prestige of British rule—a blow which undermined the belief its might.**[৬]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই ধর্মঘটটির মূলে ছিল ইউরোপীয় ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কর্মীরা। কিন্তু ভারতীয়রা এই আন্দোলনে পূর্ণ ভাগ গ্রহণ করেছিল। আরও আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে ধর্মঘটের যে প্রচারপত্র বিলি হয়েছিল তাতে 'বন্দেমাতরম' শ্লোগানটি পর্যন্ত ছাপা হয়েছিল। এইভাবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি রেল ধর্মঘটীরা রাজনৈতিক সমর্থনও জানিয়েছিল।

দেখতে দেখতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ লেগে গেল। ১৯১৪—১৯১৮ পর্যন্ত চার বছরের যুদ্ধে এদেশে যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাবার জন্য বিভিন্ন প্রকারের শিল্প কারখানা ও মিল প্রসার লাভ করল। উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেল—বৃদ্ধি পেল মালিকদের মুনাফাও। কিন্তু মজুরদের অবস্থার তেমন কোন উন্নতি হল না। অপর দিকে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের তীব্রতাকে দমিয়ে দেবার জন্য ব্রিটিশ প্রভুরা নানারকম পুলিশী নির্যাতন চালাতে লাগলো। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড। দেশবাসীর সঙ্গে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের কর্মীরাও তাদের সমর্থন রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের প্রতি জানাতে লাগল। সন্দেহ নেই ১৯১৭ সালে রাশিয়ার নভেম্বরের বিপ্লবের জয়যাত্রা ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামকে নতুন প্রেরণা জুগিয়েছিল। ১৯২০ সালের মাঝামাঝিতে হাওড়ায় প্রায় একশ দশটির মত ধর্মঘট হয়েছিল চটকলগুলিতে। এ ছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং, পরিবহন, ধাতু ও কয়লা শিল্পেও ধর্মঘট হয়েছিল। এতে ২,১১,৪৭৮ জন শ্রমিক জড়িয়ে পড়েছিল।[৭]

এরপর বিশেষ উল্লেখযোগ্য ধর্মঘট দেখা দিল ১৯২৭ সালে বেঙ্গল নাগপুর রেলের খড়্গপুর স্টেশনে। এই ধর্মঘটে যোগদান করে প্রায় ২৬,০০০ কর্মচারী।[৮] প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি ছিলেন ঐ সংস্থার সভাপতি। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সহ কম্যুনিষ্ট শ্রমিক নেতারাও খড়্গপুরের ধর্মঘটে অকৃপণ সমর্থন জানালেন। ইংরেজ সরকার শ্রমিকদের ওয়ার্কশপের লক আউটের দিনগুলিতে মজুরী দিতে

স্বীকৃত হলেও ১৭০০ কর্মীকে পদচ্যুত করে ছাড়েন।* এই ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণী বহু ক্ষতি স্বীকার করেও শিক্ষা পেয়েছিল সুসংবদ্ধ হয়ে ধর্মঘট কিভাবে চালাতে হয়।

এখানে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা অবতারণা না করলেই নয়। ইতিপূর্বে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের নেতৃত্বে আফগানিস্তানে এক প্রবাসী অন্তবর্তীকালীন স্বাধীন সরকার তৈরী করা হয়েছিল। সেই মন্ত্রীসভার অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন শিবনাথ ব্যানার্জী। তিনি দেশ থেকে চলে গিয়ে আফগানিস্তান হয়ে সোভিয়েটের সাহায্য লাভের আশায় রাশিয়ায় গিয়ে উপস্থিত হন। উদ্দেশ্য ছিল, মহামতী লেনিনের সঙ্গে দেখা করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় রাশিয়ায় পৌঁছবার দুদিন আগেই লেনিনের মৃত্যু ঘটে। তবে তিনি লেনিনের শবযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন। সজল বসু লিখছেন—**In 1923 Shibnath went to Russia crossing the inaccessible Hindukush mountain in Sept. under the leadership of Obeidullah Sindhi. He took part in the funeral of Lenin.**[১০] শিবনাথবাবু ওবাইদুল্লাহ সিন্ধির নেতৃত্বে মস্কোর প্রাচ্য শ্রমজীবী বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কসীয় দর্শন পড়ার জন্য ছাত্র হিসাবে যোগ দেন ১৯২৩ সালের শেষের দিকে। ১৯২৫ সালে রাশিয়া ও ইংলণ্ড থেকে শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে শিক্ষা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি দেশে ফেরেন। শিবনাথবাবুর পৈত্রিক বাস ছিল খুলনা জেলায় (বাংলাদেশ)। কিন্তু দেশে ফিরে তিনি উত্তর চব্বিশ পরগনার ভাটপাড়ায় পাটকল শ্রমিকদের নিয়ে প্রথম কাজ শুরু করেন।

ওই সময় ভাটপাড়ার শ্রমিক নেতা কালিদাস ভট্টাচার্য ও মহিলা শ্রমিক নেত্রী সন্তোষকুমারী দেবীকে নিয়ে তিনি চটকল শ্রমিকদের অবর্ণনীয় দুর্দশা দূরীকরণে ব্রতী হন। এমনিভাবে তাঁরা চব্বিশ পরগনার গৌরীপুর নদীয়া জুট মিল থেকে হাওড়ার বাউড়িয়া জুট মিল পর্যন্ত শ্রমিক সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। কালিদাসবাবু সভাপতি হলেও লেখাপড়া বিশেষ জানতেন না। অপরপক্ষে শিবনাথ বাবুর শিক্ষা দীক্ষা খুব উঁচু মানের ছিল। উভয়ের সাংগঠনিক দক্ষতাগুণে চটকল মজুরদের একত্রে সংগঠিত করে তাঁরা এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। সেই সময়ে গঙ্গার দুই তীরে প্রায় একশটি চটকলের দেড় লক্ষ শ্রমিকের এক সংগঠন গড়ে তুললেন।[১১]

একই সময়ে কম্যুনিষ্ট শ্রমিক নেতৃবৃন্দ চটকল শ্রমিক ও কৃষকদের নিয়ে এই হাওড়াতেই একটি সম্মেলন ডাকেন। তাতে গণতান্ত্রিক সমাজবাদে বিশ্বাসী শিবনাথবাবুর সঙ্গে কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দের মতের অমিল হয়। সভাপতি কালিদাস বাবুকে দলে টেনে নিতে পারলেও সম্পাদক শিবনাথবাবুকে তাঁরা সঙ্গে পেলেন না। তিনি স্বাধীনভাবে টিটাগড়ে চটকল শ্রমিকদের মধ্যে একাকী কাজ চালাতে লাগলেন। চটকলের শ্রমিকদের সে সময়ে বিদেশীদের হাতে কি পরিমাণে বঞ্চনার স্বীকার হতে হতো তা তদানীন্তন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য ও ঐ দেশের জুট

টেক্সটাইলস ইণ্ডাষ্ট্রিজের সাধারণ সম্পাদক মিঃ জনস্টোনের মন্তব্য থেকেই বোঝা যায়। তিনি লিখছেন—**The employer makes a profit of 400% exploiting the workers while they get two pence a day.**[১২]

চটকলের শ্রমিকদের সংগঠিত করতে করতে এবং ১৯২৭ সালের খড়্গপুরের রেল কর্মীদের আন্দোলনের জের শেষ হতে না হতেই ১৯২৮ সালে লিলুয়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপে এক শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়। এই শ্রমিক অসন্তোষের নেতৃত্বে ছিলেন কে. সি. মিত্র নামে জনৈক শ্রমিক নেতা। এই কে. সি. মিত্র শ্রমিকদের সংগঠিত করার জন্য আউধ রেলওয়ে সেক্সসনে দুবার লখনউ ও দানাপুর থেকে চাকুরীচ্যুত হন। তারপর তিনি বাংলায় এসে লিলুয়ার রেলওয়ের ওয়ার্কশপের শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে নামেন। এই কে. সি. মিত্রই শ্রমিক আন্দোলনে 'জটাধারী বাবা' নামে সমধিক পরিচিত। তখনকার দিনে লিলুয়া ওয়ার্কশপে রেলের মজুররা দিনে ছ'আনা থেকে আট আনা মজুরী পেত। প্রধানত শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি ও কর্মচ্যুত দুজন শ্রমিকের পুনর্বহালের দাবিতে আন্দোলন শুরু করলেন জটাধারী বাবা। পুনর্বহালের দাবি মেনে নেওয়ার পরিবর্তে কর্তৃপক্ষ লিলুয়ার ওয়ার্কশপে লকআউট ঘোষণা করলেন। ফলে রেলশ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি জানাবার জন্য—বালি জুট মিল, বার্ন এণ্ড কোম্পানী, জেসপ কোম্পানী, হাওড়া জেনারেল স্টোর্স-সহ বামুনগাছি রেল ওয়ার্কশপেও ধর্মঘট হয়। এমনকি চেঙ্গাইলের ল্যাডলো জুট মিলের ছ'শ নারী শ্রমিকরা পর্যন্ত মজুরী বৃদ্ধির দাবিতে এক গৌরবময় সংগ্রামের ভূমিকা গ্রহণ করে।

এই বছরই চেঙ্গাইলের ল্যাডলো জুট মিলের শ্রমিকরা পর পর চার বার একই মিলে ধর্মঘট করে মার্চ থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে। প্রথম ও দ্বিতীয় ধর্মঘটটি হয় যথাক্রমে মার্চ ও এপ্রিল মাসে। ধর্মঘটের কারণ ছিল একাধিক শিফটের পরিবর্তে একটিমাত্র শিফট চালু করার প্রতিবাদে। তৃতীয় ও চতুর্থ ধর্মঘটটি হয় মজুরী বৃদ্ধির দাবিতে। তৃতীয় ধর্মঘটটি করে মিলের ছ'শ মহিলা শ্রমিকরা ৪ঠা জুন ১৯২৮ সালে। ধর্মঘটে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের উপর বলপ্রয়োগ করলেও মজুরী বৃদ্ধির দাবি তাদের মেনে নিতে হয়। চতুর্থ ধর্মঘটটি চলে ১৯শে নভেম্বর থেকে ৪ঠা ডিসেম্বর পর্যন্ত। এতেও আংশিক সাফল্যলাভ করে শ্রমিকরা। কিন্তু এই চারিটি ধর্মঘটেরই বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে শ্রমিকরা কোন ইউনিয়ন নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হত না। এটা জানা যায় ইউনিয়নের (AITUC) সম্পাদক কিশোরীলাল ঘোষের এক চিঠি থেকে। তিনি লিখছেন—**'The (first) strike has lasted for ten days and we were informed on the 9th day. We could not go to the place till after the workers had gone back.'** যদিও শ্রমিকদের বিপদে ইউনিয়ন তাদের পাশে সর্বদাই ছিল।[১৩]

অবশেষে বাউড়িয়া ফোর্ট গ্লস্টার জুট মিলে ইংরেজ পুলিশ গুলি চালায়। এই সময়ে উক্ত চটকল শ্রমিকদের সারা বাংলা সংগঠনের সভানেত্রী ছিলেন খ্যাতনাম্নী

মহিলা ট্রেড ইউনিয়ন নেত্রী ডঃ (মিস) প্রভাবতী দাশগুপ্ত।[১৪] বাউড়িয়া জুট মিলে পুলিশ গুলি ছুঁড়ে আন্দোলন দমাতে গেল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইংরেজ সরকার ভারতে তদানীন্তন শ্বেতকায় ইংরেজ মার্কসিস্ট নেতা ফিলিপ স্প্র্যাটকে দায়ী করেন।*

লিলুয়া ওয়ার্কশপের রেল কর্তৃপক্ষের কঠোর দমনমূলক নীতির প্রতিবাদে ২৮শে মার্চ সকাল দশটা নাগাদ জটাধারী বাবা ও শিবনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে পূর্ব ভারত রেলের কলকাতার ডালহৌসী স্কোয়ারের প্রধান কার্যালয়ের সামনে লক্ষাধিক শ্রমিকের এক প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে যাওয়া হয়। সমাবেশের খবর পেয়ে তদানীন্তন পুলিশ কমিশনার টেগার্ট তাঁর শ্লিপিং ড্রেস পরেই ঘটনাস্থলে এসে পড়েন। শোভাযাত্রী শ্রমিকরা তাঁকে দেখে যে ধ্বনি দিয়েছিল তা খুবই কৌতুকজনক। তারা চীৎকার করে বলেছিল—'টেগার্ট সাহেবকো পাতলুন ঢিলা হো গিয়া।'[১৫]

কলকাতায় বিক্ষোভ দেখানোর পর শ্রমিকরা হাওড়ায় ফিরে এসে বামুনগাছির লোকো শেডে বিক্ষোভ দেখায়—তখন প্রায় বিকেল হয়ে গিয়েছে। এই মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন লিলুয়া ওয়ার্কশপের এক কর্মী—শালিখার অধিবাসী শান্তিরাম মণ্ডল। বামুনগাছি লোকো শেডের কাছে বিক্ষোভরত শ্রমিকদের উপর ইংরেজ পুলিশ সেদিন গুলি চালায়। তাতে নিহত হয় দুজন রেল কর্মী, আহত হয় অনেকে।[১৬]

বামুনগাছি তথা শালকিয়া অঞ্চল সেদিন উত্তেজনায় ছিল টানটান। সেদিনে আবার হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন ছিল। সুভাষচন্দ্র বসু শালকিয়া ধর্মতলায় নির্বাচনী কাজের তদারকি করে ফেরবার সময় শ্রমিকদের উপর গুলি চালনার সংবাদ শুনতে পান। শালকিয়া চৌরাস্তা হয়ে বামুনগাছি পোলের দিকে যেতেই হাওড়ার তদানীন্তন জেলা শাসক 'ব্রতচারী আন্দোলনে'র প্রবর্তক গুরুসদয় দত্তের সঙ্গে তাঁর দেখা।[১৭] উভয়েই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। গুরুসদয় দত্তের আদেশে বামুনগাছি লোকো শেডের ডি. সি. এম. ই. মিঃ মোল্ড সাহেবকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

শান্তিরাম মণ্ডলের পাঁচ বছর জেল হয়। মামলাটি চলেছিল হাওড়া কোর্টের বিচারক এস. এন. মোদকের (আই. সি. এস) এজলাসে। শ্রীমোদক সরকারী মেধা বৃত্তি পেয়ে তখনকার দিনে আই. সি. এস. পড়তে বিলেতে যান। তিনি আবার শালকিয়ার প্রাচীন বাসিন্দা ব্রজনাথ দাসের (যাঁর নামে চৌরাস্তায় মিষ্টির দোকান) ভাগ্নে ছিলেন। সরকারের বিপক্ষে মামলাটির কৌঁশলী ছিলেন তদানীন্তন হাওড়া কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা ও হাওড়া কোর্টের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আইনবিদ বরদাপ্রসন্ন পাইন। বরদাবাবুর সওয়ালে সরকার পক্ষের উকিল নাস্তানাবুদ হয়ে গিয়েছিলেন। এই মামলার গুরুত্ব এতই বেশি ছিল যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পর্যন্ত জনৈক লেবার পার্টির

* এই স্প্র্যাট সাহেবই আবার মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ছিলেন।

সদস্যকে মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছিল—'Who is Mr. Pain ?' অবশ্য ইংরেজ সরকার শেষ পর্যন্ত ঐ মামলাটি বেশিদিন চলতে দেননি।

বামুনগাছির ঐ গুলি চালনার ফলে শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক আন্দোলন ইংরেজ শাসন-বিরোধী আন্দোলনের রূপ নিল। পূর্বভারত রেলের অণ্ডাল, আসানসোল ও অন্যান্য বড় বড় রেল স্টেশনের শ্রমিকদের মধ্যেও অশান্তি ছড়িয়ে পড়ল। বিচার অসমাপ্ত থাকলেও রেল কোম্পানী যে বিভাগীয় তদন্ত করেছিলেন তাতে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের ত্রুটিকেই দায়ী করা হয়। হাওড়া গেজেটিয়ারের লেখক অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন—But in its turn was condemned, along with the East India Railway authorities, for high-handed action and wanton repression, including firing on the striking railway workers.

লিলুয়া ওয়ার্কশপের রেল শ্রমিকদের এই আন্দোলনকে ভারতের রেলকর্মীদের সংগ্রামের ইতিহাসে এক 'দিগ্দর্শন' বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। যার অন্যতম নায়ক ছিলেন কে. সি. মিত্র, শিবনাথ ব্যানার্জী ও শান্তিরাম মণ্ডল।

বিদেশী রেল কর্তৃপক্ষ কেবল শ্রমিক হত্যা ও শ্রমিক ছাঁটাই করেই ক্ষান্ত হলেন না। উপরন্তু লিলুয়ার সব অর্ডার কাঁচরাপাড়ার রেল ওয়ার্কশপে হস্তান্তর করলেন। তারই প্রতিবাদে পাঁচ-ছ হাজার শ্রমিক লিলুয়া থেকে কাঁচরাপাড়া অভিমুখে প্রতিবাদ শোভাযাত্রা বের করেছিলেন। শোভাযাত্রীরা কাঁচরাপাড়ায় পৌঁছলে চটকল শ্রমিকরাও বিপুলভাবে তাঁদের সংগ্রামে একাত্ম হয়ে সম্বর্ধনা জানায়। রেল শ্রমিকদের সংগ্রামে চটকল শ্রমিকদের একাত্ম হওয়ার কাজে শিবনাথ ব্যানার্জীর অবদান স্মরণ রাখার মত।

এই প্রসঙ্গে একটি ঐতিহাসিক পদযাত্রার কথা উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। লিলুয়ার ধর্মঘট শেষ পর্যন্ত পর্যুদস্ত হলেও শ্রমিকদের মনোবল ছিল বেশ সতেজ। ১৯২৮ সালে ডিসেম্বরে কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছে। মহাত্মা গান্ধী, মতিলাল নেহরু প্রমুখ জাতীয় নেতৃবৃন্দ অধিবেশনে উপস্থিত হয়েছেন। রেল শ্রমিকদের ওপর ইংরেজ সরকারের দমনমূলক নীতির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের কি মনোভাব তা জানবার জন্যই কে. সি. মিত্র এবং শিবনাথ ব্যানার্জীর পরিচালনায় প্রায় এক লক্ষ শ্রমিকের এক শোভাযাত্রা কংগ্রেস অধিবেশনে নিয়ে গিয়ে গান্ধীজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার ব্যবস্থা করা হয়। স্মরণ করা যেতে পারে যে স্বেচ্ছাসেবক বিভাগের সর্বাধিনায়ক ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান। সুভাষচন্দ্র শিবনাথ বাবুকে টেলিফোন করে ঐ সম্মেলনে শ্রমিকদের নিয়ে হাজির হতে নিষেধ করেন। সুভাষচন্দ্রের আশঙ্কা ছিল হয়তো কম্যুনিষ্টরা সভায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং প্রদর্শনীর ক্ষতিসাধন করবে। সজল বসু 'Shibnath Banerjee and his times' পুস্তকটিতে লিখেছেন—He (Subhas chandra) apprehended that

communist would create disturbances and looted the exhibition. কিন্তু শিবনাথবাবু সুভাষচন্দ্রের অভিমত অগ্রাহ্য করেই সেখানে ঐতিহাসিক মিছিল নিয়ে হাজির হন। যদিও চেয়ারম্যান যতীন্দ্রমোহন ইতিমধ্যেই গান্ধীজীকে বলে তাঁদের সঙ্গে দেখা করার সম্মতি আদায় করে নিয়েছিলেন। কে. সি. মিত্র ও শিবনাথ ব্যানার্জী ছাড়া আর যাঁরা সেদিন ঐ মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন গোপেন চক্রবর্তী, বঙ্কিম মুখার্জী ও রাধারমণ মিত্র।[১৮]

গান্ধীজী শ্রমিকদের সঙ্গে সভায় মিলিত হন। অধিবেশন মণ্ডপ ত্যাগ করার সময়ে শ্রমিকরা মুহুর্মুহু ধ্বনি তোলে 'গান্ধীজী কি জয়'। সুভাষচন্দ্র পরে অবশ্য তাঁর মনোভাব পরিবর্তন করেন। সেদিনের ঐ শ্রমিক সমাবেশ যে কত সুশৃঙ্খল ছিল তা প্রতিনিধি সম্মেলনে সদস্যদের উদ্দেশ্য করে মতিলাল নেহরু যে মন্তব্য করেছিলেন তা থেকেই স্পষ্ট হয়। **Rebuking the delegates he said, Just a few minutes before, the workers held their meeting here in such a disciplined way, the delegates should learn from them.**[১৯] এই উক্তিই কে. সি. মিত্র ও শিবনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বের বিরাট পুরস্কার। এই আন্দোলন শুধু তদানীন্তন সর্বভারতীয় জাতীয় নেতৃবৃন্দেরই আশীর্বাদ লাভ করেনি, সেণ্ট্রাল কমিটি অব দি সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকেও এই আন্দোলনকে সমর্থন জানানো হয়েছিল। কে. সি. মিত্র এরপর শ্রমিক আন্দোলন থেকে আস্তে আস্তে অবসর নিলেও শিবনাথ ব্যানার্জী আমৃত্যু শ্রমিক কল্যাণে কাজ করে গেছেন। ১৯৩৭ সালে শিবনাথবাবু প্রথম বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় হাওড়া শ্রমিক কেন্দ্র থেকে এ. আই. টি. ইউ. সি-র সভাপতি থাকাকালীন শ্রমিক প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালে ঐ একই শ্রমিক কেন্দ্র থেকে তিনি পুনঃ নির্বাচিত হন বিশিষ্ট কম্যুনিষ্ট নেতা বঙ্কিম মুখার্জীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। এই জেলায় কংগ্রেস সোসালিস্ট আন্দোলনের তিনিই ছিলেন অগ্রদূত।

হাওড়া-বেলুড়ে বঙ্কিম মুখার্জী জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৭ সালে। প্রথমে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। সেই কারাগারেই কম্যুনিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে ঐ দলে যোগ দেন ১৯৩৬ সালে। ঐ সালেই আসানসোল লেবার কনস্টিটিউয়েন্সি থেকে তিনি বঙ্গীয় বিধান পরিষদে সভ্য নির্বাচিত হন। তিনিই ভারতের প্রথম নির্বাচিত কম্যুনিষ্ট সদস্য। স্বাধীন ভারতেও পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সভ্য ছিলেন।

বাউড়িয়া শিল্পাঞ্চলে বঙ্কিম মুখার্জী শ্রমিকদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কাজ শুরু করেন। তাঁর সঙ্গে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন ইতিহাস লেখক রাধারমণ মিত্র। পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে গ্রামের শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি শ্রমিক আন্দোলনের জন্য গোপনে সভা ও বৈঠক করতেন। অন্যান্য সাহায্যকারীরা ছিলেন ইংরেজ মার্কসিস্ট নেতা ফিলিপ স্প্র্যাট, হ্যাচিনসন সাহেব, মুজফ্ফর আহমেদ, শিবনাথ ব্যানার্জী ও অমৃতবাজারের কিশোরীলাল ঘোষ।

রাজনীতিতে কংগ্রেস তথা কম্যুনিষ্ট শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে শিবনাথবাবুর তীব্র মতপার্থক্য ছিল। কিন্তু সেই সময়ে রাজনৈতিক মত-পার্থক্য কখনও ব্যক্তিগত মধুর সম্পর্ককে শত্রু সম্পর্কে পর্যবসিত করত না। সে রকম একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯২৮ সাল। হাওড়ার বাউড়িয়া জুট মিলে ধর্মঘট চলছে। ধর্মঘটীদের সমর্থনে সারা বঙ্গদেশে চটকলে হরতাল পালিত হল ১৯২৯ সালে। এই ধর্মঘটকেই চটকল শ্রমিকদের প্রথম সাধারণ ধর্মঘট বলে আখ্যা দেওয়া হয়।[২০] এই ধর্মঘটের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল অর্থনৈতিক দাবির সঙ্গে জাতীয় মুক্তি সাধনার দাবির সংযুক্তিকরণ। ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্য মালিক পক্ষ তখনকার দিনেও ভাড়া করা গুণ্ডা পুষতেন। উল্লেখ্য, এই চটকল ধর্মঘটে কম্যুনিষ্ট শ্রমিক নেতৃবৃন্দও পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। ছ'মাস ব্যাপী ধর্মঘট চলাকালীন একদিন সন্ধ্যার মুখে শিবনাথবাবু সাইকেলে চেপে বাউড়িয়া জুটমিলের ধর্মঘটী শ্রমিকদের ক্যাম্পে যাচ্ছেন। মিলের কিছু দূরে একটি পুকুরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ কোন লোকের গোঙানি শুনতে পান। শিবনাথবাবু সাইকেল থেকে নেমে দেখেন যে পুকুরের পাশে কম্যুনিষ্ট শ্রমিক নেতা বঙ্কিম মুখার্জী আহত অবস্থায় পড়ে আছেন। শিবনাথবাবু বঙ্কিম মুখার্জীকে কোন মতে শ্রমিকদের ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বঙ্কিমবাবুর মুখে ঘটনার বৃত্তান্ত শুনতে পেয়ে বুঝলেন এটা ঐ ভাড়াটে গুণ্ডাদেরই ঘৃণ্য কাজ। এমনি ছিল সেদিনের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে সম্পর্ক।* এই ধর্মঘট উপলক্ষে পণ্ডিত জহর লাল নেহরু বাউড়িয়ায় এসে একটি বিবৃতি প্রচার করে ধর্মঘটকে সমর্থন করে যান।[২১]

শিল্প শ্রমিকদের মত হরিজনদের অর্থনৈতিক দাবি দাওয়া আদায়ের জন্য জেলায় প্রথম শ্রমিক-ইউনিয়ন গড়া হল হাওড়া পৌর সভায়। সালটা ছিল ১৯৩০। উদ্যোক্তা ছিলেন অতুল রায় নামে মধ্য হাওড়ার জনৈক ব্যক্তি। তিনি অবশ্য কোন রাজনৈতিক মতাবলম্বীর সমর্থক ছিলেন না। নেহাৎ সমাজ সেবামূলক মনোভাব থেকেই হরিজনদের সংঘবদ্ধ করে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করেছিলেন—যেমন মদ, জুয়া বা অন্যান্য বদ অভ্যাস থেকে মুক্ত হওয়া ইত্যাদি। রেলের শ্রমিক নেতা জটাধারী বাবাও ঐ একই মানসিকতা নিয়ে শ্রমিক আন্দোলন করতে নেমেছিলেন। অতুলবাবুর প্রতিষ্ঠিত পৌর ইউনিয়নটির নাম ছিল 'হাওড়া মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন'। পরবর্তীকালে মনসা চরণ দে হরিজনদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। হরিজনদের সেবা করতে গিয়ে অতুলবাবু একজন হরিজন মহিলাকে বিবাহ করে হরিজন পল্লীতেই জীবন কাটিয়ে যান।

১৯৩৯ সাল। হাওড়া পৌর সভার তদানীন্তন চেয়ারম্যান ছিলেন বিশিষ্ট আইনবিদ বরদাপ্রসন্ন পাইন। হরিজন কর্মীরা তখন ধর্মঘট করল। সেই সময়ে

* এই তথ্যটি প্রদান করেন হাওড়া পৌর সভার সোস্যালিষ্ট শ্রমিক নেতা অর্ধেন্দু শেখর বসু।

মোষের গাড়ি দিয়ে শহরের 'নাইট সয়েল' পরিষ্কার করার ব্যবস্থা ছিল। ধর্মঘট বানচাল করার জন্য বরদাবাবু কয়েকদিনের মধ্যেই কয়েকটি মোটর গাড়ী মারফৎ নাইট সয়েল পরিষ্কার প্রথা চালু করে ধর্মঘট ভেঙ্গে দিলেন।

এদিকে মনসা চরণ দে প্রতিদিন হরিজনদের পল্লীতে গিয়ে তাদের হৃদয় জয় করার চেষ্টা করলেন। তাঁরই নেতৃত্বে ১৯৪৫ সালে পৌর কর্মীদের এক সর্বাত্মক ধর্মঘট হয়। তখন হাওড়া পৌর সভার চেয়ারম্যান ছিলেন শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় —পরে তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার স্পিকার ও রাজ্যের অর্থমন্ত্রীও হয়েছিলেন। এই ধর্মঘটের বছর দুই পরে আবার শ্রমিকরা দাবি পত্র পেশ করে। এবার দাবি-পত্রটির বিরুদ্ধে লেবার ট্রাইবুন্যালে মামলা করা হল। এই ট্রাইবুন্যালের রায়কেই **S. N. Modak's Award** আখ্যা দেওয়া হয়। তাঁর সুপারিশ অনুযায়ী হাওড়া পৌর সভায় ন্যূনতম মজুরী (**Minimum Wage**) (**Rs 50/-**) আইন প্রথম চালু হল। মাহিনা বৃদ্ধি ছাড়া চাকুরী স্থায়ীকরণ ও প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড চালু হল। এরপর উচ্চশ্রেণীর বাবুরা 'হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্মচারী সংঘ' নামে একটি পৃথক সংস্থা তৈরী করেন। যেটা আজও বর্তমান রয়েছে। আর হল 'হাওড়া মিউনিসিপ্যাল এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন'। এখানে একটি বিশেষ ঘটনার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন —কারণ এই ঘটনাটির মাধ্যমে তদানীন্তন শ্রমিক নেতাদের নৈতিক মানের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। মনসাবাবু ও তাঁর সহকারী অর্ধেন্দু শেখর বসু দাবি তুললেন যে পৌর সভার 'ডাবল সার্ভিস' (**Double Service**) করা চলবে না। এই দাবিকে স্বয়ং তদানীন্তন কংগ্রেসী ভাইস-চেয়ারম্যান ডাঃ বেণী দত্তও পূর্ণ সমর্থন করেন। ফলে প্রায় সাতশোর মত কর্মীর কাজ চলে যায়। স্বভাবতই শ্রমিকদের একটা অংশ তাঁদের উপর ভীষণ রুষ্ট হয় এবং অপর একটি ইউনিয়ন আর. সি. পি. আই-র নেতৃত্বে সংগঠিত হয়—কিন্তু বেশি দিন সেটি স্থায়ী হয়নি।

১৯৪৯ সালে পৌর সভার জঞ্জাল বিভাগের কর্মীদের বাদ দিয়ে অন্যান্য বিভাগের কর্মচারীদের নতুন বেতন হার ও ইনক্রিমেণ্ট চালু করা হল। এতে মনসাবাবুরা আবার হরিজন ইউনিয়নের ধর্মঘট শুরু করেন। মনসাবাবুকে চাকরীচ্যুত করা হল। কিন্তু ১৯৫১ সালে 'ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ ব্লক' কংগ্রেস বোর্ডকে হারিয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করে। চেয়ারম্যান হন কার্তিক চন্দ্র দত্ত। মনসাবাবু আবার চাকরী ফিরে পান। কিন্তু এই বোর্ড সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত হওয়ায় প্রশাসক নিযুক্ত হন। নির্বাচনে আবার কংগ্রেস পৌর সভা লাভ করলে রবীন্দ্র লাল সিংহ (পরে মন্ত্রীও হন) চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। মনসাবাবুর নেতৃত্বে একদিন বোর্ডের সভার পর চেয়ারম্যান সমেত সব কমিশনারদের রাতভোর জঞ্জাল সাফাই বিভাগের কর্মীরা আটকে রাখে। পরের দিন সকাল বেলা পুলিশ এসে তাঁদেরকে মুক্ত করে। আবার মনসাবাবুর চাকরী যায়। এবার অবশ্য সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে মনসাবাবু চাকরী ফিরে পান। ১৯৬৩ সালে মনসাবাবুর মৃত্যু হলে তাঁর সহকর্মী অর্ধেন্দু শেখর বসু ঐ ইউনিয়নের পরিচালন ভার গ্রহণ করেন।

তাঁরই আমলে হাওড়া পৌর সভায় ১৯৬৫ সালে এক দীর্ঘস্থায়ী জঞ্জাল সাফাই বিভাগের ধর্মঘট হয়। চলে আশিদিন ধরে। ধর্মঘটের কারণ ছিল তাঁদের নেতা অর্ধেন্দু বসুকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা নিয়ে। যদিও শ্রমিকরা মাত্র দশদিনের মাইনে পেয়েছিল—কিন্তু তাদের নেতাকে চাকরীতে আবার বহাল করিয়ে ইউনিয়নের স্বীকৃতি আদায় করেছিল।

আবার শিল্প কারখানার শ্রমিক আন্দোলনের আলোচনায় ফিরে আসা যাক। ১৯৩০-৩১ সাল। শালকিয়ার জি. টি. রোডে ব্রিট্যানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় উত্তর প্রদেশীয় শ্রমিক ধরমবীর সিংহের নেতৃত্বে এক ধর্মঘট হয়। এই ধর্মঘট খুবই জঙ্গী আন্দোলন ছিল। তিনি কম্যুনিষ্ট শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন; কিন্তু পরে তাঁকে Terro-Communist বলে চিহ্নিত করে পার্টি থেকে বের করে দেওয়া হয়।

বঙ্গদেশে তখন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ঘাঁটি ছিল দুটি জায়গায়—একটি মেটিয়াবুরুজ অপরটি ঘুষুড়ি। ঘুষুড়ির পুরানো বাজারে একটি দোতলা ঘরে ছিল 'বেঙ্গল লেবার পার্টির' অফিস। ১৯৩৬-৩৭ হবে। ডঃ নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের (ব্যারিষ্টার) তৈরী এই লেবার পার্টির অফিসই তখনকার দিনে হাওড়া শহরে শ্রমিক আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল।

পাটকল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও বস্ত্র শিল্প অধ্যুষিত অঞ্চল এই ঘুষুড়িতে তখন আনাগোনা হোত বঙ্গদেশের প্রথম শ্রেণীর শ্রমিক নেতাদের। তাঁদের অনেকেই আজ হয়তো আমাদের মধ্যে নেই—শুধু আছে তাঁদের রেখে যাওয়া স্মৃতি কথা ও শ্রমিক স্বার্থে সুকর্মের কিছু ফল। সেদিনের উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে ছিলেন শিবনাথ ব্যানার্জী, তারকনাথ ব্যানার্জী, কালী মুখার্জী, বলাইচন্দ্র সিংহ, বঙ্কিম মুখার্জী, কেশব ব্যানার্জী, ডাঃ রণেন সেন, আবদুল মোমিন, বীরেন ব্যানার্জী, এম. এ. জামান, জীবন মাইতি, শিশির গাঙ্গুলী, পতিতপাবন পাঠক, কমল সরকার, অবনী মুখার্জী প্রমুখ।

শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া ও কাজের ঘণ্টা নির্দিষ্ট করার দাবিতে সে-সময় বঙ্গদেশের শিল্প কারখানাতে শ্রমিক সংগঠনগুলির কাজ বেশ জোর কদমে চলছে। শুধু অর্থনৈতিক নয় রাজনৈতিক দাবিও এর সঙ্গে যোগ হল। হাওড়া শহরের শ্রমিক শ্রেণী সেই আন্দোলনে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। ইংরেজকে 'মেন এ্যাণ্ড মানি' কোনটা দিয়েই সাহায্য না করার দাবিতে ঘুষুড়ির ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং কোম্পানীতে দুমাস ধরে ধর্মঘট চলেছিল। শ্রমিকদের শ্লোগান ছিল—'না এক পাই, না এক ভাই'—অর্থাৎ সাম্রাজ্য-বাদী ইংরেজকে যুদ্ধে এক পাইও দেব না এবং যুদ্ধে এক ভাইও যাবে না। এটি পরিচালিত হয়েছিল এ. আই. টি. ইউ. সি-র উদ্যোগে। শালকিয়ার সন্তোষ গাঙ্গুলী, বীরেন ব্যানার্জী, আতঙ্কহরি পাঁজা ও সুরেন দাস নেতৃত্বে ছিলেন। শেষোক্ত দুজন ছিলেন ঐ কোম্পানীরই কর্মী।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই মার্টিন বার্ন, শালিমার পোর্ট এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, বামার লরী, হুগলী ডক, গেণ্টকিন উইলিয়মস, রাধেশ্যাম কটন মিল, হোড়মিলার কোম্পানী প্রভৃতিতে ইউনিয়ন গঠিত হয়েছে। যুদ্ধের সমরাস্ত্র তৈরীর জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলিতে বাড়তি শ্রমিকের চাহিদা—কিন্তু সুতো কলগুলিতে মন্দাহেতু ছাঁটাই শুরু হল।

এতদিন রাজনৈতিক মতবাদকে গৌণ করে জাতীয়তাবাদী, সোসালিষ্ট ও কম্যুনিষ্টরা একযোগে শ্রমিকদের স্বার্থে অথচ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়ে আসছিল। কিন্তু হিটলার সোভিয়েট রাশিয়াকে আক্রমণ করলে কম্যুনিষ্টরা এদেশে 'জনযুদ্ধে'র আওয়াজ তুলে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় এগিয়ে গেলেন। ফলে দেশের জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তাই বিভিন্ন শিল্প সংগঠনে জাতীয়তাবাদী ও সোসালিষ্টদের প্রভাব শ্রমিক শ্রেণীর উপর ভীষণ ভাবে দেখা দিল। ইংরেজ এই প্রভাব কমাবার জন্য শ্রমিকদের মধ্যে বড় বড় কারখানায় কিছু নতুন সুযোগ সুবিধা চালু করে। অবশ্য এর আর একটি কারণও ছিল যাতে শ্রমিকরা শহর ছেড়ে গ্রামে চলে না যায়। উল্লেখ্য, সেই সময় কলকাতা ও হাওড়া শহর প্রায় যুদ্ধাতঙ্কে ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল।

এই সময় শিবপুরের গেষ্টকিন উইলিয়ামসে দুই শ্রমিক নেতা হরিপদ মজুমদার ও মহম্মদ আবদুল্লার নেতৃত্বে কুড়ি টাকা করে মহার্ঘ্যভাতা আদায়ে ধর্মঘট করে সফল হন। বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা শিবনাথ ব্যানার্জীর সান্নিধ্যে এসে সোসালিষ্ট শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে হরিপদবাবু '৫২ সাল পর্যন্ত শালিমার থেকে বালি অবধি 'ইঞ্জিনিয়ারিং মজদুর সভা' নামে একচ্ছত্র ইউনিয়ন গড়েন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সমর উপকরণ উৎপাদন চালু রাখার জন্য ইংরেজ শাসক 'সাইরেন অ্যালাউন্স' চালু করেন। দিনে যতবার বিমান সঙ্কেত বাজবে ততবার বার আনা হারে ঐ টাকা শ্রমিকরা বাড়তি ভাতা পাবে। এ ছাড়া শ্রমিকদের সহানুভূতি পাবার জন্য বড় বড় কারখানায় ন্যায্যমূল্যে চাল, ডাল, ভোজ্য তেল দেবার বব্যাস্থা হয়েছিল। এমনকি রেশনে জামা কাপড়ও দেওয়া হত।

যুদ্ধের জন্য কয়েক বছর ধর্মঘটের ঘটনা কম থাকলেও ১৯৪৪ সালের শেষ থেকে আবার শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিতে থাকে। এই আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী শ্রমিক সংগঠনগুলি শ্রমিকদের উপর ভীষণ প্রভাব বিস্তার করতে লাগলো। সে সময়ের উল্লেখযোগ্য ধর্মঘট হল ইংরেজ কোম্পানী পরিচালিত কলকাতার ট্রাম কোম্পানীতে। শালিমার থেকে বালি পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ারিং ও চটকলে সোসালিষ্ট নেতা শিবনাথ ব্যানার্জীর অসীম প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। চটকলগুলিতে কম্যুনিষ্ট নেতাদের সংগঠন অবশ্য ভালই ছিল। কিন্তু জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে 'জনযুদ্ধের' শ্লোগান তাঁদেরকে শ্রমিক শ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল ১৯৪৬ সালে হাওড়া শ্রমিক কেন্দ্রের নির্বাচনে বিশিষ্ট কম্যুনিষ্ট শ্রমিক নেতা বঙ্কিম

মুখার্জীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয় সোসালিষ্ট শ্রমিক নেতা শিবনাথ ব্যানার্জীর কাছে। ১৯৪৬ সালে ২৯শে জুলাই পি এণ্ড টি (পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ) শ্রমিকদের সমর্থনে কলকাতার মনুমেণ্টের তলায় (বর্তমান শহীদ মিনার) যে বিরাট শ্রমিক শোভাযাত্রা হয়েছিল তা হাওড়া থেকে পরিচালনা করেন শিবনাথবাবু ও সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৪৫-৪৬ সালে মার্টিন বার্ন ও নিসকোতে ধর্মঘট হয়, শিবপুরের অবনী মুখার্জীর নেতৃত্বে। এই সময়ে শালিমার ওয়ার্কসের এক কর্মী উক্ত কোম্পানীর ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করে শ্রমিক আন্দোলনে এক বিশেষ স্থান করে নেন—তাঁর নাম মহম্মদ ইলিয়াস। মহম্মদ ইলিয়াসের নিজের কথায় বলি—'সাম্রাজ্যবাদ, সোসালিজম ও ট্রেড ইউনিয়নের উপর শিবনাথবাবুর তিন মিনিটের এক বক্তৃতা আমার মনে বিশেষ দাগ কাটে। সেই অর্থে তিনি ছিলেন আমার 'গুরু'।' পরে তিনি কম্যুনিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে যোগ দিয়ে শীর্ষ নেতৃত্বে আসীন হন। ১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালে দুবার হাওড়া সদর কেন্দ্রে কম্যুনিষ্ট প্রার্থী হিসেবে লোক সভায় নির্বাচিত হন। মহম্মদ ইলিয়াস স্বাধীনোত্তর যুগে শ্রমিক শ্রেণীর এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক ছিলেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক সমরেশ বসু তাঁর 'শিকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে' উপন্যাসে মহম্মদ ইলিয়াসকেই শিকল ছেঁড়ার নায়ক হিসাবে অঙ্কিত করেছিলেন। এই উপন্যাসের জন্য দিনের পর দিন ইলিয়াসের সঙ্গে সমরেশবাবু আলোচনা করেছেন।[২২] ইলিয়াস সাহেবের মৃত্যু ঘটে ২৫শে নভেম্বর, ১৯৯০ আর্থিক দৈন্যের মধ্যে।

এখানে আব্দুল মোমিন নামে অপর এক শ্রমিক নেতার কথা উল্লেখ করতে হল। উড়িষ্যার বারীপদার অধিবাসী হয়েও বঙ্গদেশের হাওড়া জেলায়ই তাঁর ঘর বাড়ি ছিল। শ্রমিকদের জন্য আন্দোলন করে তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর শ্রমিক নেতায় উন্নীত হন। তিনি 'মণিদা' ছদ্মনামে শালিখাবাসীর কাছে পরিচিত ছিলেন। পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্যই তিনি এই ছদ্মনাম নেন। কারণ তিনি ছিলেন বিপ্লবীদলের কর্মী। পাঠক জেনে হয়তো অবাক হবেন যে কলকাতার বর্তমান ফুটবল ও ক্রিকেটের এ ডিভিসন ক্লাব শালকিয়া ফ্রেন্ডস এসোসিয়েশনের (৮২ বছরের) প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন এই 'মণিদা' আসলে আব্দুল মোমিন।

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে। শ্রমিকদের নিয়ে নিজস্ব পতাকাতলে একটি আলাদা শ্রমিক সংগঠন করলেন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ—যার নাম ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সংক্ষেপে আই. এন. টি. ইউ. সি. নামে খ্যাত। এতদিন কিন্তু এ. আই. টি. ইউ. সি. সংগঠনই সংশিষ্ট শ্রমিক আন্দোলনের জন্য একটিই মঞ্চ ছিল।

বলা বাহুল্য, এই সময় আই. এন. টি. ইউ. সি-র পতাকাতলে শ্রমিক শ্রেণী এসে মিলিত হ'ল। কংগ্রেস সরকার বিভিন্ন শিল্পে ট্রাইব্যুনাল বসাতে শুরু করলেন। ফলে শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি, শ্রমিক স্বার্থে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন ইত্যাদি হতে লাগল। অপরপক্ষে, কম্যুনিষ্ট নেতারা 'এ আজাদি ঝুটা হ্যায়' বলে শ্লোগান

তুলে শ্রমিকদের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হন। কংগ্রেসের শ্রমিক নেতাদের মত সোসা-লিষ্ট শ্রমিক নেতারাও কম্যুনিষ্টদের সঙ্গ ত্যাগ করে 'হিন্দ মজদুর সভা' নামে একটি সর্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠন তৈরী করলেন। ১৯৪৮ সালে এই সংগঠনেরও প্রথম বার্ষিক শ্রমিক সমাবেশ হয় হাওড়া ময়দানে। সভাপতিত্ব করেছিলেন বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা আর. এস. রুইকর এবং সম্পাদক হন বিখ্যাত শ্রমিক নেতা অশোক মেটা। ১৯৪৭ সালের পর হাওড়ার শিল্পাঞ্চলে আই. এন. টি. ইউ. সি-র শক্তি খুবই বেড়ে যায়। এ. আই. টি. ইউ. সি. থেকে বিশিষ্ট কম্যুনিষ্ট শ্রমিক নেতা কালী মুখার্জী আই. এন. টি,ইউ. সি-তে যোগ দেন। বেলুড়ের তারাদাস ভট্টাচার্য উত্তর হাওড়ার বিভিন্ন সুতো কলের শ্রমিকদের মাইনে বৃদ্ধি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আদায়ে সক্ষম হন। তাঁরই নেতৃত্বে ১৯৫০ সালে শালকিয়ার ধর্মতলায় কেদারনাথ জুট মিলের ধর্মঘটে মালিকপক্ষের দালালদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে অহিংস আন্দোলন জঙ্গী আন্দোলনে পরিণত হয়। সেই সময় নেপালে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কৈরালা ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে নেপাল কংগ্রেস আন্দোলন করছিল। তিনি তাতে যোগ দেন। সেখানে বোমা তৈরী করতে গিয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[২৩]

প্রথমে বিরূপ মনোভাব থাকলেও পরে শিল্প ট্রাইবুন্যালে কম্যুনিষ্টরা অংশগ্রহণ করতে থাকে। এই ট্রাইবুন্যালের সুপারিশ অনুযায়ী শ্রমিকদের জন্য প্রথম প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড চালু হল। শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবি আদায়ে মালিকদের বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্ট শ্রমিক নেতারা কংগ্রেস নেতাদের ছাড়িয়ে দাবি-দাওয়া পেশ করতে লাগলেন। ফলে দয়ারাম বেরী, শিশির গাঙ্গুলী, তারক ব্যানার্জী, কেশব ব্যানার্জী ও শ্রীমতী কমলাদেবীর মত ঝানু কংগ্রেসী শ্রমিক নেতারা থাকা সত্ত্বেও চটকল ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ১৯৫২ সালের পর থেকে এ. আই. টি. ইউ. সি-র বীরেন ব্যানার্জী, মহম্মদ ইলিয়াস, সমর মুখার্জী, সন্তোষ গাঙ্গুলী, জহর ঘোষ, কালী চক্রবর্তী, হরলাল দত্ত, সন্ন্যাসী পট্টনায়ক, রবীন ভট্টাচার্য, হরিসাধন মিত্র প্রমুখ কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দের প্রভাব বাড়তে থাকে। এই সময় মুখার্জীই একাধিক বার হাওড়া শহর থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হন। তিনি আজ আর কেবল পশ্চিম-বঙ্গের শ্রমিক নেতাই নন—ভারতবর্ষের বিশিষ্ট শ্রমিক নেতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। হাওড়া বেলিলিয়াস অঞ্চলে ক্ষুদ্র কুটির শিল্পে শ্রমিক সংগঠনে ছিলেন আর. সি. পি. আই-এর অনাদি দাস ও শৈলেন হাইত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

উলুবেড়িয়া, সাঁকরাইল ও বাউড়িয়া অঞ্চলে ছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের শ্রমিক নেতা নানু ঘোষ, ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য (প্রাঃ মন্ত্রী) ও ব্যবহারজীবী অরবিন্দ ঘোষাল (প্রাঃ সাংসদ)। লিলুয়া ও বালি অঞ্চলে ক্ষুদ্র ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের নেতা ছিলেন তদানীন্তন (১৯৫৪—৬২ সাল) ফরওয়ার্ড ব্লকের বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা সরোজ কুমার ঘোষাল। হিন্দু মজদুর সভার বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা ছিলেন রামচন্দ্র শর্মা, ফকিরা সিং ও যুবরাজ কাঁড়ার। শিবপুরে রাম সেন ও ভজন দাশগুপ্ত বিশিষ্ট শ্রমিক নেতাদের অন্যতম।

পশ্চিমবঙ্গে ডাক ও তার বিভাগে দুটি শক্তিশালী ইউনিয়ন বর্তমান রয়েছে—একটি কম্যুনিষ্ট পার্টি (এম) পরিচালিত, অপরটি জাতীয়তাবাদী বিশেষ করে কংগ্রেস পরিচালিত। প্রথমোক্ত ইউনিয়নটির নাম N. F. P. T. E (National Federation of Postal and Telegraph Employees.) ইহার প্রতিষ্ঠাকাল ২৬শে নভেম্বর ১৯৫৪। যদিও প্রথমদিকে ন্যাশানাল কথাটি ছিল পরে ঐ কথাটিকে বাদ দিয়ে নাম হয় F. P. T. E যার অন্যতম নেতা ছিলেন কে. জি. বসু। অপরপক্ষে জাতীয়তাবাদী কর্মীদের নিয়ে অনেক পরে ১৯৬৯ সালে ৩০শে অক্টোবর F. N. P. T. O (Federation of National Post & Telegraph Organisation) গঠিত হয়। বর্তমানে আবার টেলিকমিউনিকেশন বিভাগ আলাদা হওয়ায় তার নাম হয় F. N. P. O—এটি একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যে জাতীয়তাবাদী সংগঠনটি তৈরী হয়েছিল প্রথমে তার নাম ছিল National Union of Postal Employees (W. B.) Class 3 & (NUPE) Class 3. এই ইউনিয়নটি কিন্তু জন্মলাভ করেছিল হাওড়াতেই প্রথম এবং উহার মূল উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন বিভাগীয় কর্মী নীলরতন ভঞ্জ, বিনয়কুমার চক্রবর্তী (উভয়েই হাওড়ার), ধীরেন গুহ ও শৈলেন দত্ত (উভয়েই কলকাতার)। শিবপুরে কেশব চক্রবর্তীর বাড়িতে ১৯৬৯-তে এক গোপন বৈঠকে এই সমিতি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আজ সেই সংগঠনটি সর্বভারতীয় স্তরে FNPO-র শাখা সংগঠনরূপে পশ্চিমবঙ্গে সব জেলায় শক্তিশালী হয়েছে পুলিন সাহার নেতৃত্বে।

পশ্চিমবঙ্গে আর এক জবরদস্ত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হচ্ছেন কল্যাণ ভদ্র। ট্যাক্সি ও পেট্রোল ডিলার্স এসোসিয়শানের নেতা তিনি। কোন কোন মন্ত্রীকেও বলতে শোনা যায় যে তিনি নাকি ইচ্ছা করলে কলকাতার যানবাহন অচল করে দিতে পারেন। তর্কে না গিয়েও দেখা গেছে যে কোন কোন মন্ত্রী নিজে থেকেই সমস্যায় পড়লে তাঁকে রাইটার্সে জরুরী তলব করে থাকেন। এই কল্যাণ ভদ্র শালকিয়া এ. এস. স্কুলে পড়াশুনা করে অর্দ্ধেক জীবনই শালকিয়া গোলমোহরে রেল কলোনীতে কাটিয়ে গেছেন। আদি বাড়ি ছিল খুলনায় (বাংলাদেশ)। তারপর বারাসতে বাড়ি করেন, বর্তমানে তিনি কলকাতাবাসী।

কিন্তু ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চলগুলিতে শ্রমিক ইউনিয়নগুলি বামপন্থী বিশেষ করে কম্যুনিষ্টদের আওতায় চলে যেতে শুরু করে। কেবল বৃহৎ শিল্পেই নয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পেও ইউনিয়ন গড়ার একটা ঝোঁক দেখা দেয়। 'এ লড়াই বাঁচার লড়াই' শ্লোগানটি সেদিনের শ্রমিকদের প্রবল ভাবে আকৃষ্ট করে। এই সুযোগটা বামপন্থী ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক নেতাদের ফাঁক দিয়ে নবীন কর্মীরাও ট্রেড ইউনিয়নে আত্মনিয়োগ করতে এগিয়ে এলেন। মাঝারি ও ছোট কারখানাগুলিতে অসংগঠিত শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবি আদায়ে আত্মনিয়োগ করে অধ্যবসায় ও সততা বলে একজন আঞ্চলিক শ্রমিক নেতা কিভাবে পশ্চিমবঙ্গের একজন প্রথম সারির নেতা হতে পারেন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ চিত্তব্রত

মজুমদার। পশ্চিমবঙ্গের (সেণ্টার অফ্ ইণ্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন) তিনি বর্তমানে সাধারণ সম্পাদক ও অল ইণ্ডিয়া কমিটির সদস্য। পৈত্রিক নিবাস পাবনা (বাংলা দেশ)। জন্মস্থান ঢাকা। দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গেই পরিবারের সকলে চলে আসেন শালকিয়ায়। সালকিয়া এ. এস. স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করেন। ট্রেড ইউনিয়নের হাতেখড়ি হয় সমর মুখার্জীর (প্রাঃ সাংসদ) হাতে হুগলী ডক ইউনিয়নের মাধ্যমে। প্রায় দশ বছর পর শ্রীমজুমদার হাওড়ায় নিজ উদ্যোগে প্রথম তৈরী করেন 'হাওড়া মেটাল এণ্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন।' মাঝারি ও ছোট ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকদের এটি আজও জেলার বৃহত্তম ইউনিয়ন। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসাবে তিনি এটিকে বেশকিছু বছর ধরে সেবা করে গেছেন। এছাড়া হাওড়ার ব্রীজ এণ্ড রুফ ও সালকিয়ায় Reyrolle Burn কোম্পানীতে ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইঞ্জিনিয়ারিং, চটকল ও সুতোকলের আর এক প্রবীণ শ্রমিক নেতার নাম হচ্ছে হরিসাধন মিত্র। জেলার শ্রমিক আন্দোলনে তাঁর সংগ্রামী ভূমিকাও স্মরণে রাখার মত।

শিল্প জগতের সঙ্গে পরিচিত প্রায় সকলেই জানেন যে হাওড়া জেলার দুটি প্রধান শিল্প হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং ও পাট শিল্প। একদা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের শ্রমিক সংগঠনের প্রভাব ও গুরুত্ব অপরাপর শিল্পকে পথ দেখাতো। তাদের আন্দোলনে অন্যান্য শিল্পের শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবি আদায়ে বিশেষ প্রভাব ফেলতো। বহু বছর ধরেই ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিক সংগঠনের সেই প্রাধান্য আজ আর নেই। সত্তরের দশকে পাট শিল্পের ইউনিয়নগুলি সেই স্থান অধিকার করে নেয়। কিন্তু আশির দশক থেকে আবার পাট শিল্পেরও অবস্থা প্লাস্টিক ও পলিথিনের আগমনে সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে। সেই সংকট সমাধানে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর 'ম্যাণ্ডেটারী জুট প্যাকেজিং এ্যাক্ট' মাধ্যমে সাময়িক স্বস্তি পাওয়া গেলেও আবার পাটজাত দ্রব্যের বাজার সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। ফলে পাট শিল্পের বহু মিলই হয় রুগ্ন নয় বন্ধ হতে থাকে। ইতিপূর্বে পাট শিল্পের শ্রমিকরা ধর্মঘটের ভয় প্রদর্শন করতো মজুরী বৃদ্ধি করার জন্য। কিন্তু আশির দশক থেকে বিপরীত চিত্র দেখা গেল। এখন শ্রমিকদের ধর্মঘট করার আগেই মালিক মিলে লক-আউট ঘোষণা করে দিচ্ছেন। এরকম অবস্থা আগে কদাচিৎ দেখা যেত। নব্বুই-এর দশকে ফুলেশ্বরের কানোরিয়া জুট মিলকে কেন্দ্র করে প্রফুল্ল চক্রবর্তীর নেতৃত্বে শ্রমিকরা আন্দোলনের সামিল হয়। এতকাল এই জুটমিলের শ্রমিকরা প্রচলিত বিভিন্ন রাজনৈতিক (ডান / বাম) ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের পতাকাতলে থেকেই তাদের দাবি দাওয়ার জন্য লড়ে আসছিল। কিন্তু '৮৯-৯০ সাল নাগাদ ঐ মিলটি রুগ্ন বলে ঘোষিত হওয়ায় উহার মালিকানার হাত বদল হয়। জুট ব্যারোন গোবিন্দ সারোদার হাত থেকে শিব শংকর পাসারীদের হাতে মিলটির পরিচালনার ভার পড়ে। চুক্তিমত ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় পাসারীরা মিলটি চালাতে রাজী হন। কিন্তু নব্বুইয়ের দশকের শুরু থেকেই দেশের 'শিল্পে উদারীকরণ' নীতি চালু হলে

ব্যাংক রুগ্নশিল্পে টাকা বিনিয়োগ করতে অনিচ্ছুক হয়। ফলে পাসারীরাও ঐ মিল খোলার ব্যাপারে অনাগ্রহী হয়ে পড়েন। শ্রমিকরা দীর্ঘদিন ধরে বেকার হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় শ্রমিকরাও হয়ে উঠে দিশেহারা। শ্রমিকদের দুঃখ দূরীকরণে প্রফুল্ল চক্রবর্তী ও তাঁর সহযোগীরা শ্রমিকদের নিয়ে মিলের সামনে জঙ্গী আন্দোলন শুরু করেন। সাধারণ লঙ্গরখানা খুলে শ্রমিকদের দু'বেলা আহারেরও ব্যবস্থা করেন। অর্থ সংগ্রহের জন্য (দেশী / বিদেশী) নানা প্রকারের অভিযানও করা হয়। সন্নিহিত গ্রামগুলি থেকেও নানা প্রকারের শাকশব্জী ও চাল সংগ্রহ করে লঙ্গরখানাগুলি চলতে থাকে। নব্বুইয়ের দশকের প্রথমার্দ্ধে ('৯৩-'৯৪) সালের সংবাদপত্র পাঠেই সেই খবর পাওয়া যাবে। অবশেষে রাজ্য সরকারের মধ্যস্থতায় শ্রমিক মালিক বৈঠক বিশেষ করে সেই সময় পাটের দাম কমে যাওয়ায় মালিক পক্ষ মিল খুলতে রাজী হয়ে এক বোঝাপড়ায় উপনীত হন। সেই থেকে আজও মিলটি উৎপাদন চালিয়ে যাচ্ছে। এই আন্দোলনে যেটা চোখে পড়ার বিষয় ছিল সেটা এই যে, প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষের উপর শ্রমিকদের আস্থার সংকট। কিন্তু এ কথাও বলতে হবে যে, কিছু দিন চলার পরই প্রফুল্লবাবুর ইউনিয়নও আবার দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। আসলে আপাত মধুর স্লোগানে শ্রমিকরা অনেক সময়ই এক নেতৃত্ব ছেড়ে অন্য নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে—কারণ কোন শ্রমিক সংগঠনই শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে সচেতনতা আনতে সক্ষম হন না। তাই দেখা যায়, সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে ইউনিয়ন বদলের পালাও জোরদার হয়ে উঠে। আজকাল প্রায়ই বলতে শোনা যায় ট্রেড ইউনিয়ন নয়—ইউনিয়ন ফর ট্রেড। মন্তব্যটি ভেবে দেখার মত।

---

১. ২. ৪. ৫. ৬. ৮, ৯, ১২. Working Class of India—Sukumal Sen.

৩. ভারত শ্রমজীবী—অধ্যাপক কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

৭. Howrah Labour Union—1920.

১০, ১১, ১৫. ১৮, ১৯. Shibnath Banerjee & his times—Sajal Bose.

১৩, ১৪. The Quarterly Review of Historical Studies—Labour Protest in Howrah Jute Mills—Amal Das. Vol XXV 1986 Nov. 4.

১৬. Amrita Bazar Patrika—4th April 1928. কিন্তু সজল বসু তাঁর Shibnath Banerjee & his times বইতে পাঁচজন মৃত বলে উল্লেখ করেছেন।

১৭. শালিখার ইতিবৃত্ত—হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

২০. শ্রমিক নেত্রী সন্তোষ কুমারী—মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়।

২১. শতবর্ষের আলোকে হাওড়া জেলা পরিষদ—দুঃখহরণ ঠাকুর চক্রবর্ত্তী।

২২. যুগান্তর—২৭শে নভেম্বর—১৯৯০।

২৩. শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ—বালি সাধারণী সভা।

শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্

আমাদের দেশের শাস্ত্রীয় অনুশাসনে বলা হয়েছে—শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্। অর্থাৎ সুস্থ শরীর ছাড়া ধর্ম সাধন হয় না। স্বামী বিবেকানন্দও বলতেন—গীতা পড়ার চেয়ে ফুটবল খেলাও ভাল। একথা বলারও একই উদ্দেশ্য—তা হচ্ছে এই যে অসুস্থ শরীরে সাধন-ভজন করা সম্ভব নয়। তাই চাই সুস্বাস্থ্য। হাওড়া জেলায় পুরানো দিনে অনেক নাম করা ব্যায়ামাগার তৈরী হয়েছিল। তবে সে সব ব্যায়ামাগারগুলির বেশির ভাগই তৈরী হয়েছিল বিপ্লবী কাজকর্মের আখড়া হিসেবে—না হয় জাতীয় আন্দোলনে যুবশক্তিকে দীক্ষিত করার কেন্দ্র হিসেবে। সে সব ব্যায়ামাগারের সব কটি আজ আর নেই। কিন্তু সেগুলোতে তৈরী ছেলেদের সেবায় দেশমাতা আজ শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারছেন। সেই গৌরবের ইতিহাসও স্মর্তব্য।

হাওড়া জেলার কুস্তিতে বেশ নাম ছিল। কুস্তিতে এই জেলার খ্যাতি এক সময়ে সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল। এ ব্যাপারে বালি গ্রামের খ্যাতির কথাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ সম্বন্ধে বিচিত্র সংবাদও তদানীন্তন সংবাদপত্রে প্রকাশ হত। ১৮৩৬ খ্রীঃ 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার এক বিজ্ঞাপনে দেখা যায়—"বালির জনৈক কুস্তিগীর মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মহাবল ও পরাক্রম বর্ণনা করে তাঁহাকে কুস্তি শিক্ষাদান কার্যে নিয়োগ করিবার অথবা যাঁহারা কুস্তিগীর দ্বারপাল নিযুক্ত করিয়াছেন তাহাদের পরীক্ষা লইতে হইলে অনুগ্রহপূর্বক বালির দক্ষিণ পল্লীস্থ শ্রীযুক্ত জগন্নাথ চক্রবর্তী অথবা শ্রীযুক্ত মধুসূদন চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট লিপি প্রেরণ করিলে ঐ কুস্তিগীর মহাবল পরাক্রমকে তৎক্ষণাৎ তন্মাশয়ের সমীপস্থ করিব।" উপরিউক্ত বিজ্ঞাপনটি যে একজন বালির বিখ্যাত কুস্তিগীরের শক্তি সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

অপর এক ভারতবিখ্যাত কুস্তিগীরের নাম হল ভবেন্দ্র মোহন সাহা। কলকাতার দর্জিপাড়ায় ক্ষেত্রগুহের কুস্তির আখড়ার নাম তদানীন্তন ব্যায়াম জগতে সবার মুখে মুখে উচ্চারিত হত। এই আখড়ায় কুস্তি শিখেই বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন যতীন্দ্র-মোহন গুহ (গোবরবাবু)। বিপ্লবী বীর যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী (বাঘা যতীন) দেশমাতৃকার মুক্তিসাধনে শক্তি অর্জনের জন্য ব্যায়াম ও কুস্তি শিখেছিলেন এই আখড়ায়ই। আবার হাওড়ার এক গ্রামের ছেলে 'ভব' সেও পিতার আগ্রহে গ্রাম ছেড়ে ক্ষেত্রবাবুর আখড়ায় কুস্তি শিখতে এসেছিল। কয়েক বছরের মধ্যেই কুস্তি ও ব্যায়াম চর্চা করে 'ভব' হয়ে উঠলো ভীমের মত বলশালী। ভেতো বাঙালীর অপবাদ ঘোচাবার জন্য যোগ দিলেন ভারতবিখ্যাত সার্কাস পরিচালক ও ব্যায়ামবিদ প্রফেসর রামমূর্তির দলে। উনিশ বছরের ভব রামমূর্তির সার্কাস দলে ঘুরে বেড়ালেন

রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর ও যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশে। কুস্তি ও শক্তি প্রদর্শনের নানান খেলা দেখিয়ে চমৎকৃত করে দিলেন বিদেশীদের। দিকে দিকে ভববাবুর তথা বাঙালীর শক্তিমত্তার জয়ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল। পাছে শক্তি পরীক্ষায় গুরু রামমূর্তির চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয় সেই ভয়ে ঐ সার্কাস ছেড়ে যোগ দিলেন প্রফেসর কে. বসাকের 'হিপোড্রাম সার্কাসে'। তারপর আর তিনি পেছনে তাকান নি। 'বসাকের সার্কাসে' লোক ভেঙ্গে পড়তো কিভাবে ভববাবু দুই হাতে দুটি চলন্ত মোটর গাড়ীকে নিস্তব্ধ করে দিচ্ছেন। শুধু কি তাই—যুবক ভবেন্দ্রর বুকের উপর চল্লিশ মণ পাথর চাপিয়ে তার ওপর কুড়ি-পঁচিশজন লোককে গান গাইতে বসিয়ে দিতেন। এমন অদ্ভুত খেলা ও আশ্চর্য শক্তিপ্রদর্শন দর্শকরা তো ইতিপূর্বে দেখেননি! ভবেন্দ্রর এই অমিত শক্তি ও বীরত্বের প্রদর্শনী স্বয়ং জাপান সম্রাট মিকাডো পর্যন্ত দেখতে আগ্রহী হলেন।[১] সম্রাটের চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করলে ভবেন্দ্রের গলায় সম্রাট পরিয়ে দিলেন একটি স্বর্ণপদক ও (সেদিনের) সাড়ে সাতশো টাকার নগদ পুরস্কার। এই হাওড়ারই একটি গ্রামের ছেলে ছিল ভব—এর আসল নাম হচ্ছে ভবেন্দ্র মোহন সাহা। ১৮৯১ সালে জগৎবল্লভপুর থানার পাঁতিহাল গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতার নাম ছিল উপেন্দ্র মোহন সাহা। কিন্তু পাঠকের কাছে এখনও ভবেন্দ্রমোহন সাহা নামটি বোধহয় অচেনাই থেকে যাচ্ছে। কারণ এই নামে তাঁকে খুব কম লোকই চেনেন বা জানেন। তিনি আসলে 'ভীম ভবানী' নামেই বঙ্গবাসীর কাছে পরিচিত ও আদৃত। শুধু তাই নয়—স্বদেশী যুগে স্বদেশী মেলায় একবার 'ভীম ভবানী'কে এনে তাঁর শক্তি ও চমক লাগানো খেলা দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছিল যাতে বাঙলার যুব যুবসমাজ শক্তিচর্চায় আগ্রহী হয়। সেই মেলায় স্বয়ং রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাগ্মী বিপিন চন্দ্র পালও উপস্থিত ছিলেন। পাঠক জেনে আরও চমৎকৃত হবেন যে 'ভবেন্দ্রকে' 'ভীম ভবানী' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন প্রখ্যাত নাট্যকার রসরাজ অমৃতলাল বসু।[২] আর এই অমৃতবাবুরও শ্বশুর বাড়ি ছিল হাওড়া শালিখার কামিনী স্কুল লেনে।

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে শালকিয়া অঞ্চলেও কুস্তির খুব প্রচলন ছিল শালিখার ভারতাদিত্য ব্যায়ামাগারের ঊষাপতি ব্যানার্জী ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শালকিয়া স্বাস্থ্য সমিতির গোষ্ঠবিহারী সাধুখাঁ ১৯৩৬ সালে সিমলা ব্যায়াম সমিতি কর্তৃক অল বেঙ্গল রেসলিং কমপিটিসনে হেভী ওয়েট বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হন। ঐ বছরেই আট স্টোন গ্রুপে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ান হন একই ক্লাবের সদস্য অপূর্ব সরকার। এই অপূর্ববাবুই আবার ১৯৩৮ সালে বিহার অলিম্পিক কুস্তিতে বিজয়ী ঘোষিত হন। একই বছরে বেঙ্গল রেসলিং চ্যাম্পিয়ানশিপ কুস্তি প্রতিযোগিতায় ন'স্টোন বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হলেন শালকিয়া স্বাস্থ্য সমিতির শচীন গাঙ্গুলী। তিনি ঐ বছরই আবার বিহার অলিম্পিকেও বিজয়ী হন। শালকিয়ার অন্যান্য ব্যায়াম সমিতিগুলি আজ মৃতপ্রায়! কিন্তু অশীতিপর অকৃতদার

ব্যায়ামবিদ্ শচীনবাবুর প্রতিষ্ঠিত এই শালকিয়া স্বাস্থ্য সমিতি আজও সমানে চলেছে। দিনে রাতে প্রায় আশিজনের মত এখনও নিয়মিত ব্যায়াম অনুশীলন করে। শালকিয়া হাউসের জমিদার বাড়ির ছেলে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও কুস্তিতে সে সময়ে বেশ নাম করেছিলেন। শালকিয়া অঞ্চলে অনেক নামী নামী পালোয়ানও কুস্তি শেখাতে আসতেন। যেমন বিশিষ্ট কুস্তিগীর গোপীকৃষ্ণন, পিলখানার খেদান খাঁ ও পাঞ্জাবের বিল্লা পালোয়ান ও লালু সিং। পাঞ্জাবের এই লালু সিং-ই বিভূতি-ভূষণকে আর্থিক সাহায্যে কুস্তি শেখাতেন। অজিত ব্যানার্জী (বীরেন ব্যানার্জীর ভাই) ও শান্তি ব্যানার্জী এই জেলার নাম করা পালোয়ান ছিলেন। বালির মারুতি ব্যায়াম সমিতির কয়েকজন নাম করা কুস্তিগীর ছিলেন। (দ্রষ্টব্য বালি সুইমিং ক্লাব)।

নৌকো বাইচ—হাওড়া জেলার মধ্যে নৌকো বাইচ প্রথম চালু হয় সম্ভবত বালি গ্রামে ১৮৮৯ সালে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে অথবা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই গঙ্গাবক্ষে বাইচ প্রতিযোগিতা চালু হয়। এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিত বাগবাজার, বরাহনগর, শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া ও বালি প্রভৃতি স্থানের দলগুলি। উত্তরপাড়া থেকে প্রথম এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়। বলা বাহুল্য, এই বাইচ খেলায় বালির কৃতিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বহুদিন বজায় ছিল। বালির সেরা নৌকোর হালি হিসেবে নৃসিংহ মুখার্জীর নাম উল্লেখ্য। প্রথম যুগে ফ্রেণ্ডস রোয়িং ক্লাব গড়ে ওঠে—পরে অবশ্য এর নাম পাল্টে রাধানাথ (ফুটবলার) বাইচ সমিতি হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে বাইচ বন্ধ হয়ে যায়। আবার চালু হয় ১৩৫৮ সালে। পশ্চিমবঙ্গের সর্বজন শ্রদ্ধেয় রাজ্যপাল হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতেন।

কাবাডি খেলা—কাবাডি অলিম্পিক আইটেম হিসেবে সিওল অলিম্পিকে (১৯৮৮) সর্বপ্রথম তালিকাভুক্ত হয়। শুধু তাই নয়—এই বিশ্বব্যাপী কাবাডি প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষই প্রথম সোনা লাভ করে। এই কাবাডি খেলা বালিতে ১৯১৪ সালে বীরেশ্বর ব্যানার্জী বালি যুবক সমিতির উদ্যোগে প্রথম শুরু করেন। পরে বালি ও চন্দননগরের যৌথ প্রচেষ্টায় নিয়মাবলী তৈরী হলে ১৯১৭-১৮ সালে বালিতে 'চন্দ্রশেখর কাবাডি শিল্ড' প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ১৯৪৮ সালে কাবাডি খেলা ভারতীয় অলিম্পিক গেমসের অন্তর্ভুক্ত হয়। সর্বভারতীয় কাবাডি প্রতিযোগিতায় একাধিকবার বাংলা দলের দলপতি ছিলেন বালির বিখ্যাত কাবাডি খেলোয়াড় প্রভাত কুমার ব্যানার্জী। ওয়েস্ট বেঙ্গল কাবাডি ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন বালির প্রভাতবাবু (ব্যানার্জী) ও নিরঞ্জন মুখার্জী। আজ বিশ্ব অলিম্পিকে এই খেলাটি অন্তর্ভুক্ত হওয়া ও তাতে প্রথম সোনা পাওয়া হাওড়াবাসীর আনন্দ ও স্বীকৃতি স্মরণ করার মত। এই তথ্যটি দেন বালির নিশিকান্ত চ্যাটার্জী। ভারত বিখ্যাত সটপাট ছুড়িয়ে সুব্রতা দেবনাথ এই বালির মেয়ে। আন্তর্জাতিক মানের আর এক এ্যাথলেট ছিলেন অমিয় মুখার্জী।

তিনি এশিয়ান গেমসেও স্বল্প দূরত্বের দৌড়ে যোগ দিয়েছিলেন। বালির বীরেন বসু একজন বিখ্যাত লাঠিয়াল ছিলেন।

সাঁতার—এই প্রতিযোগিতায় হাওড়া জেলার কীর্তি বাংলাদেশ তথা ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্ব সাঁতার প্রতিযোগিতায়ও ছড়িয়ে পড়ে। এই ব্যাপারে জেলার বাসিন্দা ও বিশিষ্ট সাঁতারু শচীন নাগের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তিনি ১৯৫১ সালে দিল্লীতে প্রথম এশিয়ান গেমসে ভারতের হয়ে সাঁতারে প্রথম সোনা জেতেন। ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতারে তিনি ১২ বার জাতীয় চ্যাম্পীয়ান আখ্যা লাভ করেন।[৩] ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালে যথাক্রমে লণ্ডন অলিম্পিক ও হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে তিনি ভারতের হয়ে সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। সবচেয়ে আনন্দের ও গৌরবের বিষয় যে শচীনবাবু একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীও ছিলেন। ভারত সরকার ১৯৮২ সালে নবম এশিয়ান গেমসে একটি ভিলেজের নাম শচীনবাবুর নামে চিহ্নিত করে শ্রদ্ধা দেখিয়েছিলেন।[৪] এই শচীনবাবু বেনারসে জন্মালেও কলকাতায় আসেন তিরিশের দশকে। শেষ জীবনে হাওড়ার শিবপুরে বসবাস করে ১৯শে আগস্ট ১৯৮৭ সালে এখানেই দেহত্যাগ করেন।

ওয়াটার পোলো—এই প্রসঙ্গে বালিগ্রামের এক খ্যাতিমান ওয়াটার পোলো খেলোয়াড়ের নাম করতে হয়। তিনি হচ্ছেন কানাই রায়। নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের কানাইবাবু দূরপাল্লার সাঁতারু হিসাবে জীবন শুরু করলেও পরে তিনি ওয়াটার পোলোতে মনোনিবেশ করেন। এই খেলায় প্রথমে তিনি জুনিয়ার বিশ্বকাপে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৮২-তে দিল্লীর এশিয়ান গেমসে ভারতের হয়ে অংশ নিয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান লাভ করেন। উল্লেখ্য, ঐ বছরের এশিয়ান গেমসেই ভারত ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।

বালি সুইমিং ক্লাব—হাওড়া জেলায় যে কটি সুইমিং ক্লাবের নাম করা হল তার মধ্যে প্রাচীনতম সুইমিং ক্লাব হচ্ছে এটি। এই ক্লাবটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৭ সালে। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বালির প্রাচীন বাসিন্দা কালিকৃষ্ণ রায়। ক্রীড়াজগতে তিনি 'কালিদা' নামেই পরিচিত। কালিবাবুর পৈত্রিক বাস ছিল হুগলী জেলায়। প্রায় আড়াইশো বছর আগে তাঁর ঠাকুরদা ভোলানাথ রায় সরস্বতী সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক হওয়ায় বালিতে এসে বসবাস করতে থাকেন। এখান থেকেই নৌকা যোগে কলকাতার সংস্কৃত কলেজে পড়াতে যেতেন। কালে তিনি ঐ কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যালও হয়েছিলেন। কালিবাবুর পিতা সুরেন্দ্রনাথ রায় আয়-কর বিভাগে চাকুরী করতেন। যুবক বয়েস থেকেই কালিবাবুর ব্যায়াম চর্চা ও খেলাধুলার ওপর ভীষণ ঝোঁক ছিল। বালির 'মারুতি ব্যায়ামাগার' তাঁর ও সহকর্মীদের আর একটি কীর্তি। এই ব্যায়ামাগারটি তদানীন্তন যুগে বিখ্যাত কুস্তির আখড়া বলে পরিচিত ছিল। প্রসিদ্ধ কুস্তিগীর গোবর গুহ, বীরেন বসু, বিপ্লবী অমর বসু ও অতীন বসু (স্বাধীনতা সংগ্রামী) প্রমুখ ব্যক্তিগণ এখানে আসতেন। আর বিখ্যাত মুসলিম কুস্তিগীর রমজান মিয়া তো বালি ব্যারাকপুর স্কুলের পাশেই থাকতেন।

এই ব্যায়ামাগারের নামী কুস্তি লড়িয়ে ছিলেন কালি রায়, কেষ্ট চন্দ্র ভট্টাচার্য, ব্রজগোপাল রায় ও মহেশ ভট্টাচার্য। মহেশবাবু আবার কুস্তিতে ভারত চ্যাম্পীয়ান ছিলেন। এছাড়া বদ্যিনাথ ঘোষ, পাঁচকড়ি ভট্টাচার্য, নারায়ণ সরকারও কুস্তিতে বেঙ্গল চ্যাম্পীয়ান হন। আর দুর্গা চ্যাটার্জীও ভারত চ্যাম্পীয়ান হন। এঁরা সকলেই বালির অধিবাসী। কালিদা কুস্তির সঙ্গে সঙ্গে সাঁতারের প্রশিক্ষণ চালিয়ে যান—তাঁর সঙ্গে ছিলেন গোবিন্দ মুখার্জী, রতন মুখার্জী, ভবানী শংকর মুখার্জী, (প্রাঃ বিধায়ক), নন্দলাল ব্যানার্জী, প্রশান্ত মুখার্জী, বিনয় ব্যানার্জী ও জ্ঞানরঞ্জন দাস। ১৯৪৭ সালে গঙ্গাবক্ষে বালি থেকে আহিরীটোলা পর্যন্ত সাত মাইল সাঁতার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছিল আহিরীটোলা সুইমিং এসোসিয়েশন। এই প্রতিযোগিতায় বালি সুইমিং ক্লাবের বিনয় ব্যানার্জী প্রথম হয়েছিলেন। সাঁতারে এই ক্লাবের রেকর্ড শুধু জেলা কেন রাজ্যের অন্য কোন ক্লাবও তেমন ম্লান করতে পারেনি। ১৯৬০ সালে ক্লাবের সদস্য অভিজিৎ ঘোষ রাশিয়াতেও ভারতের প্রতিনিধি হয়ে সাঁতারে যোগ দিয়েছিলেন। ক্লাবের অপর দুই সদস্য বিশ্বজিৎ ঘোষ ১৯৬৪ সালে সর্বভারতীয় সাঁতারে প্রথম হন এবং সুরজিৎ ঘোষ নেপালে ১৯৬৭ সালে সাঁতারে প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৯৮০-তে মস্কো অলিম্পিকে ক্লাবেরই সদস্য অভিজিৎ ঘোষ ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। এই ক্লাব থেকেই কানাই রায় বিশ্ব ওয়াটার পোলোতে গোলকিপার হিসাবে দক্ষতা দেখিয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

ক্লাবের মহিলা সাঁতারুদের রেকর্ড সত্যই প্রশংসনীয়। শুক্লা ভাণ্ডারী ও স্নিগ্ধা ভাণ্ডারী দুই বোনই ১৯৬৭ সালে বোম্বে সর্বভারতীয় সাঁতারে দুটি বিভাগে প্রথম হয়। পরবর্তীকালে শুক্লা তো এন. আই. এস. কোচ পদে উন্নীতা হন। একই বছরে ইন্দ্রাণী বাগও বোম্বেতে সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন। কাজল মণ্ডল মহিলাদের সর্বভারতীয় সাঁতারে পুরস্কৃত হন। কেবল বাঙালী মেয়েরাই যে বালি সুইমিং ক্লাব থেকে নাম করেছে তা নয়—নেপালের মেয়ে মীনা থাপা এই ক্লাব থেকেই প্রথম শ্রেণীর সাঁতারু হয়ে বর্তমানে জাতীয় কোচ হিসাবে নিযুক্ত আছেন। মীনা থাপার বাবা বর্দ্ধমানে পুলিশ অফিসারের উঁচু পদে কাজ করতেন। তিনি তাঁর মেয়েকে ক্লাবের সভাপতি গজেন ঘোষের বাড়িতে রেখে কালিদার তত্ত্বাবধানে সাঁতার শেখান। বিখ্যাত ইংলিশ চ্যানেল সাঁতারু বুলা চৌধুরী হিন্দ মোটর থেকে সাঁতার শিখতে ও অনুশীলন করতে আসতেন বালি সুইমিং ক্লাবে। সাম্প্রতিককালে এই ক্লাবের মুখ উজ্জ্বলকারিণী হিসাবে উল্লেখ করতে হয় ঊর্মিলা ছেত্রীকে। নেপালী বাবা ও বাঙালী মায়ের মেয়ে ঊর্মিলা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও উদ্দেশ্যসাধনে যে চেষ্টা করে যাচ্ছেন তা উল্লেখ না করলে ঊর্মিলাকে বোঝা যাবে না। ঊর্মিলার পিতা রিক্সা চালিয়ে তাঁকে ভারতীয় মহিলা সাঁতারুদের মধ্যমণি করে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই ঊর্মিলা ভারতে মহিলা সাঁতারুদের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। ইদানিং কালে সর্বাণী চ্যাটার্জী ও তুলিকা বেরা নবীনদের মধ্যে সাঁতারে প্রতিশ্রুতিময়ী উঠেছে। আর এদের কোচ হিসাবে চালাচ্ছেন জ্ঞানরঞ্জন দাস (এন.

আই. এস. কোচ) ও বাদল চ্যাটার্জী। আর মহিলা কোচ হচ্ছেন গৌরী পাল ও কাজল মণ্ডল। সাঁতারু তৈরীর একটি সফল কারখানা হচ্ছে এই সুইমিং ক্লাবটি—যার সদস্য সংখ্যা প্রায় ৪০০ জন। গজেন ঘোষের প্রদত্ত পুকুরটি কালিদার পরিচালনায় সাঁতারের কালীক্ষেত্র হয়ে উঠেছে—যদিও কালিদা সম্প্রতি গত হয়েছেন।

শালকিয়াতে আধুনিক পদ্ধতিতে নির্মিত একটি সুইমিং পুলের বিশেষ অভাব ছিল। সেই অভাব শালকিয়া সুইমিং এসোসিয়েশন সম্প্রতি দূর করেছে। এই ব্যাপারে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বিশেষভাবে তাদের সাহায্য করেছেন—পারিজাত সিনেমার পাশে শ্রদ্ধানন্দ পার্ক হিসাবে একটি ছোট উন্মুক্ত স্থান ছিল এবং তার পাশেই একটি বড় পুকুরও ছিল। পুকুরটি সংস্কারের অভাবে স্থানীয় অঞ্চলের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা সৃষ্টি করে আসছিল। হাওড়া পুরসভা তাদের এই সম্পত্তিটির সংস্কার সাধনে অগ্রসর হয় ১৯৯১-৯২ সাল নাগাদ। কিন্তু হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনিয়ার অমরেন্দ্রনাথ সামন্তের তত্ত্বাবধানে ও পরামর্শে সমগ্র পুকুরটির সংস্কার করে এটিকে একটি আধুনিক সাঁতারের পুলে পরিণত করা হয়। এই পুলটির রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত দায়িত্ব দেওয়া হয় শালকিয়া সুইমিং এসোসিয়েশনের হাতে এবং সেইমত চুক্তিপত্রও নাকি সাক্ষরিত হয়। পুলটির উদ্বোধন হয় ১৯৯৩ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে। উদ্বোধন করেন তদানীন্তন মেয়র স্বদেশ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সাঁতারু বুলা চৌধুরীও সেদিন উপস্থিত ছিলেন। এই পুকুরটি আন্তর্জাতিক মানের সাঁতারের পুল বলে উদ্যোক্তারা দাবি করেন। আটটি পঞ্চাশ মিটার লম্বা লেন বিশিষ্ট এই পাকা পুকুরটি তৈরী করতে এসোসিয়েশনের খরচ হয়েছে তেত্রিশ লক্ষ টাকা। ওয়াটার পোলো খেলাও এখানে হয়। স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং বর্তমানে না হলেও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ স্থানীয় বিত্তবান মানুষ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ ও সমিতির 'আজীবন সদস্যদের' দানেই নির্মিত হয়েছে বলে উদ্যোক্তারা জানান। উদ্বোধনের এক বছরের মধ্যেই (১৬. ১২. ১৯৯৪) পশ্চিমবঙ্গের আন্তঃ জেলা রাজ্য সাঁতার প্রতিযোগিতা এই পুকুরেই অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন। অনুষ্ঠানের কার্যসূচী অনুযায়ী মহিলা ঘোষিকা বৈশাখী মজুমদার প্রতিযোগিতার সূচনা হল বলে ঘোষণা করতে মুখ্যমন্ত্রীকে আহ্বান করেন। যথারীতি ঘোষণা করার পরিবর্তে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিয়ে আসন গ্রহণ করেন। বিষয়টির প্রতি অভিজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষিত হলেও কেউই মুখ্যমন্ত্রীকে পুনরায় ঘোষণাটি করার কথা বলতে সাহস পাচ্ছিলেন না। কিন্তু অবশেষে ঐ ঘোষিকাই মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়মমাফিক পুনরায় ঘোষণা করতে অনুরোধ জানান এবং মুখ্যমন্ত্রীও সেই অনুরোধ রক্ষা করে সকলের অস্বস্তি দূর করেন।

শালকিয়া সুইমিং এসোসিয়েশন (সংঘশ্রী)—এতক্ষণ যে সব সুইমিং ক্লাবের

আলোচনা হল তার সব কটিই হচ্ছে অর্থের বদলে স্বার্থের সম্পর্ক—অর্থাৎ এডমিশন ফি ও মাসিক চাঁদার বিনিময়ে (যা নেহাত কম নয়) সাঁতার শেখাবার আধুনিক ব্যবস্থা। কিন্তু কোন অর্থের লেনদেন ছাড়াই নিঃস্বার্থভাবে সাঁতার শেখাতে যে লোকটি আত্মোৎসর্গ করেছেন তাঁর পরিচয় একটু দেওয়া যাক। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম তাঁর কিঞ্চিৎ প্রশস্তিও করেছে। তিনি হচ্ছেন রামপদ গাঙ্গুলী। সকলের কাছে তিনি 'মেজদা' নামেই পরিচিত। মেজদার জন্মস্থান রাজসাহীতে (বাংলাদেশ)। দেশ বিভাগ হবার আগে থেকেই শালকিয়াতে এসে কাকার বাড়িতে থাকতেন। কারণ আগস্ট আন্দোলনে ছাত্র নেতা হিসাবে বগুড়াতে (বাংলাদেশ) কাজ করতে গিয়ে গ্রেপ্তার এড়াবার জন্যই এখানে আসেন। শালকিয়া এ. এস. স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। কলেজে পড়তে পড়তে পুলিশের চাকুরীতে ঢুকেই প্রথমে লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগে এবং পরে কলকাতা পুলিশের সার্জেণ্ট পদে উন্নীত হন। বিভাগীয় পুরস্কার ছাড়া ১৯৭০ সালে 'রাষ্ট্রপতির পুলিশ মেডেল' (ইণ্ডিয়ান পুলিশ মেডেল—সংক্ষেপে আই. পি. এম) লাভ করেন।

স্বাধীনতার পর সম্ভবত তিনিই হাওড়াবাসী হিসাবে পুলিশের এই বিভাগে প্রথম পুরস্কৃত হন।

সত্তর দশকের শুরুতে দুর্গাপূজার মহাষ্টমী দিনে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের পশ্চিমে ওয়াটার গেট গঙ্গার ঘাটে এক ডুবন্ত অন্ধ্রবাসীকে তিনি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচান। সেদিন ঘাটে বহু স্নানার্থী থাকলেও কেউ এগিয়ে আসেননি। সামাজিক দায়বদ্ধতা বোধই সেদিন মেজদাকে জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য ভেবে এগিয়ে যেতে হয়েছিল। এরপর থেকে চলে তাঁর অভিযান। এ অভিযান কোন বিশ্ববিখ্যাত সাঁতারু তৈরী করা নয়—সাঁতার শিখে যাতে একজন স্ত্রী ও পুরুষ নিজেকে জলে ডোবা থেকে বাঁচাতে পারেন সাথে সাথে ডুবন্ত মানুষকে বাঁচাতে পারেন এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই মেজদা ১৯৭২ সালে শালকিয়া নতুন মন্দিরের গঙ্গার ঘাটে সাঁতার শেখাতে শুরু করেন। আর তাঁরই প্রারম্ভিক ব্যায়াম চর্চা অনুশীলন হয় 'সংঘশ্রী ক্লাব'-এর মাঠে। লেনদেন বিহীন এই সংগঠনে দলে দলে কিশোর যুবক (বর্তমানে বৃদ্ধেরাও) এসে যোগ দিয়েছেন। সিজিন টাইমে একদিন কাকভোরে এলেই দেখতে পাবেন বাহাত্তর বছরের এক অকৃতদার অবসরপ্রাপ্ত যুবক পুলিশ সার্জেণ্ট মাঠে ব্যায়াম করাচ্ছেন সবাইকে। এর পরই শুরু হবে গঙ্গাবক্ষে সাঁতার। গঙ্গাবক্ষে সাঁতার শেখানোর ঝুঁকি অনেক। কিন্তু ছাব্বিশ বছরের অনুশীলনে একটিও দুর্ঘটনা ঘটেনি। এটা সম্ভব হয়েছে মেজদার দ্রোণাচার্যসুলভ তীক্ষ্ন দৃষ্টি। আর তাঁর এ কাজে একলব্য তুল্য সহযোগী যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন—ডাঃ সীতাংশু মিত্র, ডাঃ গণেন্দ্রনাথ গুহ, ডাঃ সুসমীর সিন্‌হা, হলধর আদক, ক্ষুদিরাম সরকার, স্বপন দত্ত, অশোক দত্ত, অশোক আগরওয়াল, শুভেন্দু পোল্লে প্রমুখ।

পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে একই নামে দুটি সাঁতারের ক্লাবের নাম

লেখা হল কেন। এর একটু ইতিহাস আছে। নতুন মন্দিরের ঘাটে যে সাঁতারের ক্লাবটি রয়েছে এটিরই নাম শালকিয়া সুইমিং এসোসিয়েশন। হাওড়া জেলা সুইমিং এসোসিয়েশনের কাছ থেকে অনেক ঘোরাঘুরির পর মেয়র স্বদেশ চক্রবর্তী ও সুইমিং কোচ জ্ঞানরঞ্জন দাসের সুপারিশে জেলা সুইমিং এসোসিয়েশনের সভাপতি পতিতপাবন পাঠক ক্লাবটিকে অনুমোদন দান করেন। এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠা-কাল ১৯৭২ ও প্রতিষ্ঠাতা রামপদ গাঙ্গুলী। পারিজাত সিনেমার কাছে যে সুইমিং পুল তৈরী হয়েছে তা কিন্তু ঐ অনুমোদিত শালকিয়া সুইমিং এসোসিয়েশনের নামেই। পরে অবশ্য রামপদবাবুর মূল উদ্দেশ্য ওখানে রক্ষিত হচ্ছে না বলে তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত শালকিয়া সুইমিং এসোসিয়েশন (সংঘশ্রী) এই নামেই নিখরচায় সাঁতার শিক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। কেউ কেউ রসিকতা করে (প্রকৃত ঘটনাটি তাই) বলেন নতুন মন্দির ঘাটে শালকিয়া সুইমিং এসোসিয়েশন এ টিম এবং পারিজাত সিনেমার কাছে শালকিয়া সুইমিং এসোসিয়েশন হচ্ছে বি টিম।

উলুবেড়িয়া সুইমিং পুল—অরুণকুমার হাজরা ও কাশীনাথ রায়ের সহযোগিতায় উলুবেড়িয়া পৌরসভা একটি ২৫ মিটারের আধুনিক সুইমিং পুল তৈরী করেছেন। খ্যাতনাম্নী সাঁতারু বুলা চৌধুরী ১৯৮৯ সালে উদ্বোধনের দিন উপস্থিত ছিলেন। সাঁতার যারা জানে না, উঠতি সাঁতারু আর উলুবেড়িয়া অ্যামেচার অ্যাকোয়াটিক ক্লাবের সাঁতারুরা এখানে এগিয়ে চলেছে। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত এই পুলটি উলুবেড়িয়ার গৌরব বিশেষ।

ফুটবলের রেফারী—এই কাজেও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেতে হাওড়ার ফুটবল প্রেমীরা পেছিয়ে নেই। ১৯৭৪ সালে ফুটবলের ফিফা ইণ্টারন্যাশনাল ফুটবল রেফারী পদে স্বীকৃতি পান এল. এন. ঘোষ। এ ছাড়া কালী রায় ১৯৫২ এবং পঙ্কজ দাস ১৯৭৩ সালে ইংল্যাণ্ডের রেফারী এসোসিয়েশনের সভ্যপদে স্বীকৃতি পান

১৯৫৯ সালে উলুবেড়িয়ার অরুণ কুমার হাজরা ইংলণ্ডের লীডস থেকে ফুটবল রেফারিং পাশ করেন। ওদেশে কার্ণেগী কলেজ অব ফিজিক্যালে ছাত্র থাকার সুবাদে বিভিন্ন খেলা যোগ্যতার সঙ্গে পরিচালনা করেন। ষাটের দশকে উলুবেড়িয়া অঞ্চলের বারিদবরণ লাহিড়ী সি. আর. এর-স্বীকৃত রেফারী হিসাবে কলকাতার মাঠে খেলা পরিচালনা করেন। এঁরা সকলেই হাওড়াবাসীর গর্বের বস্তু।

হকি—১৯৩৬-৩৭ সালে উলুবেড়িয়া স্কুলের ব্যায়াম-শিক্ষক, সুধীরচন্দ্র পাল মহাশয়ের প্রশিক্ষণে হকিতে উলুবেড়িয়া স্কুলের অজয় দে,মনতাজ জমান আমেদাবাদে অন্তঃরাজ্য হকি প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের হয়ে খেলে সুনাম অর্জন করে। ইংলণ্ডের লীড্‌সে কার্ণেগী কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশনের ছাত্র হিসাবে কলেজের প্রথম হকি দলের হয়ে ১৯৫৮ সালে ম্যাঞ্চেষ্টার, লীড্‌স্‌, হাল প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় দলের সঙ্গে প্রদর্শনী হকি খেলায় বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন অরুণ কুমার হাজরা। ঐ একই কলেজের হয়ে ১৯৫৯ সালে লাফ বরো শিক্ষণ

মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে আমন্ত্রণমূলক সাঁতার প্রতিযোগিতায় তিনি ব্রেস্ট স্ট্রোকে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন।

ভারোত্তলন—আমাদের দেশে ওয়েট লিফটিং বা ভারোত্তোলনের প্রচলন করে ইংরেজরা। এ ব্যাপারেও হাওড়া জেলা বঙ্গদেশে নিজ স্থান করেছে। হাওড়া জেলায় ভারোত্তোলনের জন্মদাতা হিসেবে রামকৃষ্ণপুরের বিখ্যাত ভারোত্তোলক অমর নাথ দত্তের নাম করলে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হবে না। এই দত্ত পরিবারের একটি নিজস্ব জিমনাসিয়াম ছিল—তার নাম 'দত্ত জিমনাসিয়াম'। প্রতিষ্ঠাকাল আনুমানিক ১৯০০ সাল। আজও সেই ব্যায়ামাগারটি ঐ নামেই চলছে। তবে সেটি আজ পুরোপুরি মহিলা ব্যায়ামবিদ বিশেষ করে মহিলা ভারোত্তোলন-কারিণীদের একমাত্র ট্রেনিং সেণ্টার। হাওড়াবাসী জেনে খুশী হবেন যে ভারোত্তোলনে বিশ্বের দরবারে ভারতের মুখোজ্জ্বলকারিণী ছায়া আদক ও সুমিতা লাহা এই জিমনাসিয়ামেই অনুশীলন করে থাকেন। অমর নাথ দত্ত নিজেও সে যুগে একজন বেঙ্গল চ্যাম্পীয়ান ভারোত্তোলক ছিলেন। নামকরা আরও দুজন বিখ্যাত জিমন্যাস্টিক শিক্ষকের নাম এখানে স্মরণ করা যেতে পারে—তাঁরা হচ্ছেন সাঁত্রাগাছি দাসের ব্যায়ামগারের প্রতিষ্ঠাতা কালিপদ দাস ও শিবপুর ফ্রেণ্ডস এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা দাশরথি ঘোষ। কিন্তু বাঙ্গালীর হয়ে ভারোত্তোলনে বিশ্বের দরবারে হাওড়ার (রামকৃষ্ণপুর) বিশ্বকল্যাণ সংঘ যে ইতিহাস রচনা করেছে তা অভাবনীয়। এই ক্লাবেরই আজীবন সভ্য লক্ষ্মীকান্ত দাস ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে ভারোত্তোলনে একমাত্র ভারতীয় প্রতিযোগী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। অলিম্পিকে এই বিভাগে তিনিই প্রথম যোগদানকারী বাঙ্গালী। প্রতিযোগিতায় তিনি ফেদার ওয়েটে একাদশ স্থান লাভ করেন। পরের বারেও টোকিও অলিম্পিকে (১৯৬৪ সাল) যোগদান করেন। ১৯৬৬ সালে লণ্ডনের কিংসস্টোন শহরে কমনওয়েলথ ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায়ও তিনি প্রতিযোগী ছিলেন। ভারোত্তোলনে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন 'এলিট ব্যাজ'-ও লক্ষ্মীকান্তবাবু একমাত্র ভারতীয় হিসেবে পান। পশ্চিমবাংলার মধ্যে লক্ষ্মীকান্তবাবুই প্রথম ব্যায়ামবীর যিনি ভারত সরকারের বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ 'অর্জুন' পুরস্কার* (১৯৬৩ সাল) পান। লক্ষ্মীবাবুর ভারোত্তোলনের এই বিরাট খ্যাতির পেছনে যাঁদের দান স্মরণ করার মত তাঁরা হচ্ছেন বিশ্বকল্যাণ সংঘের অন্যতম প্রবীণ সদস্য গোবর্ধন দাস ও প্রেমচাঁদ মিত্র। লক্ষ্মীবাবু ভারতীয় ভারোত্তোলনে পরপর এগারবার জাতীয় চ্যাম্পীয়ান হয়ে যে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন তার পেছনে ছায়ার মত লেগে থেকে প্রয়োজনীয়

* ১৯৬২ সালে ভারোত্তোলনে 'অর্জুন' পুরস্কার পান অপর এক বাঙ্গালী ভারোত্তোলক অলোক নাথ ঘোষ। কিন্তু তিনি কোন ন্যাশনাল প্রতিযোগিতায় না খেলে সার্ভিসেসের হয়ে মধ্যপ্রাচ্যে একটি ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব দেখান। ফলে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে তাই লক্ষ্মীবাবুকেই বাংলাদেশের প্রথম 'অর্জুন' প্রাপক বলে ধরা হয়। মনে রাখতে হবে ভারত সরকার এই পুরস্কারটি প্রথম প্রবর্তন করেন ১৯৬১ সালে।

প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ জুগিয়েছেন এই প্রেমচাঁদবাবু। তাই হয়তো তাঁকে লক্ষ্মীবাবুর 'গুরু' বলে আখ্যা দেওয়া হয়।* এই ক্লাবেরই আর এক ভারোত্তোলনকারী আন্দুল নিবাসী কমলাকান্ত সাঁতরা ১৯৮২ সালে জাতীয় ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় প্রথম হন। এই বছরই দিল্লীতে নবম এশিয়াডে ভারতের হয়ে তিনি প্রতিযোগিতা করে ব্যায়ামের ক্ষেত্রে হাওড়ার গৌরব বাড়িয়ে দিয়েছেন।

এতদিন ভাবা হত ভারোত্তোলন বুঝি কেবল ছেলেদেরই খেলা। কিন্তু মহিলারাও যে সুযোগ পেলে বিশ্বে নামী হয়ে উঠতে পারে তার উদাহরণ বিগত কয়েক বছরে এশিয়ান গেমস এমনকি বিশ্ব ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায়ও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সে রকমই একজন মহিলা ভারোত্তোলনকারিণী সম্বন্ধে এখানে উল্লেখ করা হল। তিনি হচ্ছেন হাওড়া আন্দুলের মাশিলা গ্রামের মেয়ে ছায়া আদক। শ্রীমতী আদক পূর্বে উল্লিখিত দত্ত জিমনাসিয়ামে নিয়মিত অনুশীলন করে আসছেন। এই ছায়া আদকই ১৯৯০ সালে বেজিং এশিয়াডে ১৫২ কেজি ভার তুলে ব্রোঞ্জ পদক গলায় পরেছিলেন। গ্রামের এক মুদি দোকানদারের কন্যা ছায়া আদক। তা সত্ত্বেও নিষ্ঠা, সংকল্প ও অধ্যবসায় থাকলে যে কি পর্যন্ত ওঠা যায় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলেন শ্রীমতী আদক।

এই ছায়া আদক সম্বন্ধে আনন্দবাজার পত্রিকার নিজস্ব প্রতিনিধি দিল্লী থেকে ১৫ই অক্টোবর ১৯৯০) লিখছেন—'হাওড়া বিশ্বকল্যাণ সঙ্ঘের জিমনাসিয়াম থেকে সেদিন ওঁরা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। এমনকি ওঁদের বারবেলগুলোতে হাত দিয়েছিলাম বলে প্রবীণ কর্তারা বলেছিলেন ওগুলো ধুতে হবে। মেয়েছেলের হাত লেগে অপবিত্র হয়ে গেছে। এখন ওঁরা অবশ্য দাবি করছেন, আমি ওঁদেরই হাতে গড়া। এসব কথা শুনলে রাগও হয়, হাসিও পায়।'

বিশ্বের কল্যাণ করা যে সঙ্ঘের উদ্দেশ্য তাদেরই কর্মকর্তারা কেন নারী কল্যাণ ও প্রগতিতে এত অনাগ্রহী হলেন এটা জানার জন্য একদিন সময় করে ক্লাবে গিয়ে হাজির হলাম। কিন্তু পরে কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করে আলোচনা সূত্রে জানা গেল ব্যাপারটা ঠিক নয়। সাংবাদিক যে নিজেই একটু রং চড়িয়ে সংবাদটিকে রসালো করতে চেয়েছেন তা ছায়া আদকের প্রতিবাদ নোট থেকেই বোঝা গেল। যদিও ভারোত্তোলনের হাতেখড়ি হয়েছিল ছায়া আদকের মহিয়াড়ী মহাকালী ব্যায়ামাগারে। আরও আনন্দের বিষয় লক্ষ্মীকান্ত দাসই হচ্ছেন ছায়া আদকেরও কোচ। আর দুই প্রবীণ ভারোত্তোলক হচ্ছেন হাওড়ার নারায়ণ চন্দ্র দে ও গোপাল গোবিন্দ খাঁড়া। বাজে শিবপুরের গোপালবাবু সারা ভারত ভারোত্তোলন ফেডারেশনের সম্পাদক ও রাজ্য সমিতির সভাপতি। একাধিকবার তিনি অলিম্পিকে ভারতীয় টীমের ম্যানেজার হয়ে দল পরিচালনা করেছেন। বালির অনিল পাল ফেদার ওয়েটে লণ্ডনে কমনওয়েলথ গেমসে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। বালি ফিজিক্যাল কালচারের অশোক সেনগুপ্তও ভারোত্তোলনে এন. আই. এস কোচ হয়ে ভারতীয় টীমের প্রতিনিধিত্ব করে জেলার সুনাম বাড়িয়েছেন। এঁরা সকলেই গর্বের বস্তু।

ব্যায়াম সমিতি—কয়েকটি ব্যায়াম সমিতির নাম ও তার সংক্ষিপ্ত কৃতিত্ব আলোচনা না করলে ব্যায়াম চর্চার ক্ষেত্রে হাওড়ার অবদান অজানা থেকে যাবে। এই ব্যায়াম সমিতিগুলির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে নিছক শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্ এই আপ্ত বাক্য কেবল মনে রেখেই ব্যায়াম সমিতি ও ক্লাবগুলি সংগঠিত হয় নি। পরন্তু দেশমাতৃকাকে বিদেশী বন্ধনের হাত থেকে মুক্ত করার জন্যই ব্যায়াম সমিতিগুলি গড়ে উঠেছিল। তবে একজ শরীর চর্চার জন্যও যে দু'চারটে সমিতি তৈরী হয়নি তাও নয় যেমন শালকিয়া অভয় ব্যায়াম সমিতি। ১৯২০ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করেন স্বয়ং অভয়পদ ব্যানার্জী। অসীম শক্তির অধিকারী ছিলেন অভয়বাবু। বুকের ওপর এক টন পাথর চাপিয়ে তার ওপর আবার হাতুড়ী দিয়ে পাথর ভাঙ্গা ও চলন্ত মোটর গাড়ী হাত দিয়ে টেনে রাখা ছিল তাঁর সেরা খেলা। অভয়বাবুর কথা কলকাতায়ও ছড়িয়ে পড়ে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই ক্যাপ্টেন জীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর খুব হৃদ্যতা ছিল। সেই সুবাদে ক্যাপ্টেন ব্যানার্জী শালকিয়ায় আসতেন। সে সময়ে একটা সাধারণের ধারণা ছিল যে নিষ্কর্মা লোকেরাই বুঝি ব্যায়ামচর্চা করে। বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ করে জীতেন্দ্রনাথ শরীর চর্চার দিকে মন দেন। 'ভেতো বাঙ্গালী' এই অপবাদ ঘোচাবার জন্য জীতেনবাবু ব্যায়ামাগারের প্রসারে মনোনিবেশ করেন। ১৯১২ সালে ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ যখন এদেশে আসেন তখন জীতেনবাবু সম্রাটের সেনাদলের নেতৃত্ব দিয়ে 'দরবার মেডেল' পান। ১৯১৫ সালে তিনি 'ক্যাপ্টেন' আখ্যাও লাভ করেন। ১৯৩৪-৩৫ সাল। ভারত বিখ্যাত ব্যায়ামবিদ্ গোবরবাবু, গামা পালোয়ান, বিষ্ণুচরণ ঘোষ, ডাঃ বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ মিলিত হয়েছেন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (বর্তমান সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার)। অভয়বাবুও খেলা দেখালেন বুকের ওপর ভারী পাথর চাপিয়ে হাম্বর দিয়ে তার ওপর পাথর ভাঙ্গার খেলাটি। পরের খেলাটি ছিল মোটা শেকল কাঁধে ঠেলে ছেঁড়ার খেলাটি। কিন্তু শেকলটি কিছুতেই ছিঁড়ছে না। অভয়বাবুর সমর্থকদের মুখ একেবারে চুণ। কি ব্যাপার, আজ কি অভয়বাবুর শরীরে শক্তি নেই! শেকলটি ছিঁড়ছে না কেন! হঠাৎ দেখা গেল যে, উদ্যোক্তারা একটি কাঠের বেঞ্চির সঙ্গে বেড় দিয়ে তলায় একটি কাঠের ডাসা না দিয়ে বাঁশের সঙ্গে শেকলটিকে বেঁধে দিয়েছেন। যখনই শক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে বাঁশটিও অমনি বেঁকে বেড়ে যাচ্ছে। দু'বার চেষ্টা করেও যখন হল না তখনই ব্যাপারটা ধরা গেল। সঙ্গে সঙ্গে পাশের একটি দোকান থেকে মোটা কাঠের তক্তা এনে শিকলটিকে জড়ানো হল। এবার শক্তি প্রয়োগ করতে সহজেই শেকলটি ছিঁড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে কি উল্লাস! অভয়বাবুর শক্তিমত্তা দেখে উপস্থিত ব্যায়ামবিদগণ ধন্য ধন্য বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। এদিন যে ব্যক্তি সবচেয়ে গর্বিত হয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন ক্যাপ্টেন জীতেনবাবু। কারণ তাঁরই উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়েছিল তাঁর বন্ধু অভয়বাবুর অসাধারণ খেলাগুলি দেখাবার জন্য।

এই জীতেনবাবু ব্যায়ামের উন্নতিতে ১৯৪১ সালে ১৭ই সেপ্টেম্বর তাঁর আমৃত্যু সঞ্চিত এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি ও নগদ অর্থ দিয়ে গড়ে দিয়েছেন 'দি অল বেঙ্গল ফিজিক্যাল কালচার এসোসিয়েশন' নামে একটি সংস্থা —যা এখনও সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে দেখা যাবে।

অভয়বাবুর মত একজন ব্যায়ামবিদ যে একজন ভাল ক্রিকেটার হতে পারেন তা হয়তো আমাদের সহসা বিশ্বাস হবে না। কিন্তু অভয়বাবু তৎকালে একজন ভাল ক্রিকেটারও ছিলেন। তিনি হাওড়া টাউন ক্লাবের ক্যাপ্টেন হয়ে নিজ দক্ষতার প্রমাণ দিয়ে গেছেন।

এবার এমন কয়েকটি ক্লাবের নাম করা হবে যারা শরীরচর্চার জন্য ব্যায়াম সমিতি হিসেবে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হলেও মূলত দেশের মুক্তি আন্দোলনে সহায়তা করাই ছিল তাঁদের মূলমন্ত্র। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য শালকিয়া ফ্রেন্ডস এসোসিয়েশন, হাওড়া সেবা সংঘ, হাওড়া সংঘ, অন্নপূর্ণা ব্যায়াম সমিতি প্রভৃতি ক্লাব। শালকিয়া ফ্রেন্ডস আজ কলকাতার ময়দানে একটি প্রথম শ্রেণীর ফুটবল ও ক্রিকেট ক্লাব বলে স্বীকৃত। এটি ১৯১৮ সালে তৈরী হয়েছিল নিছক ব্যায়াম চর্চার জন্য। কিন্তু পরে ব্যায়ামচর্চার মাধ্যমে ছেলেদের বিপ্লবী কাজে ট্রেনিং দেওয়া হত। এই ব্যাপারে ক্লাবের প্রাধন সংগঠক কিশোরী ঘোষাল (পানিদা) ও আব্দুল মোমিন অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন আহিরীটোলার ডাঃ বসন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। এই বসন্তবাবুর কথা আগেই বলা হয়েছে। আব্দুল মোমিন একজন বিপ্লবী দলের কর্মী ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে শ্রমিক আন্দোলন অধ্যায়ে উল্লেখ আছে। এই পানিবাবু ই. বি. রেলওয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়ে সামাদ্, বাঘা সোম, গোনা দত্ত প্রমুখ খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের সঙ্গে কলকাতার মাঠে খেলতেন। শালিখার আর এক খ্যাতনামা ফুটবলার বাদল গুপ্ত গোষ্ঠপালের সঙ্গে মোহনবাগানের হয়ে গোলকিপার খেলতেন। এরও আগে ১৯২০ সালে শালকিয়া এ্যাথলেটিক ক্লাব তৈরী হলে তাতে ধীরেন বসু মল্লিক (চরণদা), হাওড়া ইউনিয়নের শচীন দত্ত, সত্য হাজরা প্রমুখ বিশিষ্ট খেলোয়াড়রা যোগ দেন। সত্য হাজরা মোহনবাগানের ব্যাক হিসেবে খেলার জন্য অন্তর্ভুক্ত হলেও তাঁর অকাল মৃত্যু তাতে বাদ সাধে। এই ক্লাবেরই সদস্য শালিখা-বাসী রাখাল মুখার্জী তদানীন্তনকালে বেঙ্গল সকার লীগের রেফারী হিসেবে খেলা পরিচালনা করতেন। কালে তিনি আই. এফ. এর জয়েণ্ট সেক্রেটারীও হয়েছিলেন।

সে যুগে জেলার বিভিন্ন ক্লাবই অল্প বিস্তার স্বদেশের মুক্তি আন্দোলনে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করতো। কিন্তু দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে সদস্যরা পুরোভাগে থেকে আন্দোলন করেছেন এমন ঘটনা খুবই কম। যদিও বা তা পাওয়া যায় তথাপি সেই অপরাধে ক্লাবকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছে এমনটি বোধহয় হয়নি। এ রকম একটি ক্লাব হচ্ছে 'হাওড়া সেবা সংঘ'। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে সরকার সংঘকে বে-আইনী ঘোষণা করেন এবং ক্লাবের ১৯৩৭ সালে পর্যন্ত সব

খাতাপত্র বাজেয়াপ্ত করে। এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, অজিত নাথ মল্লিক, হরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বিজয়কৃষ্ণ হাজরা প্রমুখ।[৬] ক্লাবটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে।

এই ক্লাবটির অন্যতম কর্ণধার ও পরবর্তী কালে হাওড়া জেলার এক অবিসম্বাদী জাতীয় নেতা হরেন্দ্র নাথ ঘোষের লেখা থেকেই ক্লাবের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হবে। তিনি লিখছেন—'শুধু শক্তি চর্চার দ্বারা স্বাস্থ্যোন্নতি সম্ভব হইলেও মানসিক বিকাশ ও রাজনৈতিক চেতনার অভাবে তাহা জাতির মুক্তির কার্যে ব্যবহৃত নাও হইতে পারে।[৭] সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই দেশের মুক্তি সাধনে হরেনবাবুর প্রয়াসে ক্লাবটি জড়িয়ে পড়ে। এই সংঘের অন্যান্য কাজের মধ্যে দুর্গোৎসব একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। এই দুর্গোৎসবের প্রেরণা লাভ করেন হরেনবাবুর বড়দা সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ কলকাতার 'সিমলা ব্যায়াম সমিতির' অন্যতম কর্ণধার ও যুগান্তর দলের নেতা অতীন্দ্র নাথ বসুর কাছ থেকে। তাঁরই চেষ্টায় ১৯২৭ সালে জয়দেব কুণ্ডু লেনে প্রথম বছর মাত্র ১০০ টাকায় (একশ) দুর্গা পুজো হয়েছিল। তন্মধ্যে প্রতিমা বাবদ ব্যয় হইয়াছিল মাত্র ২৫ টাকা।[৮]

হাওড়া জেলার মধ্যে হাওড়া সেবা সংঘের ১৯২৭ সালের আয়োজিত পুজোকেই জেলার প্রথম সার্বজনীন দুর্গোৎসব বলে সমিতির হীরক জয়ন্তী বর্ষে ১৯৮৯ সালের স্মরণিকায় দাবি করা হয়েছে। শুধু তাই নয়—এই বছরই একটি প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করেন হরেনবাবু। তার উদ্বোধন করলেন তদানীন্তন খ্যাতনাম্নী নেত্রী শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা। বলা বাহুল্য, এই প্রদর্শনীটি ছিল জাতীয় ভাবোদ্দীপক বিষয়কসহ কুটির শিল্প, সূচীশিল্প ও নানা প্রকারের হস্ত শিল্পের। 'এটি চলেও ছিল দীর্ঘ দুমাস ধরে।'[৯] এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশে সার্বজনীন দুর্গোৎসবের কিঞ্চিৎ আলোকপাত করলে হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বাংলাদেশের কোথায়, কবে, কারা সার্বজনীন দুর্গোৎসব প্রথম চালু করেছিলেন তা নিয়ে নানান জনে নানান মতামত ব্যক্ত করে থাকেন। তবে একথা ঠিক যে আজকে যে সব প্রাচীন সার্বজনীন দুর্গোৎসবের ফিরিস্তি দেখতে পাওয়া যায় আসলে কিন্তু সেগুলি এককালে কোন না কোন জমিদার বা ধনাঢ্য বাড়ির পুজো ছিল। পরে হয় বন্ধ হয়েছে নয় সার্বজনীন রূপ গ্রহণ করেছে। সেই রকমই একটি বাড়ির পুজো সার্বজনীন রূপ নিল বঙ্গদেশে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে। রানী রাসমণির মেয়ের শ্বশুর বাড়ি আটাপাড়া। সিঁথির (দমদম) মোড় থেকে দুই কিলোমিটার ভেতরে গ্রামটি। ঘটা করে আগে পুজো হত। কিন্তু মেয়ে কলকাতার জানবাজারে চলে এলে পুজো বন্ধ হয়ে যায়। পাড়ার লোকজন ঠিক করলেন মায়ের পুজো বন্ধ হবে না—চাঁদা তুলে পুজো করা হবে। শুরু হল সার্বজনীন পুজো। আজও তা হয়ে আসছে মহাসমারোহে। ১৯৯০ সালে তার শতবর্ষ পূরণ হয়েছে।[১০]

এই সংবাদ হয়তো হাওড়াবাসীর কাছে তেমন উৎসাহের উদ্রেক ঘটাবে না। কিন্তু এর পরের ঘটনাটি জানলেই হাওড়াবাসীর গরবের সীমা থাকবে না। ঐ সার্বজনীন

পুজোতে পুরোহিত ও তন্ত্রধার এসেছিলেন এই হাওড়া জেলার আমতা থেকে। ঐ প্রবন্ধের লেখক মানস রায় আরও লিখছেন—সেই পুজো ঘরের বাইরে এল। হল সার্বজনীন।…পুরুত-ঠাকুর আনা হল হাওড়া আমতা থেকে। আশুতোষ ভট্টাচার্য। সঙ্গে এলেন অবিনাশ চক্রবর্তী আর শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী।[১১]

কিন্তু একটি ক্লাবের উদ্যোগে সার্বজনীন পুজোর আড়ালে দেশের মুক্তি সাধনে বিপ্লবীরা একত্র হওয়ার পথ সম্ভবত প্রথম দেখালো বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব—যার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন সুভাষ চন্দ্র বসু। তারপর কলকাতার 'সিমলা ব্যায়াম সমিতি'র দুর্গোৎসবটির শুরু কিন্তু সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণেই। মৃন্ময় দুর্গামূর্তির মাধ্যমে চিন্ময় ভারত মাতার মুক্তি সাধনের উদ্দেশ্য নিয়েই ১৯২৬ সালের যুগান্তর দলের অন্যতম নেতা অতীন্দ্রনাথ বসু সিমলা ব্যায়াম সমিতির সার্বজনীন দুর্গোৎসব প্রবর্তন করেন যেখানে মহাষ্টমীর অন্নকূটের প্রসাদ সাধারণের পঙক্তিতে বসে খেতে আসতেন স্বয়ং সুভাষচন্দ্র বসু। যার ফলে ইংরেজ সরকার ১৯৩২, ৩৩, ও ৩৪ সালের পুজো বে-আইনী বলে ঘোষণা করেছিলেন।[১২]

এর এক বছর পরেই হাওড়া সেবা সংঘের সার্বজনীন দুর্গাপুজোটিও উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠল—কারণ এই ক্লাবের কর্ণধার হরেন্দ্রনাথ ছিলেন নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের একজন দক্ষিণ হস্ত। এই ক্লাবই আবার হাওড়ায় প্রথম অসামরিক ব্যাণ্ডপার্টি বাদন দল ও R. W. A. C. এ্যাম্বুলেন্সের প্রথম শাখা জেলায় স্থাপন করে। ক্লাবেরই আর এক সংগঠক ছিলেন কার্তিক চন্দ্র দত্ত। যিনি স্বাধীনতার পরে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে কংগ্রেসকে হারিয়ে প্রথম চেয়ারম্যান হন।

তৃতীয় ক্লাবটি হচ্ছে 'হাওড়া সংঘ'। এই সংঘটিও দেশ প্রেমের তাগিদেই গড়ে উঠেছিল। 'প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অধ্যাপক বেণী মাধব বড়ুয়া। অনাথ বন্ধু সমিতি, বয়েজ ট্রেনিং কটেজ, সানরাইজ ড্র্যামাটিক ক্লাব এবং সাধনা পাবলিক লাইব্রেরীকে মিলিত করেই এই নূতন নামে ক্লাবটি হয় ১৯২৫ সালে।[১৩] আজও এই ক্লাবটি বিভিন্ন সেবামূলক কাজ, পাঠাগার পরিচালনা ও দুর্গোৎসব ইত্যাদি করে সমাজের সুখ-দুঃখের অঙ্গ হয়ে আছে। এদের পরিচালনায় একটি মাধ্যমিক স্কুলও পরিচালিত হওয়া খুবই গৌরবের। হাওড়া সেবা সংঘের মত এদের অসামরিক ব্যাণ্ড পার্টিও এক উল্লেখযোগ্য বিষয়।

শেষোক্ত ক্লাবটির নাম হচ্ছে 'হাওড়া ব্যায়াম সমিতি।' এই নামটি বললে আজকে হয়তো কোন ব্যায়ামাগার খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু ইতিহাস বলে হাওড়া তথা পশ্চিমবাংলার বিখ্যাত ক্লাব 'অন্নপূর্ণা ব্যায়াম সমিতির' আদি নাম ছিল তাই। এই ক্লাবটির আঁতুরঘর ছিল কালীকুণ্ডু লেনে। কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, জিমন্যাষ্টিক করাই ছিল তখন উদ্দেশ্য। কিন্তু সুস্বাস্থ্যের সঙ্গে সুনিয়ন্ত্রিত মনও চাই। তাই গঠিত হল 'স্টুডেণ্টস লাইব্রেরী' নামে একটি পাঠাগার। সেই পাঠাগারে আসতে শুরু করলেন স্বদেশী বিপ্লবী নেতারা। পরিকল্পনা হ'ল দেশের দুর্গতি দূর

করার জন্য দুর্গতিনাশিনীর পুজো করতে হবে। তাই ব্যায়াম সমিতির সম্পাদক ও প্রধান সংগঠক দানু বসু লক্ষ্মণ দাস লেনে ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি করে দুর্গাপুজো শুরু করলেন ১৯৩৩ সালে। সঙ্গে ছিলেন ডাঃ শরৎচন্দ্র দত্ত, ললিত মোহন মণ্ডল, হেমচন্দ্র সিং ও দুর্লভ শী প্রমুখ। ঐ বছরই ক্লাবটি বর্তমান সমিতি ভবনে উঠে আসে। জন্মকাল থেকেই সমিতিতে চলতে থাকে সামরিক কুচকাওয়াজ, জনসেবা ও ইংরেজ বিরোধী সভা-সমিতি। এই ক্লাবেরও ব্যাণ্ডপার্টি তদানীন্তনকালে বহু বড় বড় জাতীয় নেতাদের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে প্রশংসা পেয়েছে। ১৯৪২ সালটি এই ক্লাবের পক্ষে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। 'ভারত ছাড়' আন্দোলন চলছে। সারা দেশ আন্দোলনে উত্তাল। দুপুরের রোদ থাকতে থাকতেই দুর্গা প্রতিমার ভাসান দিতে ইংরেজ জেলা শাসক আদেশ জারি করলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ক্লাবের প্রথানুযায়ী লক্ষ্মীপুজার বিসর্জনের দিন একসঙ্গে রাতে বিসর্জন দেবার কথা বললেন। ফলে সরকারী আদেশের প্রতিবাদে সে বছর দুর্গা প্রতিমার নিরঞ্জনই স্থগিত রইল। 'পরের বছর একসঙ্গে দুটি প্রতিমার নিরঞ্জনে অভূতপূর্ব শোভাযাত্রা দর্শনের জন্য যে জন-সমাগম হয় তা অতুলনীয়।'[১৬] ১৯৪৬ সালে কলকাতায় 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' নাম করে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বিভৎসরূপ ধারণ করেছিল। তা থেকে সাধারণ নাগরিককে রক্ষা করার জন্য যে বিজলী ফৌজ' সমিতি গঠন করেছিল তা পশ্চিমবাংলায় এক নজির বিহীন দৃষ্টান্ত। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই হল যেন এই ক্লাবের মূল কথা।

এছাড়া আরও কয়েকটি সুপ্রতিষ্ঠিত ক্লাব যারা আজও নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখে দেশ ও দশের হিতে কাজ করে যাচ্ছে—তাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করেই এই অধ্যায়টি শেষ করা হবে।

রামকৃষ্ণপুর সংসদ—১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে নিজের পরিবারের শ'দুয়েকের মত বই দিয়ে একটি পাঠাগার তৈরী করলেন নৃসিংহ বসু। পরে এই অঞ্চলের আরও দুটি ক্লাব যেমন ফ্রেণ্ডস্ ইউনাইটেড ক্লাব এবং ঐক্য সমাজ এরাও এসে এই সংস্থার সঙ্গে একীভূত হয়। ১৯২০ সালে এরা রামকৃষ্ণপুর বালিকা বিদ্যালয় নামে একটি স্কুল পরিচালনা শুরু করে। ১৯৩০ সালে এটি রামকৃষ্ণপুর সংসদ নামে নামাঙ্কিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি বালিকা বিদ্যালয়, পাঠাগার ও অন্যান্য সেবামূলক কাজ করে সমাজের উপকার সাধন করে চলেছেন।

শালকিয়া তরুণ দল—কতিপয় তরুণের উৎসাহে ১৯৩৬ সালেএটি একটি ফুটবল ক্লাব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর থেকে নিজেদের সাংগঠনিক যোগ্যতায় ও সেবামূলক কাজের মাধ্যমে সমাজের আস্থালাভ করে। পাঠাগার, বিভিন্ন প্রকারের খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা নিয়মিত অনুষ্ঠিত করে জেলার একটি প্রথম শ্রেণীর ক্লাবে পরিণত হয়েছে। একটি প্রাথমিক স্কুলও এরা পরিচালনা করে। সমিতির পরিচালিত সার্বজনীন দুর্গোৎসব জেলার সেরা পুজোগুলির অন্যতম। বর্তমানে একটি শিশু ক্লিনিকও সমিতি চালাতে শুরু করেছে।

রামকৃষ্ণপুর ব্যায়াম সমিতি—১৯২৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় শরীর চর্চার কেন্দ্র হিসেবে। পরে এটি আরও পল্লবিত হয় নানা শাখা খুলে—যেমন স্কাউট গ্রুপ, ব্রতচারী, পাঠাগার, ফুটবল ও বাস্কেটবল ইত্যাদি। এদেরও দুর্গোৎসব একটি বড় পুজো।

বিশ্বকল্যাণ সংঘ (রামকৃষ্ণপুর)—হাওড়া জেলার এই ব্যায়ামাগারটি যথার্থ অর্থেই একটি সমাজ কল্যাণমূলক সংস্থা। ১৯৪৮ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হলেও নিজস্ব বাড়ি, নিজস্ব ব্যায়ামাগার, পাঠাগার অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুল চালু এমনকি একটি এ্যালোপ্যাথিক ডিসপেনসারীও এরা চালান।

বাবলু স্মৃতি ও যোগ ব্যায়াম কলেজ—হাওড়া শহরে ব্যায়ামবিদ আয়রনম্যান নীরদ সরকারের নাম সর্বজনবিদিত। জন্মস্থান ও যৌবনের অর্ধেক ঢাকায় (বাংলাদেশ) কাটান। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে শালিখায় এসে বাসা বাঁধেন। সেদিন থেকে শালিখার যুবশক্তির মধ্যে দেশপ্রেম ও শরীর গঠনের ব্রত নিয়ে কাজ করে গেছেন। তাঁর ব্যায়ামের গুরু ছিলেন রাজেন গুহঠাকুরতা। ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নীরদবাবু 'আয়রনম্যান' উপাধি লাভ করেন। তিনি শুধু ব্যায়ামবিদই ছিলেন না—স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামীর তাম্রপত্র ও পেনসন লাভ করেন। ১৯৫৪ সালে পশ্চিম বাংলার নবরূপকার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এ রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের সুস্বাস্থ্যের জন্য নীরদবাবুকে অগ্রণী হতে বলেন। ডাঃ রায়ের পরামর্শে ও অর্থানুকূল্যে নীরদবাবু ছাত্রদের উপযোগী করে 'স্বাস্থ্য, ব্যায়াম ও আসন' নামে একটি বই প্রকাশ করেন। ব্যায়ামের প্রসঙ্গে তিনি এক ডজন বাংলায় বই লিখে গেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বাবলু স্মৃতি ব্যায়াম ও যোগব্যায়াম কলেজ। অনেক কিশোর ও যুবক আজও ব্যায়াম করে চলেছে। নীরদবাবুর চমকপ্রদ খেলার মধ্যে ছিল চোখ দিয়ে লোহার শিক বাঁকানো, সুচালো বর্শা গলায় দিয়ে লোহার রড বাঁকানো, ধারালো খাঁড়ার উপর পেট দিয়ে ঝোলা, মাথা দিয়ে ডাব ফাটানো ইত্যাদি'। ১৩৯১-এর ৪ঠা বৈশাখ তাঁর মৃত্যু হয়। নীরদ-পুত্র পুরন্দর সরকার পিতার ন্যায় দেহ সৌষ্ঠবে উত্তম পেশীর অধিকারে মনোনিবেশ না করে ক্যারাটে অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করেন। সর্বভারতীয় ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় চারবার বিজয়ীর সম্মান লাভ করেন। ১৯৮২-তে তাইওয়ানে বিশ্ব-ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। অপরপক্ষে ১৯৮৫ সালে কমনওয়েলথ ক্যারাটে চ্যাম্পীয়ানশীপে যোগদান করে পঞ্চম স্থান লাভ করেন। উভয় প্রতিযোগিতায়ই পুরন্দরবাবু ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে একমাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধি। পিতৃ প্রতিষ্ঠিত ব্যায়ামাগারটি আজও তিনি আধুনিক পদ্ধতিতে চালিয়ে যাচ্ছেন—সঙ্গে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ শাখার জাপানী ক্যারাটে এসোসিয়েশনের মুখ্য প্রশিক্ষকের পদ।

হাওড়া রাইফেল ক্লাব—হাওড়া জেলায় ১৯৪৮ সালে তদানীন্তন জেলাশাসক কুমার অধিক্রম মজুমদারের পরিচালনায় হাওড়া ডালমিয়া পার্কে এই ক্লাবটি

প্রতিষ্ঠিত হয়। উহার উদ্দেশ্য ছিল দেশের জরুরী প্রয়োজনে যেন উহার মাধ্যমে দ্বিতীয় সমরবাহিনী তৈরী করা যায়। প্রথমে ক্লাবের স্যুটিং প্রশিক্ষণ শুরু হয় জেলা শাসকের খোদ বাংলোয়। উল্লেখ্য, জেলাশাসক কুমার অধিকম অন্যান্যদের মধ্যে স্বয়ং রাইফেল চালনা শেখান শৈল কুমার মুখার্জী (প্রাঃ মন্ত্রী) এবং বঙ্কিম চন্দ্র কর (প্রাঃ স্পীকার) মহাশয়দ্বয়কেও। তারপর ক্লাব স্থানান্তরিত হয়ে উহা চলে যায় শিবপুর পুলিশ লাইনে। তারও পরে ডালমিয়া পার্কের বর্তমান স্থানে স্থায়ী জায়গা দেওয়া হয়। যদিও রাইফেল স্যুটিং ১৯৭০ সাল থেকে বন্ধ হয়ে যায়। এক সময় রাজ্য সরকার এখানে পুকুর বুজিয়ে শরৎ সদন প্রতিষ্ঠা করবার পরিকল্পনা সি, এম, ডি, এ মারফৎ করেছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হেতু সেই পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়। রাইফেল ক্লাবের কর্তৃপক্ষও ঐ পরিকল্পনা অন্যত্র রূপ দিতে অনুরোধ করেছিলেন। কারণ ঐ এলাকায় কোথাও আগুন লাগলে ফায়ার ব্রিগেড আগুন নেভাবার কোন জল পাবেন না। সুতরাং পুকুরটিকে নষ্ট না করারই যুক্তিযুক্ত বলে ক্লাব কর্তৃপক্ষ যুক্তি দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসায় ঐ জায়গাটি আবার রাইফেল কর্তৃপক্ষের হাতেই ফিরিয়ে দেওয়া হল। ক্লাবের সভাপতি প্রসিদ্ধ হোমিও চিকিৎসক ডাঃ ভোলানাথ চক্রবর্তী রাজ্যের মন্ত্রী হাওড়ার বিশিষ্ট জননেতা ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্যের সহায়তায় সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়ে নিলেন। আজ রাইফেল ক্লাবের উদ্যোগে যে দুটি বাঁধানো সাঁতার শেখার পুলের ব্যবস্থা করা হয়েছে তা সত্যই প্রশংসনীয়। ছেলে ও মেয়েদের আলাদা সাঁতার শেখার এই ব্যবস্থা করতে যাঁর অবদান সর্বাগ্রে স্মরণীয় তিনি হচ্ছেন ডাঃ ভোলানাথ চক্রবর্তী। বে-সরকারী ও সরকারী সাহায্যে তিনি এটি গড়ে তুলে হাওড়াবাসীর ধন্যাবাদার্হ হয়ে উঠেছেন। অলিম্পিক স্যুটার সোমা দত্ত একদা এই হাওড়া রাইফেল ক্লাব থেকেই ট্রেনিং নিয়ে স্যুটারের জীবন শুরু করেছিলেন।

এতক্ষণ শহরের ব্যায়াম সমিতিগুলির কথাই বলা হল। এবার গ্রামের দু-একটি বিখ্যাত ব্যায়াম সমিতির কথা বলা যাক। এই সমিতিটির নাম মহিয়াড়ী মহাকালী ব্যায়াম সমিতি। আন্দুল-মৌড়ী গ্রামে এই ব্যায়াম সমিতিটি গড়ে উঠে ১৯২৮ সালে। উদ্দেশ্য গ্রামের ছেলেদের স্বাস্থ্যচর্চার মধ্য দিয়ে সুস্থ নাগরিক করে তোলা। ১৯৮১ সালে ক্লাবের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবও পালিত হয়েছে। ক্লাবটি গ্রামাঞ্চলে হলেও যে তা খুবই সুসংগঠিত ও প্রাণবন্ত তা বোঝা যায় ক্লাবের ১৯৮৫ সালের প্রতিবেদন থেকে। অর্গানাইজিং কমিটির কার্যকরী সভাপতি জয়কৃষ্ণ মুখার্জী লিখছেন—গত বারের মত এবারও পশ্চিমবঙ্গ ভারোত্তোলন সমিতি মহিয়াড়ী মহাকালী ব্যায়াম সমিতিকে ৪৩-তম সিনিয়ার, ২৮-তম জুনিয়ার ও ১-ম সাব জুনিয়ার রাজ্য ভারোত্তোলন চ্যাম্পীয়নশীপ অনুষ্ঠান প্রযোজনার গুরু দায়িত্ব অর্পণ করে পশ্চিমবঙ্গের যোগ্যতম সংস্থার সম্মানে ভূষিত করেছেন। আজ পর্যন্ত কোন সংস্থা

পরপর দু বছর ভারোত্তোলন চ্যাম্পীয়ানশীপ প্রযোজনার দায়িত্ব পেয়েছে কিনা জানি না।[১৫] এই মন্তব্যে যে ক্লাবের শ্রীবৃদ্ধির শুভ ইঙ্গিত রয়েছে তা বলাই বাহুল্য। প্রতিবেদক অন্যত্র আরও লিখেছেন—'শরীর চর্চা যথা—ভারোত্তোলন, দেহ সৌষ্ঠব, যোগব্যায়াম, জিমনাষ্টিক, সাঁতার, ক্যারাটে ইত্যাদি সমিতির নানা বিভাগে নিয়মিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা আজ প্রায় চার শত। সকাল পাঁচটা থেকে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত নানা দলে বিভক্ত হয়ে শিক্ষার্থীরা অনুশীলন করে।'[১৬]

ব্যায়াম চর্চায় অর্থাৎ কুস্তি, লাঠি, ছুরি, যুযুৎসু প্রভৃতিতে উলুবেড়িয়া অঞ্চলেরও খুব আগ্রহ ও খ্যাতি ছিল। তারও কারণ ঐ একটিই অর্থাৎ ইংরেজ বিতাড়ণ। উলুবেড়িয়া বাসীরা কৃষক, শ্রমিক ও আইন অমান্য আন্দোলনে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। বিপ্লবী কাজেও তাঁদের সমান উৎসাহ ছিল। কিন্তু শরীর যদি সুগঠিত না হয় তবে চরিত্রের বল কোথা থেকে আসবে আর কেমন ভাবেই বা বিদেশী ও স্বদেশী পুলিশের সঙ্গে সম্মুখ সমরে লড়াই করা যাবে! তাই তিরিশের দশক থেকেই শুরু হল সংঘবদ্ধভাবে নিয়ম মেনে স্বাস্থ্য সাধনা। ছোট খাট ব্যায়ামাগারের কথা ছেড়ে দিলেও 'অতুল স্মৃতি সংঘের' কথা উল্লেখ না করে পারা যাবে না। ১৯৩৩-৩৪ সাল হবে। উলুবেড়িয়ার সর্বজন শ্রদ্ধেয় আইনজীবী বীরেন্দ্র নাথ দাসের বাড়ির সংলগ্ন মাঠের এক কোণে 'অতুল স্মৃতি সংঘ' নামে একটি ব্যায়ামাগার তৈরী হল। সংঘের উদ্দেশ্যে বলা হল—যুবকদের শরীর ও চরিত্র গঠন করে সমাজের কল্যাণসাধন। কিন্তু এর সঙ্গে যেটা আন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল তা আরও ব্যাপক অর্থাৎ যুবশক্তিকে সংগঠিত করে দেশের মুক্তি সাধন। সারা বছরের শেখা কসরতের প্রদর্শনী হতো কালীপুজোকে উপলক্ষ করে। ভাইফোঁটার দিনে প্রতি বছর শারীরিক কসরতের ব্যবস্থা করা হত। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কুস্তিগীর যতীন্দ্রমোহন গুহের (গোবরবাবু) মত গুণীব্যক্তিও তাতে উপস্থিত থাকতেন। কুস্তি শিক্ষা দিতে আসতেন গোবরবাবুর ক্লাবেরই দক্ষ প্রশিক্ষক ক্ষেত্র গুহ। এখানে কুস্তিচর্চা করেই নাম করেছিলেন তারাপদ দাস (পচাদা), সত্য মুখার্জী, সত্য দাশ (গ্যাঁড়াদা) ও কালোদা। পরবর্তীকালে এঁদের কাছেই বয়সে তরুণ শিক্ষক অরুণ কুমার হাজরা কুস্তি, যুযুৎসু, লাঠি ইত্যাদি শিক্ষা করে উন্নততর আধুনিক শারীর বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য বিলেত যান। শিক্ষান্তে দেশে ফিরে অরুণবাবু পশ্চিমবঙ্গের বাণীপুরস্থ সরকারী শরীর শিক্ষা শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল হন। হাওড়া জেলার অধিবাসী হিসাবে অরুণবাবুই আজ পর্যন্ত এই পদে প্রথম আসীন হয়েছিলেন। অনেক স্থান বদল করে আজও অতুল স্মৃতি সংঘ তার অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। তবে সেদিনের লাঠিয়াল তারাপদ দাস, গোলাম খাঁ, সত্য মুখার্জী, শচীন (বোঁচা) দে, বিভূতি (নানু) ঘোষ, হারাধন ঘোষ, গোরী ও চন্দ্রশেখর মুখার্জীদের দেখা পাই কোথায়! এই অতুল স্মৃতি সংঘই নামাংকিত হয়েছে উলুবেড়িয়ার প্রাক্তন বিধায়ক বিভূতি ঘোষের (নানুবাবু) পিতার নামে।

১, ২. হাওড়ার গৌরব কাহিনী—সলিল মিত্র।

৩. আনন্দবাজার পত্রিকা—২০, ৮. ১৯৮৭।

৪. দৈনিক বসুমতী—২০. ৮. ১৯৮৭।

৫. Sports Week March 16, 1969.

৬. হীরক জয়ন্তী উৎসব ১৯৮৪—হাওড়া সেবা সংঙ্ঘ।

৭, ৮, ৯. হীরক জয়ন্তী বর্ষ—সার্বজনীন দুর্গোৎসব ১৩৯৬—হাওড়া সেবা সংঘ

১০, ১১, ১২. আনন্দবাজার পত্রিকা ৭ই অক্টোবর ১৯৮৯—কলকাতার প্রাচীন সার্বজনীন পুজো কাটিকে গুটিক—মানস রায়।

১৩. W. Bengal District Gazetteers (Howrah) Amiya K. Banerjee.

১৪. Golden Jubilee 1983 Howrah Annapurna Bayam Samiti.

১৫, ১৬. মহিয়াড়ী মহাকালী ব্যায়াম সমিতি—১৯৮৫—রাজ্য ভারোত্তোলন চ্যাম্পীয়ানশীপ।

বণিকের মানদণ্ড হাতে নিয়ে এদেশে এলেও রাজদণ্ড ধারণ করতে বেশি দেরী করতে হয়নি ইংরেজকে। এদেশের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা, বিশ্বাসহীনতা ও অনৈক্য ছিল তার প্রধান কারণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারে তিনটি প্রেসিডেন্সীতে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় চালু করে এদেশীয় যুব শক্তিকে উচ্চ-শিক্ষায় শিক্ষিত করার উদ্যোগ নিল ইংরেজ শাসক। যার ফলশ্রুতি হিসেবে তৈরী হল কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়। স্বাভাবিক কারণেই কলেজীয় শিক্ষা চালু হল। ইংরেজ মানসিকতা তৈরীর উদ্দেশ্যে ইংরেজ প্রবর্তিত নানা প্রকারের খেলাধুলাও এদেশে প্রবর্তিত হল। তার মধ্যে দুটি খেলা ভারতীয়দের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করল। একটি ক্রিকেট, অপরটি ফুটবল। ব্যয়বহুল ক্রিকেট খেলা যেমন সঙ্গতিসম্পন্ন গুজরাতি অধ্যুষিত বোম্বাই রাজ্যে একদা আস্তানা গড়েছিল তেমনি স্বল্প ব্যয় সম্পন্ন ও উত্তেজনাপ্রবণ ফুটবল খেলা শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকদের কাছে অধিকতররূপে আদৃত হয়েছিল।

উনিশ শতকের আশির দশকে বিভিন্ন কলেজে যথা শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং, বিশপস কলেজ, মেডিকেল কলেজ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ফুটবল খেলার জন্য নিজস্ব টিমও গড়ে উঠেছিল। তাঁরাই আবার বাইরে এসে ফুটবল টিম গঠন করতে উৎসাহী হন। এই উৎসাহের ফলশ্রুতি হিসেবেই জন্ম নিল মোহনবাগান ক্লাব ১৮৮৯ সালে। যদিও ট্রেডস কাপে মোহনবাগান কয়েকবার চ্যাম্পীয়ান হয়েছে—কিন্তু আই. এফ. এ. শীল্ডে প্রথম প্রতিযোগিতা করে ১৯০৯ সালে। এরও আগে শোভাবাজার, টাউন ক্লাব, হেয়ার স্পোর্টিং আর চুঁচুড়া স্পোর্টিং শীল্ডে যোগদান করে। কিন্তু সাফল্য লাভ করতে পারেনি। মোহনবাগান দুবছর শীল্ডে যথারীতি পরাজয় বরণ করলেও ১৯১১ সালে গোরা সৈন্যদের হারিয়ে প্রথম ভারতীয় টিম হিসেবে এক ঐতিহাসিক নজির সৃষ্টি করল। প্রতিদ্বন্দ্বী গোরা টিমের নাম ছিল ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেণ্ট। এই খেলায় মোহনবাগান ৩—১ গোলে জিতে গোরা টিমের বিরুদ্ধে ভারতীয় খেলোয়াড়দের হীনমণ্যতার মানসিকতা কাটাতে সক্ষম হল। শুধু তাই নয়, এই সালেই ইংরেজ রাজশক্তি ঘোষণা করতে বাধ্য হল যে লর্ড কার্জনের বঙ্গ ভঙ্গের প্রস্তাব (১৯০৫) তাঁরা তুলে নিলেন। একদিকে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের বঙ্গ ভঙ্গ রদ আন্দোলনের রাজনৈতিক সাফল্য অপরদিকে রাজশক্তির টিমের শীল্ডের প্রথম পরাজয় যেন গোদের উপর বিষফোঁড়ার সামিল হল ইংরেজ শক্তির কাছে। এই ঘটনাটি উল্লেখ করা হল এইজন্য, এই শীল্ড খেলায় যে এগারজন ভারতীয় খেলোয়াড় ছিলেন তাঁর মধ্যে অন্যতম ছিলেন বালি উত্তরপাড়ার বঙ্কিম মুখার্জী পরিবারের ছেলে মনোমোহন মুখার্জী। এই উত্তরপাড়া কালের গতিতে হাওড়া জেলা থেকে

আজ আলাদা হয়ে গেলেও ইতিহাসের পুরানো নজিরে দেখতে পাওয়া যায় যে উহা এককালে হাওড়া জেলারই উত্তরাংশ ছিল। তার জন্যই উহার নাম হয় উত্তরপাড়া অর্থাৎ বালির উত্তর দিকের অংশ। ঐতিহাসিকগণ বলেন 'বালি' একটি পুরাতন গ্রাম। বর্তমান উত্তরপাড়ার সীমানায় খালের বাঁধারে ইঁট খোলা অঞ্চল চকবালি নামে আজও অভিহিত। পশ্চিম বাংলার প্রবীণদের মধ্যে এখনও 'বালি-উত্তরপাড়া' ডাক অতি পরিচিত।[১]

সুতরাং মোহনবাগানের সেদিনের শীল্ড জয়ের গৌরব জাতীয় গৌরব হলেও হাওড়া জেলার গর্ব এই যে সেই জয়ের প্রত্যক্ষ অংশীদার ছিলেন মনোমোহন মুখাজী নামে জনৈক হাওড়ার খেলোয়াড়। সেই অর্থে মোহনবাগান হাওড়ার ক্লাব না হলেও মনোমোহনের জন্য হাওড়াবাসী বিশেষভাবে গর্বানুভব করতে পারেন। তৎকালে এই জয় কেবল ফুটবলের জয় বলে চিহ্নিত হত না—এই জয় ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অপসারণের বিরুদ্ধেই প্রতীকী জয়। শোনা যায়, জনৈক বৃদ্ধ ভদ্রলোক মোহনবাগানের ডিফেন্ডার রেভারেন্ড সুধীর চ্যাটাজীকে সেদিন বুকে জড়িয়ে ধরে ফোর্ট উলিয়ামের 'ইউনিয়ন জ্যাকের' দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছিলেন—'বলো, বলো, কবে তোমরা ওটাকে টেনে নামাবে ?"

এখানেই উত্তরপাড়া মুখাজী পরিবারের ফুটবলের ইতিহাসের ইতি হয়নি। দীর্ঘ আঠাশ বছর পর অর্থাৎ ১৯৩৯ সালে আবার এই মোহনবাগানই প্রথম আই. এফ-এর লীগ চ্যাম্পীয়ন হল। 'যদিও ভারতীয় দল হিসেবে লীগ বিজয়ের প্রথম গৌরব লাভ করেছিল মহমেডান স্পোর্টিং ১৯৩৪ সালে।' '৩৪—৩৮' পর্যন্ত পাঁচ বছর লীগ চ্যাম্পীয়ান ছিল এই মহমেডান স্পোর্টিং।'[২] মোহনবাগানের এবারের প্রথম লীগ বিজয়ের তিলকের ফোঁটা পড়েছিল আবার উত্তরপাড়ার মুখাজী বংশেরই এক অধস্তন পুরুষের কপালে। তিনি ছিলেন মনোমোহনেরই সুযোগ্য পুত্র বিমল মুখাজী। তবে এবার বিমলবাবু আর পিতার ন্যায় একজন খেলোয়াড়ই ছিলেন না তিনি ছিলেন স্বয়ং দলের অধিনায়ক। পিতা-পুত্রের এই যৌথ সাফল্যের ইতিহাস হাওড়াবাসীর স্মৃতির ইতিহাসে যাতে ম্লান হয়ে না যায় তাই এই আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা।

এবার হাওড়া জেলার ফুটবল ইতিহাসের কথায় আবার আসা যাক। হাওড়া জেলায় ঠিক কবে থেকে ফুটবল খেলার প্রচলন হল তা সঠিক দিনক্ষণ নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে। তবে হাওড়ার বিশিষ্ট ফুটবল রেফারী কালী রায় তাঁর 'হাওড়া জেলার ফুটবল খেলার ইতিহাস' বইতে লিখছেন—'১৮৭৭ খ্রীঃ থেকে হাওড়ায় ফুটবল খেলা চালু হয়। তবে তৎকালে ঐ ফুটবল রেলকর্মী, মিলিটারী, পুলিশ ও শিবপুর বি. ই. কলেজের ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮৮৯ খ্রীঃ প্রথম প্রতিযোগিতা-মূলক খেলা 'ট্রেডস্ কাপ' প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশে ফুটবল ইতিহাসের সূত্রপাত হয়। আর আই. এফ. এ-র জন্ম হয় ১৮৯৩ সালে।'

আই. এফ. এ. ফুটবল প্রতিযোগিতার আগে 'ট্রেডস্ কাপের' ফুটবল প্রতিযোগিতা

বঙ্গদেশে খুবই জনপ্রিয় ছিল। আই. এফ এ-র সাহেবরা 'ট্রেডস্ কাপের' সাহেবদের সম্মানের চোখে দেখতেন না—কারণ ওঁরা ছিলেন ব্যবসাদার—বিশেষ করে আবার জুট মিলের মালিক বা ম্যানেজার বলে। তাই হয়তো ঐ কাপের অনুরূপ নামও হয়েছিল। হাওড়া শহরে আই. এফ. এ. পরিচালিত প্রথম 'হাওড়া লীগ ফুটবল চালু হয় ১৯১৮ সালে। এই লীগে হাওড়া থেকে প্রথম যে পাঁচটি ক্লাব যোগ দিয়েছিল সেগুলি হচ্ছে হাওড়া ইউনিয়ন, হাওড়া টাউন ক্লাব, হাওড়া স্পোর্টিং ক্লাব, শিবপুর ইনস্টিটিউট ও শিবপুর ইউনিয়ন ক্লাব।[৩] পরে অবশ্য শালকিয়া ফ্রেণ্ডস, আন্দুল স্পোর্টিং ক্লাব মাকড়দহ স্পোর্টিং ক্লাব প্রভৃতিও যোগদান করেছিল। হাওড়া লীগ যাঁরা চালাতেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্যবহারজীবী সুব্রত ব্যানার্জীর পিতা), প্রতাপ মুখার্জী, এম. দত্ত, ডাঃ রমেন মিত্র এবং ডাঃ রহমান।[৪]

হাওড়া শহর ও গ্রামে ফুটবল খেলার প্রসার ও প্রতিযোগিতা যাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় তারজন্য ১৯৩৮ সালে মাকড়দহে 'হাওড়া জেলা ফুটবল এসোসিয়েশন' নামে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা তৈরী করা হয়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন ভূধর ব্যানার্জী (পূর্বাহ্নিপাড়া), ডাঃ রমেন মিত্র (মধ্য হাওড়া), বুকাঙ্গদ রায় (রাউতাড়া), শিবপ্রসাদ ব্যানার্জী (দঃ ঝাপড়দহ) ফণিভূষণ দত্ত (দঃ হাওড়া), প্রবোধ কুমার ব্যানার্জী (মাকড়দহ) এবং মহম্মদ আবদুল মল্লিক (হাওড়া)। এঁদের মধ্যে ভূধর ব্যানার্জী ছিলেন প্রধান সংগঠক।[৫] বালি গ্রামেরও ফুটবলের ঐতিহ্য আছে। এই গ্রামে ফুটবলের প্রবর্তক ছিলেন কান্তি গোস্বামী, রাজেন শেট ও শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। আর দক্ষিণ বালিতে ছিলেন প্রবোধ ভট্টাচার্যসহ সুনীতি গোস্বামী ও ব্রজগোপাল রায়।

এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে, আই. এফ. এ. শীল্ড ও লীগের খেলা যেমন কলকাতায় ভারতের সেরা ফুটবল টিমগুলিকে আকর্ষণ করে তেমনি বোম্বাইতে রোভার্স কাপও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৩৯ সাল। রোভার্স কাপ খেলার জন্য বোম্বাই থেকে আমন্ত্রণ আসে বাংলার প্রথম শ্রেণীর ফুটবল টিমগুলির কাছে। কিন্তু সে বছর বাংলা থেকে কেউ গেল না। হাওড়া জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনই সে বছর সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে সর্বপ্রথম রোভার্স কাপে যোগদান করে বাংলার মুখ রেখেছিল। যদিও বাংলা ফাইনাল খেলায় ১-২ গোলে পরাজয় বরণ করে। তাতে খেলেছিলেন জীবনকৃষ্ণ ব্যানার্জী (অধিনায়ক), বিভূতিভূষণ সরকার, প্রফুল্ল মিত্র, রহমন, কেষ্ট ব্যানার্জী, শচীন্দ্রনাথ মিত্র (ল্যাংচা), নরসীমা, কৃষ্ণরাও, মোহন টাট, পশুপতি ব্যানার্জী (লেড়ো), জামান, ওসমান, জোন্স, রঙ্গনাথম এবং কিঙ্কর চ্যাটার্জী।[৬]

হাওড়ার ফুটবলাররা কেবল হাওড়ার টিমগুলির হয়েই প্রথম শ্রেণীর ফুটবল ম্যাচ কলকাতায় খেলেননি, কলকাতার প্রথম শ্রেণীর ফুটবল ক্লাবেও খেলে নিজেদের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন শরৎ চৌধুরী, দেবী

ঘোষ, অভয়পদ রায়, রতন দত্ত, দাশু মিত্র, পি. বর্মন, বাঘা কুণ্ডু, রতন সেন, কার্তিক চ্যাটার্জী, ল্যাংচা মিত্র, পদ্ম ব্যানার্জী, আদিত্য রায়, শৈলেন মান্না, নীলেশ সরকার, সমর (বদ্রু) ব্যানার্জী প্রমুখ।

শরৎ চৌধুরী শিবপুর বিশপস্ কলেজের ছাত্র ছিলেন। হাওড়া ইউনাইটেড ক্লাবে ব্যাক খেলতেন। এই ক্লাবটি হাওড়াতে ইংরেজরাই স্থাপন করেন ১৮৮০—১৮৯০ সালের কোন এক সময়ে।[৭] ক্লাবের বেশির ভাগ খেলোয়াড়ই ছিল এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয় সাহেব। তাঁদের মধ্যে শরৎবাবু নিজেকে প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড় বলে নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন। ১৯০৬ সালে তিনি সিনিয়ার ডিভিশনে বৃটিশ মিলিটারী টিম রয়েল আইরিশ রাইফেলের বিরুদ্ধে অতুলনীয় খেলা খেলেছিলেন। তদানীন্তন 'দি ইংলিশম্যান' (বর্তমান স্টেটসম্যান) পত্রিকা লিখছে—'শরৎ চৌধুরী এই খেলায় একটিও বল একবারের জন্য বিপথে চালিত করেননি।'

আন্দুলের অভয়পদ রায় ছিলেন শোভাবাজার ক্লাবের অধিনায়ক। ১৯০৫ সালে আই. এফ. এ. শীল্ড বিজয়ী ডালহৌসী এ. সি. এবং ১৯০৬ সালে আই. এফ. এ. শীল্ড বিজয়ী ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের বিরুদ্ধে প্রদর্শনী ম্যাচে দেশীয় টীমের অধিনায়কও ছিলেন তিনি। এই শোভাবাজার ক্লাব কলকাতার আদি ফুটবল ক্লাবগুলির মধ্যে অন্যতম।

রতন দত্ত ১৯২১ সালে হাওড়া ইউনিয়ন ক্লাবে খেলা শুরু করেন। প্রথম জীবনে ব্যাকে খেলা শুরু করলেও শেষে গোলরক্ষক হিসেবেই খ্যাতি লাভ করেন।

দেবী ঘোষ—হাওড়া ইউনিয়নে ব্যাক হিসেবে ফুটবল খেলা শুরু করেন। কলকাতার মাঠেও একজন প্রতিভাবান খেলোয়াড় ছিলেন। শুধু দেশেই নয়—১৯৩৩ সালে কলম্বো, '৩৪ সালে ভারতের আই. এফ. এ-র বাছাই দলের হয়ে খেলেছিলেন। ১৯৩৬ সালে মোহনবাগানের হয়ে ডুরাণ্ড খেলেছিলেন। ফুটবল বিশেষজ্ঞদের মতে গোষ্ঠ পালের পর এত বড় ব্যাক আর দেখা যায় নি।

দাশু মিত্র—হাওড়া ইউনিয়নের সম্পাদক ও রাইট হাফ হিসেবে ময়দানে পরিচিত ছিলেন। ১৯৪০-এ তিনি এরিয়ানের হয়ে মোহনবাগানকে শীল্ড খেলায় ৪—১ গোলে পরাজিত করতে সহায়তা করেন। তিনি একজন প্রশিক্ষকও ছিলেন। এই ক্লাবেরই আর এক বিশিষ্ট ফুটবলার ছিলেন পরেশ চক্রবর্তী।

কার্তিক চ্যাটার্জী—বালির ছেলে—হাওড়া ইউনিয়নের হয়ে কলকাতার মাঠে খেলে গেছেন রাইট আউটে। কোনদিন দলত্যাগ করেন নি। ১৯৫৪ সালে খেলা থেকে অবসর নেন। কার্তিকবাবুর বংশ তিন পুরুষের ফুটবলার। কার্তিকবাবুর এক পুত্র কৃষ্ণকমল চ্যাটার্জী জর্জ টেলিগ্রাফে খেলতেন। আর কার্তিকবাবুর বড় ছেলে শ্যামলবাবুর ছেলে হচ্ছেন মোহনবাগানের সত্যজিৎ চ্যাটার্জী। সত্যজিৎবাবুর মিডিও হিসেবে ভারতবিখ্যাত নাম আছে। তিন পুরুষের ফুটবল খেলার বংশ বিরল। এণা মিত্র এবং কে. দত্তও ঐ একই ক্লাবে খেলতেন।

রাধানাথ (রাজা) ব্যানার্জী—বালির ছেলে। হাওড়া ইউনিয়নের হয়ে ১৯২৯ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলতে গিয়ে তলপেটে আঘাত পান। সঙ্গে সঙ্গে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করানো হলো। বাঁচানো গেল না। তাঁর নামেই আই. এফ. এ. 'রাজা শীল্ড' প্রবর্তন করেন। বিখ্যাত ফুটবলার বদ্রু ব্যানার্জীর দাদা ছিলেন তিনি।

'রাজা শীল্ডে'র কথা মনে পড়তেই হাওড়া জেলার আর এক 'রাজা' ফুটবলারের নাম মনে পড়ে গেল। তারও মৃত্যু হয়েছিল প্রতিপক্ষের অতর্কিত আক্রমণে—তবে সেটি বাংলার মাটিতে নয়—ভিন রাজ্যের মাটিতে। ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩ সাল। কোচিনের ক্যান্নানোর মাঠে জাতীয় ফুটবল লীগের খেলা হচ্ছে : হাওড়া শিবপুরের ছেলে সঞ্জীব দত্ত রেলওয়ের হয়ে খেলতে গেছে। শুধু তাই নয় টীমের অধিনায়কও 'রাজা' (সঞ্জীবের ডাক নাম)। অন্ধ্র প্রদেশের সঙ্গে খেলা হচ্ছে। সতীর্থ আব্দুল খালেকের সেণ্টার ধরতেই বক্সের বাইরে লাফিয়েছিল সঞ্জীব। আনন্দবাজার পত্রিকার রূপায়ন ভট্টাচার্য লিখেছেন—সতীর্থ খালেক বলেন—'বলটা ধরার আগেই ওদের (অন্ধ্র প্রদেশের) একজন ডিফেণ্ডার 'রাজাদা'র বুকে লাথি মেরেছিল, তা পরিষ্কার। টুর্ণামেণ্ট থেকে ছিটকে যাওয়ায় কাল রাতেই অন্ধ্র প্রদেশের ছেলেরা অনেকেই শহর ছেড়ে চলে গিয়েছেন। এমনকি—কোচ আফজলও।'* উল্লেখ্য, অরূপ শ্রীমানী গোলটা করার সুবাদেই রেলওয়ে খেলাটি জিতে যায়।

রাজা তথা সঞ্জীবের এই আকস্মিক ও মর্মন্তুদ মৃত্যুর কি কোন পূর্ব সংকেত ছিল ? রেলওয়ের কোচ চাঁদু রায় চৌধুরীর স্মৃতিচারণে তারই আভাষ পাওয়া যায়। আনন্দবাজার পত্রিকার (১৫. ২. ৯৩) স্টাফ রিপোর্টার ক্যান্নানোর থেকে লিখছেন—"এখানে খেলতে আসার আগে সঞ্জীব আর কয়েকজন মিলে আমরা দক্ষিণেশ্বরে পূজা দিতে গিয়েছিলাম। যে যার প্রসাদ নিয়ে হাতে ফিরছি। হঠাৎ দমকা হাওয়া শুধু সঞ্জীবের হাতের প্রসাদটাই ফেলে দিল। আমাদের গোলকিপার বলছিল শনিবার ভোর রাতে ওর ঘরে একটা কালো বেড়ালের ডাক শুনেছে। কেন যে এসব হল ?"

এসব ঘটনাই কি অমঙ্গলের বার্তাবাহী—না বিধাতা সূতিকা গৃহে সাত দিনের দিন দেওয়ালে অদৃশ্য হাতে যা লিখে যান তারই ফলশ্রুতি !

চূড়ান্ত পরিণাম তা কে বলবে ?

বদ্রু ব্যানার্জীর বড়দাদা রাধানাথ ব্যানার্জী (রাজা) যে ভাবে খেলার মাঠেই প্রাণ হারিয়ে ছিলেন শিবপুরের রাজা দত্তও (সঞ্জীব) একইভাবে খেলারত অবস্থায় প্রাণ দিলেন। বালির রাজা ব্যানার্জীর নামে কলকাতায় আই. এফ. এ 'রাজা শিল্ড' ষাটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত চালু রেখেছিল—কিন্তু শিবপুরের রাজার নামে কলকাতার মাঠে কোন শীল্ড চালু না হলেও শিবপুরেই 'সঞ্জীব স্মৃতি ফুটবল'

* আনন্দবাজার পত্রিকা—১৬. ২. ৯৩।

নামে একটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ফুটবল মাঠে খেলারত অবস্থায় কলকাতার মাঠে প্রথম মৃত্যু ঘটে ১৯৩১ সালে বালির রাজা ব্যানার্জীর। আর দ্বিতীয় ঘটনা ঘটলো ১৯৯৩ সালে কোচিনের ক্যাম্নানোর মাঠে শিবপুরের রাজা দত্তের! এই দুই রাজাই কিন্তু হাওড়া জেলার দুই কৃতী ফুটবলার। এই মর্মান্তিক ঘটনা দুটির দুঃখ যেন আর কোনদিন হাওড়াবাসীকে সহ্য করতে না হয়। তাই ইতিহাসের নজির হিসাবে আগামী দিনের গবেষকদের কাজের সুবিধার জন্য ঘটনাটি উল্লেখ করা হল।

শচীন মিত্র (ল্যাংচা)—জন্ম বর্ধমানে। কিশোর বয়স থেকে বালিতে লেখাপড়া শেখেন। সেই থেকে আজও বালির বাসিন্দা। খেলা শুরু বালি ওয়েলিংটন ক্লাবে। কলকাতার প্রথম শ্রেণীর বেশ কয়েকটি ক্লাবেই খেলেন। মোহনবাগানে খেলে তিনি ভারত বিখ্যাত হন। ল্যাংচাবাবুরও বংশ তিন পুরুষের প্রথম শ্রেণীর ফুটবলার। তবে সেটা কার্তিকবাবুর মত ছেলের বংশের নয়—মেয়ের বংশের। বিখ্যাত নীলেশ সরকার ল্যাংচাবাবুর জামাতা। নীলেশবাবুর ছেলে সন্দীপ সরকারও প্রথম ডিভিসনে শালকিয়া ফ্রেণ্ডসের হয়ে খেলেন। ল্যাংচাবাবু খেলোয়াড় হিসাবে যেমন খ্যাত ছিলেন কোচ হিসেবেও ততোধিক খ্যাতি পেয়েছিলেন। তাঁরই কাছে ফুটবলের ট্রেনিং পেয়েছিলেন বদ্রু ব্যানার্জী, নীলেশ সরকার, সুব্রত ভট্টাচার্য, পি. দে. (জংলা) ও স্বপন সেনগুপ্ত। কোচ হিসেবে ল্যাংচাবাবু ভারত বিখ্যাত।

নীলেশ সরকার—বালির আর এক বিখ্যাত ফুটবলার হচ্ছেন নীলেশ সরকার। জন্ম টাকিতে। কলেজে পড়ার সময় থেকেই (১৯৫৪-এ) বালিতে এসে বসবাস করতে থাকে। কলকাতার ফুটবল মাঠে নীলেশবাবুর আর একটি পরিচিত নাম ছিল—তা হচ্ছে 'হ্যাটট্রিক সরকার'। ইণ্টার কলেজ ফুটবলে নীলেশবাবু বিভিন্ন কলেজের বিরুদ্ধে তেরটি হ্যাট্রিক করেছিলেন। তাই ময়দানের দর্শকরা তাঁকে হ্যাট্রিক সরকার নামে ডাকতো। ১৯৫৬ সালে বালি প্রতিভাতে খেলে টিমকে প্রথম ডিভিসনে উন্নীত করেন। ১৯৫৮ সালে কলকাতার প্রথম ডিভিসন ক্লাবে প্রথম খেলে লীগ ও শীল্ড জেতেন। পরের বছরই (১৯৫৯) মোহনবাগানের হয়ে খেলে লীগ, শীল্ড ও ডুরাণ্ড কাপ জিতে এক অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেন। বাংলা দলেও তিনি একাধিকবার খেলেছেন। বালির শচীন (ল্যাংচা) মিত্র ছিলেন নীলেশ বাবুর ফুটবল শিক্ষক।

রতন সেন—বাগনানবাসী রতনবাবু প্রথম জীবনে শালকিয়া ফ্রেণ্ডসের রাইট আউট হিসেবে ফুটবল জীবন শুরু করেন। পরে কলকাতার ভবানীপুর ও মোহনবাগানে যোগ দেন। শুধু ভারতের প্রথম শ্রেণীর ফুটবল ম্যাচেই তিনি অংশ নেন নি—১৯৫১ সালে পাকিস্তান, ১৯৫৫ সালে সোভিয়েট রাশিয়া, ১৯৫৬-তে দূরপ্রাচ্যে মোহনবাগানের হয়ে খেলতে যান। আন্তর্জাতিক ম্যাচেও তিনি জার্মানী, অস্ট্রেলিয়া এবং চীনের বিরুদ্ধেও আই. এফ. এ. একাদশের হয়ে খেলে ফুটবলে হাওড়াবাসীর সুনাম বাড়িয়েছেন।

শৈলেন মান্না—পৈতৃক বাস হুগলীর রমানাথপুর গ্রামে হলেও মাতুলালয় হাওড়ার ব্যাঁটরাতেই তাঁর জন্ম। আমাদের তত্ত্বাবধানেই তাঁর ফুটবল জীবন গড়ে ওঠে। 'আমার ছেলেবেলা' প্রবন্ধে শৈলেন মান্না নিজেই লিখছেন—"আমাদের নিজেদের ক্লাব বলতে ছিল ব্যাঁটরা ডিসিপ্লিন ফুটবল ক্লাব (বি. ডি এফ. সি.)। কানাই, অবনী, অমর পালচৌধুরী এবং চায়না পালকেও মনে পড়ে। এরাও আমাদের সঙ্গে ছিল। চায়না পরে ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়েছিল। জেলার খেলাতে বিস্তর খেলেছি। এই ভাবেই আমি তৈরী হচ্ছিলাম নিজেরই অজান্তে।"[৮] তারপর ১৯৪২ সাল থেকেই মোহনবাগানের যে জার্সি পরলেন তা জীবনে কখনও ছাড়েননি। মোহনবাগানের যাঁরা 'ঘরের ছেলে' বলে পরিচিত তাঁদের মধ্যে হাওড়ার শৈলেন মান্না অন্যতম শ্রেষ্ঠ। জীবনে বহু বিজয়ের সাক্ষী তিনি নিজেই। একদিন কলকাতার ফুটবলে গোষ্ঠ পাল ও উমাপতি কুমার যেমন কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলেন তেমনি মোহনবাগানের 'ঘরের ছেলে' শৈলেন মান্নাও নিজেকে সেই স্তরে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালে ভারত ফুটবলে সর্বপ্রথম অলিম্পিকে যোগ দেয়। সেবারের অলিম্পিক হয়েছিল লণ্ডন শহরে।

প্রথম খেলাটি হয়েছিল ফ্রান্স বনাম ভারত। ভারত এই খেলায় ২—১ গোলে ফ্রান্সের কাছে হেরে যায়। কিন্তু সেদিনের ইংলণ্ডের দর্শক অবশ্য ভারতের প্রতিই বেশী ফেভারিট ছিল। কারণ ভারত দুটি পেনাল্টি মিস করে। ফরাসী দলের বিরুদ্ধে গোটা ভারতীয় দলটির কয়েকজন খালি পায়ে ম্যাচ খেলেছিলেন। খালি পায়ে ফুটবল খেলা যায় এটা ইংলণ্ডের লোকেরা চিন্তাও করতে পারে না। সেদিনের এই খেলাটি দেখবার জন্য স্বয়ং ইংল্যাণ্ডের রাজা ও রানীও মাঠে উপস্থিত ছিলেন। খেলার শেষে রানী ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক কিষেণলাল, ম্যারাথন দৌড়বীর ছোটে সিং ও ফুটবলের সহঅধিনায়ক এস. মান্নাকে তাঁর রাজপ্রাসাদ বাকিংহাম প্যালেসে চা মজলিসে নিমন্ত্রণ করেন। চা খেতে খেতে রানী এলিজাবেথ মান্নাবাবুকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—'আপনার পা দুটো কি লোহা দিয়ে তৈরী?' এই প্রশ্নটি শুনে মান্নাবাবুর মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা তাঁর 'ওলিম্পিকের স্মৃতি' প্রবন্ধ থেকেই তুলে দিচ্ছি[৯]—কিংকর্তব্যবিমূঢ় আমি প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি। পরে বুঝতে পেরে হেসে ফেললাম। আসলে হয়েছিল কি আমাদের দলের আমরা পাঁচজন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে খালি পায়ে ফুটবল খেলেছিলাম। আর সেটা চমকে দিয়েছিল ইংলণ্ডবাসীদের এবং রানী এলিজাবেথকেও।' জেনে আপসোস হবে যে ঐ দুটি পেনাল্টির মধ্যে একটি মিস করেছিলেন রমন এবং অন্যটি সহঅধিনায়ক মান্নাবাবু নিজে। যদিও আমাদের দেশের কাগজগুলি লিখলো দুটিই মিস করে রমন। এটা ঠিক নয়।[১০] এ টীমের অধিনায়ক ছিলেন টি. আও।

১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি ওলিম্পিকে কিন্তু মান্নাবাবু ভারতের অধিনায়ক হলেন। তাতেও প্রথম খেলাতেই যুগোশ্লাভের কাছে ১০—১ গোলে হেরে যায় ভারত। কেবল

১৯৫২ সালে দিল্লীতে এশিয়ান গেমসেই তাঁর অধিনায়কত্বে ভারত ফুটবলে সোনা জেতে ইরানকে ১—০ গোলে হারিয়ে।

এ প্রসঙ্গে আর এক হাওড়াবাসীর কথা একটু বলে রাখার মত। সেবারের অলিম্পিকে ভারতের বক্সিং টিমের সহঃ ম্যানেজার হয়ে গিয়েছিলেন শালকিয়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও ক্রীড়ামোদী মণিলাল আটা। মোহনবাগানের একদা জায়েণ্ট কিলার ফুটবলার বলাই চ্যাটার্জীই সেবারে অলিম্পিক বক্সিং টিমের ম্যানেজার ছিলেন। তিনি শালকিয়া ফ্রেণ্ডসে গল্প করেছিলেন যে বিমান থেকে যখন বক্সিং টিম লণ্ডনে নামে তখন মণিলাল আটাকে দেখিয়ে ওদেশের বক্সিং-এর জনৈক কর্মকর্তা তাঁকে (বি. ডি. চ্যাটার্জীকে) জিজ্ঞেস করেছিলেন—'ইনিই কি তোমাদের হেভী ওয়েট বক্সিং চ্যাম্পিয়ান?' উল্লেখ্য, মণি আটার চেহারা প্রকৃতপক্ষেই দেখার মত ছিল। যদিও তিনি কোনদিন বক্সিং লড়েননি। এর পেছনে যাঁর হাত ছিল তিনি হচ্ছেন শালকিয়া ফ্রেণ্ডস এসোসিয়েশনের সম্পাদক নরনারায়ণ চ্যাটার্জী (ঝণ্টুদা)। অলিম্পিক যাওয়ার আগের দিন মণিবাবু ঝণ্টুদার কাছে ভারতীয় দলের হয়ে লণ্ডনে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ঝণ্টুদা কালবিলম্ব না করে মণিবাবুকে নিয়ে সন্ধ্যে বেলায় আই. এফ. এর প্রবাদ পুরুষ পঙ্কজকুমার গুপ্তের কাছে গিয়ে হাজির। চব্বিশ ঘণ্টা আগে এই রকম একটি আবদার রক্ষা করা কার পক্ষে সম্ভব! কিন্তু ঝণ্টুবাবুর পরিচিতির সুবাদেই সেই অসম্ভব আবদার রক্ষা করেন পঙ্কজবাবু। যদিও নিজ খরচেই তাঁকে যেতে হয়েছিল।

১৯৫৯ সালে খেলতে খেলতে মান্নাবাবু ইংলণ্ডে যান কোচেস ট্রেনিং নিতে। এখানে মনে রাখা যেতে পারে যে এত বৈচিত্র্যপূর্ণ ফুটবলের জীবন শৈলেন মান্নার হয়েছে মোহনবাগানের সাহচর্য ও নিজ গুণপণা গুণে। কিন্তু এত কিছু করার পরও শৈলেন মান্না কোনদিন অর্থের বিনিময়ে ক্লাবের হয়ে খেলেননি, যেমন খেলেননি গোষ্ঠ পাল, উমাপতি কুমার, করুণা ভট্টাচার্য ও চুনী গোস্বামীর মত 'ঘরের ছেলে' কৃতী খেলোয়াড়রা। এহেন কৃতী বঙ্গসন্তানকে ভারত সরকার ১৯৭১ সালে 'পদ্মশ্রী' খেতাবে ভূষিত করেছেন।

সমর ব্যানার্জী (বদ্রু)—বালি গ্রামের এক খেলোয়াড়। ফুটবলের হাতেখড়ি বালি প্রতিভা ক্লাবে। তারপরই মোহনবাগান ক্লাবে যোগদান। মোহনবাগানের ফুটবল অধিনায়ক হয়ে ভারতব্যাপী খ্যাতি লাভ। ১৯৫৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন অলিম্পিকে ভারতীয় ফুটবলের অধিনায়ক হয়ে ভারতকে আন্তর্জাতিক মানে চতুর্থ স্থানে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজও পর্যন্ত ওটিই অলিম্পিক ফুটবলে ভারতের সর্বোচ্চ স্থান হয়ে আছে। '৫৬ সালে মেলবোর্ন ওলিম্পিক হচ্ছে সেবার অস্ট্রেলিয়াতে। ভারতীয় ফুটবল টীমের অধিনায়ক এবারও হাওড়ার খেলোয়াড়। নাম সমর ব্যানার্জী, যিনি খেলার মাঠে পরিচিত বদ্রু ব্যানার্জী বলে। দুর্গাপুজোর ভাসানের দিন। সকলের মনই বিসর্জনের বাজনার সঙ্গে বিমর্ষ। কিন্তু বালির গ্রামের লোক সেদিন রাত একটা অবধি যেন মহাষ্টমীর উৎসবের

মতো মাতোয়ারা। অনেকের হাতে মালা ও শংখ। কারণ তাদেরই গ্রামের ছেলে বদ্রু ব্যানার্জী অলিম্পিকে ভারতীয় ফুটবল টীমের অধিনায়ক হয়েছে। কলকাতা থেকে ট্যাক্সি নিয়ে বদ্রু ব্যানার্জী সমবেত শুভার্থীদের আশীর্বাদ নিয়ে বাড়ীতে ঢুকলেন। যে বাবা একদিন ফুটবল খেলার জন্য বদ্রুকে চ্যালাকাঠ দিয়ে মারতে মারতে বালি ব্রীজে তুলে দিয়ে এসেছিলেন।[১১] তিনিই সেদিন আনন্দে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন আর বললেন—দেশের মুখ রাখবার চেষ্টা করো।[১২] বাবা শশাঙ্ক শেখর ব্যানার্জী কোন দিনই চাননি বদ্রু খেলোয়াড় হউক। কারণ বড় ছেলে রাজা ব্যানার্জী ফুটবল খেলতেই মারা গিয়েছিল। সেবারের ভারতীয় অলিম্পিক টীমে ছিল কেম্পিয়া, আর মুর, পি. কে., বদ্রু, নেভিল ও কিট্টু। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে প্রথম ম্যাচে দুর্দান্ত খেলে ৪-২ গোলে জিতল। নেভিল ডিসুজা হ্যাট্রিক করল।[১৩] কিন্তু দ্বিতীয় খেলায় যুগোশ্লাভ থেকে প্রথমার্দ্ধে এক গোলে ভারত এগিয়ে থাকলেও আত্মঘাতী একটি গোলেই সমস্ত খেলার ছন্দ কেটে যায়। পরে আর দাঁড়াতে পারেনি। এইভাবে তৃতীয় স্থানের জন্য বুলগেরিয়ার কাছেও ভারত হেরে গিয়ে ওলিম্পিকে চতুর্থ স্থান লাভ করে।

পরপর তিনটি অলিম্পিক গেমসে ভারতীয় ফুটবলের অধিনায়কত্ব করার গুরু-দায়িত্ব লাভ করেছিলেন হাওড়ারই দুই খেলোয়াড়—এটা কি কম গৌরবের বিষয়!

বালির আর এক ফুটবলার ছিলেন কমল সামন্ত। শৈলেন মান্নার স্থানে মোহন-বাগানের ব্যাকে কয়েক বছর খেলে সম্মান পেয়েছিলেন। **The Statesman** লিখল —**Good substitute for S. Manna.** এতক্ষণ মোহনবাগান ক্লাবে হাওড়ার নামী ফুটবলারদের সম্বন্ধে বলা হল। এখানে ঐ ক্লাবেরই একজন খ্যাতনামা সংগঠকের নাম না আলোচনা করলে অঙ্গহানি হয়ে যাবে। তিনি হচ্ছেন ধীরেন দে। ধীরেনবাবু ফুটবলের একজন স্বীকৃত রেফারি ছিলেন। তিনি ১৯৩৭ সালে কলকাতার মাঠে ইংলন্ডের বিখ্যাত কোরিন্থানস্ ফুটবল টীম বনাম আই. এফ. এ একাদশের ম্যাচটি খেলিয়েছিলেন যোগ্যতার সঙ্গে। ধীরেনবাবু মোহনবাগান ক্লাবের একজন ভাল ক্রিকেটার ছিলেন, মোহনবাগান ক্লাবে তিনিই প্রথম যিনি খেলোয়াড় থেকে ক্লাবের কর্মকর্তার পদে আসীন হন—যেমন সচিব ও সহ-সচিব ইত্যাদি পদে। হাওড়ার ধীরেনবাবুই প্রথম যিনি মোহনবাগানের হাইকম্যাণ্ড কলকাতার বসু-সেন-মিত্তির বাড়ির একাধিপত্য ভেঙ্গে দিয়ে ক্লাবের সহ-সচিবের পদে নির্বাচনে জয়ী হন কলকাতার কমল বসুকে হারিয়ে। সেই থেকে প্রায় চল্লিশ বছর তিনি মোহনবাগান ক্লাবের নৌকাটির কাণ্ডারী হিসাবে কাজ করে গেছেন। তবে সেই ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল তাঁরই কলকাতার লিণ্ডসে স্ট্রীটের দে'জ মেডিক্যাল কোম্পানীর অফিস। বিভিন্ন রাজ্যে যেয়ে বিভিন্ন টুর্ণামেণ্টে ক্লাবের পক্ষ থেকে নাম দেওয়ার কাজে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। মোহনবাগান ক্লাবের বর্তমান কর্ণধার হচ্ছেন কেষ্ট সাহা, টুটু বসু, অঞ্জন মিত্র ও বলরাম চৌধুরী। এঁদেরকে বলা হয় মোহনবাগানের 'চারমূর্তি'।' আনন্দের কথা এঁদের মধ্যে দুই মূর্তিই হচ্ছেন

হাওড়ার অধিবাসী। টুটু বসু বর্তমানে কলকাতায় থাকলেও হাওড়া রামকৃষ্ণপুরের বাসিন্দা আর বলরামবাবু তো খোদ শালকিয়াই থাকেন।

হাওড়া জেলার আরও কয়েকজন কৃতী ফুটবলারের নাম উল্লেখ করেই এই প্রসঙ্গ শেষ করা হবে। আমতা তাজপুরের আদিত্য রায় আউটে হাওড়া স্পোর্টিং-এর হয়ে খেলে ইংরেজ আমলে কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। শালকিয়ার পশুপতি ব্যানার্জী (লেড়োদা), সীতাংশু কুণ্ডু (বাঘা কুণ্ডু) ও পি. বর্মন. হাওড়ার সমর দত্ত (কেষ্ট দত্ত), প্রমুখ ছিলেন নামী ফুটবল খেলোয়াড়। হাওড়ার অপর চার খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের মধ্যে আছেন অশোক চ্যাটার্জী, অমিয় ব্যানার্জী, অরুণ ঘোষ ও সুদীপ চ্যাটার্জী। অশোক চ্যাটার্জীর বড় কৃতিত্ব হচ্ছে ১৯৬৫ সালে 'কুয়ালালামপুরে মারডেকা ফুটবল ম্যাচে' ভারতের হয়ে তিনি জাপানের বিরুদ্ধে হ্যাট্রিক করেছিলেন।[১৪] এই মারডেকা ম্যাচে বালির ল্যাংচা মিত্র ছিলেন ভারতের ফুটবল কোচ। ১৯৬০ সালে অরুণ ঘোষ রোম অলিম্পিকে ভারতের হয়ে খেলেন। শিবপুরের সুদীপ চ্যাটার্জী কলকাতর মাঠে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ১৯৮২ সালে। সে বছর কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে 'নেহরু আন্তর্জাতিক গোল্ড কাপের' প্রথম প্রতিযোগিতা শুরু হয়। সুদীপবাবু তাতে প্রথম ভারতের অধিনায়ক হন। আশির দশকের আর এক কৃতী খেলোয়াড় হলেন বিকাশ পাঁজি। হাওড়ার জগদীশপুরে বলুহাটি গ্রামের ছেলে। তিনি ক্যালকাটা জিমখানা ও শালকিয়া ফ্রেন্ডসে ফুটবল জীবন শুরু করেন। ১৯৮৯ সালে ত্রিচুরে জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়ানশীপে খেলে কৃতিত্ব দেখান। পরে মোহনবাগান—ইস্টবেঙ্গলেও দল বদল করেন। ১৯৯১ সালে ত্রিবান্দমে নেহরু গোল্ড কাপে জাম্বিয়ার বিরুদ্ধে ভারত ১—০ গোলে জয়ী হয়। গোলটি অধিনায়ক বিকাশই করেন।[১৫] এই বিকাশ পাঁজিকে কলকাতা তথা ভারতের ফুটবলে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার কৃতিত্বের মূলে ছিলেন শালকিয়া ফ্রেন্ডসের কর্ণধার নরনারায়ণ চ্যাটার্জী (ঝণ্টুদা)—এ সত্য বিকাশ বাবুও স্বীকার করেন।

এখানে উলুবেড়িয়ার ছেলেদেরও ফুটবলের কৃতিত্ব উল্লেখ করার মত। বিজন বিহারী দে বঙ্গবাসী কলেজে পাঠরত অবস্থায় ফুটবল দলের অধিনায়ক হন। ১৯৩৭ সাল থেকে মোহনবাগান ক্লাবে তিনি খেলা শুরু করেন। মোহনবাগান ১৯৩৯ সালে যখন আই, এফ, এর প্রথম লীগ চ্যাম্পিয়ন হয় তখন বিজন দে ঐ দলে অংশ গ্রহণের কৃতিত্ব অর্জন করেন। এছাড়া ঐ অঞ্চলের নির্মল ঘোষ উয়াড়িতে, বারিদ বরণ লাহিড়ী, বিমল দে, সুপ্রভাত দে, দেব কুমার জাসু প্রভৃতি বি, এন, আর-এ নিয়মিত খেলেছেন। এখন ইস্টবেঙ্গলের একজন নামী খেলোয়াড় তরুণ দেও উলুবেড়িয়ারই ছেলে।

হাওড়া জেলা থেকে আই, এফ,-এর প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন কোণার অধিবাসী হেমন্ত কুমার দে। অপরপক্ষে ক্রিকেট এসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের (সি. এ. বি) হাওড়া জেলা থেকে প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন শালকিয়া ফ্রেন্ডসের সম্পাদক

নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (ঝণ্টুদা) (১৯৭৫ সাল)। আই. এফ.-এর-কার্যকরী সমিতির প্রথম জেলার নির্বাচিত সদস্য হন ১৯৩৮ সালে হাওড়ার ডাঃ রমেন মিত্র। কলকাতা রেফারী এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি হাওড়া ইউনিয়নের সম্পাদকও ছিলেন।[১৬]

কলকাতার মাঠে প্রথম শ্রেণীর ফুটবল খেলায় রেফারী করার যোগ্যতা অর্জন করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন হাওড়া-শালিখার মানিকলাল বসু ও সন্তোষকুমার সেন। এঁরা দুজনেই তিরিশের দশকে আই. এফ্. এ. পরিচালিত প্রথম শ্রেণীর ফুটবল ম্যাচ পরিচালনা করতেন। মানিকবাবু কলকাতার লোক হলেও দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে শালকিয়ায় থেকেই মৃত্যুবরণ করেন।

হাওড়া জেলা রেফারী এসোসিয়েশন প্রথম গঠিত হয় ১৯44 সালে। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন তুণ্টু ঘোষ। কলকাতার মত হাওড়া জেলায়ও প্রবীণ খেলোয়াড়দের নিয়ে ১৯৬৬ সালে 'হাওড়া জেলা ভেটারেন্স স্পোর্টস এসোসিয়েশন' গঠিত হয়। উদ্যোক্তা ছিলেন কালী রায়, পশুপতি ব্যানার্জী ও রবীন্দ্রনাথ হাজরা। ফুটবলে ১৯৬৫ সালে অরুণ ঘোষ 'অর্জুন পুরস্কার' পেয়ে হাওড়াবাসীর মুখোজ্জ্বল করেছেন। আধুনিক ফুটবলের একটি অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ হচ্ছে 'স্পোর্টস মেডিসিন'। ১৯৭০ সালে হাওড়ার খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ দীনবন্ধু ব্যানার্জীর উদ্যোগের ও ডাঃ এম. এস. ঘোষের (বিখ্যাত অস্থি চিকিৎসক) সভাপতিত্বে 'হাওড়া জেলা স্পোর্টস মেডিসিন' তৈরী হলে খেলোয়াড়দের অশেষ উপকার সাধিত হয়। শুধু হাওড়ায় নয়— পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতে যাঁরা স্পোর্টস মেডিসিন নিয়ে প্রথম চিন্তা ভাবনা করেন ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ডাঃ ব্যানার্জীকে ভারত সরকার তার সমাজ সেবার স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৯১ সালে 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত করেন। স্পোর্টস মেসিনের আর একজন দক্ষ শিক্ষক হচ্ছেন উলুবেড়িয়ার অরুণ কুমার হাজরা। ১৯৮৯ সালে ঐ বিষয়ে কলকাতায় এশিয়ান কনফারেন্সে তাঁর লেখা প্রবন্ধ সম্মেলনে প্রসংশিত হয়। পাঞ্জাবের পাতিয়ালা এন. আই. এস ফুটবল কোচ হিসেবে জেলার অগ্রদূত বলা যায় যথাক্রমে ল্যাংচা মিত্র ও অশোক নাগকে। রামকৃষ্ণ-পুরের অশোক নাগ সম্বন্ধে নরনারায়ণ চ্যাটার্জী লিখছেন—**It is Asoke Nag a quality Footbal Coach, who with his sincere efforts caused the football team of the Salkia Friend's promotion to First Division League of Calcutta and also created its stability to remain in First Division.**[১৭] আর ল্যাংচা মিত্র তিনি নিজেই একটি ইতিহাস।

এতক্ষণ ফুটবলে হাওড়া জেলার খেলোয়াড়দের কৃতিত্বপূর্ণ গৌরবের কথা আলোচনা করা হল। কিন্তু এই ফুটবলকেই কেন্দ্র করে একদা হাওড়া জেলায় একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। সেই ইতিহাসের একটু আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা আছে। ফুটবল খেলা যে হাওড়ার গ্রামেতেও কত জনপ্রিয় হয়ে

উঠেছিল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছে ঝিকিরা (আমতা) ওয়েষ্টার্ণ ফুটবল ক্লাব। গ্রামের মধ্যে এটি সম্ভবত প্রাচীনতম ক্লাব। এর প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৮২ সালে। এই ক্লাব তার শতবর্ষ উদযাপন ক'রে পশ্চিম বাংলায় তার গৌরবের কথা ঘোষণা করায় হাওড়াবাসী মাত্রই গর্বিত। এই ক্লাবের উদ্যোগে 'ভাগ্যধর শীল্ড' নামে একটি ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতার নামী-নামী ক্লাবরাও এতে অংশ গ্রহণ করতো। ১৯৭৯ সালে ঝিকিরা ওয়েষ্টার্ণ ক্লাবের মাঠে মহিলা ফুটবলের এক প্রতিযোগিতা হয়। হাওড়া পৌরসভার প্রথম চেয়ারম্যান ও তাজপুরের সুসন্তান মহেন্দ্রনাথের স্মৃতিতে 'মহেন্দ্রনাথ মেমোরিয়াল কাপ' খেলা হচ্ছে। মহিলাদের এই প্রতিযোগিতার সংগঠক হিসেবে নেতৃত্বে ছিলেন প্রখ্যাত খেলোয়াড় ও কোচ পি. কে. ব্যানার্জীর স্ত্রী আরতি ব্যানার্জী। যে কোন কারণেই হউক দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী মহিলা টিমের মধ্যে কলকাতার একটি দল সেদিন অনুপস্থিত ছিল। ফলে একই দলের মহিলা ফুটবলারদের ভাগাভাগি করে খেলান হয়। গ্রামে মহিলা ফুটবল খেলা—তার ওপর আবার কলকাতার দল। স্বভাবতই মাঠে সেদিন তিল ধারণের জায়গা ছিল না। কর্মকর্তাদের কিছু ত্রুটির জন্য গ্রামবাসীরা নৈরাশ্য ও ক্ষোভবশতঃ খেলোয়াড়দের ওপর মারমুখী হয়ে ওঠে। এর ফলে পুলিশের সঙ্গে গ্রামবাসীদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। তাতে একজন পুলিশ ও একজন গ্রামবাসী মারা যায়। মহিলা খেলোয়াড়রা জীবনে বাঁচলেও অনেকেই আশঙ্কাজনক ভাবে আহত হয়েছিলেন। হাওড়ার ফুটবল ইতিহাসে এটি একটি কালিমালিপ্ত অধ্যায়। মনে রাখা যেতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম মেয়েদের ফুটবল খেলার প্রবর্তন করেন এই আরতি ব্যানার্জী সত্তরের দশকের প্রথমার্দ্ধে।

এবার ক্রিকেটের কথায় আসা যাক। একথা ঠিক যে বর্তমান শতাব্দীর চাল্লশের দশক পর্যন্ত ক্রিকেট এত জনপ্রিয় হয়নি। আজকের মত টেষ্ট ম্যাচ, রণজি ট্রফি, দলীপ ট্রফি, ইরানী ট্রফি ইত্যাদি প্রবর্তনও তখন হয়নি। কিন্তু এসব না থাকলেও হাওড়া থেকে বেশ নাম করা ক্রিকেটার কলকাতার ইডেন গার্ডেনে খেলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এমনকি বেঙ্গল টিমে স্থান পেয়ে হাওড়ার মুখোজ্জ্বল করেছিলেন। সে সময়ও বড় বড় ক্রিকেট ম্যাচ খেলার রেওয়াজ ছিল—যেমন গভরনার্স একাদশ, ভাইসরয়স-একাদশ বনাম বেঙ্গল রেষ্ট ইত্যাদির মধ্যে। সেই খেলা দেখতে ইডেনে সাহেবসুবো থেকে ভারতীয় ক্রীড়ামোদীদের বেশ ভীড়ও হত। হাওড়ার ক্রিকেট ইতিহাসে হাওড়া স্পোর্টিং-এর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই ক্লাবেরই বিখ্যাত ব্যাটস্‌ম্যান বামাচরণ কুণ্ডুর নাম সবার আগে উল্লেখ করতে হয়। তিনি তিরিশের দশকে বেঙ্গল টিমে খেলে নিজ কৃতিত্বের নজির রেখে গেছেন। আর একজন নামী ব্যাটস্‌ম্যান ছিলেন হাওড়া কোর্টের বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী বরদাপ্রসন্ন পাইন। আইনের ক্ষেত্রে যেমন তিনি হাওড়া কোর্টে এক নম্বর ছিলেন ক্রিকেটে ব্যাটিং-এর ক্ষেত্রেও হাওড়া স্পোর্টিং-এর তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়। হাওড়া ইউনিয়নের দাশু মিত্র ফুটবলের মত ক্রিকেটেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বরদাবাবুর ছেলে

ব্যবহারজীবী সুশীল পাইনের নামও ক্রিকেট খেলোয়াড়দের স্মরণে রাখার মত। শালিখার কিশোরীমোহন ঘোষাল (পানিদা) ও বিশ্বনাথ বসাক প্রভৃতি সে যুগের ক্রিকেটে উল্লেখযোগ্য নাম।

হাওড়া স্পোর্টিং-এর আর এক চৌখস ব্যাটস্‌ম্যান ছিলেন যাঁর নাম কলকাতার ক্রিকেট ও ফুটবল মাঠে সদাই উচ্চারিত হত। তিনি হচ্ছেন মণি দাস— ক্রীড়া জগতে এম. দাস বলেই পরিচিতি। মোহনবাগানে মণিবাবু ফুটবলে নাম করলেও ক্রিকেটের তাঁর খ্যাতি ছিল সমধিক। কলকাতার ইডেন উদ্যানে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে। ম্যাচটি ছিল বাঙ্গালা গভরনার একাদশ বনাম কুচবিহার মহারাজ একাদশের মধ্যে। পরবর্তী বছরে অর্থাৎ ১৯১৮ সালে অনুরূপ একটি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ খেলা হল। এই ক্রিকেট ম্যাচ, কুচবিহার মহারাজার একাদশ গভরনার একাদশকে এক ইনিংস ও সতের রানে পরাজিত করে।[১৮] স্মরণ করা যেতে পারে যে কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের স্মৃতি রক্ষার্থেই কুচবিহার ট্রফি খেলা হয়। এই টিমে সেদিন যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিদেশী ও এদেশীয় খেলায়াড়রাও ছিলেন। অপরপক্ষে গভরনর দলের সব খেলোয়াড়ই ছিলেন বিদেশী। মহারাজার টিমে উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে ছিলেন কুচবিহারের যুবরাজ ভিক্টর, হ্যারিলি, ফ্র্যাঙ্কে টারেন্ট-উইকেট কিপার ছিলেন এইচ. এম. হ্যানি। আর ভারতীয়দের মধ্যে ছিলেন 'মণি দাস'।

স্টেটসম্যান পত্রিকায় যে ছবিটি ছাপা হয়েছিল তাতে লেখা হয়েছে—**On his (H. M. Hanny) left is another local batsman, Mohan Bagan's Moni as,**[১৯] এই মণিবাবু ১৯১৭ সালের ইডেনের প্রথম খেলাতেও কুচবিহার মহারাজের হয়ে খেলেছিলেন। এতক্ষণে হয়তো পাঠক বুঝতে পারছেন যে মণিবাবু কি স্তরের একজন ব্যাটসম্যান ছিলেন—যার ফলে কুচবিহার মহারাজার একাদশে সেরা বিদেশী ক্রিকেটারদের মধ্যেও তিনি নিজ আসন করে নিতে পেরেছিলেন। এই মণি দাস মধ্য হাওড়ার পঞ্চাননতলা রোডের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। আধুনিক চারু শিল্পী রবীন মণ্ডল হচ্ছেন তাঁরই ভাগ্নে। ভবিষ্যৎ ক্রিকেট খেলোয়াড়দের কাছে হাওড়ার ক্রিকেটের প্রাচীন ঐতিহ্য তুলে ধরার পক্ষে এই নজিরগুলি খুবই মূল্যবান।

সব শেষে সত্তরের দশকের শেষার্ধে ও আশির দশকে হাওড়া-শালিখার অলোক ভট্টাচার্য ও সুব্রত পোড়েল রণজি ট্রফিতে বাংলার হয়ে খেলে জেলার সুনাম রেখেছেন। এ ক্ষেত্রে টেবিল টেনিসেরও একজন নামী কোচের নাম উল্লেখ না করে থাকা যাবে না। তিনি হচ্ছেন রামকৃষ্ণপুর বিশ্বকল্যাণ সংঘের প্রাক্তন সদস্য নিমাই নিয়োগী। তিনি অনেকদিন হল লণ্ডনে টেবিল টেনিসের কোচ হিসাবে নিযুক্ত আছেন। কলকাতায় কয়েক বছর আগে যে ইডেনে বিশ্ব টেবিল টেনিস টুর্ণামেন্ট হয়ে গেল তারও তিনি অন্যতম আম্পায়ার ছিলেন। রামকৃষ্ণপুরের আর এক খেলোয়াড় ডাঃ নন্দলাল সিংহ টেবিল টেনিসে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলেন। তিনি চেয়ারম্যান চারুচন্দ্র সিংহ-এর পরিবারের সন্তান ছিলেন।

আকাশে বিমান চালনা যেমন একটা পেশা তেমনি কারো কারো কাছে এটি আবার নেশাও হয়ে ওঠে। এ রকমই নেশা হিসাবে বিমান চালাতেন হাওড়া-বাঁটরার বিনয় কুমার দাস। পনের বছর বয়সে জাপানের অ্যাপকার অ্যাণ্ড কোম্পানীতে শিক্ষানবীশ হিসেবে সে দেশে যান। এছাড়া ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশেও ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য অল্প বয়সেই ঘুরে আসেন। পরে নিজ চেষ্টায় যন্ত্রপাতি নির্মাণের একটি কোম্পানী তৈরী করে প্রচুর অর্থের মালিক হন। বিমান চালনা ছিল তাঁর পরম সখ। তাই তিনি একটি বিমানও ক্রয় করেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি ১৯৩০ সালে ভারতের আকাশে বিমান উড়িয়েছিলেন।[২০] আরও আনন্দের কথা তাঁরই অনুসন্ধানের ফলে ভারতের নতুন স্থানে বিমান অবতরণ ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। 'প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় বদরিকাশ্রম প্রভৃতি স্থানে বিমান অবতরণ ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।[২১] বিনয়বাবু যে বিমানটি কিনেছিলেন তার নাম ছিল 'জিপসি মথ'—এই নামটি কোথাও উল্লেখ নেই। এই তথ্যের পরিবেশক ব্যাঁটরা স্কুলের প্রবীণ শিক্ষক ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি আযোধ্যা নাথ অধিকারী (বন্দ্যোপাধ্যায়)। ১৯৩৪ সালে বাগনানের খাজুরান গ্রামে খেয়ালী সংঘ একটি পুরস্কার বিতরণী সভার আয়োজন করেছিল। বিনয়বাবু সেদিন তাঁর 'জিপসি মথ' চালিয়ে খাজুরানের মাঠে নেমেছিলেন।

বাগনানের মাটিতে সেই প্রথম বিমান নামলো। গ্রামের অসংখ্য নরনারীর সেদিনের স্মৃতি আজও প্রবীণদের বলতে শোনা যায়। এই দুঃসাহসী যুবক বিনয় দাস মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে (১৯৩৫) এক বিমান চালনা কৌশল প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে গিয়ে অপর প্রতিযোগী ডি. কে. রায়ের বিমানের সঙ্গে সংঘর্ষে অকালে প্রাণ হারান।[২২] হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজ প্রাঙ্গণে তাঁরই মর্মর আবক্ষ মূর্তি স্থাপিত আছে। ঠিক এমনি আর এক যুবক সুচিত্র বসু (প্রাক্তন বিধায়ক সুপ্রিয় বসুর মেজদা) মাত্র ৩৮ বছর বয়সে হরিয়ানার পাণিপথে বিমান চালাতে গিয়ে ১৯শে মে ১৯৭৮ সালে এক দুর্ঘটনায় অকালে প্রাণ হারায়। বিমান চালনায় এঁরা যুবশক্তির কাছে প্রেরণা দাতা হয়ে থাকবেন।

এই অধ্যায়ের শেষে জেলার কয়েকটি ঐতিহ্যপূর্ণ ফুটবল ও ক্রিকেট ক্লাবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া হল।

বালি এ্যাথলেটিক ক্লাব—খেলাধুলা নিয়ে অনুশীলন করছে এবং তার উৎপাদিত ফল রাজ্য তথা ভারতের গৌরবের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে এমনই ক্লাব হচ্ছে বালি এ্যাথলেটিক ক্লাব। ক্লাবটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৮৮ সালে এবং শতবার্ষিক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়েছিল ১৯৮৭ সালে। সারা বছর ধরে নানা কর্মসূচীর মাধ্যমে ঐ উৎসব পালিত হয়েছিল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রাজ্যের তদানীন্তন ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীসুভাষ চক্রবর্তী। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তনমন্ত্রী শ্রীপতিত পাবন পাঠক, কেন্দ্রীয় প্রাক্তন বাণিজ্যমন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী ও সারা ভারত ফুটবল ফেডারেশনের তদানীন্তন সভাপতি অশোক ঘোষ।

বালি এ্যাথলেটিক ক্লাবের প্রতিষ্ঠাকালে নাম ছিল ওয়েলিংটন ক্লাব। ক্লাবের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মনোমোহন গোস্বামী। এই মনোমোহন বাবুই আবার পরবর্তী কালে হয়ে উঠলেন বাংলাদেশের বিখ্যাত নট ও নাট্যকার।* ১৯১১ সালে মোহনবাগান ক্লাব যেমন বিদেশী টীমকে হারিয়ে আই. এফ. এ. শীল্ড বিজয় করে ভারতীয়দের মনোবল তুঙ্গে তুলেছিল তেমনি বালির ওয়েলিংটন ক্লাবটিও তদানীন্তন কলকাতার বিখ্যাত ফুটবল টীম রয়েল আর্টিলারী গ্যারিসন নামে একটি মিলিটারী টিমকে ৩—১ গোলে পরাজিত করে বাঙ্গালী যুবশক্তির মধ্যে আত্মবিশ্বাসের এক প্রেরণা জুগিয়েছিল। এই ক্লাবেরই একদা কর্ণধার ছিলেন বিখ্যাত ফুটবলার রাধানাথ যিনি 'রাজা' ব্যানার্জী নামে ফুটবল মাঠে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই ক্লাব থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল ভারতের দুর্ধর্ষ লেফট ইনসাইডার শচীন্দ্রনাথ মিত্র। যিনি ল্যাংচা মিত্র নামেই আবালবৃদ্ধবণিতার কাছে পরিচিত। ল্যাংচাবাবু ১৯৯৭ সালের ৪ঠা নভেম্বর বালিতে ছিয়াশী বছর বয়সে পরলোক গমণ করেন। এই ক্লাবেরই একটি সফল উৎপাদিত ফল হিসাবে কলকাতা তথা ভারতের ফুটবলে আত্মপ্রকাশ করলেন সমর (বদ্রু) ব্যানার্জী। এ ছাড়া এই ক্লাবের বহু সদস্যই ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, এরিয়ান, ভবানীপুর ক্লাবের হয়ে কলকাতায় খেলে যশ ও গৌরব অর্জন করেছেন। আধুনিক কালেও মোহনবাগানের সত্যজিৎ চ্যাটার্জী এই ক্লাবেরই ঘরোয়ানায় তৈরী। সত্যজিৎবাবুর ঠাকুরদা কার্তিক চ্যাটার্জী এককালে দিকপাল ফুটবলার ছিলেন। তিনিও এই ক্লাবেরই আদি যুগের সদস্য। শুধু ফুটবলেই নয়—কলকাতার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে ক্লাবের সদস্য দিলীপ ঘোষ ব্যাটসম্যান হিসাবে এককালে খুবই যশ অর্জন করেছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৫৪ সালে ওয়েলিংটন ক্লাবটির নাম বদলে রাখা হয় বালি এ্যাথলেটিক ক্লাব। ভারতীয় ফুটবলে গত একশ বছরে ক্লাবটি যে সব ফুটবল প্রতিভার যোগান দিয়েছে তার জন্য ফুটবল প্রেমিক মাত্রই গর্বভরে ক্লাবটিকে স্মরণ করবে।

হাওড়া স্পোর্টিং ক্লাব—অবিভক্ত বাংলার প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট ক্লাবগুলির মধ্যে অন্যতম প্রাচীন ক্লাব হচ্ছে এটি। যদিও এই ক্লাবটি কেবল ক্রিকেট নয়, ফুটবল, টেবিল টেনিস, লন টেনিস প্রভৃতিতেও অতীত গৌরবের অধিকারী—তথাপি ক্রিকেটেই এই ক্লাবের ইতিহাস বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই ক্লাব থেকেই ক্রিকেটের হাতে খড়ি হয়েছিল প্রখ্যাত ক্রিকেট ভাষ্যকার অজয় বসু ও প্রেমাংশু চ্যাটার্জীর। বিখ্যাত বেঙ্গল স্পিনার জলি সরকারও ক্রিকেট খেলা শুরু করেছিলেন হাওড়া স্পোর্টিং থেকেই। এছাড়া পুরোনো দিনের নামী ক্রিকেটারদের মধ্যে ছিলেন মণি দাস, বাদল ঘোষ, কার্তিক দত্ত, মোনা দাস, রাজকৃষ্ণ ঘোষ, বিশ্বরঞ্জন চ্যাটার্জী, এইচ বার্লো, নরেন পাল, কালি পাইন, কানাই পাইন, বিভূতি ঘোষ, সুশীল পাইন (উকিল),

* যাত্রা থিয়েটার অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

কালিপদ লাহা, লক্ষ্মণ পাত্র, বারীণ মিত্র, পূর্ণেন্দু পাল, বাদু বসু, সুবল পাল প্রমুখ। 'ক্রিকেট ব্রু' সত্যেন কর, যদুনন্দন গাঙ্গুলী ও সুনীত দত্তও এই ক্লাবে ক্রিকেটে হাত পাকান। তদানীন্তন বঙ্গদেশে জীমখানা পরিচালিত ক্রিকেট লীগে হাওড়া স্পোর্টিং ক্লাব পর পর ক্রিকেটে তিন বছর জয়ী হয়ে 'ত্রিমুকুট' আখ্যা লাভ করে। এর পর ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল তৈরী হলে জেলাগুলির মধ্যে এই ক্লাবটিকেই প্রথম স্বীকৃত ক্লাব বলে অনুমোদন দেওয়া হয়। ১৮৮৯ সালে এই ক্লাবটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রিকেটে এই ক্লাবের অবদানের কথা স্মরণে রেখেই তৎকালে এটিকে বলা হত বাংলার এম. সি. সি. (M. C. C.)। এই ক্লাবের নিয়মিত খেলোয়াড়দের মধ্যে নাম করেছিলেন শচীন দত্ত, দুলাল সেন, অম্বিকা ব্যানার্জী (বিধায়ক), অমর মুখার্জী, নদের চাঁদ মল্লিক ও লালু পাইন প্রমুখ। ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি প্রখ্যাত অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ একদা এই ক্লাবের সভাপতি ছিলেন। ক্রিকেটের কর্মকর্তাদের মধ্যে একদা বি. বি. ঘোষ, অলোকনাথ মুখার্জী, অশোক রায় প্রমুখ ব্যক্তিরা এই ক্লাবেরই সদস্য ছিলেন। এহেন ক্লাবটিকে যাঁরা তৈরী করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন নিতাইচরণ দত্ত, বামাচরণ কুণ্ডু, সারদাচরণ মিত্র, বরদা পাইন (বিখ্যাত ব্যবহারজীবী), মন্মথ বসু, দ্বিজবর চোংদার, মহীন দত্ত, জি. ব্যানার্জী, সন্তোষ দত্ত (প্রাঃ সাংসদ), বঙ্কিম কর (প্রাঃ স্পীকার), ডাঃ শরৎ দত্ত, খগেন মিত্র প্রমুখ। নিজস্ব ত্রিতল পাকা বাড়িতে রয়েছে ফ্রি রিডিং রুমযুক্ত একটি পাঠাগার ও টেবিল টেনিস কোচিং সেণ্টার। প্রবীণ ব্যক্তিদের বিশেষ করে খেলোয়াড়দের কাছে হাওড়া স্পোর্টিং একটি সুবিদিত নাম। কিন্তু যেটা আজও কোন সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হয়নি* সেটা হচ্ছে এই—সৌরভ গাঙ্গুলী (ক্রিকেটার) প্রথম স্বীকৃত ক্রিকেট টুর্নামেণ্ট খেলে হাওড়া জেলার পক্ষ হয়ে, অনুর্দ্ধ ১৯ বছর আন্তঃজেলা জুনিয়ার ক্রিকেট টুর্নামেণ্টে। খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৬ সালে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নরেন্দ্রপুর বিদ্যামন্দিরের মাঠে। তখন সৌরভের বয়স হবে পনেরো ছুঁই ছুঁই। এই তথ্যটি দেন ক্লাবের বর্তমান সম্পাদক রোটারিয়ান নিমাই চরণ দত্ত। বর্তমান সভাপতি অজিত হরি দত্ত ও সম্পাদক নিমাই চরণ দত্ত এত গৌরবের কথা শোনালেও ক্লাবের নবীন সদস্যদের তাঁরা ক্রিকেট ও ফুটবল অনুশীলনের কোন ব্যবস্থা করে উঠতে পারছেন না। কারণ যে মাঠ দুটিতে এই শতবর্ষের ক্লাবটি অনুশীলন করে আসছিল তা আজ হাওড়া কর্পোরেশন স্টেডিয়াম ও শরৎ সদনে রূপান্তরিত হয়েছে।

আমতা স্পোর্টিং ক্লাব—হাওড়া জেলার গ্রামে একশো বছরের ফুটবল ক্লাব বলতে আমতা স্পোর্টিং ক্লাবের নামই সবার আগে মনে পড়ে। গ্রামের ছেলেদের খেলাধুলার মাধ্যমে সুস্থ দেহে সুস্থ মন গড়ে তোলার আদর্শে যাঁরা এই ক্লাবটি তৈরী করেছিলেন তাঁদের মধ্যে যোগীন্দ্রনাথ মিত্র ও বিপিনচন্দ্র ঘোষের নাম সর্বাগ্রে

* কেবল 'বিচার' পূজা সংখ্যা ১৯৯৬—হাওড়া।

স্মরণীয়। ১৮৯৩ সালে এই ক্লাবটি গড়ে উঠে। নির্দিষ্ট কোন মাঠ নেই। যখন যেখানে সুবিধামত মাঠ পাওয়া যায় সেখানেই ফুটবল খেলা হয়। কয়েক বছর যাবার পর আমতা হাই স্কুলের ড্রয়িং শিক্ষক শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় বর্তমান সন্তোষ নগরের মাদারিয়া খালের পশ্চিমদিকে খেলা চলতে লাগল। শরৎবাবু, যোগীনবাবু ও হাওড়া কোর্টের প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী প্রভাসচন্দ্র মল্লিকের নেতৃত্বে ক্লাব বেশ গড়গড়িয়ে চলতে থাকে। কিন্তু একবার ফুটবলের ফাইনাল প্রতিযোগিতায় নারীটের কাছে খরিয়প হেরে যায়। ফলে মাঠের মালিক খরিয়প গ্রামের লোক হওয়ায় তিনি মাঠটিকে চাষের কাজে লাগিয়ে দেন। ফলে কিছুদিনের জন্য ক্লাব বন্ধ থাকে। এই দুর্দিনে এগিয়ে এলেন বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনিই নিজ অর্থে ডাকবাংলোর সামনে বর্তমান মাঠটি ক্লাবকে কিনে দেন। তারপর থেকেই যেন ক্লাবের বুকের উপর থেকে অচল পাষাণ নেমে গেল। ক্লাবের সেকালের নামী খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, অম্বুজাক্ষ মজুমদার, প্রসাদ চক্রবর্তী, শৈলেন রায়, জীবন দত্ত, বলাই ঘোষ, সনৎ মিত্র, হরিসাধন ব্যানার্জী, কুঞ্জবাবু ও চুনীবাবু প্রমুখ। তিরিশের দশকে এই ক্লাবের ভার নেন প্রাক্তন সাংসদ সমর মুখার্জী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ক্লাবটি প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। আবার ১৯৫০ সাল থেকে ক্লাবের দায়িত্ব নিলেন রবীন্দ্রনাথ মুখার্জী। দীর্ঘ পথ চলার পর ১৯৮৩ সালে ৫ই জুন ক্লাবের সুদৃশ্য পাকা ক্লাবঘর উদ্বোধন করেন ক্লাবেরই অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ও প্রাক্তন সাংসদ সমর মুখার্জী। এই ক্লাবেরই পরিচালিত 'প্লেয়ার্স মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ শীল্ড' প্রতিযোগিতায় যোগদান করে আশেপাশের অনেক গ্রামের ফুটবল ক্লাব। এই ক্লাবের অনুপ্রেরণায় গড়ে ওঠে ঝিকিরার 'পারিজাত ক্লাব', খরিয়পের 'ভিক্টোরিয়া ক্লাব' ও নারিট এবং তাজপুরের ফুটবল ক্লাব। এই ক্লাবেরই সদস্য প্রদীপ মুখার্জী (মাণ্টি) কলকাতার এরিয়ান ক্লাবের হয়ে লীগ, শীল্ড, ডুরাণ্ড ও রোভার্স কাপ খেলেছেন। সবচেয়ে আনন্দের কথা আমতা স্পোর্টিং ক্লাব আজ আর কেবল ফুটবল ক্লাবই নয়—তার প্রভাব সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও সঞ্চালিত হয়ে আমতার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকেও পরিশীলিত করছে।[২৩]

বাঁটুল ক্লাব—উলুবেড়িয়া মহকুমায় বাগনান থানার অন্তর্গত বাঁটুল ক্লাবও আমতা স্পোর্টিং ক্লাবের মতই একই সালে প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ ১৮৯৩ সালে। তখনও বাগনানে রেল লাইন বসেনি। গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগের প্রধান অবলম্বন নৌকাপথ অথবা পা-গাড়ি। বাঁটুল ক্লাবের জন্মবৃত্তান্তের ইতিহাসটি বেশ একটু কৌতুকপ্রদ। আদিতে এই ক্লাবটির নাম ছিল 'বাঁটুল ভিক্টোরিয়া ফুটবল ক্লাব।' ভিক্টোরিয়া নামটি যুক্ত থাকার ফলে প্রথমে হয়তো মনে হবে ক্লাবের স্রষ্টারা বোধহয় ইংরেজ প্রভুদের মোসায়েব বা দালাল ছিলেন। কিন্তু ক্লাবের সৃষ্টি কাহিনী জানলে হয়তো অন্য ধারণা হবে। গল্পটি এরকম—ব্রিটিশ সরকার দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ চালু করার পরিকল্পনা নেন উনিশ শতকের আশির দশকের শেষ দিকে। দামোদর নদীর ওপরে মহিষরেখা সেতু তৈরী করা শুরু হয়েছে। গোরা

ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মীরা নদীর ধারে তাঁবু করেছে। কাজের পর অবসর বিনোদনের জন্য নদীর চড়াতে তারা ফুটবল খেলতো। বাঁটুল থেকে উৎসাহী গ্রাম্য যুবকরা সেতু নির্মাণের কাজটি আগ্রহ সহকারে দেখতে যেত। তাদের সেই আগ্রহকে আরও উসকে দিয়েছিল গোরাদের একটি গোল বস্তু নিয়ে গোলাকার উপায়ে খেলতে দেখে। ক্রমাগত যাতায়াতের ফলে তারাই কতিপয় গ্রাম্য যুবকদের খেলার নিয়মকানুন শিখিয়ে দিয়েছিল। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যই হয়তো তদানীন্তন বৃটিশ সাম্রাজ্যের রানী ভিক্টোরিয়ার সম্মানার্থে ক্লাবটির নাম রাখা হয় 'বাঁটুল ভিক্টোরিয়া ফুটবল ক্লাব'। পঞ্চাশ বছর প্রায় ঐ নামেই ক্লাবটি চলে। দেশ স্বাধীন হবার পর ক্লাবটির নাম পাল্টে রাখা হয় 'বাঁটুল ক্লাব'। সমালোচকরা হয়তো ক্লাবের পূর্বসূরীদের বিরুদ্ধে বিদেশী ভক্ত হওয়ার অপবাদ আনতেও পারেন তবে পরবর্তীকালে বাঁটুলের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই ক্লাবের উদ্যোক্তাদের যে সংগ্রামী মনোভাব ও সক্রিয়তা দেখা গিয়েছে তাতে সন্দেহ দূর হয়ে যাওয়ারই কথা। যেমন ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ক্লাবের ছেলেরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল—যদিও ভিক্টোরিয়া নামটি ছিল। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে ছিলেন মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ননীলাল বসু, নিশিকান্ত বসু, শৈলজাপ্রসাদ গুপ্ত, যামিনী বসু, সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, প্রকাশ গুপ্ত, কালিপদ বসু, বিনোদবিহারী ঘোষাল, গোষ্ঠবিহারী গাঙ্গুলী, গোষ্ঠবিহারী পাণ্ডা ও সত্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। ক্লাবের ফুটবল মাঠ ছিল দত্তপুকুরের মাঠ। ফুটবল খেলার ক্লাব হলেও ক্লাবের উৎসাহী সদস্যরা শিক্ষা সংস্কৃতি প্রসারেও সমান উৎসাহী করে তুলেছিলেন গ্রামবাসীদের। বৎসরান্তে নাটক পরিবেশন ছিল ক্লাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ক্লাবের ফুটবলাররা কেবল থানা বা জেলার মধ্যেই ভাল খেলে নাম করেননি, কলকাতার মাঠেও ভাল ফুটবলার পাঠিয়ে কলকাতার ফুটবলকে পুষ্ট করেছেন। নামী ফুটবলারদের মধ্যে ছিলেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত গুপ্ত, কৃপাঙ্গ পাণ্ডে, দিলীপ ব্যানার্জী, সুভাষ সর্বাধিকারী, অমল দত্ত, পরিতোষ মুখার্জী, রাসবিহারী দত্ত ও মৃণাল ঘোষ প্রমুখ। রাসবিহারী দত্তের অধিনায়কত্বে গ্রিয়ার স্পোর্টিং দ্বিতীয় ডিভিসন থেকে প্রথম ডিভিসনে উন্নীত হয়। দিলীপ ব্যানার্জী (১৯৪৭-৪৮) ও মৃণাল ঘোষ বি. এন. আর.-এ খেলতেন। এরিয়ান ক্লাবে খেলতেন ক্লাবেরই খেলোয়াড় অজিত ব্যানার্জী, প্রভাস সাহা ও পরিতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। আরও গর্বের বিষয় হচ্ছে সুভাষ সর্বাধিকারী (অলিম্পিয়ান) বাঁটুল ক্লাবেরই প্রথম জীবনে খেলোয়াড় ছিলেন। আর একালের বিখ্যাত কোচ ও ডায়মণ্ড পদ্ধতিতে খেলার বিতর্কিত নায়ক অমল দত্তও প্রথম জীবনে বাঁটুল ক্লাবের হয়ে নিয়মিত বিভিন্ন শীল্ডে খেলতেন। এই ক্লাবের একটি স্মরণীয় বছর হচ্ছে ১৯৫২-৫৩ সাল। এ বছর বাঁটুলে মোহন-বাগান ও এরিয়ান একাদশের মধ্যে যে খেলাটি হয়েছিল তার সুখময় স্মৃতি আজও প্রবীণদের আলোচনার বস্তু। আর নবীনদের জন্য উল্লেখ করা হল উভয় দলের কয়েকজন দিকপাল খেলোয়াড়দের নাম যেমন ধনরাজ, মেওয়ালাল, শম্ভু মুখার্জী,

অনিল দে, রতন সেন, চুনী গোস্বামী, শৈলেন মান্না, ভেঙ্কটেশ, সুভাষ সর্বাধিকারী, প্রশান্ত মুখার্জী প্রভৃতি প্রখ্যাত খেলোয়াড়রা। শতবর্ষ পেরিয়ে গেলেও বাটুল ক্লাব আজ আর ফুটবলের মধ্যেই নিজেদের সীমায়িত না রেখে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেও স্বাধীনোত্তর দেশে নিজেদের কর্মধারাকে প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছে। এটাই বড় আনন্দের বিষয়।[২৪]

উলুবেড়িয়া টাউন ক্লাব—এই ক্লাবের কথা একটু বলা দরকার। ১৯০১ সালে এই ক্লাবটি ফুটবল খেলা শুরু করে। পুরোনো দিনে বিভূতি মণ্ডল, নলীন (কটু) ঘোষাল, সুরেন সাঁতরা, প্রেমাংশু সরকার, বিশ্বেশ্বর (কাঁচ) রায়চৌধুরী, রওশন আলি, কামাখ্যা রায়, অমূল্য তামলি, গঙ্গা চাটুজ্জে, দেবেন কুঁতি, পটলা কর, বিশ্বনাথ (মটু) পালিত, হরগোবিন্দ বিশ্বাস, সন্তোষ ঘোষ, বিজয় দাশ প্রভৃতিদের নাম উল্লেখযোগ্য।

ক্লাবের স্বর্ণময় যুগে শচীন (বোঁচা) দে, বারিদবরণ লাহিড়ী, গৌর ধাড়া, পরিমল কুশারী, খগেন বেরা, দেবকুমার জাষু, বিমল দে, নুর মহম্মদ, নির্মল ঘোষ, হিমাংশু কুঁতি, শ্যামাপ্রসাদ (ছোটকু) রায়চৌধুরী, বিমল কুশারী প্রভৃতি আন্দুলে দেবেন্দ্র মেমোরিয়াল শীল্ড, মৌড়িগ্রামে অমূল্য মেমোরিয়াল শীল্ড, বালিতে রাজা শীল্ড, মেদিনীপুরের বেলদা থেকে কাপ জয় করে আনে। এই টাউন ক্লাবের উদ্যোগেই উলুবেড়িয়া কোর্টের কাছে নেতাজীর মর্মর মূর্তি স্থাপিত হয় ১৯৫২ সালে। ডঃ রাধাবিনোদ পাল এই মূর্তিটির আবরণ উন্মোচন করেন।

ইতিমধ্যে নীতি ও আদর্শের সংঘাতে টাউন ক্লাব থেকে গণদেব মণ্ডল, অরুণ কুমার হাজরা, খগেন বেরা, বিমল কুশারী প্রমুখরা বেরিয়ে এসে ১৯৫৬ সালে গড়ে তুললো উলুবেড়িয়া অ্যাথলেটিক ক্লাব। গণদেব মণ্ডলের পৃষ্ঠপোষকতায়, বিমল কুশারীর অক্লান্ত পরিশ্রমে আর অরুণকুমার হাজরার কোচিং-এ টগবগে ঘোড়ারা ট্রেড্‌স্‌ কাপের প্রতিযোগিতায় কলকাতার মোহনবাগান মাঠে মোহনবাগান ক্লাবকে হারিয়ে দেওয়ায় বিখ্যাত ফুটবলার বলাই চাটুজ্জে অরুণ হাজরার পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন যে ওদের যেন ঠিকমত দেখভাল করা হয়। ওড়িশার খুরদারোড, বালেশ্বর, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুরের বেলদা থেকে ট্রফি তুলে আনে ঐ টগবগে ঘোড়ারা।*

শালকিয়া ফ্রেণ্ডস এসোসিয়েশন—আজকের শালকিয়া ফ্রেণ্ডস এসোসিয়েশন নির্ভেজাল খেলাধুলার একটি প্রথম শ্রেণীর ক্লাব ব'লে কলকাতার মাঠে সমধিক প্রসিদ্ধ। কিন্তু মনে রাখা যেতে পারে যে, একদিন দেশের মুক্তি সাধনে যুবশক্তিকে সংগঠিত করাই ছিল এই ক্লাবের আসল উদ্দেশ্য। ১৯১৮ সালে বাবুডাঙ্গার স্টলকার্ট লেনে পানা কুণ্ডু মশায়ের বাড়িতে এই ক্লাবটি তৈরী হয়। তখন ব্যায়ামচর্চাই ছিল এর একমাত্র উদ্দেশ্য। জিমন্যাস্টিক খেলাতে তখনকার দিনে এই ক্লাবের বেশ

* তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করেছেন অরুণ হাজরা

নামডাক ছিল। এই ক্লাবে ব্যায়ামচর্চার মধ্য দিয়ে ছেলেদের বিপ্লবী কাজকর্মে ট্রেনিং দেওয়াও হত। পানাবাবুকে এই কাজে অনুপ্রেরণা দিতেন আহিরীটোলার ডাঃ বসন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন আব্দুল মোমিন নামে জনৈক স্বদেশপ্রেমিক মুসলমান। মোমিন সাহেব শালিখাতে 'মণিদা' নামেই পরিচিত ছিলেন। আসলে ক্লাবের মধ্য দিয়ে তিনি স্বদেশী করতেন এবং পুলিশের চোখ এড়াবার জন্যই তিনি নাম নিয়েছিলেন। হাওড়া কোর্টের উকিল চিন্তামণি মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে (ক্লাবের প্রবীণ সদস্য) মোমিন সাহেবের খুব অন্তরঙ্গতা ছিল। তিনি 'মণিদা'কে তাঁর বিপদে আপদে বিশেষ সহায়তা করতেন। এই মোমিন সাহেব উড়িষ্যার বারীপদার অধিবাসী ছিলেন—কালে তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর শ্রমিক নেতার পদে উন্নীত হন। ১৯২২ সালের পর থেকেই ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে খেলাধুলার অন্যান্য শাখার যাতে উন্নতি করা যায় তার দিকে নজর দেবার চেষ্টা করা হয়—বিশেষ ক'রে ফুটবলে।

কয়েক বছর অনুশীলনের পর ১৯৩১—৩২ সালে হাওড়ার ফুটবল লীগ বিজয়ী হ'য়ে ক্লাব কলকাতা ফুটবল লীগে তৃতীয় ডিভিসনে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। কিন্তু নানা কারণে খেলা ওঠে না। ফলে নিজেদের ভবিষ্যত উন্নতির কথা চিন্তা ক'রে স্থানীয় কতিপয় কৃতী খেলোয়াড় যেমন পশুপতি ব্যানার্জী, পি, বর্মন, রতন সেন প্রমুখ খেলোয়াড়রা কলকাতার বড় ক্লাবে যোগ দেন। পরে, অবশ্য তাঁদের মধ্যে অনেকেই আবার নিজ ক্লাবে ফিরে আসেন। এর জন্য নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের (ঝণ্টুদা) অসীম ধৈর্য ও নিষ্ঠা বিশেষভাবে স্মরণীয়। শালকিয়া ফ্রেণ্ডসের নাম আজ কলকাতার মাঠে কি ক্রিকেটে, কি ফুটবলে একটি সুপরিচিত নাম। এই পরিচিতি প্রতিষ্ঠার কাজে মণিলাল আটার দানও ভোলবার নয়। মণিলাল আটাই ১৯৪৮ সালে চতুর্দশ অলিম্পিক গেমসে ভারতীয় বক্সিং টিমের সহকারী ম্যানেজার হ'য়ে গিয়েছিলেন। হাওড়াবাসীর পক্ষে এটা আজও স্মরণ রাখার মত।

১৯৩৭—৪০ সাল পর্যন্ত শালকিয়া ফ্রেণ্ডস ক্যালকাটা ফুটবল লীগে চতুর্থ ও তৃতীয় ডিভিসনে খেলবার যোগ্যতা অর্জন করে এবং পরে '৪৩ সালে দ্বিতীয় ডিভিসনে চ্যাম্পিয়ান হলেও ওঠানামা না থাকার ফলে ক্লাব প্রথম ডিভিসনে খেলার সুযোগ পায় না। ১৯৫০ সালে রামপ্রতাপ চামেরিয়া পার্কে সমিতির নিজস্ব পাকা প্যাভেলিয়ান তৈরী হয়। এর উদ্বোধনপর্বে ভারতবর্ষের কয়েকজন বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিলেন কর্ণেল সি. কে. নাইডু ও বিজয় মার্চেণ্ট। একই দিনে সালকিয়া এ. এস. স্কুলের অনুরূপ প্যাভিলিয়নেরও উদ্বোধন হয়। ঐ দুই মাননীয় খেলোয়াড়ই সেদিন আশা প্রকাশ করেছিলেন যে ঐ মাঠ থেকে কেউ না কেউ ভারতীয় টিমের অন্তর্ভুক্ত হবেন। বলা বাহুল্য, তাঁদের সেই আশা সালকিয়া ফ্রেন্ডসের কতিপয় খেলোয়াড়রা রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। সালকের পি. বর্মন ১৯৪৩-৪৪ সালে মোহনবাগানের হয়ে লীগ বিজয়ীর সম্মান লাভ করেন। অপর খেলোয়াড় বাঘা কুণ্ডু ১৯৪৪-৪৫ সালে মোহনবাগানের শীল্ড বিজয়ের খেলোয়াড়দের মধ্যে

অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। অভিজ্ঞদের মতে বাঘাকুণ্ডুর মত ফাস্ট লেফট্ উইঙ্গার আজও কলকাতার মাঠে কদাচিৎ দেখা যায়। ফুটবলার রতন সেন (আর সেন) প্রথমে ভবানীপুর ও পরে মোহনবাগানে খেলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাশিয়ায় ও মধ্যপ্রাচ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে শালিখা তথা হাওড়াবাসীর মুখোজ্জ্বল করেছেন। এই ক্লাবেরই সম্পাদক নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ক্রিকেট এসোসিয়েশন অব্ বেঙ্গলের অবৈতনিক সম্পাদক হয়ে সাফল্যের সঙ্গে ১৯৭৬-৭৭ সালে ভারত বনাম ইংলণ্ড টেস্টম্যাচের ব্যবস্থা করেছিলেন ইডেন গার্ডেনসে। গঙ্গার পশ্চিম পারে তিনিই প্রথম সি. এ. বি-র সম্পাদক হবার গৌরব অর্জন করেছেন। আজ শালকিয়া ফ্রেণ্ডস ফুটবল ও ক্রিকেট দুই বিভাগেই কলকাতার প্রথম ডিভিসনে খেলছে। তবে এর পেছনে যাঁরা নেপথ্যে থেকে ক্লাবকে সঞ্জীবনী শক্তি জুগিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে নিত্য হাজরা, গৌর হাজরা, ননী হাজরা, চিন্তামণি মুখার্জী, সন্তোষ সেন, আব্দুল মোমিন ও দ্বিজেন ব্যানার্জী বিশেষভাবে স্মরণীয়।

বালি প্রতিভা—পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে 'বালি প্রতিভা' মফঃস্বলের প্রথম ফুটবল ক্লাব যারা কলকাতার মাঠে 'এ' ডিভিসনে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল। বছরটি হচ্ছে ১৯৫৫ সাল, ১লা আগস্ট, ডালহৌসি ক্লাবকে ১—০ গোলে হারিয়ে সেবার লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপের গৌরব লাভ করেছিল। সেদিনের বিজয়সূচক গোলটি করেছিলেন টিমের খেলোয়াড় এস. মুখার্জী। ঐ টিমে যাঁরা সেদিন খেলেছিলেন তাঁদের নামও আগামী প্রজন্মের জ্ঞাতার্থে ছেপে দেওয়া হল—এইস. দাস, পি. মণ্ডল, এ. দাশশর্মা, এস, মুখার্জী, বি. রায়, ডি. সামন্ত, এস. বসু, পি. শেঠ, এন, সরকার, এ. মুখার্জী ও কে. দত্ত।[২৫] সেদিনে বালি গ্রামের সারারাতটা প্রায় হৈ, হুল্লোড়েই যেন ভোর হল। সেই যে উন্নতি হল আজও পর্যন্ত সেই ধারা অক্ষুণ্ণ রয়েছে—যদিও ক্লাবের জার্সির রং অনেকটাই যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু হাওড়াবাসীর এই গৌরবের পেছনে যাঁরা একদা দধীচির মত অস্থি চর্মসার করে ক্লাবটিকে গড়ে তুলেছিলেন তাঁদেরকে যাতে ভাবীকাল না ভুলে যায় তাই এই আলোচনা।

১৯২০ সাল। বালি গ্রামের ফুটবল প্রেমিক নীরদ ঘোষ কয়েকটি স্কুলের ছেলে (প্রায় সবাই রীভার টমসন—বর্তমান শান্তিরাম স্কুল) নিয়ে একটি ক্লাব করলেন। খেলার মাঠ ঠিক হলো 'বালি জুট মিলের মাঠ'। কিন্তু ক্লাবের নাম কি হবে—ঠিক করে উঠতে পারছেন না নীরদবাবু। হঠাৎ একদিন ফেরী ঘাটে গিয়ে দেখলেন মালাপাড়া জেটি 'প্রতিভা' নামে একটি স্টীমার ঘাট পেরিয়ে যাচ্ছে। তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিলেন ক্লাবের নাম হবে 'প্রতিভা ক্লাব, বালি'। কিন্তু লোকে বলতে লাগল 'বালি প্রতিভা'। নীরদবাবুর নামকরণের পেছনে হয়তো সেই চিন্তাই কাজ করেছিল যে একটি জাহাজ যেমন বহু যাত্রীকে পারাপার করে তেমনি 'বালি প্রতিভা'ও ফুটবল প্রতিভা তৈরী করে কলকাতা তথা ভারতের ফুটবলকে পুষ্ট করবে। সেই স্বপ্ন যে ব্যর্থ হয়নি তা আলোচনান্তেই বোঝা যাবে। অকৃতদার নীরদবাবুর অকাল মৃত্যুতে ক্লাবের হাল ধরলেন খগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

(হলাদা) ও নন্দলাল মাঝি। সঙ্গে রইলেন যমজ দুই ভাই নেকো আর ভেকো (পরেশনাথ গাঙ্গুলী ও অমরনাথ গাঙ্গুলী)। কিন্তু যে লোকটি ক্লাবের ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটিয়েছিলেন তিনি হলেন প্রভাস গাঙ্গুলী। সুগংঠক প্রভাসবাবু রেল লাইনের ওপারে হিন্দু স্পোর্টিং ক্লাবের ফুটবল প্রশিক্ষক নারায়ণ ব্যানার্জী ও পত্রিকা সমিতির কর্তাব্যক্তি শ্যামাপদ গাঙ্গুলীকে (যিনি খেলার মাঠে শ্যাম গাঙ্গুলী নামে বিশেষ পরিচিত) 'বালি প্রতিভা'-তে নিয়ে এলেন। এই 'ত্রয়ী ফুটবল' রথীর চেষ্টায় দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই ক্লাবটি দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলতে থাকে। সঙ্গে রইলেন প্রভাত শেঠ, নীলেশ সরকার ও বর্তমান সভাপতি এবং সম্পাদক যথাক্রমে বলদেব চট্টোপাধ্যায় ও হেরম্ব মুখোপাধ্যায়। ১৯৪৮ সালে রাজা শীল্ডে যোগ দিয়ে প্রথম বারেই চ্যাম্পীয়ান হলো। বিখ্যাত অলিম্পিয়ান বদ্রু ব্যানার্জী ও (তখন ছেলে মানুষ) সেই ম্যাচে খেলেছিল। আসল নায়ক ছিলেন প্রভাস গাঙ্গুলী। ১৯৪৯-এ ক্লাব চতুর্থ ডিভিসনে উঠলো। প্রথম ডিভিসন ক্লাব এরিয়ানের অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিয়ে বালির ছেলে প্রভাত শেঠ যোগ দিলেন বালি প্রতিভাতে। চতুর্থ ডিভিশনেও ক্লাব চ্যাম্পীয়ান হল। এইভাবে ক্লাব এগিয়ে চললো। পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্দ্ধ থেকেই ক্লাবের এক নতুন রত্ন খেলোয়ার জোগাড় করলেন প্রভাসবাবু। সেই খেলোয়াড়টি হচ্ছে নীলেশ সরকার। এই সময় ক্লাবের ফুটবল কোচ হিসাবে ছিলেন শচীন্দ্রনাথ মিত্র (ল্যাংচাদা)। বালি প্রতিভার অনেক ফুটবল তারকাই প্রথম যুগে তাঁর হাতেই তৈরী হয়েছিলেন।

১৯৫৫ সালে বালি প্রতিভা 'এ' ডিভিসনে ওঠার পর ক্লাবের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতার বড় ক্লাব ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ও মহমেডানের সঙ্গে কোন বছর ড্র করছে আবার কোন বছর হেরেও যাচ্ছে। কিন্তু সেই হারাটা হচ্ছে সমানে সমানে লড়ে হারার গৌরব। ১৯৬৬ সালে মহমেডানকে ২—০ গোলে হারিয়ে সংবাদপত্রের শিরোনাম পেল বালি প্রতিভা। আর ঐ দুটি গোল করলেন এস. কুমার (সমন) ও ডি. দত্ত (দেবী)। সেন্টার ফরওয়ার্ড এস. কুমার এই ক্লাবে '৬২ পর্যন্ত খেলে ইস্টবেঙ্গলে যোগ দেন। আবার '৭০ সালে নিজ ক্লাবে ফিরে আসেন। এই ক্লাবেই খেলোয়াড়ী জীবন শুরু করেন '৫৯ সালে বিখ্যাত ভারতীয় স্টপার সুব্রত ভট্টাচার্য। পরিমল দে (জংলা)-র কথা আগেই বলা হয়েছে। বিখ্যাত রাইট ব্যাক সুধীর কর্মকার ফুটবল শুরু করলেন এই ক্লাবের খেলোয়াড় হয়ে। ভারতের প্রথম শ্রেণীর গোলকিপার তরুণ বসুরও ফুটবলের হাতে খড়ি এই ক্লাব থেকে। মোহনবাগান ও ভারতীয় টীমের হাফ ব্যাক অরুণ ভট্টাচার্য এই ক্লাব থেকে অনুশীলন করে বড় হয়েছেন। এরিয়ান ও ইস্টবেঙ্গলের স্টপার অশোক লাল ব্যানার্জীও বালি প্রতিভার উৎপাদিত ফসল। এঁরা যদিও কেউই হাওড়ার সন্তান নন তথাপি বালি প্রতিভাতেই তাঁদের ফুটবল প্রতিভার স্ফুরণ হয়েছিল। এরপর যাঁদের নাম করা হচ্ছে তাঁরা সকলেই বালির ছেলে। বালি প্রতিভাতে খেলা শিখেই তাঁরা কলকাতা তথা ভারতের ফুটবলে নাম করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে হাফ ব্যাক ভি. পাল এখানে খেলেই

এরিয়ান, মোহনবাগান পরে ভারতীয় টীমে খেলেন। স্টপার পরিমল দাস এখানে খেলেই বি. এন. আর হয়ে বেঙ্গল ও ইণ্ডিয়া খেলেন। অনিল মুখার্জী বালি প্রতিভা থেকে ইস্টার্ন রেল ও মোহনবাগান হয়ে ইণ্ডিয়া খেলেন। স্টপার ভবানী রায় বালি প্রতিভা থেকে মোহনবাগান হয়ে বেঙ্গল ও ইণ্ডিয়া টীমে খেলেন। অনিল দাসশর্মা স্টপার হিসাবে খুবই নাম করেছিলেন। কোচ 'ল্যাংচাদা' সর্বপ্রথম থ্রি ব্যাক প্রথা এদেশে ফুটবলে চালু করলেন। এই অনিল দাসশর্মাই সেই প্রথার প্রধান ব্যাক হিসাবে খেলে নাম করেছিলেন। আজকাল অবশ্য চার ব্যাক প্রথায় ফুটবল খেলা হচ্ছে। সেদিক থেকে ল্যাংচাদার কোচিং-এর তারিফ করতেই হবে। প্রভাত শেঠের বালি প্রতিভার প্রতি প্রেমের কথা আগেই বলা হয়েছে। ফুটবল ছাড়া, তিনি একজন বেঙ্গল চ্যাম্পীয়ান ব্যাটমিণ্টন খেলোয়াড়ও ছিলেন।

আজকাল প্রায়ই অভিযোগ শোনা যায় যে খেলার মাঠে গট-আপ ম্যাচ খেলা হয়। এর সত্যতা যে আছে তার প্রমাণ ১৯৮৩ সালের ফুটবল খেলা। ঐ বছরেই দুটি ম্যাচে ১৯৪টি গোল হয়েছিল।[২৬] আই. এফ.-এর গভর্নিং বডির এক কর্মকর্তা গট-আপ খেলার জন্য সকল ক্লাবকেই কমবেশী দোষী বলে অভিযুক্ত করলে বালি প্রতিভার অন্যতম কর্ণধার ও আই. এফ. এ গভর্নিং বডির সদস্য শ্যাম গাঙ্গুলী ভীষণভাবে আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন—বালি প্রতিভা কখনও গট-আপ গেম খেলে না।" শ্যামবাবুর উক্তির প্রতিবাদে কেউ আর এগিয়ে আসেনি। নিজ আদর্শে আস্থাবান থেকে বালি প্রতিভা এগিয়ে চললেও তাঁর গতি যে অনেক শ্লথ হয়ে গেছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। নূতন পথ খুঁজে বার করে খেলোয়াড় তৈরীর কাজে আবার হৃত আসন পুনোরুদ্ধার করাই হবে কাজের কাজ।[২৭]

শালকিয়া এসোসিয়েশন—এই ক্লাবটি এই সেদিনের। কিন্তু তা হলে হবে কি? অল্প সময়েই ক্লাবটি মেয়েদের ক্রীড়াজগতে যে ইতিহাস ইতিমধ্যেই সৃষ্টি করেছে তা প্রশংসা দাবি রাখে। ১৯৬৮ সালে, ২৩শে নভেম্বর এর জন্মকাল। এটি মূলতঃ মেয়েদের ভলিবলের ক্লাব। শালকেতে বড় মেয়েদের নিয়ে ইতিপূর্বে ভলিবলের নিয়মিত অনুশীলনের কোন কেন্দ্র ছিল না। সামান্য কয়েক বছরের অনুশীলনেই ক্লাবের মেয়েরা ঐ খেলায় এত দক্ষ হয়ে উঠল যে ১৯৭৪ সালে বাঙ্গালোরে যে ভারতের প্রথম মহিলা ভলিবল জাতীয় চ্যাম্পীয়ানসীপ প্রতিযোগিতা শুরু হয় তাতে বড়দের গ্রুপে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম হয়। হাওড়া জেলা থেকে সর্ব প্রথম শালকের তথা হাওড়ার মেয়ে সন্ধ্যা মুখার্জী ঐ দলে কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। ১৯৭৮ সালে যখন নিখিল ভারত রেলওয়ে ভলিবল (মেয়েদের) চ্যাম্পীয়ানসীপ প্রতিযোগিতা হয়—তাতে সন্ধ্যা মুখার্জী, সুমিতা দেব, মমিনা চ্যাটার্জী (সবাই এই ক্লাবের সভ্যা) অংশ গ্রহণ করে শালকিয়া তথা হাওড়াবাসীরও গৌরবের পাত্রী হয়েছে। ১৯৭৯ সালে জাতীয় ভলিবলে পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ বিভাগের হয়ে

---

* এই ক্লাবের তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করেছেন সমরেন্দ্রনাথ কুমার ও মানস বানার্জী (মঙ্গু)

খেলল শালিখারই মেয়ে রুমু ধাড়া ও হাসিরানী বসু মল্লিক। এই রুমু ধাড়াই হাওড়ার মেয়েদের মধ্যে প্রথম ভলিবলে 'ইউনিভার্সিটি ব্লু হল ১৯৭৪ সালে। ঐ বছরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ভলিবলে বিজয়িনীর সম্মান লাভ করেছিল যার অন্যতম অংশীদার ছিল রুমু। তারপর অপর সদস্যা সুমিতা দেবও 'ইউনিভার্সিটি ব্লু' হয়। শালিখার মেয়েরা ভলিবলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পর্যন্ত তাঁদের যোগ্যতা দেখাল। ১৯৭৯ সালে হংকংএ এশিয়ান চ্যাম্পিয়ানসীপ মহিলা ভলিবল প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড় হয়ে গিয়ে শালিখার মেয়ে সুমিতা দেব কেবল হাওড়া জেলারই নয় পশ্চিমবাংলারও মুখোজ্জ্বল করেছে। ১৯৮০ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে জুনিয়ার এশিয়ান ভলিবল চ্যাম্পীয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে ভারত প্রথম ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেছিল। সে খেলাতে যোগ দিয়ে শালিখারই মেয়ে তাপসী দেবও ভলিবলের ইতিহাসে নজির হ'য়ে আছে। ১৯৮২ সালে দিল্লীতে যে এশিয়াড হয়েছিল তাতেও যোগদান করে সুমিতা দেব। এসবের মূলে ছিলেন নিরলস কর্মী অরুণ (মানু) মুখার্জী ও গোপালী সামন্ত।

এতক্ষণ খেলাধূল্যার কয়েকটি বিষয়ে হাওড়াবাসীর কৃতিত্ব আলোচনা করলেও স্পোর্টস নিয়ে আলোচনা হয় নি। স্পোর্টস বলতে এখানে দৌড় ঝাঁপকেই বলা হচ্ছে। শালিখা তথা হাওড়া জেলার মধ্যে দূর পাল্লার দৌড়ে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন শালিখারই ছেলে অনিল রানা। ১৯৪৫ সালে অবিভক্ত বাংলাদেশে আন্তঃ জেলা ৮০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় অনিল রানা প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টান্ত উৎসাহিত করেছিল শালিখার মুষ্টিমেয় যুবককে যাদের মধ্যে ছিল মলয় সরকার, ডেকো ও বংশীলাল ধীমান। ডমিসাইল্ড শালিখার বাসিন্দা বংশীলালই প্রথম যিনি সর্বভারতীয় ১০০০. ১৫০০ ও ৩০০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিয়ে ৩য় স্থান অধিকার ক'রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

'ইউনিভার্সিটি ব্লু' আখ্যা পাওয়া প্রতিটি খেলোয়াড়েরই একটি কাম্য বস্তু। শালিখা অঞ্চলের যুবক যুবতীরা যে সংখ্যায় এই সম্মান পেয়ে আসছে জেলার অন্য কোন অংশ সেই গৌরবের অধিকারী হয়েছে ব'লে জানা নেই। উত্তর হাওড়ার প্রথম 'ব্লু' প্রাপক হচ্ছে বংশীলাল ধীমান (দৌড়বীর ১৯৫০)। তারপর বরুণ মুখার্জী (১৯৫৪ ক্রিকেট ও '৫৬ হকি), কানাইলাল সেন (ক্রিকেট ১৯৫৯), সুসীম পোড়েল (ক্রিকেট, হকি ১৯৫৮-৫৯), সুপ্রিয় বসু (ক্রিকেট ১৯৬২-৬৩), শোভন মিত্র (ক্রিকেট ১৯৭১), কাজল ব্যানার্জী (ক্রিকেট ১৯৭০-৭১), ইন্দ্রদেব মুখার্জী (হকি ১৯৭১, ৭২, ৭৩) ব্লু আখ্যা পায়। শালিখার মেয়েরাও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। মেয়েদের মধ্যে 'ব্লু' হয়েছে রুমু ধাড়া (ভলিবল ১৯৭৪), সুমিতা দেব (ভলিবল ১৯৭৬), নমিতা পাত্র (ঘোষ) ও শ্যামলী গণ দু'জনই ১৯৭৮ সালে (এথলেটিকসে) 'ব্লু' অ্যাখ্যা লাভ করে। রীতা পাল ১৯৬৮ সালে সর্বভারতীয়

ক্রস কান্ট্রি দৌড়ে প্রথম হ'য়ে এবং সর্বভারতীয় মেয়েদের দূরপাল্লার দৌড়ে তিনবারই (১৯৭০, '৭০, '৭১) বিজয়িনী হ'য়ে শালিখা, হাওড়া তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখোজ্জ্বল করেছে।

শালিখার ছেলে প্রশান্ত ব্যানার্জী মিডিয়াম ফাস্ট বোলার হিসেবে বাংলা দলে অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে রণজি ট্রফিতে খেলার যোগ্যতা লাভ করেছিলেন। সাম্প্রতিক কালে শালিখারই আর এক ক্রিকেটার অলোক ভট্টাচার্য (বোলার) ১৯৭৭ সালে ভারত বনাম পাকিস্তান টেস্ট ম্যাচে কলকাতায় দ্বাদশ ব্যক্তি হ'য়ে ক্রিকেট ম্যাচে যোগদান করেছিল। অদ্যাবধি হাওড়ার কোন ক্রিকেটারের ভাগ্যেই এই সুযোগ জোটে নি। অপর আর এক তরুণ বোলার সুব্রত পোড়েল রঞ্জি ট্রফি, দলীপ ট্রফি ও ইরানী ট্রফি খেলে ক্রিকেট আসরে সম্ভাবনাময় খেলোয়াড় ব'লে বিবেচিত হয়েছিলেন। পরে খেলোয়াড় হিসাবে অবসর নিয়ে ক্রিকেটের আম্প্যায়ার হবার জন্য নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। আম্প্যায়ারিং যোগ্যতা পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন। এই সুব্রত পোড়েলই ১৯৯৬ সালে ভারতে যে ক্রিকেটের 'ওয়ার্ল্ড কাপ' খেলা হয় তাতে কয়েকটি খেলায় আম্প্যায়ারিং করে জেলার সুনাম বাড়িয়েছেন বইকি! তবে টেস্ট ক্রিকেটে জেলা থেকে প্রথম আম্প্যায়ার হয়েছিলেন হাওড়া স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্য হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সর্বশেষে এক কিশোর দাবারুর কথা বলেই এই অধ্যায়টির ইতি টানা হচ্ছে। হাওড়া জেলার পুইল্যা (আন্দুল) গ্রামের অদ্বয় চৌধুরী ৮ বছর বয়সেই দাবা খেলায় ১৯৯২ সালে এশিয়ার রেকর্ড সৃষ্টি করে। অদ্বয় ১৯৯২-৯৬-তে পাঁচবার লণ্ডনে গিয়ে ১১টি সোনা ও রুপোর মেডেল জয় করেছে। ১৯৯৬ সালে কিশোর অদ্বয় বড়দের সঙ্গে দাবা খেলার র‍্যাঙ্কিং বা রেটিং পেয়েছে। সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনা হল ১৯৯৪-তে গ্র্যান্ড মাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়াকে পর্যন্ত সে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। অদ্বয় জেলার মধ্যে একমাত্র স্কুলের ছাত্র যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দাবাতে প্রথম র‍্যাঙ্কিং পেয়ে বিলেতে খেলতে গেছে। দাবার মতই কৃতিত্ব প্রদর্শন করে যাচ্ছে সে লেখাপড়াতেও। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী অক্ষয় শিক্ষায়তনের ছাত্র শিক্ষক অবনীন্দ্র-পুত্র অদ্বয় বিদ্যালয়েও প্রথম ছাড়া অদ্যাবধি দ্বিতীয় হয়নি।

১. বালি সাধারণী সভা—শতবার্ষিক স্মারক গ্রন্থ।
২. প্রথমবারের লীগ জেতা—দরবারী দত্ত—আনন্দবাজার পত্রিকা ২৪শে নভেম্বর ১৯৯০।
৩, ৪, ৫, ৬ হাওড়া জেলার ফুটবল খেলার ইতিহাস—কালী রায়।
৭. ইংরেজ বণিকদের সঙ্গেই ফুটবল কলকাতায়—রূপক সাহা আনন্দবাজার পত্রিকা ৩. ৮.
৮. আমার ছেলেবেলা— আনন্দবাজার পত্রিকা ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৯২।
৯, ১০. অলিম্পিকের স্মৃতি—শৈলেন মান্না—প্রতিদিন—৯. ৮. ৯২।
১১. অলিম্পিক স্মৃতি—বদ্রু ব্যানার্জী—প্রতিদিন ৯. ৮. ৯২।
১২. মনে পড়ে—বদ্রু ব্যানার্জী—সাপ্তাহিক বর্তমান ২৬. ৩. ৯১।
১৩. অলিম্পিক স্মৃতি —বদ্রু ব্যানার্জী—প্রতিদিন ৯. ৮. ৯২।

১৪, ১৬. হাওড়া জেলা ফুটবল খেলার ইতিহাস—কালী রায়।
১৫. আনন্দবাজার পত্রিকা খেলার খবর—২১. ১. ৯১।
১৭. Dossier on Howrah—Howrah Chamber of Commerce & Industries 1991
১৮, ১৯. The First Big Match at Eden—Subrata Sarkar The Statesman 24.2.91.
২০. হাওড়ার গৌরব কাহিনী—সলিল মিত্র।
২১, ২২. সাংসদ বাঙালী চরিতাভিধান—সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু।
** পূর্বেই আলোচনা হয়েছে।
২৩. বাংলার খেলা—১৯৮৩ সন।
২৪. স্মরণার্ঘ্য—বাঁটুল ক্লাব ১৯৯৩।
২৫. আনন্দবাজার পত্রিকা—২. ৮. ৫৫.
২৬, ২৭. গ্যালারী—বার্ষিক সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৫।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ অবধি হাওড়া জেলার দুটি স্থান ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। তার মধ্যে দক্ষিণে ছিল বিখ্যাত বেতড় বন্দর আর উত্তরে ছিল ঘুষুড়ি অঞ্চল। ইতিপূর্বে বেতড় বন্দরের গুরুত্ব বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্রাট ফারুকশিয়ারের ফরমানে ইংরেজদের যে আটত্রিশটি গ্রাম দান করা হয়েছিল তাতে বাট্টার (বেতড়) বন্দরের রাজস্ব অন্যান্য স্থানের তুলনায় বেশ বেশি ছিল। এতেই বোঝা যায় যে ওই বন্দরের গুরুত্ব সে সময় কেমন ছিল। ১৯৫১ সালের ডিস্ট্রিক্ট সেন্‌সাস্‌ হ্যাণ্ডবুকে 'হাওড়া' সম্বন্ধে এ. মিত্র. লিখেছেন—**Betor was well-known as the place of anchorage of large sea-going vessels, particularly of the Portuguese, furthest up the river.**[১]

ইংরেজ শাসনের পূর্বে এদেশের গ্রামগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। হাওড়া জেলার বিভিন্ন গ্রামে যে সব উদ্বৃত্ত পণ্যদ্রব্য ছিল তা দুটি স্থানের মাধ্যমে কেনাবেচা হত—এমনকি বাইরেও রপ্তানি হত। কেন্দ্র দুটি ছিল বেতড় ও ঘুষুড়ি। অমিয় ভূষণ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'হাওড়া' নামক প্রবন্ধে বলেছেন—**Betor in the South and Ghusuri in the North, inside the present city of Howrah were such important markets before the end of the 15th century.** বঙ্গদেশের উর্বর পলিমাটিতে যে প্রচুর ফসল হত তারই ফলশ্রুতি হিসেবে এসব জায়গার বাণিজ্যিক গুরুত্ব সহজেই বোঝা যায়। অবশ্য ইউরোপীয় বণিকদের আগমনে এদেশের শিল্প বাণিজ্যের ধারা স্বাভাবিক কারণেই পাল্টে যায়। সংগঠিত মূলধনের প্রভাবে যান্ত্রিক শিল্পের প্রবর্তনে স্থাপিত হয় বড় বড় কল-কারখানা ও জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র যার ছোঁয়াচ হাওড়ার গায়ে ভালভাবেই লেগেছিল।

ইউরোপীয় বণিকরা বিশেষ করে ইংরেজরাই কলকাতায় প্রথম বসতি স্থাপন করে এসেছে। রাতারাতি শিল্প কারখানা সৃষ্টিতে ও খনিজ সম্পদ উদ্ধারে প্রথমে তারা তেমন আগ্রহ দেখায় নি। তবে আগ্রহ প্রকাশ করল কলকাতার আশেপাশে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতি কেন্দ্র স্থাপনে। কারণ দীর্ঘদিন সমুদ্রযাত্রা করে এদেশে জাহাজ পৌঁছলে স্বাভাবিক কারণেই তার মেরামতী ও যন্ত্রপাতির সংস্কার সাধনের প্রয়োজন হয়ে পড়তো। তাই কলকাতা শহরের বিপরীত দিক নগর হাওড়া অঞ্চলেই জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতীর জন্য উৎকৃষ্ট স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়। এই স্থান নির্বাচনে আরও একটি ভৌগোলিক কারণ ছিল—এই তীরে প্রাকৃতিক উপায়ে গঠিত দীর্ঘ নালা ও পলিমাটি গঠিত নদীর প্রশস্ত তীর। প্রকৃতপক্ষে, কলকাতা শহরকে সচল ও সবল রাখবার জন্য অপর তীর হাওড়াকে কলকাতার 'ওয়ার্কশপ' হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল। সেই চিন্তাধারার আজও ছেদ পড়েনি।

ইউরোপীয়দের উদ্যোগে শালিখায়ই প্রথম এ বঙ্গে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতীর কেন্দ্র গড়ে ওঠে। হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারের লেখক অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে—'১৭০৬ সালে হাওড়ার তীরে জাহাজ মেরামতী ও তলা পাল্টানোর ব্যাপারে এক বিশেষ সমীক্ষা করা হয়। তারও অনেক পরে ১৭৯৬ সালে 'অরফিউস' (Orpheus) নামে একটি ফ্রিগেট জাহাজকে শালকিয়ার ডকে ভেড়ান হয় মেরামত করার জন্য। এই ডক ইয়ার্ডটি জনৈক ইউরোপীয় মিঃ বেকন (Mr. Bacon) সাহেবের নামে ছিল।'

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দুদশকে ডক তৈরীর কাজে আরও জোর দেওয়া হল। কারণ দক্ষিণ ভারতে তখন দুর্ভিক্ষ চলছিল। জাহাজে করে সেখানে তাড়াতাড়ি মাল পাঠানোর তাগিদে শালকিয়া অঞ্চলে আরও ডক ইয়ার্ড তৈরী হতে শুরু করল। সে যুগের নাম করা ডক ছিল গোলাবাড়ির কাছে জেমস্ ম্যাকেঞ্জি সাহেবের ডক। এটি তৈরী হয়েছিল ১৮০০ সালে।[২]

পরের বছরই তিনি আরও একটি ডক তৈরী করলেন। প্রাচীনরা আজও এই স্থানটিকে 'জোড়া ডক' (Union Dock) বলে থাকেন। গোলাবাড়ি থানার পেছনে ম্যাকেঞ্জি লেনের অবস্থিতি তার কথা আজও স্বরণ করিয়ে দেয়। আর ম্যাকেঞ্জি সাহেবের প্রাসাদতুল্য গঙ্গার ধারে বাড়িটিতে (গোলাবাড়ি থানার পেছনে) আজ শালিখার পুরাতন অ-বঙ্গবাসী বাসিন্দা জালান পরিবারের লোকেরা বাস করছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ডক ও জাহাজ নির্মাণ ব্যবসায়ে ইউরোপীয়রা প্রচুর অর্থোপার্জন করতে থাকলে কতিপয় দুঃসাহসিক বাঙ্গালী ব্যবসায়ীও ঐ পথে ঝুঁকি নিতে এগিয়ে আসেন। তাঁদের মধ্যে কলকাতার তারকনাথ প্রামাণিক মহাশয়ের নামটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।* তারকনাথবাবু কলকাতার বাসিন্দা হলেও তাঁর ডক ইয়ার্ডটি ছিল শালকিয়ার গোলাবাড়ি অঞ্চলে। আগে এটি ডক ছিল না। ১৮১০ সালে বিচ্ক্যাম্প (Beauchcamp) নামে জনৈক সাহেব একটি 'নকসা জাহাজ' (Patent ship) কেন্দ্র হিসেবে তৈরী করেন। পরে তিনি এটি তারকবাবুর কাছে বিক্রি করে দিয়ে দেশে যান। তারকবাবু সেটিকে পরে 'ডকে' রূপান্তরিত করেন। এই ডকটির নামকরণ করা হয় 'ক্যালিডনিয়ন ডক'। ১৮১৫ সালে গোলাবাড়ি অঞ্চলে জর্জ ওয়াকার (George Walker) নামে এক সাহেব 'কমার্সিয়াল ডক' নামে আরেকটি ডক তৈরী করেন। এটি পরে খুরুটের ব্যবসায়ী রাধামোহন প্রামাণিক কিনে নেন। এতদিন পর্যন্ত কলকাতার পাশে অর্থাৎ ক্লাইভ স্ট্রীট অঞ্চলেও ডক ছিল। তাই শালকিয়া অঞ্চলে ডকের ঘনত্ব কম ছিল। কিন্তু ১৮২৩ সাল নাগাদ স্ট্র্যান্ড রোড তৈরী হবার ফলেই ঐ ডকগুলিকে পাততাড়ি গোটাতে হয়। কিন্তু তাঁরা ব্যবসা তুলে দিলেন না। ডকগুলি স্থানান্তরিত হয়ে পাড়া গাড়লো হাওড়ার উপকূলে শিবপুর থেকে ঘুষুড়ি পর্যন্ত। তারক প্রামাণিকের দেখাদেখি রামকিনু সরকার,

* এই তারকনাথবাবু ছিলেন হাওড়া খুরুটের অধিবাসী—দ্রঃ নগর হাওড়া—অলোক কুমার মুখোপাধ্যায়।

জয়নারায়ণ সাঁতরা ও কালীকুমার কুণ্ডু (উভয়ে মধ্য-হাওড়ার অধিবাসী) ডক ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু বাঙ্গালী অংশীদারী কারবারের যে দশা হয় এখানেও তার ব্যতিক্রম হল না। যোগনাথ মুখোপাধ্যায় ১৩৮০, ২৫শে শ্রাবণ সংখ্যায় 'অমৃত' পত্রিকায় লিখেছেন—'সালকিয়ায় ১৮৪৯ সালে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া ডক' নির্মাণ করেন রামকিনু সরকার, জয়নারায়ণ সাঁতরা ও কালীকুমার কুণ্ডু (মধ্য হাওড়ার)। কিন্তু অংশীদারদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে ১৮৬৫ সালে ঐ ডক বন্ধ হয়ে যায়।' এইভাবে ১৮৭২ সালের মধ্যে হাওড়া থেকে ঘুষুড়ির মধ্যে আটটি ডক গড়ে ওঠে।* ১৮৪৭ সালে আলবিয়ান ডক নাকে একটি ডক তৈরী করেন হাওড়ার পীতাম্বর মুখার্জী রবার্টস ও গ্ল্যাডস্টোনকে অংশীদার করে।

১৮৪২ সালে কলকাতার রাধানাথ মল্লিকের উদ্যোগে ও জনৈক রিড (Reid) সাহেবের সহযোগিতায় শালকিয়ায় হুগলী ডক প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে তাঁর পুত্র জয়গোপাল মল্লিক ঐ ডকের মালিক হন।

মোট কথা, বঙ্গদেশের জাহাজ তৈরী ও মেরামতী কেন্দ্র প্রথম গড়ে ওঠে এই হাওড়া শালিখায়। তারক প্রামাণিক মহাশয় যে বিপুল অর্থের অধিকারী হয়েছিলেন তার প্রধান উৎস ছিল এই শালিখায় ডক ব্যবসা। তাঁর প্রধান কাজ ছিল জাহাজ সারানো ও জাহাজের পুরনো পেতল ও তামার চাদর পাল্টানো। শুধু কি তাই? জলের ওপরে জাহাজ সারিয়ে যেমন লাভ হত তেমনি জলের তলার মাটি বিক্রি করেও বেশ লাভ হত। এভাবে তারকবাবু যে কি বিপুল পরিমাণ অর্থ এই শালকিয়ার মাটি থেকে রোজগার করেছিলেন তার উল্লেখ পাওয়া যায় পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থের 'প্রাতঃস্মরণীয় তারকনাথ প্রামাণিক' পুস্তকে। তিনি লিখেছেন—'এই ডকের কার্যে তারকনাথের বিপুল ধনাগম হইত। কোন কোন সময় ইহাতে অপ্রত্যাশিতভাবে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা লব্ধ হইত। ডকের তলভাগস্থ মাটিতে বহু পিত্তল ও তাম্রের পেরেক প্রভৃতি পতিত হইত। উক্ত মাটি বিক্রয় করিয়াও মালিকগণ কিছু কিছু মুদ্রা লাভ করিতেন।'

এই কারবারের সঙ্গে যুক্ত থেকে তদানীন্তন হাওড়া-শালিখার বিশিষ্ট নাগরিক অতুল কৃষ্ণ ঘোষও এই অঞ্চলের একজন নামী ধনবান ও বিদ্যোৎসাহী নাগরিক বলে পরিচিত হয়েছিলেন। জাহাজে কুলির কনট্রাক্ট পেয়ে বিপুল অর্থের অধিকারী হয় আর এক শালিখাবাসী—তাঁর নাম মাধবচন্দ্র ঘোষ। যাঁর নামে মাধব স্মৃতি পাঠাগার। পরে তিনি গঙ্গা পারাপারের জন্য স্টীমার সার্ভিসও চালু করেন।

শালিখায় জাহাজ মেরামত ও নির্মাণকেন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বেশ গড়ে উঠলো। প্রচুর লোক গ্রাম থেকে এসে এই অঞ্চলে ভিড় করল রোজগারের আশায়। স্বভাবতই নগর হাওড়া লোকের ভিড়ে জমজমাট হয়ে উঠলো। তাই হাওড়া শহরকে ১৮৮১ সালের আদম সুমারির রিপোর্টে ইংলণ্ডের মিডলসেক্সের সঙ্গে তুলনা করা

* এই জমিতে ১৭৯০ সালে গিলমোর কোম্পানীর ডক ছিল। দ্রঃ শালিখার ইতিবৃত্ত—লেখক

হয়েছে। জাহাজ মেরামতীর কাজই বেশি হত। তাই দেখা যায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুদশক পর্যন্ত তেমন নতুন জাহাজ নির্মাণের খবর নেই। ফলে নগর হাওড়া অঞ্চলে বেশ কয়েক বছর আবার বেকারী বেড়ে গেল। বললে অত্যুক্তি হবে না যে তদানীন্তনকালে এই অঞ্চলের ধনী ব্যক্তিদের অর্থোপার্জনের প্রধান উৎসই ছিল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই জাহাজী ব্যবসা। তাই হয়তো উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকের নগর হাওড়াকে O'Malley and M. Chakravorty বলেছেন—**Howrah is inhabitated chiefly by persons connected with docksand shipping.'** 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'গ্রন্থে (১ম খণ্ড) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেন—'২৯শে জুলাই ১৮২৬—১৫ই শ্রাবণ ১২৩৩ সাল শালিখায় জাহাজ ভাসান —বহু দিবসাবধি এ প্রদেশে জাহাজ ভাসান রহিত হইয়াছিল। এ প্রযুক্ত এতদ্দেশস্থ অনেক কারিগরদিগের কর্মাভাব হইয়াছিল।'

তারপরই তিনি আবার উল্লেখ করেছেন—'কিন্তু সম্প্রতি এদেশেও জাহাজের প্রয়োজন হওয়াতে কারিগর লোক সকলে নিজকর্ম প্রাপ্ত হইয়াছে। ইদানীন্তন মোং শালিখায় মিঃ গিলমোর কোম্পানীর কারখানায় এক সুন্দর চারিশত টন অর্থাৎ দশ হাজার নয়শত নয় মোন বোঝাধারি এক জাহাজ প্রস্তুত হইয়া গত ২২শে জুলাই বেলা দুই প্রহরের পর ভাসিয়াছে। এই জাহাজ ভাসিবার কালে অনেক সাহেব লোক দর্শনার্থে আসিয়া এক হইয়াছিলেন। জাহাজ ভাসিলে পর ইহার নাম 'উইলেম' রাখিলেন—কারণ ঐ নামে এক ব্যক্তি ঐ সাহেবদিগের কারখানার প্রধান ছিলেন—দর্শনাগত সাহেব লোকদিগের মধ্যে প্রধান সাহেব লোককে কিঞ্চিৎ উত্তম দ্রব্যাদি ভোজন দ্বারা সন্তোষপূর্বক বিদায় করিলেন।'

এই জাহাজী ব্যবসায় প্রচুর অর্থ লাভের আশায় হাওড়া রামকৃষ্ণপুরের ই. সি. বি. ও শালিখার রামলাল মুখার্জী এণ্ড সন্স নামে দুটি প্রতিষ্ঠান সে যুগে গড়ে উঠেছিল। বলা বাহুল্য, এই দুই পরিবারের আর্থিক উন্নতির মূলেই ছিল সেই ব্যবসা। কিন্তু দুঃখের বিষয় শেষোক্ত কোম্পানিটি আজ আর নেই। তাঁদের ঐশ্বর্যও আজ ঘাটতির খাতায়। অপরপক্ষে আনন্দের বিষয় যে, রামকৃষ্ণপুরের বিখ্যাত বসু পরিবারের প্রতিষ্ঠিত আই. ই. সি. বোস অ্যাণ্ড কোং আজও সমান গতিতে চলেছে। সিপিং স্টিভেডার কোম্পানী হিসেবে আজ সারা ভারতে এটি একটি পরিচিত নাম। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ঈশান চন্দ্র বসু। প্রতিষ্ঠা কাল ১৮৫১ সাল। ঈশানবাবুর বংশধররা আজও যোগ্যতার সঙ্গে সেই বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানটিকে পত্রপুষ্পে আরও সুশোভিত করে তুলেছেন—যাঁদের মধ্যে দেবসাধন বসুর নামটি সকলের আগেই উল্লেখ করতে হয়। এই বংশেরই অন্যতম উত্তরাধিকারী হিসেবে ডঃ নিমাই সাধন বসু সারস্বত জগতে নিজ প্রতিষ্ঠা লাভে সক্ষম হয়েছেন।

শালিখার পিপল্‌স্‌ ইঞ্জিনীয়ারিং এ্যাণ্ড মোটর ওয়ার্ক্‌স্‌ লিমিটেডের নাম এখানে একটু উল্লেখ করা দরকার। প্রাচীনত্বে ও বিরাটত্বে এটা তেমন না হ'লেও স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এর প্রতিষ্ঠা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

পিপল্‌স্‌ ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানীটি প্রথম গঠিত হয় ১৯২১ সালে। এই সালটির রাজনৈতিক তাৎপর্যের কথা পাঠক মাত্রই জ্ঞাত আছেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে সারা ভারতে তখন স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার ও বিদেশী দ্রব্য বর্জন আন্দোলন চলছে। সেই সময়ে কতিপয় শিক্ষিত বাঙ্গালী স্বদেশ প্রেমিক যুবক পূর্ববঙ্গে মোটরলঞ্চ সার্ভিস চালু করেন। কিন্তু বছর দুই যেতে না যেতেই ১৯২৩ সালে পুলিশের অভিযোগ-মতে পিপল্‌স্‌ ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের উদ্যোক্তাদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং কারখানাটি ভেঙ্গে তচনছ করা হয়। পুলিশের মতে উদ্যোক্তারা ব্যবসার আড়ালে স্বদেশী আন্দোলনের প্রবক্তা ছিলেন। দু'বছর পরে অর্থাৎ ১৯২৫ সালে প্রকাশ্যে ঘাটাল স্টীম নেভিগেশন কোম্পানী' নামে একটি কোম্পানী তৈরী করা হল। লঞ্চ সার্ভিস চালু হ'ল ঘাটাল থেকে কোলাঘাট পর্যন্ত। এতে স্বাভাবিকভাবেই এদেশীয় জনসাধারণের মনে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হ'ল। ফলে বিদেশী হোরমীলার স্টীমার কোম্পানী তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। উক্ত কোম্পানীটি তখন যাত্রীদের টানবার জন্য বিনা পয়সায় সিগারেটও দিতে লাগল। এখানেই তারা থেমে রইলো না—স্বদেশী কোম্পানীকে বিপাকে ফেলবার জন্য তদানীন্তন বি. এন. আর. রেল কর্তৃপক্ষ যাতে ঐ স্বদেশী কোম্পানীকে কোলাঘাটের লঞ্চ মেরামত ও তীরে ভেড়বার জায়গা না দেয় তারও চেষ্টা করল। তখনকার দিনে প্রতিটি জাহাজ প্রতি বৎসর ইন্‌স্‌পেক্‌সন করার নিয়ম ছিল। অফিসার ছিলেন সবই প্রায় ইউরোপীয়। তাই নানা অছিলায় এই স্বদেশী কোম্পানীটির জাহাজ যাতে পরিদর্শন না হয় তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এমনকি উক্ত কোম্পানীর জাহাজ যাতে কেউ না সারায়, তার জন্যও বিদেশী সরকার নানাভাবে চেষ্টা করতেও পিছপা হননি। ফলে কোম্পানী নিজেই একটি ওয়ার্কশপ শালকিয়ায় প্রতিষ্ঠা করলেন। ভারতীয় কারিগরদের সাহায্যে প্রথম স্টীমার 'শীলাবতী' তৈরী করা হ'ল। কিন্তু ওটিকে পরীক্ষা করে ভাসাবার অনুমতি দিতে অনেক সময় অতিবাহিত করা হ'ল। ১৯৩৪ সালে এই কোম্পানীর জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। কলকাতা কর্পোরেশনের 'থিয়ো' নামে একটি জলযানের মেরামতী কাজ করার জন্য এই স্বদেশী কোম্পানীটি টেণ্ডার দিল। সর্বনিম্ন দর দেওয়া সত্ত্বেও এই কোম্পানীকে সারাবার কাজ না দিয়ে মেসার্স জন কিং কোম্পানীকে দেওয়া হ'ল—কারণ তাদের একাজে সুনাম আছে এই যুক্তিতে। এবার কিন্তু পিপল্‌স্‌ ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ পৌর কর্তৃপক্ষকে সহজে ছাড়লেন না। বিখ্যাত তদানীন্তন কংগ্রেস নেতা দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এই স্বদেশী ও বিদেশীর পক্ষপাতিত্বের প্রশ্নে প্রচণ্ড বিতর্কের সৃষ্টি করলেন। ফলে উক্ত কর্তৃপক্ষকে শেষ পর্যন্ত এই স্বদেশী কোম্পানীকেই জলযানটি সারাতে দিতে হয়। বলা বাহুল্য, এই কাজে লাভ ও সুনাম দুইই কোম্পানীর হয়।

এরপরই দেখা দিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাবার জন্য বেশী সংখ্যায় জাহাজ মেরামতী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এই স্বদেশী কোম্পানীটি সরকারী তালিকাভুক্ত হয়েও পুলিশী রিপোর্ট বিরূপ হওয়ায় কোন

সরকারী কাজ পায় না। কিন্তু অচিরেই স্বায়ত্তশাসন ও বাংলা সরকারের সাধারণ কাজের জন্য জাহাজ মেরামতী ভীষণভাবে প্রয়োজন হ'য়ে পড়ল। বাধ্য হ'য়ে তখন তাদের এই স্বদেশী কোম্পানীটির কাছে কাজ নিয়ে হাজির হ'তে হয়।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশের মুসলমান কর্মীরা (তারাই এই কাজে তখন একচেটিয়া ছিল) বেশীর ভাগই পূর্ব পাকিস্তানে অপ্‌সন্‌ দিয়ে চলে যায়। ফলে পশ্চিমবঙ্গের জলযান পরিচালনার ব্যাপারে এক ভীষণ সংকট দেখা দেয়। পিপলস্‌ ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী ১৯৪৭ সালে নভেম্বর মাসে 'মেরিন স্কুল' প্রতিষ্ঠা ক'রে দু'মাসের এক স্বল্পকালীন 'ইনটেনসিভ কোর্স' চালু ক'রে দেড়শ' যুবককে আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন কাজে মোটামুটিভাবে উপযুক্ত ক'রে তোলেন। এভাবে ১৯৫০ সালের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে প্রায় চারশ কর্মী প্রশিক্ষণ লাভ ক'রে জলযানে নিযুক্ত হন। তবে এই স্বদেশী প্রতিষ্ঠানটির কৃতিত্বের জন্য বিপিনচন্দ্র ভট্টাচার্য, যতীন্দ্রকুমার মজুমদার ও ত্রিগুণাচরণ সরকারের কর্মপ্রচেষ্টাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরা দেশ বিভাগের আগে থেকেই শালিখার বাসিন্দা হিসেবে এখানে ছিলেন। বাঁধাঘাট ও আহিরীটোলার মধ্যে লঞ্চ পারাপারের যে ফেরী সার্ভিস আছে তা এই কোম্পানীর পরিচালকরা ঘাটাল স্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর নামেই প্রবর্তন করেন যা আগেই বলা হয়েছে। পিপলস্‌ ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানাটি আজ অবশ্য বন্ধ।

দড়ির কারখানা—জাহাজ মেরামত ও নির্মাণের কাজে হাওড়া যেমন বঙ্গদেশের মধ্যে অগ্রণী ছিল তার চাইতেও পুরানো শিল্প ছিল দড়ির কারখানা। **Upjohn's Survey Map of Calcutta** (১৭৯২-৯৩) ঘুষুড়িকে দড়ির কারখানার স্থান ব'লে চিহ্নিত করেছে। তাতে দু'টি লেনকে 'রোপ ওয়াক' (**Rope Walk**) ব'লে উল্লেখও করা হয়েছে। এই কারখানা দুটি স্থাপিত হয়েছিল স্টলকার্ট ভ্রাতৃদ্বয়ের উদ্যোগে। জেলার দু'টি স্থানে বিশেষ করে ঘুষুড়ি ও শালিমারে (শিবপুর) দড়ির কারখানা গড়ে ওঠার পিছনেও যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। শালিখায় জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র বা ডক ইয়ার্ড প্রথম গড়ে ওঠায় মোটা দড়ি বা কাছির প্রয়োজন বিশেষ-ভাবে অনুভূত হয়। তেমনি 'বেতর' বন্দর হিসেবে থাকায় তারও কাছাকাছি অঞ্চল শালিমারে দড়ির বা কাছির কারখানা স্বাভাবিক কারণেই গড়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই অঞ্চলে দড়ির কারখানা দুটি গড়ে উঠেছিল **Mr. W. Stalkart** এবং **Mr. I. Stalkart** নামে দু'ভায়ের উদ্যোগে। এঁদের সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে কিছু না জানা গেলেও এঁরা ছিলেন এই অঞ্চলে বিদেশীদের মধ্যে অন্যতম প্রাচীন বাসিন্দা। ইংল্যাণ্ড থেকে এসে এঁরা শালিখায় বসবাস ক'রে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দড়ির কারখানা পত্তন করেন। এই কারখানা ক'রেই যে তাঁরা এ অঞ্চলে বিত্তশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ব'লে সমাজে পরিগণিত হয়েছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই স্টলকার্ট ভ্রাতৃদ্বয়ও এ অঞ্চলের সামাজিক এবং নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে খুবই তৎপর ছিলেন। তারও হদিশ মেলে হাওড়া

মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ১৮৬২ সালে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল বোর্ড যাঁদের নিয়ে প্রথম গঠিত হয়েছিল তাঁদের এগার জনের মধ্যে ছিলেন এই স্টলকার্ট ভ্রাতৃদ্বয়। প্রায় অর্ধশতাব্দী এই দড়ির কারখানা চালানোর পর ১৮০১ সালে উক্ত কারখানা দু'টি মেসার্স ক্লার্ক'স এণ্ড কোম্পানী (M/S. Clarks & Co.) কর্তৃক অধিগৃহীত হয়। এর পরে আরও কয়েকটি বড় দড়ির কারখানাও গড়ে ওঠে যেমন ডব্লু. এইচ. হার্টন এণ্ড কোম্পানী (W. H. Harton & Co.) এবং বামুনগাছিতে গঙ্গাধর ব্যানার্জী এণ্ড কোম্পানী প্রভৃতি। এছাড়া হাওড়ায় ১৮১৫ খ্রীঃ আমুথি এণ্ড কোম্পানিও একটি দড়ির কারখানা খোলেন।

সুতোকল—১৮১৭ অথবা ১৮২২ সালে বাউড়িয়া কটন মিল নামে হাওড়ায় ভারতের প্রথম কাপড়ের কল গড়ে ওঠে।* এর প্রায় তিন দশক পরে অর্থাৎ ১৮৫০ সালে বোম্বাই এবং আমেদাবাদে কাপড়ের কল গড়ে ওঠে। অবশ্য বস্ত্র বয়নে ইংরেজ আমলের আগে থেকেই হাওড়া জেলার খ্যাতি ছিল। ১৭৯৬ সালে জনৈক স্যামুয়েল ক্লার্ক নামে এক ইংরেজ এখানে নিয়োজিত হয়েছিলেন ইংলণ্ডে সুতোর গাঁট ও তুলোর গাঁট পাঠাবার জন্য। আবার ১৭৯৭ সালে বামুনগাছির কালী প্রসাদ লহরী নামে জনৈক ব্যক্তি জেমস্ ফ্রীসার্ড কোম্পানীর প্রতিনিধি হিসেবে সুতোর গাঁট বিদেশে চালানের প্রতিনিধিত্ব করতেন।[৩] এর পরেই ১৮১৭ সালে ব্রাইটম্যান এবং মিঃ হগও হুগলী নদীর তীরে তুলোর গাঁটের কারবার করেছিলেন। এই অঞ্চলে তুলো যে এক সময়ে প্রচুর উৎপাদিত হ'ত ওপরের আলোচনা তাই প্রমাণ করে। হাওড়া গেজেটিয়ারের লেখক অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাই লিখেছেন 'A cotton screw for packing and screwing cotton which used to grow in abundance in this region, was known to have existed in Salkia in 1797'. প্রকৃতপক্ষেই শালিখার গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে এই ধরনের শিল্প প্রচুর পরিমাণে গড়ে উঠেছিল। গঙ্গার ঘাটে ঘাটেই এই তুলো ও সুতোর গাঁট তৈরী করার কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। অমিয়বাবু আবার লিখেছেন—One such screw became well-known in Salkia and the "ghat" there was known as the cotton screw ghat. এই ঘাটটির নাম তিনি উল্লেখ না করলেও সম্ভবতঃ 'বাঁধাঘাট'কেই বোঝান হয়েছে। আজও বাঁধাঘাটের কাছাকাছি অঞ্চলে এই তুলোর গুদাম, সুতোকল, তুলোর গাঁট ও প্রেসার মিলগুলি সারিবদ্ধভাবে কারাবার চালিয়ে যাচ্ছে।

পাট শিল্প—রেশম শিল্প ও বস্ত্র বয়ন শিল্পের মত অত প্রাচীন না হ'লেও পাটশিল্প বঙ্গদেশের একটি পুরনো শিল্প। হাওড়া জেলায় প্রথম জুট মিল ১৮৭৩ সালে বাউড়িয়ায় 'ফোর্ট গ্লস্টার জুট মিল' স্থাপিত হ'লেও তারও আগে পাটের গাঁট ইংলণ্ডে চালান যেত এই ঘুষুড়ির কারখানা থেকেই। এই কারখানাটি স্থাপিত হয়েছিল ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে।[৪] ১৮৫৬ সালে S. Misser কর্তৃক অঙ্কিত Survey

* O' Malley & M. Chakravorty—Bengal Dist Gazetteers—Howrah.

Map of India-য় বর্তমান হাওড়া স্টেশন এলাকার গুডস্ ইয়ার্ড-এর পেছনের জায়গাটিতে জুটস স্ক্রাস-এর স্থান ছিল ব'লে দেখান হয়েছে।[৫] ঐ সময়েই শালকিয়া ডবসন্ রোড, কুলেন প্লেস ও রোজমারি লেনেতেও জুট প্রেস স্থাপনের নজির আছে। ঘুষুড়ি ও শালকিয়াতে আজও কয়েকটি জুট মিল ও অনেক জুট প্রেস অতীত গৌরবের কথাই মনে করিয়ে দেয়। শালকিয়া ও ঘুষুড়ি অঞ্চলে স্থানীয় লোকেদের তুলনায় ভিনদেশী লোকের সংখ্যাধিক্যের প্রধান কারণই হচ্ছে এই পাট কলের অবস্থান।

পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণপুরে ও শিবপুরেও বেশ কয়েকটি পাটকল গড়ে ওঠে। ১৮৭৪ থেকে ৭৫ এর মধ্যে গড়ে ওঠে শিবপুর মিল, হাওড়া জুট মিল এবং গ্যাঞ্জেস জুট মিল। আর রামকৃষ্ণপুরে ১৮৭৬ সালে গড়ে ওঠে রামকৃষ্ণপুর জুট মিল। এইভাবে সাঁকরাইল থেকে ঘুষুড়ি পর্যন্ত গঙ্গার ধারে জুট মিলের মেলা বসে যায়। আজ অবশ্য সেই রমরমাভাব আর নেই।

তেলকল—সরষের তেলের কল জেসপ কোম্পানী ১৮৩০ সালে হাওড়ায় প্রথম স্থাপন করে। ঐ জায়গাটির নাম হচ্ছে বর্তমান তেলকল ঘাট। কিন্তু এরও আগে থেকে শালিখায় ও সাঁত্রাগাছিতে ছোট ছোট দিশী তেলের কল ছিল। এই দশকের পর থেকেই শালকিয়া ও ঘুষুড়িতে তেলের কল ক্রমশই বাড়তে থাকে। শালকিয়ায় এ ব্যবসায় সাধুখাঁদের একাধিপত্য সর্বজনবিদিত। হরগঞ্জ রোড ও বেনারস রোড এই ব্যবসার জন্য সমধিক উল্লেখযোগ্য। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের পরে এই ব্যবসায়ে শালকিয়ার প্রাধান্যও অস্বীকার করা যায় না। হাওড়া গেজেটিয়ারের লেখক অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—**In 1925, four out of a total of seven oil mills were in the Haraganj—Banaras Road area, the other three were in the Ramkrishnapur—Shibpur locality.'** আজও কয়েকটি বড় বড় তেলকল শালকিয়ায় দেখতে পাওয়া যাবে।

অপরপক্ষে, 'নগর হাওড়ার' লেখক অলোক কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—কোলিন সাহেবের (E. W. Collin) মতে হাওড়ায় তেলকলগুলির মধ্যে রামকৃষ্ণপুরের কলটি ছিল খুব বড়। ব্যাঁটরার নটবর পাল ও শালকিয়ার সাধুখাঁরা এই ব্যবসায়ে একাধিপত্য লাভ করেছিলেন। তিলি সম্প্রদায়ের এটি ব্যবসা। আগে ঘানিতে তেল পেষাই হত। শিবেন্দ্র নারায়ণ শাস্ত্রী তাঁর বাংলার পারিবারিক ইতিহাসে (২য় খণ্ডে) লিখেছেন—সালিখার দিগম্বর খাঁ পুত্র উমাচরণ খাঁ-ই প্রথম তেল তৈরীর জন্যে বাষ্পচালিত লোহার পেষণ ব্যবহার করেন। বলাবাহুল্য, এই ব্যবসায়েই তাঁর দুই পুত্র কানাইলাল সাধুখাঁ ও বলাইচরণ সাধুখাঁ প্রচুর অর্থ রোজগার করেন। সমাজ কল্যাণে তাঁদের দানও কম ছিল না। এক কালে তাঁরা 'তেলের রাজা' (Oil King) বলে পরিচিত ছিলেন।

চাল ব্যবসা—হাওড়ায় চাল ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র ছিল রামকৃষ্ণপুরে। এই ব্যবসায়ও আবার প্রধানত আধিপত্য ছিল খাঁ সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীদের। পার্শ্ববর্তী

জেলা থেকে চাল এনে এঁরা রামকৃষ্ণপুর ঘাটের গুদামে জমা করতেন। শালকিয়ায়ও এরকম একটি ঘাট ছিল। চালের ব্যবসাই এই ঘাটে হত বলে তার নাম হয়ে যায় চাল পট্টির ঘাট (চেলু পট্টি ঘাট)। হুগলী ডকের পাশেই ঘাটটি রয়েছে। মধ্য হাওড়ার কিশোরী খাঁ, সাধুচরণ খাঁ, বিহারী লাল খাঁ ও রামকৃষ্ণপুরের খাঁয়েরাও এই ব্যবসায়ে প্রচুর নাম ও অর্থোপার্জন করেন।

চিনি শিল্প—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ চিনিকল শালিখা অঞ্চলে গড়ে ওঠে। সে সময় শালিখার কাছাকাছি অঞ্চলে আখের যে চাষ হত তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ আখের কলের অবস্থানই তা বলে দেয়। আর সেই আখের কল থেকেই এখানে গড়ে উঠেছিল মদের ব্যবসা। আখের রস মদ তৈরীর একটি আবশ্যকীয় উপাদান। লেভেট (Levet) নামে জনৈক সাহেব হাওড়াতে যে বিস্তীর্ণ জমি লীজ নিয়েছিলেন (হাওড়া কোর্ট অঞ্চলে) তাতে তিনি ১৭৬৭ খ্রীঃ মদের ভাঁটি তৈরী করেছিলেন। বর্তমান হাওড়া কালেকটারেটের বাড়িটি লেভেট সাহেবেরই বাড়ি ছিল বলে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ বাড়িটি তিনি তিনটি কাজে ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। একাংশে কলকাতার শুল্ক বিভাগে অফিস হত, দ্বিতীয়াংশে ২৪ পরগনা জেলা শাসকের অফিস ছিল এবং তৃতীয়াংশে প্রসিদ্ধ বিশপ কলেজের জনৈক পাদ্রী থাকতেন। স্মরণ করা যেতে পারে যে বিশপ কলেজ আজ কলকাতায় হলেও এর প্রথম পত্তন হয়েছিল হাওড়া শহরে বর্তমান শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ প্রাঙ্গণে—যার অন্যতম ছাত্র ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং তাঁর অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৪ পরগনা জেলার বিচারালয় যে একদা শালিখার এই অঞ্চলে ছিল তারও সাক্ষ্য পাওয়া যাবে ডঃ সুরেশ চন্দ্র মৈত্র রচিত 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন—'১৮৩৫ সনে ২৪ পরগনা জেলা শাসকের আদালতে মামলা জিতে কৃষ্ণ-মোহন (রেভারেণ্ড বন্দ্যোপাধ্যায়) তাঁর পত্নী বিন্দুবাসিনী দেবীকে তাঁর পিত্রালয় শালিখা* থেকে নিয়ে এলেন। এক রকম উদ্ধার করলেনই বলা যায়। হাওড়ার শালিখা তখন ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই বিন্দুবাসিনী একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে ছিলেন বলেই কৃষ্ণমোহনকে আদালতের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল।'

আবার চিনি শিল্প প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। এই অঞ্চলে মদ শিল্প তৈরীর মূলে ছিল জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতী কেন্দ্র থাকায়। কারণ বিদেশী নাবিকদের কাছে এর প্রয়োজনীয়তা খুবই ছিল। পরবর্তীকালে এদেশীয় নাবিক ও মাঝি-মাল্লারাও এতে বেশ আসক্ত হয়ে পড়ে। আজও সেই ট্র্যাডিসন সমানে চলেছে।

ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই যে শিল্প হাওড়াকে বঙ্গদেশের তথা ভারতের শিল্পজগতে পরিচিত করে দিল তা হচ্ছে ইঞ্জিনীয়ারিং ও ঢালাই শিল্প। এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। হাওড়ার বড় বড় ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারখানা ছিল বার্ন এণ্ড কোম্পানী, আলবিয়ান

* বিন্দুবাসিনীর পিতৃগৃহ ছিল বর্তমান সীতানাথ বসু লেন। দ্রঃ শালিখার ইতিবৃত্ত—লেখক।

কোম্পানী, হাওড়া ফাউণ্ড্রি ও জন কিং কোম্পানী প্রভৃতি। এ ছাড়া লিলুয়ার রেলের কারখানাও খুব পুরানো। এর মধ্যে আবার লোহার শিল্প প্রতিষ্ঠান আলবিয়ন মিলস-ই সম্ভবত প্রাচীনতম। এটি ১৮১১ সালে শিবপুরে উইলিয়ম জোন্সের পরিচালনায় তৈরী হয়।[৬] হাওড়ার বার্ন কোম্পানী ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ নাম। এটি প্রথমে কিন্তু তৈরী হয় কলকাতায় ১৭৭১ সালে।* তারপর অনেক বছর কেটে যায়। ব্যবসায়ে চলে উত্থান পতন। প্রায় একশ বছর পর তাদের সুদিন আসে। ইস্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানী থেকে প্রচুর অর্ডার পেলে বড় কারখানাটি হাওড়ায় তুলে আনেন ১৮৪৬ সাল নাগাদ।** এইভাবে কারখানার কাজ শুরু হয়। ১৯২৭ সালে এই বার্ন কোম্পানীর নাম পাল্টে হল মার্টিন বার্ন এণ্ড কোম্পানী।[৭] বঙ্গদেশে যে সব বৃহৎ বৃহৎ ইমারতী কাজ তদানীন্তন সময়ে হয়েছিল তার প্রায় সব কাজেই এই কোম্পানীর হাত ছিল। আজও এদেশে বৃহৎ ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের ক্ষেত্রে এরা সুনামের সঙ্গে কাজ করে চলেছে। 'নগর হাওড়ার' লেখক অলোক কুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন—এই শিল্পের (ইঞ্জিনীয়ারিং ও ফাউণ্ড্রি) ক্রমশ উন্নতি ঘটার ফলে ১৯০৮ সালে দেখা যায় যে বাংলার মোট ৫৬টি কারখানার মধ্যে ৪৪টি অবস্থিত এই হাওড়ায়। সুতরাং এ থেকে সেই সময়ে শিল্পে হাওড়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে। কিন্তু বর্তমানে এই সংস্থাটি ভারত সরকারের একটি সংস্থা। ১৯৭৫ সালে বার্ন এণ্ড কোং লিঃ এবং দি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন লিঃ রাষ্ট্রায়ত্ত হবার পরেই বার্ন স্ট্যাণ্ডার্ড নামে পরিচিত হয়ে আসছে। সত্তরের দশকে এই সংস্থার আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়লে কেন্দ্রীয় সরকারকে শ্রমিক স্বার্থে এই ব্যবস্থা নিতে হয়। বর্তমানে এই কারখানায় অন্যান্য কাজের সঙ্গে ট্রামগাড়িও তৈরী করা হচ্ছে।

জেলার আরও দুটি বৃহৎ ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা হচ্ছে ব্রীজ এণ্ড রুফ এবং গেষ্ট কীন উইলিয়ামস। ব্রীজ এণ্ড রুফ প্রাচীন সুগঠিত কোম্পানী হলেও এটিও সত্তরের দশকে রুগ্ন হয়ে পড়ে। ফলে শ্রমিক স্বার্থে এটিও কেন্দ্রীয় সরকারের একটি অধিগৃহীত সংস্হা হিসাবে আজও উৎপাদন চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯২২ সালে আওয়েন উইলিয়ামস নামে এক ইংরেজ ভদ্রলোক হাওড়ায় একটি কামারশালা কিনে এই কারখানাটি শুরু করেছিলেন। আজ এটি খালি পশ্চিমবঙ্গ নয় সারা ভারতের গর্বের বস্তু। প্রথমে কোম্পানীর নাম ছিল হেনরি উইলিয়ামস (ইণ্ডিয়া) লিঃ। কিন্তু প্রচুর কাজের অর্ডার একার পক্ষে তাঁরও সামলানো সম্ভব হচ্ছিল না। তাই ১৯৩৪ সালে এই কোম্পানীর সঙ্গে ইংলণ্ডের বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থা গেষ্টকীন নেটল ফিল্ডস অংশীদার হবার প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাবে উইলিয়ামসও মত দেন। সেই থেকে বেশী সংখ্যক শেয়ার গেষ্ট কীন কিনে নেন এবং কোম্পানীর নাম হয় গেষ্টকীন উইলিয়ামস লিঃ। আজও সেটি নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

---

* মতান্তরে ১৭৭৪। বার্ন সট্যাণ্ডার্ড—বিশেষ প্রতিনিধি—আঃ বাজার পত্রিকা ৩১।৫।৮২।

** O' Malley & M. Chakravorty—পূর্বোক্ত গ্রন্থে।

বৃহৎ শিল্প ছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রতিষ্ঠাও হাওড়াকে করে তুলেছিল সমান গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে হাওড়া শহর এক সময়ে বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এমন সব সুদক্ষ মেশিনের কাজ করতে সক্ষম হল যা বিদেশী কারিগরদেরও তাক লাগিয়ে দেয়। হাওড়ার বেলিলিয়াস অঞ্চলে ঘরে ঘরে আধুনিক মেসিন পত্র নিয়ে ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠল। যার জন্য একদা এর নাম হয়েছিল 'সেফিল্ড অব বেঙ্গল' বা ইণ্ডিয়া। ইংরেজ ব্যবসায়ীদের দেখাদেখি বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরাও কারখানা স্থাপনে এগিয়ে এলেন। এই ব্যাপারে প্রথমেই নাম করতে হয় শিবপুরের কিশোরী লাল মুখার্জীর কথা। তিনি প্রথম লোহার কারখানা তৈরী করলেন হাওড়ার শিবপুরে। সালটি ছিল ১৮৬৭। এরপর অবশ্য শালকিয়ায়ও তাঁরা কারখানা করেন। বেলিলিয়াস রোডের কারখানা মালিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ঈশান চন্দ্র কুণ্ডু, ফকির চাঁদ দাস, রামচন্দ্র ব্যানার্জী প্রমুখ। বেলিলিয়াস অঞ্চলে এইভাবে বিভিন্ন ধরনের আধুনিক লোহার যন্ত্রপাতি উৎপাদন শুরু হয়ে গেল। বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথম আখ মড়াইয়ের মেশিন তৈরী করেন কেশব ব্যানার্জী, রামচন্দ্র (নারায়ণ) ব্যানার্জীর পুত্র। 'নগর হাওড়ার' লেখক অলোকবাবুর এই মন্তব্যটি সঠিক নয়। বিশিষ্ট ইঞ্জিনীয়ার ও লেখক সিদ্ধার্থ ঘোষ 'কলের শহর কলকাতা' গ্রন্থে লিখেছেন—১৮৮৯-এ ব্যাঁটরার ফকির চন্দ্র দাস তাঁর উদ্ভাবিত সুগার কেন মিল-এর উন্নত সংস্করণের জন্য দুটি পেটেণ্ট পেয়েছিলেন (৪১ ও ৪২ সংখ্যা)। 'দি বেঙ্গল টাইমস' এই সংবাদ জানিয়ে মন্তব্য করেছিলেন—**We have rarely ever seen so encouraging an announcement.**

'আখ পিষে রস বের করার জন্য কাঠের বদলে লোহার পেষণ যন্ত্র তৈরী করেন ১৯০৯ সালে হাওড়ার রাম নারায়ণ ব্যানার্জী এণ্ড সন্স।' সুতরাং ফকির চাঁদই এই যন্ত্রের আবিষ্কারক। ভারতে প্রথম ঢালাই লোহার কড়াই তৈরী করেন হাওড়া-ব্যাঁটরার অধিবাসী যোগেন্দ্র নাথ চ্যাটার্জী।[৮] ঢালাইয়ের বাটখারা তৈরীর কাজে উল্লেখযোগ্য কাজ শুরু করেন হাওড়া-ব্যাঁটরার রাজারাম দাস। তিনি এই কাজ শুরু করেন ১৮৬৭ সালে। ঢালাই কারখানাগুলির মধ্যে আটাজ আয়রণ ফাউণ্ড্রি, ডি. এন. সিং, আর. এম. চ্যাটার্জী এণ্ড সন্স প্রভৃতি স্বাধীনোত্তর কালের ষাটের দশক পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কাজ করে গেছে। এরপর অবশ্য আরও নতুন নতুন কয়েকটি ঢালাই কারখানা হয়েছে—তাদের মধ্যে সুরেকা ফাউণ্ড্রির নাম করার মত।

এই শতাব্দীর সত্তরের দশকের প্রথম থেকেই মেসিনে কয়লার গুল তৈরী করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন হাওড়ার প্রেমুর কাস্টিং এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কসের মালিক এস. কে. চক্রবর্তী নামে জনৈক ব্যক্তি। এতদিনে হাতে গুল দিয়েই জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু শ্রীচক্রবর্তী বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর যে মেসিনটি আবিষ্কার করলেন তার নাম কোল ব্রিকেটিং মেসিন। নিজ পরিকল্পনা ও নিজ কারখানায় মেসিনটি উৎপাদন করে তিনি এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ইদানিং কালে স্বনির্ভর পরিকল্পনা সরকার চালু করার আগেই শ্রী চক্রবর্তী সেই

পরিকল্পনা নিজেই চালু করেছিলেন। তিনি তাঁর কারখানার কর্মীদের কিছুদিন কাজ করার পর একটি করে গুলে তৈরীর মেসিন নিজেই কিনে দিয়ে তাদেরকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করেন। শ্রমিক অতি সহজেই মালিক হয়ে উঠেন।

বিদ্যুৎ সংকটের কথা সকলেরই জানা। আর শহরে ও গ্রামে পানীয় ও চাষের জল উত্তোলনের জন্য এই বিদ্যুৎ বিশেষ সহায়ক। বিদ্যুৎ ছাড়াই হস্তচালিত পাম্প কত সহজে গভীর কূপ থেকে জল তুলতে পারে তারই উপায় উদ্ভাবন করেছেন বি. সি. দে। শ্রীদে হাওড়া লাইট কাষ্টিং কোম্পানীর পরিচালক। এই প্রতিষ্ঠানটি তৈরী হয়েছিল ১৯৩০ সালে।

রাস্তা তৈরীর জন্য রোড রোলার অত্যাবশ্যকীয়। কিন্তু রোলার বিগড়ে গেলে তার যন্ত্রাংশ পাওয়া এককালে খুবই অসুবিধা হত। সেই যন্ত্রাংশই সাফল্যের সঙ্গে হাওড়াতে তৈরী করে চলেছেন দক্ষ কারিগর নিমাই চন্দ্র মাঝি—যিনি ইণ্ডিয়া এণ্টারপ্রাইজের মালিক।

পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতার পরে প্রথম জলের মেটাল পাইপ বা টিউব তৈরী শুরু হয় এই হাওড়াতে। প্রতিষ্ঠানটির নাম জিণ্ডাল ইণ্ডিয়া। ১৯৫২-তে উৎপাদন শুরু করে। আজ শুধু দেশেই নয় বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে এই টিউব।

দেশী ছাপা প্রিণ্টিং মেসিনের মধ্যে 'বাণী প্রিণ্টিং' মেসিন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মেসিনের উৎপাদন করেন হাওড়ার বহু পরিচিত ব্যবসায়ী হারাধন পোল্লে। এই মেসিন বাংলাদেশ ও নেপালেও রপ্তানি হয়। ক্ষুদ্র শিল্পে প্রিসিশন ইনষ্ট্রুমেণ্ট তৈরীতে দাসনগর প্রিসিশন ইনডাষ্ট্রির খুব সুনাম বাজারে রয়েছে। শিবপুরের প্রকৃতি নাথ চট্টোপাধ্যায় নিজ সাংগঠনিক নৈপুণ্যে শালিমার নারিকেল তেল উৎপাদন করে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয় সারা ভারতে সুনাম অর্জন করেছেন। আর হাওড়ারই এক হোমিও চিকিৎসক ভারতে প্রথম কেশ তেলের মূল উপাদান হিসাবে জাবোরাণ্ডি ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছেন।

হাওড়ার ময়দা কলও একদিন খুব নাম করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই এখানে ময়দার কল তৈরী হতে থাকে। এ ব্যাপারে ইংরেজ মালিকরাই প্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন। ১৮৫৮ সালে বিখ্যাত জেসপ কোম্পানীর পক্ষ থেকে হাওড়া কোর্টের কাছেই ময়দার একটি বড় কল বসানো হয়। আজও কয়েকটি ময়দার কল হাওড়ায় দেখতে পাওয়া যাবে গঙ্গার ধারে। যদিও তার মধ্যে কয়েকটি আবার বন্ধ হয়ে গেছে।

প্রশ্ন হতে পারে, হাওড়া শহরে কোন ব্যক্তি একাই ব্যাংক ব্যবসা, মেসিনারী কোম্পানী, জুট মিল, কটন মিল, ওষুধ তৈরীর কারখানা, বীমা কোম্পানী ও স্টীমার কোম্পানী করেছিলেন কি? এর একমাত্র দৃষ্টান্ত হচ্ছেন কর্মবীর আলামোহন দাস। পিতৃহীন অসহায় এক কিশোর মায়ের ভাজা মুড়ি কলকাতার রাস্তায় বিক্রি করে যে এত বড় হবে এটা কি কেউ ভেবেছিল? মুড়ির ব্যবসা ছেড়ে তিনি ধরলেন লোহার ব্যবসা। ওজন করার যন্ত্র (ওয়েইং মেসিন) তৈরী করে বিদেশীদের বাজার

কোম্পানী কি না করেছিলেন! গ্রামে পিতার স্মৃতিতে 'গোপী মোহন শিক্ষা সদন' নামে উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত স্থাপন করেছিলেন। দাশনগরের জন্মাষ্টমী মেলা তাঁর আর এক কীর্তি ছিল। তাঁর হাতেই তৈরী 'দাশ নগর'। আলামোহনের সাংগঠনিক প্রতিভা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ার কৃতিত্ব দেখেই আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় তাঁকে 'কর্মবীর' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। আচার্য রায় দাশ নগর দেখে বলেছিলেন —দাশ নগর মৃতপ্রায় 'বাঙ্গালীর তীর্থক্ষেত্র'। আলামোহন কেবল হাওড়াবাসীর গৌরব নয় বঙ্গবাসীরও গৌরব। আলামোহনের জন্ম হয়েছিল উদয়নারায়ণপুরের খিলা গ্রামে।

মহানগরী কলকাতায় যতগুলি এভিনিয়ু দিয়ে রাস্তার নাম আছে তার মধ্যে বি, কে, পাল এভিনিয়ুর নাম বোধ হয় সকলেরই জানা। তবে অধিকাংশ লোকই হয়তো জানেন না যে তিনি আসলে হাওড়ার লোক। বি, কে, পালের পুরো নাম হচ্ছে বটকৃষ্ণ পাল। আদি বাড়ি হাওড়া শিবপুরে। ১৮৩৫ সালে শিবপুরে জন্ম হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যেই মা-বাবা দুজনেরই মৃত্যু হয়। এখন ভরসা শুধু মাতুলালয়। বটু মামাবাড়ি কলকাতার বেনেটোলাতেই ঠাঁই নিল। মামাদের একটি মশলার দোকানেই কাজে ঢুকে গেল মাত্র এগার-বার বছরে। যুবক বয়সে বড়বাজারের খোংরাপটিতে নিজেই একটি মশলার দোকান করেন। কিন্তু পুঁজির অভাব মেটাবার জন্য মাধব চন্দ্র দাঁ নামে একজনকে অংশীদার হিসাবে নিলেন। এবার কিন্তু দোকানদারীতে বেশ ভাল বেচা কেনা হতে লাগলো—ফলে লাভের মাত্রাও বৃদ্ধি পেল। উদ্যমী পুরুষ বটকৃষ্ণের এতে মন উঠল না। তখন বিলেতী ওষুধের চাহিদা এদেশে খুব। তাই ঠিক করলেন যে মশলার দোকানের একাংশে বিলেতী ওষুধও বিক্রী করবেন। একেই বলে রথ দেখা আর কলা বেচা। যারাই মশলা কিনতে আসেন তাদেরই কাছে বটুবাবু বিলেতী ওষুধও গছাতে লাগলেন। অচিরেই লক্ষ্মীর আশীর্বাদ যেন ঝড়ে পড়তে লাগলো। মশলার দোকানের সঙ্গে ওষুধের দোকানের সহাবস্থান কি শোভা পায়? তাই তিনি আলাদা করে ওষুধের দোকান দিলেন—নাম হল 'বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং'। এখানেই তিনি থামলেন না। দেশের লোকে যাতে কম পয়সায় খাঁটি ওষুধ পায় সেদিকেও তিনি এবার মন দিলেন। দেশী গাছগাছড়া থেকে দেশীয় প্রক্রিয়ায় নানা ওষুধ তিনি তৈরী করতে লাগলেন। বটকৃষ্ণ পালের 'টনিক' সে যুগে খুব প্রচলিত ছিল। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের 'বেঙ্গল ক্যেমিকেল' প্রতিষ্ঠার আগেই দেশীয় উদ্যোগে ওষুধ তৈরীতে বটকৃষ্ণবাবু উদ্যোগী হয়ে জাতির সেবা করেছেন সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর বিত্তলাভেও সক্ষম হয়েছেন। নিজে শিক্ষালাভ করতে পারেননি বলে শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান ভোলার নয়। শিবপুরে 'বি, কে, পাল ইনস্টিটিউশন' তাঁর কীর্তির কথা আজও ঘোষণা করছে। বেনেটোলাতেও দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৯] বড়বাজারের কাছে বন ফিল্ড লেনে ও শোভাবাজারে আজও 'বি, কে, পাল এণ্ড কোং চলছে।

হাওড়া শালিখার আর এক শিল্প সংগঠকের নাম করা যেতে পারে তিনি হচ্ছেন

অবনী দত্ত। একজন সাধারণ নিঃস্ব কারিগর থেকে **Friends Electric Co.** তৈরী করে তিনি অমর হয়ে আছেন। প্যারিসে ইণ্টারন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্সের একমাত্র সদস্য হয়ে জেলার গৌরব বাড়িয়েছিলেন। বর্তমানে এই কোম্পানীটি জাহাজী শিল্পে যুক্ত হয়ে আরও সুনাম করেছে শ্রীদত্তের ভাইপো মদন মোহন দত্তের পরিচালনায়।

হাওড়ার আর এক শিল্প সংগঠক ছিলেন রাঘবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্মস্থান শিবপুরে। পুলিশ বিভাগের উচ্চ পদ থেকে অবসর নিয়ে দেশের যুবকদের কারীগরী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে ১৯৪৫ সালে হাওড়া হোমস প্রতিষ্ঠা করেন। নার্সেস ট্রেনিং এবং মানসিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষাকেন্দ্রও তিনি গড়ে দিয়ে গেছেন। সাহসিকতার জন্য তিনি ইংরেজ আমলে 'কিংস পুলিশ মেডেল' পান। আজ হাওড়া-হোমস একটি বৃহৎ ট্রেনিং সেণ্টারে পরিণত হয়েছে।

হাওড়ার কলকারখানার ব্যাপারে গুরু জোন্স-এর কথা উল্লেখ না করলে অধ্যায়টি খুবই ত্রুটিপূর্ণ থেকে যাবে। এই জোন্স সাহেব কোন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়েন নি। তাঁর কোন ইঞ্জিনীয়ারিং তকমাও ছিল না। নিজের মেধা খাটিয়ে তিনি যে প্রযুক্তির অধিকারী হয়েছিলেন তার জন্য তাঁকে সকলে 'গুরু' বলে সম্বোধন করত। বাস্তবিক তিনি ছিলেন একজন স্বয়ম্ভু ইঞ্জিনীয়ার। তাঁর জীবন সম্বন্ধে জানা যায় যে তিনি কলকাতায় আসেন ১৮০০ সালে।[১০] সামান্য একজন কারিগরের পদে কাজ করার পর তিনি হাওড়ায় এসে একটি ক্যানভাসের কারখানা তৈরী করেন। একটি ছোট্ট কাগজের কারখানাও তৈরী করেছিলেন। এই কারখানায় প্রস্তুত কাগজ ১৮১১-তে জাভা অভিযানের আগে সরকারী সেনাবাহিনীকে কার্তুজের জন্য কাগজ সরবরাহ করা হইয়াছিল।[১১]

শ্রীরামপুরের উইলিয়ম কেরীকেই আমরা কলে তৈরী কাগজের জনক বলে জানি। ১৮৬৫ পর্যন্ত শ্রীরামপুরই ছিল কলের কাগজের একমাত্র উৎপাদন কেন্দ্র। তাই হয়তো দীনবন্ধু মিত্র লিখেছেন—

> সর্ব অগ্রে ছাপাখানা এই স্থানে হয়,
> মুদ্রিত হইল যাতে বঙ্গ পরিচয়।
> কাগজের কল হেথা অতি চমৎকার,
> জন্মিছে কাগজ তাই বিবিধ প্রকার।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে…হাওড়ার 'গুরু জোন্স' সাহেব কেরী সাহেবের অনেক আগেই কাগজ শিল্প প্রচলন করেছিলেন।

হাওড়ার 'গুরু জোন্সের' মহত্তম কীর্তি হচ্ছে ভারতীয় কয়লা খনিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে কয়লা উৎপাদন। ভারতীয় কয়লা খনি শিল্পের জনক হিসেবেই তিনি ইতিহাসে পরিচিত। রাণীগঞ্জ কয়লাখনির পত্তন তাঁরই হাতে।[১২] এই 'গুরু' জোন্স বিদেশী হলেও হাওড়ায় বসবাস করে তিনি হাওড়াবাসী বলেই তখন লোকের কাছে সমাদর পেতেন। সিদ্ধার্থ ঘোষ আরও লিখছেন—জোন্স সাহেব

অনর্গল বাংলা বলতে পারতেন। এটাই কি প্রমাণ করে না তিনি এখানকার মানুষের সঙ্গে কি রকম অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিলেন?

আজকাল শহরের রাস্তায় তিন চাকার মোটর (ভ্যান) গাড়ী দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরনের এক প্রকার সাইকেল প্রাচীন কলকাতায়ও দেখতে পাওয়া যেত। শুনলে হাসি পাবে যে, ঐ তিন চাকার সাইকেলে চড়ে রাস্তায় ঘুরতে বের হতেন তদানীন্তন কলকাতার বনেদী ঘরের ধনী ও মানী ব্যক্তিরা। ঐ সব আরোহীদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর। 'সে যুগের যানবাহন' প্রবন্ধে * বিশিষ্ট সাংবাদিক হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ লিখেছেন—সৌখিন বাঙালি সমাজে প্রথম যাঁরা তিন চাকার পা গাড়ি ব্যবহার আরম্ভ করেন তাঁদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্র নাথ অন্যতম। দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর তখন পার্ক স্ট্রীটের একটি বাড়িতে থাকতেন। দ্বিজেন্দ্র নাথ রোজ সকালে জোড়াসাঁকো থেকে ট্রাই সাইকেলে চৌরঙ্গী পেরিয়ে সেখানে আসতেন। দ্বিজেন্দ্র নাথ যখন গড়ের মাঠের পাশ দিয়া গাড়িতে যেতেন তার শমশ্রুরাজি অবাধে উড়তে থাকত।' পাঠক জেনে হয়তো আনন্দ লাভ করবেন যে এই দেশে ট্রাই সাইকেলের আবিষ্কারক হচ্ছেন হাওড়া সাঁত্রাগাছির জনৈক ভদ্রলোক। তাঁর নাম প্রসন্ন কুমার ঘোষ।

এ সম্বন্ধে কৌতূহল মেটাবার জন্য তদানীন্তন 'সুলভ সমাচারের' সংবাদ ছাপিয়ে দেওয়া হল। '১৮৭৯, ১৫ই অগ্রহায়ণ 'সুলভ সমাচার' খবর প্রকাশ করে ······সম্প্রতি সাঁতরাগাছিতে একজন কর্মকার বুদ্ধি খাটাইয়া একখানি সেই রকম (ট্রাই সাইকেল) গাড়ি প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহাতে অগ্রে একজন এবং পশ্চাতে দুইজন পা দিয়া চাকা ঘুরাইতে থাকে। আমাদের দেশের লোকে যদি একটু চেষ্টা করে তবে তাহারা কত কল অনায়াসে গড়িতে পারে।' প্রথম সংবাদে আবিষ্কারকের নাম সুলভ সমাচার দিতে না পারলেও তাঁরা যে এ ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় গৌরব প্রকাশে উদগ্রীব ছিলেন তা পরবর্তী সংবাদ থেকেই প্রকাশ পায়। সপ্তাহ কয়েক পরে ৬ই পৌষ সংখ্যায় 'সুলভ সমাচার' লিখেছে—'আমরা যে লিখিয়াছিলাম একজন সাঁতরাগাছির কামার একখানি নূতন রকমের গাড়ি নির্মাণ করিয়াছেন, শুনা গেল যে বাবু প্রসন্ন কুমার ঘোষ তাহা প্রস্তুত করিয়াছেন।'

আর একজন গ্রাম্য কর্মকারের কথা বলা হচ্ছে। তিনি হচ্ছেন ডোমজুড়ের দফরপুর গ্রামের সুসন্তান রামকৃষ্ণ কর্মকার। পিতা মাধব চন্দ্র কর্মকার। গ্রামের একজন সাধারণ কর্মকারের কাজ করে ছেলে রামকৃষ্ণের শিক্ষা-দীক্ষার দিকে ততটা নজর দিয়ে উঠতে পারেন নি। তাই অল্প বয়সেই রোজগারের জন্য রামকৃষ্ণকে শহরে এসে বিভিন্ন কলে কারখানায়, জাহাজী কোম্পানী, কলকাতা মিণ্ট এমনকি দমদমের বুলেট ফ্যাকট্রীতে পর্যন্ত কাজ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়। সিমলা পাহাড়ের কাছে কৌশলীতে স্টীম ইঞ্জিনবসিয়ে ও বয়লার বসিয়ে ময়দাও পাউরুটির-তৈরী করেন। তারপর নেপালে চলে যান রাজার আহ্বানে ১৮৬৯ সালে। নেপালের

* মাসিক বসুমতী—৮৭০—৮৭২ পাতা।

টাঁকশালে তিনি যন্ত্রের সাহায্যে প্রথম মুদ্রা তৈরীর প্রথা চালু করেন। এমনকি সামরিক অস্ত্র তৈরীরও ব্যবস্থা করে দিয়ে তিনি দেশে ফেরেন। কয়েক বছর পর আবার কাবুলে গিয়ে তিনটি অস্ত্র কারখানা তৈরী করে দিয়ে আসেন। নেপালে দ্বিতীয় বার ডাক আসে ১৮৮৪ সালে। সেখানেও গোলাগুলি তৈরীর কারখানা তৈরী করে দিয়ে আসেন। গুণমুগ্ধ নেপালের রাজা রামকৃষ্ণবাবুকে 'ক্যাপ্টেন' উপাধি প্রদান করেন। সেই থেকে দফরপুরের রামকৃষ্ণ কর্মকার হন 'ক্যাপ্টেন রামকৃষ্ণ'। কোন ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল-কলেজে না পড়েও নিজ মনীষা বলে শিল্প জগতে হাওড়ার নাম ইতিহাসে অক্ষয় করে তিনি ক্যাপ্টেনের ভূমিকাই পালন করে গেছেন।

শেফিল্ডের কারিগর—এবার একজন শেফিল্ডের কারিগরের কথা বলা হবে। ইতি-পূর্বে গুরু জোন্সের কথা বলা হয়েছে—যিনি জন্মসূত্রে বিদেশী হলেও কর্মক্ষেত্রে বাঙ্গালী তথা হাওড়াবাসীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এবার একজন বাঙ্গালী কারিগরের কথা বলা হবে যিনি জন্মসূত্রে বাঙ্গালী কিন্তু কর্মনৈপুণ্যে ইংলণ্ডের শেফিল্ডের কারিগরের সমকক্ষ। ঘটনাটি হচ্ছে এইরকম—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। ক্যালকাটা মুভিটোন নামে একটি ফিল্ম স্টুডিও তৈরী হয়েছে। সিনেমার বিখ্যাত শব্দযন্ত্রী বাণী দত্ত ঐ স্টুডিওতে প্রধান হিসাবে যোগ দেন—সহকারী হিসাবে নিয়ে যান সাম্প্রতিক কালের বিখ্যাত সিনেমা পরিচালক তপন সিংহ-কে। নতুন স্টুডিও, নতুন সেট সেটিং, নতুন ক্যামেরা হিসাবে সেখানে বসানো হল 'মিচেল ক্যামেরা'। সবাই স্টুডিও দেখে ভীষণ খুশি। এতৎ সত্ত্বেও স্টুডিওটি ভাল চলছিল না—কারণ সেখানে 'প্লে-ব্যাক' মেশিন নেই। অথচ এই মেশিন ছাড়া গান সমেত বাংলা ছবি করাও অসম্ভব। স্টুডিও কর্তৃপক্ষ বাণীবাবুকে জানিয়ে দিয়েছেন যে ঐ মেশিন কেনার জন্য কোম্পানী আর টাকা খরচ করতে পারবেন না। সুতরাং বাণীবাবু নিজের উদ্ভাবনী শক্তিতে ঐ বিদেশী মেশিনের একটি বিকল্প পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে লাগলেন। এখানে জানিয়ে রাখা ভাল যে বাণীবাবু নিজেও একজন পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। বেশ কয়েকদিন চিন্তাভাবনা করে তিনি একটি তিন বাই চার গিয়ারের ড্রয়িং করতে লাগলেন। পুরো নক্সাটিকে তিনি একদিন সহকারী তপন সিংহ-কেও দেখালেন। তপনবাবু গিয়ারের নিখুঁত ড্রইং দেখে খুব খুশি হলেন। বাণীবাবু বললেন, 'মালিক যখন আর খরচ করবেন না তখন আমাদেরই একটা বিহিত করতেই হবে।'[১৩] তিনি অঙ্ক কষে ঠিক করলেন যে মুভিওয়ালার আর পি এম ১৫০০ আর ক্যামেরার আর পি এম ১৪০০। সুতরাং তিনের চার রেশিওতে একটা গিয়ার কাটিয়ে নিলেই ঠিক হয়ে যাবে। বাণীবাবু হাওড়া বেলিলিয়াস অঞ্চল থেকে এক লেদ মেশিনের কারিগরকে নিয়ে গেলেন। সেই কারিগরটি ড্রইং মত হিসাব করে দিন পনেরোর মধ্যেই নতুন গিয়ার তৈরী করে দিয়ে গেলেন। এবার পরীক্ষার পালা। তপন সিংহ লিখছেন—'আমার উপর দায়িত্ব পড়ল রোজ মুভিওয়ালাতে হাজার ফিটের একটা ডামি ফিল্ম রোল চাপিয়ে

স্টপ ওয়াচ হাতে নিয়ে চালানো আর দেখা প্রতি মিনিটে ওটি ৯০ ফুট চলছে কিনা। দেখি একেবারে অঙ্কের মতো ঠিক।''[১৪]

একদিন ঐ স্টুডিও দেখতে এলেন বিখ্যাত সিনেমা পরিচালক অজয় কর। স্টুডিওতে 'মিচেল ক্যামেরা' দেখে তিনিও খুব খুশি—কারণ অজয়বাবু নিজেও একজন নামী ক্যামেরাম্যান ছিলেন। তারপর যেটা অজয়বাবু বললেন সেটাও তপন সিংহ-এর ভাষায়ই বলি। অজয়বাবু বললেন—'সব কিছুই তো সুন্দর। তবে শুনলাম আপনাদের নাকি 'প্লেব্যাক' মেশিন নেই ?''[১৫] উত্তরে তপনবাবু বললেন —'কে বললে ? আমরা শেফিল্ড থেকে নতুন 'প্লে-ব্যাক' মেশিন এনেছি। বলে মুভিওয়ালা আর গিয়ার দেখিয়ে বললাম—হাওড়া, হাওড়া শেফিল্ড অব ইণ্ডিয়া।''[১৬] হাওড়ার একজন দক্ষ কারিগরের এই স্বীকৃতির তুলনা নেই। কিন্তু তপনবাবু সেই কারিগরের নামটি উল্লেখ করেননি—তাই আমিও জানাতে অক্ষম।

এবার একজন গাড়ি বিলাসী মানুষের কথা বলা যাক। তিনি যেমন একাধিক 'ভিণ্টেজ' কার-এর মালিক তেমনি একজন বিখ্যাত মোটর প্রযুক্তিবিদও বটে। পুরানো অভিজাত গাড়ির মালিকদেরই ভিণ্টেজ কারের মালিক বলা হয়। প্রতি বছর কলকাতায় দি স্টেটসম্যান পত্রিকার উদ্যোগে 'ভিণ্টেজ কারের' প্রতিযোগিতা হয়। বর্তমান প্রজন্মের ছেলেরা ঐ প্রতিযোগিতার গাড়িগুলি দেখলে হয়তো হাসি চাপতে পারবে না। কিন্তু যাঁরা গাড়ির পেডিগিরির খবর রাখেন তাঁরা সম্ভ্রমে ও ঈর্ষায় তাকিয়ে থাকেন ঐ সব গাড়ির মালিকদের দিকে। এই রকমই একজন সৌভাগ্যশালী মালিক হচ্ছেন পার্থসাধন বসু। তিনি বর্তমানে কলকাতার অধিবাসী হলেও তিনি ও তাঁর পরিবারের সবাই ছিলেন কয়েক বছর আগেও হাওড়া রামকৃষ্ণ-পুরের অধিবাসী। পার্থবাবুকে আজকের ছেলেরা না চিনলেও তাঁর পিতা দেবসাধন বসু হাওড়ার লোকেদের কাছে খুবই পরিচিত ছিলেন। এই দেবসাধন বসুরই আর এক পুত্র হচ্ছেন কলকাতার ময়দানে অতি পরিচিত নাম 'টুটু বসু'। পারিবারিক জাহাজের স্টিভেডারী ব্যবসা করলেও পুরনো গাড়ি সংগ্রহ ও সংরক্ষণই হচ্ছে পার্থবাবুর নেশা বা শখ। আধুনিক ধনী ব্যক্তিরা এমন বিলাসী গাড়ি ব্যবহার করেন যা তেল খাবে কম অথচ যাবে বেশি কিলোমিটার। কিন্তু পার্থবাবুর মতো মডেলটি—ফোর্ড (যার গাড়ির চাকার স্পোক হচ্ছে কাঠের), ১৯৩১ সালের ব্যুইক মাণ্টার এইট, ১৯৩৪ সালের শেভ্রলে ফিটন, এম, জি, ডেমলার, ফিয়াট ইত্যাদি ক'জন ধনীর গ্যারেজে বা বাড়িতে আছে ? এ কালের পুঁচকে ফিয়াট নয়। ১৯২৬-এর[১৭] ঐ একই প্রবন্ধে দীপংকরবাবু আরও লিখছেন—১৯২৭ সালের 'অবর্ণ' নামে একটি মোটর গাড়ি শোভাবাজারের রাজবাড়ির শোভাবর্ধন করতো যে গাড়ি সেটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে একদিনও চলেনি। খোলা উঠোনে ক্ষয় পাওয়া 'অবর্ণ' এখন পার্থবাবুর তত্ত্বাবধানে ওঁর মিস্ত্রিদের যাদুহাতের ছোঁয়ায় 'নিউ বর্ণ' হওয়ার অপেক্ষায় আছে।'

আশা করি এতদিনে 'অবর্ণ' 'নিউবর্ণ' হয়ে পার্থবাবুর টুপিতে নতুন সেরা

পালক হিসাবে যুক্ত হয়েছে—সঙ্গে সঙ্গে হাওড়াবাসীর মাথার টুপীটিও ঝলমল করে উঠবে।

কুটির শিল্প—এতক্ষণ পর্যন্ত বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পে হাওড়ার গুরুত্ব ও ভূমিকা সম্বন্ধেই আলোচনা হল। এবারে কুটির শিল্পেও যে হাওড়ার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে সে সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যাক। এই সব কুটির শিল্পের মধ্যে আছে দেউলপুরের পোলোবল, জগৎবল্লভপুরের বড়গাছিয়ার তালা, ডোমজুড় ও জগৎবল্লভপুরের চিকনের সূচী শিল্প, দক্ষিণ কলোড়া, ধুলোগড়, পাঁচলা, দেউলপুর ও জালালসির জরীর কাজ, উলুবেড়িয়া বাণীবনের ব্যাডমিণ্টন খেলার শাটেল কক্‌স, পাঁচলার চড়া, কুলাই ও বিকি হাকোলা গ্রামের পরচুলা প্রভৃতি কুটির শিল্পের কারিগররা আজও ভারত তথা বিশ্বের বাজারে প্রশংসা লাভ করে চলেছে।

প্রথমে পোলো বলেরই কথা বলা যাক। ইংরেজ আমলে এই বলের কারবার খুব ভালো চলতো। সাহেবরা তখন সারা ভারতেই পোলো খুব খেলতো। বাঁশের গুঁড়ি বা গুঁপো থেকে এই বল তৈরী হয়। এই বলের একচেটিয়া কারবার করে ধুলোগড়ির কাছে দেউলপুর গ্রামের কয়েক ঘর কারিগর। এই বল তৈরী করে আজও বিদেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সাহায্য করে ঐ গ্রামের কারিগররা। সুদূর আমেরিকাতেও এই বল রপ্তানি হয়। ইংরেজ চলে যাওয়ার পর থেকে এই কারবারেরও ভাঁটা পড়েছে। চাহিদা না থাকায় গ্রামের কিছু কিছু পরিবার এই ব্যবসা তুলেই দিয়েছে। বর্তমানে গ্রামের কোলে, দাস, হাজরা ও বাগ পরিবারের লোকেরাই চাষের সঙ্গে এখনও এই কুটির শিল্পটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

জগৎবল্লভপুরের বিভিন্ন গ্রামে চিকনের কাজ ভারত বিখ্যাত। গ্রামের ঘরে ঘরে মুসলমান রমণীরা মসলিন বা মিহি কাপড়ের ওপর সূক্ষ্ম সূচীশিল্পের কাজ করে হাওড়া হাট ও কলকাতার বড়বাজারে বিক্রি করে। আগে এটা সম্পূর্ণ হাতে করলেও দেশ স্বাধীন হবার পর জার্মানীর 'মাণ্ডলস' (Mundlos) মেশিন পায়ে চালিয়ে একাজ করা হচ্ছে।

দামী শাড়িতে সোনা বা রূপোর জরি বসানোর কাজেও এই জেলার কুটির শিল্পীরা অনন্য। মুসলমান মহিলাদের এই জরির কাজ বা চুমকি বসানোর পারদর্শিতা পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়। এর প্রধান ক্রেতা হচ্ছে বড়বাজারের মহাজনরা। তাঁরাই কারিগরদের উপকরণ যোগান দেন।

পরচুলোর ব্যবসাটাও পাঁচলায় বিভিন্ন গ্রামেই চলে। দেশ-বিদেশে এই শিল্পীদের পরচুলোর আদর আছে। সিনেমা, যাত্রা প্রভৃতিতে এর চাহিদা আছে। আজকালতো সাধারণ মানুষও মাথার টাক ঢাকার জন্য পরচুলা বেশ ব্যবহার করছে। সাধারণ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সাহায্যে এই কুটির শিল্পটি চলে। বৈদেশিক মুদ্রাও এর দ্বারা অর্জিত হয়। কিন্তু সরকারী সহায়তা আরও আন্তরিক হলে এই শিল্পের ক্ষেত্রে হাওড়ার কারিগররা তাদের কৃতিত্ব আরও দেখাতে সক্ষম হবে।

হাওড়ার ডোমজুড় থানার অধিবাসীরা স্বর্ণালঙ্কার ও হীরে কাটার পারদর্শিতার জন্য বোম্বাইতে হীরে-জহরতের বাজারে খুবই আদৃত কারিগর। তার ইতিহাস একটু আলোচনা হলে ভালই লাগবে।

সোনার ওপর সেটিংএর কাজে বোম্বাই শহর আজ খুব নাম করলেও এর মূলে ছিল কিন্তু ইংরেজ কোম্পানীরা। আমাদের হয়তো জানা আছে যে বিখ্যাত হ্যামিলটন এণ্ড সন্স, কুক এণ্ড কেলভি প্রভৃতি কোম্পানী এই ব্যবসা কলকাতায়ই প্রথম শুরু করেন। পরে অবশ্য তাঁদের দেখাদেখি ভারতীয় ধনী ব্যবসায়ীরাও এই ব্যবসায় নামেন। কোম্পানী দুটি বিদেশী হলেও কারিগররা অধিকাংশই ছিল বাঙ্গালী। পশ্চিম ভারতের গুজরাটী সমাজে জাভেরী বলে একটি সম্প্রদায় আছে। তারাও উন্নতমানের 'মণিকারে'র কাজ শিখতে কলকাতার ঐ বিদেশী কোম্পানী দুটিতে আসত। কিন্তু এত দূরে এসে কাজ শিখতে শ্রম ও ব্যয় প্রচুর হত। তাই ধনাঢ্য গুজরাটী ব্যবসায়ীরা এখান থেকে দক্ষ 'মণিকার' নিয়ে গিয়ে বোম্বাইতে ব্যবসা শুরু করার পরিকল্পনা নেয়। সেইমত তাঁরা হ্যামিলটন এণ্ড সন্সকে একজন দক্ষ কারিগর সেখানে পাঠাতে অনুরোধ করেন। হ্যামিলটন কোম্পানীও তাঁদের অনুরোধে চন্দ্রকান্ত কর্মকার নামে তাঁদের একজন দক্ষ মণিকারকে বোম্বাই পাঠান। সম্ভবত তিনিই প্রথম বাঙ্গালী মণিকার যিনি সেখানে গিয়ে ঐ কাজটি একজন দক্ষ কারিগর হিসাবে গিয়ে শুরু করেন।

এই চন্দ্রকান্তবাবুর বাড়ি ছিল হাওড়া জেলার ডোমজুড় থানার অধীনস্থ নিবিড়া গ্রামে। যতদূর জানা যায় ১৮৭০ সালে তিনি বোম্বাই যান। সে সময়ে রেলপথে কলকাতার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ছিল না। তাই জাহাজে করেই তাঁকে বোম্বাই যেতে হয়। যাবার সময় দুজন সঙ্গীকেও তিনি সঙ্গে নিয়ে যান—একজন ছিলেন হুগলী জেলার বেগমপুরের আদান গ্রামের হরিশ্চন্দ্র দাস কর্মকারের পুত্র চণ্ডীচরণ দাসকর্মকার, অপরজন ছিলেন হাওড়া ডোমজুড় গ্রামের মহেশচন্দ্র কর্মকারের পুত্র মতিলাল কর্মকার। মতিলাল কয়েক বছর থেকে ওখান থেকে চলে আসেন। কিন্তু চণ্ডীচরণ কর্মকার চন্দ্রকান্তবাবুর পরামর্শে ওখানেই কারবার করতে মনস্থ করেন। তিনি পার্শি গলিতে (ধনজী স্ট্রীটে) 'বোম্বাই জুয়েলারী ওয়ার্কস' নামে একটি দোকান পত্তন করেন। বর্তমানে ক্ষেত্রমোহন দাস যে দোকানের স্বত্বাধিকারী সেটিই তাঁর পিতামহ চণ্ডীচরণ দাসের প্রতিষ্ঠিত দোকান। চন্দ্রকান্তবাবু কিন্তু গুজরাটী জাভেরী ব্যবসায়ীদের কাছেই চাকুরী করে জীবন কাটান। কিন্তু তাঁরই প্রদর্শিত পথে হাওড়া-হুগলীর স্বর্ণশিল্পীরা আজ কেবল দক্ষ কারিগর হিসাবেই বোম্বাইতে প্রতিষ্ঠিত নয়—অনেকেই আজ বিত্তশালী জুয়েলারী ওয়ার্কসের মালিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। এরপর অবশ্য কলকাতার ভবানীপুর, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কাঁসারি-পাড়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকেও শিল্পী বা কারিগররা সেখানে যায়। স্বর্ণশিল্পীরা নিজেদের রোজগারের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসংস্কৃতি রক্ষার কাজেও পিছপা ছিলেন না। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস একবার এখানে

এসে বিখ্যাত শিল্পপতি শিব ব্যানার্জীর স্লিটার রোডের বাড়িতে ওঠেন। স্বর্ণশিল্পীরা দেশবন্ধুকে সম্বর্দ্ধনা জানান কালযাদেবী (কালবাদেবী) রোডে কালীচরণ দাসের বাড়িতে। দেশবন্ধুর পরামর্শ মতোই স্বর্ণশিল্পীরা 'বেঙ্গলী ইউনিয়ন' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন (১৯২১ সালে)। প্রথম সভাপতি ছিলেন চণ্ডীচরণ দাস কর্মকার ও সম্পাদক ছিলেন নারায়ণচন্দ্র কুণ্ডু। এঁরা উভয়েই স্বর্ণকার ছিলেন। আজ বোম্বাইতে বেঙ্গলী এসোসিয়েশন একটি সুপরিচিত বাঙ্গালীদের সংস্থা। বোম্বাইতে দুর্গাপূজা আজ একটি প্রধান আকর্ষণ। কালযাদেবী সার্বজনীন দুর্গাপূজাটি আজও পুরোপুরি মণিকার শিল্পীদের দ্বারাই পরিচালিত। বঙ্গসংস্কৃতির প্রসার ও প্রচার বোম্বাইতে অধিক মাত্রায় বাড়লেও আমরা কজনই বা খোঁজ রাখি হারিয়ে যাওয়া ডোমজুড়ের চন্দ্রকান্ত কর্মকারকে !*

---

* দুঃখহরণ ঠাকুর চক্রবর্তীর লেখা—'বোম্বাইয়ে বাঙ্গালী মণিকার' প্রবন্ধটিই এই অংশের তথ্যের প্রধান উৎস।

১, ২. Howrah Dist. Gazetteers—Amiya K, Banerjee.

৩. ৪. ৫, ৬. Bengal Dist. Gazetteers—O' Malley & M. Chakraborty.

৭. নগর হাওড়া—অলোক কুমার মুখোপাধ্যায়।

৮, Howrah Manufacturers' Association Annual Brochure 1970.

৯. হাওড়ার গৌরব কাহিনী—সলিল মিত্র।

১০. ১১. ১২. কলের শহর কলকাতা—সিদ্ধার্থ ঘোষ।

১৩. ১৪. ১৫. ১৬, নিউ থিয়েটার্স থেকে ক্যালকাটা মুভিটোন—তপন সিংহ।

১৭. গাড়ি বিলাস—দীপঙ্কর চক্রবর্তী রবিবাসরীয়—আনন্দবাজার পত্রিকা—১৩ই জুন ১৯৯৩ সাল।

ছাত্র আন্দোলনের রূপরেখা

বাংলাদেশে কে, কবে ছাত্রসংগঠনের প্রবর্তক ছিলেন তা নির্দিষ্ট করে বলা মুসকিল। ইংরেজ রাজত্বে এদেশে শ্বেতকায় শিক্ষকদের অপমানজনক মন্তব্য নেটিভ ছাত্রদের প্রায়শঃই মর্মবেদনার কারণ হয়ে দাঁড়াতো। কিন্তু পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ ছাত্ররা সাহস ও মর্য্যাদাবোধের অভাবে বাধ্য হয়ে তা হজম করতো। তারই মধ্যে কতিপয় মর্য্যাদাবোধসম্পন্ন ছাত্র সেই সব সাদা শিক্ষকদের কখনও ব্যক্তিগত, কখনও বা কতিপয় সতীর্থ মিলে তাঁদের উচিত শিক্ষা দিয়ে ইতিহাসের নজির হয়ে আছেন—যেমন সুভাষ চন্দ্র বসু ও উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ। তবে ঐ প্রতিবাদ আন্দোলন আকারে কবে প্রথম দেখা দিয়েছিল তার সঠিক ঠিকানা হদিস করা বড়ই কঠিন। এতদ্ সত্ত্বেও বিপ্লবীবীর ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' গ্রন্থে যা লিখে গেছেন তা স্মরণে রাখা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন—'১৮৭৫ খ্রীঃ আনন্দমোহন বসু বিলেত থেকে ফিরে এসে এদেশে ছাত্র আন্দোলন শুরু করেন। ছাত্রদের প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল 'ছাত্রসভা'। ইহাই ছাত্র আন্দোলনের অঙ্কুর।'

কিন্তু এই অঙ্কুরকেই ইংরেজ শাসক তার ভেদনীতি, নেটিভদের প্রতি অবজ্ঞা ও অত্যাচারের জাতাকলে পেষণ করতে গিয়ে প্রকারান্তরে উহাকে মহীরূহে পরিণত হতে সাহায্য করেছিল। তাই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে শিক্ষিত বাঙ্গালীদের তথা ছাত্রসমাজকে বেশী দিন দূরে ঠেলে রাখতে পারে নি। এতদিন যা ছিল ব্যক্তি বা মুষ্টিমেয় ছাত্রের আন্দোলন। লর্ড কার্জনের বঙ্গ-ভঙ্গ প্রস্তাব ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার ছাত্রসমাজ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদাত্ত আহ্বান ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সক্রিয় যোগদান বাংলার ছাত্রসমাজকে বলতে গেলে প্রথম জাতীয় সংঘবদ্ধ আন্দোলনে রূপায়িত করল। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ছাত্রদের স্কুল-কলেজ থেকে বেড়িয়ে এসে হরতালে যোগদান, বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও জাতীয় বিদ্যালয়ে বিজাতীয় শিক্ষার বিরুদ্ধে বিজ্ঞান ভিত্তিক অথচ জাতীয় চেতনা সম্পন্ন শিক্ষালাভের প্রতিশ্রুতি ছাত্রমহলে আনলো নূতন চেতনা। 'এ্যান্টি কার্লাইল' সার্কুলার জারি করে বিতাড়িত ছাত্রদের শিক্ষার এক বিকল্প পরিকল্পনা দেশের লোকের মনে প্রচুর আগ্রহের সৃষ্টি করল। সুবোধচন্দ্র মল্লিকের মত দানবীর দাতারাও এগিয়ে এলেন প্রয়োজনীয় অর্থভাণ্ডারকে পূর্ণ করতে। এসবই বঙ্গবাসীর কাছে বিদিত ঘটনা।

অবশেষে ১৯১১ সালে ইংরেজ শাসক দেশের জাগ্রত জনমতের কাছে নতি স্বীকার করে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিলে ছাত্র সমাজের আন্দোলন সাময়িকভাবে প্রশমিত হয়।

কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইংরেজ ভারতবাসীকে তার প্রতিশ্রুতি মত স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার দিতে নারাজ হওয়ায় গান্ধীজী ইংরেজের বিরুদ্ধে ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। গান্ধীজীর এই আহ্বান ছাত্র সমাজের কাছেও বিশেষভাবে আদৃত হয়। ইংরেজের গোলামী শিক্ষা বর্জনের আহ্বানে সেদিন হাজার হাজার ছাত্র স্কুল-কলেজ ত্যাগ করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। স্বদেশী পণ্য ক্রয়, বিদেশী দ্রব্য বয়কট ও বিলেতী মদের দোকানে পিকেটিং-এ ছাত্র সমাজ মেতে উঠলো। গান্ধীজীর উদাত্ত আহ্বান—'শিক্ষা অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু স্বরাজ নয়।' এই শ্লোগান মাথায় নিয়ে ১৯২১ সালে ২০শে জানুয়ারী বাংলা দেশে বিশেষ করে কলকাতার বড় বড় কলেজেব ছাত্ররা ধর্মঘটের সামিল হন। গান্ধীজী ছাত্রদের সাধুবাদ জানালেন। তার কিছুদিন পরে গান্ধীজী ঐ সালেরই ৪ঠা ফেব্রুয়ারী 'জাতীয় মহাবিদ্যালয়' উদ্বোধন করতে কলকাতায় আসেন। দলে দলে ছাত্ররা গান্ধীজীর ডাকে সরকারী স্কুল-কলেজ ছেড়ে আসতে থাকে। একই সালের ১৭ই নভেম্বর 'প্রিন্স অব ওয়েলস'-এর কলকাতায় আগমনের বিরুদ্ধে ছাত্র-সমাজ হরতাল ও ধর্মঘট পালন করে। এতে আবার অনেক ছাত্র স্কুল-কলেজ থেকে বিতাড়িত হলেন এবং অনেকে কারাবরণ করলেন।

অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলে ছাত্র আন্দোলনও একটু ঝিমিয়ে পড়ে, তথাপি ১৯২৪ সালে ক্যালকাটা স্টুডেণ্টস এসোসিয়েশন নামে একটি ছাত্র সংগঠন গড়ে ওঠে। জেলায় জেলায় এবং কলেজে কলেজেও কিছু ছাত্র সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। হাওড়া জেলায় ১৯২৬ সালে 'ছাত্র সমিতি' গঠিত হয় যার প্রথম সভাপতি ছিলেন মধ্য হাওড়ার কৃষ্ণ কুমার চট্টোপাধ্যায় (প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ)। ১৯২৮ সালে ৩রা ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের এক স্মরণীয় দিন। সেদিন 'সাইমন কমিশন' ভারতে এলে প্রতিবাদে ছাত্র ধর্মঘট ডাকা হয়। ধর্মঘটের প্রধান নেতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক প্রমোদ ঘোষাল পুলিশের লাঠিতে গুরুতর আহত হন। তার প্রতিবাদে ১৭ই ফেব্রুয়ারী কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে এক স্মরণীয় ছাত্র সমাবেশ ডাকা হয়। এই সমাবেশ পরাধীন ভারতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—কারণ সেদিন সরকারী বেথুন কলেজের ছাত্রীরা প্রথম সমাবেশে যোগদান করেছিলেন। ইংরেজ সরকার প্রমোদবাবু ও স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্রনেতা শচীন্দ্র নাথ মিত্রকে কলেজ থেকে বিতাড়িত করেন! প্রেসিডেন্সী কলেজ কর্তৃপক্ষ হিন্দু হোস্টেল বন্ধ করে দিল। সুভাষ চন্দ্র হিন্দু হোস্টেলের ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা করেন ১২১/এ বহুবাজার স্ট্রীটের বাড়ীতে।[১]

ইংরেজ সরকারের এই দমননীতির বিরুদ্ধে কলকাতা স্টুডেণ্ট এসোসিয়েশনের কার্যকরী সমিতির সদস্য যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্র বীরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত, জগদীশ চ্যাটার্জী, প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রমোদবাবুর সতীর্থ অমর রায় ও স্কটিশ চার্চ কলেজের স্টুডেণ্টস ইউনিয়নের সভাপতি শচীন্দ্রনাথ মিত্র (সাসপেণ্ডেড ছাত্র) প্রভৃতি সকলে মিলে ঠিক করে যে অল বেঙ্গল স্টুডেণ্টস এসোসিয়েশন নামে

(A. B. S. A.) একটি ছাত্র সংস্থা গঠন করা হবে।[৫] উল্লেখ্য, বীরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্তের নেতৃত্বে এবং সুশীল দেবের সম্পাদনায় তখন 'ছাত্র' নামে একটা বাংলা পত্রিকাও ছাত্ররা প্রকাশ করতো।[৬] প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯২৮ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী কলেজ স্ট্রীটের এলবার্ট হলে (বর্তমান কফি হাউস) অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে এক ছাত্রসভা হয়। তাতে প্রমোদ ঘোষাল, বীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ও শচীন্দ্রনাথ মিত্রকে আহ্বায়ক করে এক কমিটি গঠন করা হয়। পরে আরও কিছু কলেজের ছাত্র প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সেণ্ট্রাল কাউন্সিল গঠন করা হয়।

এই কমিটির নেতৃস্থানীয় সদস্যের মধ্যে ছিলেন হাওড়া বালির রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (হাইকোর্টের বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী), মধ্য হাওড়ার কৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায় (প্রাক্তন কং সাংসদ)। যথারীতি ১৯২৮ সালে সেপ্টেম্বর মাসে (২২-২৫ সেপ্টেঃ) পর্যন্ত মির্জাপুর স্কোয়ারে (বর্তমান শ্রদ্ধানন্দ পার্কে) তদানীন্তন যুব সমাজের 'দুই হীরো' পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও সুভাষ চন্দ্র বসু—যথাক্রমে সভাপতি ও উদ্বোধক হিসাবে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। গঠিত হল 'অল বেঙ্গল স্টুডেণ্টস এসোসিয়েশন (এ. বি. এস. এ)। সংগঠনের সভাপতি হলেন প্রমোদ ঘোষাল ও সম্পাদক বীরেন দাশগুপ্ত। প্রমোদবাবু সম্বন্ধে রণজিৎ বাবু স্মৃতিচারণ করে বলেন—'প্রমোদ থাকতো কলেজ স্ট্রীট পাড়ায়। খুব প্রতিভাবান ছাত্র ছিল—আই. এস. সি পরীক্ষায় সে অসাধারণ ফল (সম্ভবত প্রথম) করেছিল।* শচীন মিত্রও স্কটিশের খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন! আর আমি (রণজিৎবাবু) বালির ছেলে হলেও পড়ি 'সেণ্ট পলস্ কলেজে।' বলা বাহুল্য, এই সম্মেলন বাংলার ছাত্রদের মধ্যে এক নূতন রাজনৈতিক চিন্তার সঞ্চার করেছিল।

কিন্তু পরবর্তী বছরেই অর্থাৎ ১৯২৯ সালে সেপ্টেম্বরে দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ সদ্য প্রতিষ্ঠিত ছাত্র সংগঠনটি দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল—যথা অল বেঙ্গল স্টুডেণ্টস এসোসিয়েশন (এ. বি. এস. এ) এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র এসোসিয়েশন (বি. পি. এস. এ)। আরও স্পষ্ট করে বলতে পারা যায় এ. বি. এস. এ. ছিল দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সমর্থক আর বিক্ষুব্ধ দলটি অর্থাৎ বি. পি. এস. এ. ছিল সুভাষ চন্দ্র বসুর সমর্থক।

হাওড়ার ছাত্রনেতারা কিন্তু এ. বি. এস. এ-এর সঙ্গেই প্রথম থেকে যুক্ত ছিলেন। ১৯২৯ সালে জুলাই মাসে বালির 'রিভার টমসন' স্কুলে (বর্তমান শান্তিরাম হাই) হাওড়া জেলার প্রথম ছাত্র সম্মেলন করা হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত। রণজিৎবাবু নিজেই আমাকে এক সাক্ষাৎকারে জানান[৪]—দুদিন ব্যাপী এই সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছাত্র প্রতিনিধিরা যোগদান করেছিলেন। সম্মেলন উপলক্ষ্যে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়েছিল —যার মূল সভাপতি ছিলেন—কৃষ্ণ কুমার চট্টোপাধ্যায় (প্রাঃ সাংসদ), সম্পাদক ছিলেন রামকৃষ্ণপুরের—রবীন্দ্রলাল সিংহ (প্রাঃ শিক্ষামন্ত্রী পঃ বঃ) ও অর্গানাইজিং

* আট দশক-এ ভবতোষ দত্ত লিখছেন—প্রমোদ ঘোষাল প্রথম হয়েছিলেন।

সেক্রেটারী ছিলেন বালির সীতাংশু কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন স্বয়ং রণজিৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৩০ সালে গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে রণজিৎবাবু হাওড়ায় প্রথম এবং নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতির (এ. বি. এস. এ) সভাপতিরূপে কৃষ্ণকুমারও কারাবরণ করেন। পরে গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। আন্দোলনে বহু ছাত্রনেতাও কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। গান্ধীজী বড়লাট লর্ড আরউইনের কাছে বিপ্লবীর ভগৎ সিং প্রমুখের ফাঁসীর আদেশ মকুব করার আবেদন জানালেও উহা অগ্রাহ্য হয়। অবশ্য অনেকেই আবার জেল থেকে মুক্তিও পান। গান্ধী আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল ৫ই মার্চ ১৯৩১ সাল। তারপরেই ৬—৭ মার্চ উত্তর কলকাতার বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাড়িতে নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতির সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন কবি হারীন চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়। সম্মেলনে ছাত্র প্রতিনিধিরা গান্ধী-আরউইন চুক্তির সমর্থনে দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদলের মতে উক্ত চুক্তি দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা—অপরপক্ষ মনে করে ভবিষ্যৎ দেশের বৃহত্তর স্বার্থেই উহা করা হয়েছে। সুতরাং এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানানোও সম্মেলনের উচিত। হাওড়াবাসীর কাছে যেটা বেশী উল্লেখ্য তা হচ্ছে এই ছাত্রসমিতির সহসভাপতি তখন ছিলেন বালির রণজিৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সহসভাপতি হিসাবে তিনিই নিজে উক্ত চুক্তির সমর্থনে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সর্বসম্মত না হলেও বাদানুবাদের পর প্রস্তাবটি ভোটাধিক্যে পাস হয়ে যায়।[৫]

এরপর ছাত্র আন্দোলনের নেতারা কেউ কেউ বিপ্লবীদের সঙ্গেও ইংরেজ বিতাড়ণে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৯৩৪ সালের ৮ই মে দার্জিলিং-এর লেবং রেস কোর্সে গভর্নর স্যার জন এ্যাণ্ডারসনকে বিপ্লবীরা গুলি করে হত্যা করার বিফল চেষ্টা করেন। প্রধান আসামী হিসাবে চিহ্নিত করা হয় ভবানী ভট্টাচার্য ও রবীন্দ্র ব্যানার্জীকে। সাহায্যকারী প্রধান হিসেবে ছিলেন উজ্জ্বলা মজুমদার (রক্ষিত রায়) প্রমুখ। ইতিহাসে ইহাই 'লেবং শুটিং কেস' নামে বিখ্যাত। বিচারে ভবানী ও রবীন্দ্রকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তরুণী উজ্জ্বলা মজুমদারকে দেওয়া হয় ১৪ বছরের কারাদণ্ড। রবীন্দ্রের মৃত্যুদণ্ড অবশ্য পরে রদ হয়েছিল।[৬]

কিন্তু এক্ষেত্রে যেটা অজানা ছিল সেটা বালির রণজিৎবাবু লেখককে সাক্ষাৎকারে জানান যে লেবং কেসে যুক্ত থাকার অভিযোগে অনেকের সঙ্গে পুলিশ তাঁকেও গ্রেপ্তার করে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে হাজির করে। তাতে তাঁর কয়েক দিনের কারাবাস হয়। রণজিৎবাবু আরও বলেন যে অপর এক ছাত্রনেতা অশোক চন্দ্র সেনকে হোম ইনটার্ণ করে রাখা হয়েছিল। এই অশোক চন্দ্র সেনই ছিলেন তদানীন্তন প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রতিভাবান ছাত্র। পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় একাধিকবার মন্ত্রী হন।

রণজিৎবাবুর বক্তব্যও সমর্থিত হতে দেখা যায় ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের লেখা থেকে।[৭] তিনিও লিখছেন—লেবং শুটিং-এর রাজনৈতিক গুরুত্ব অত্যধিক।

স্যার জন এ্যান্ডারসন কঠিন শাসক 'ব্ল্যাক এন্ড ট্যান' নীতির জনক। মহাশক্তিশালী বলে অভিহিত ওকে শায়েস্তা করতে হবে। ওঁর আমলে গ্রামে গ্রামে গুন্ডা বদমায়েস দিয়ে "ভিলেজ গার্ড" বা গ্রামরক্ষী বাহিনী গড়া হল। এই সময়েই নজরুল তাঁর 'বিদ্রোহী' কাব্য রচনা করেন। ১৯৩২ সালে অশোক সেন (প্রাঃ মন্ত্রী) (পিতা অক্ষয় কুমার সেন) কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে I. Sc. পড়ে। অশোক সেনের আদি বাড়ি ছিল টিকাটুলি অঞ্চলে ঢাকা শহরে। অশোক সেন কিশোর বয়সে তাঁর দাদা সুকুমার সেনের (আই. সি. এস.) রিভলভার চুরি করে বিপ্লবীদের দিয়েছিলেন। বিপ্লবীবন্ধু ও সতীর্থ বকুল দাসগুপ্তের হাতে তুলে দেয়।' ভূপেন্দ্রবাবুর লেখায় পার্শ্বচরিত্র বলেই হয়তো রণজিৎবাবুর নামটি বাদ পড়ে গেছে। বাকী সবই ঠিক আছে। সুতরাং তাঁর বক্তব্যকে নেহাত আত্মপ্রচার বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। রণজিৎবাবুর সঙ্গে এই সময় বালির যাঁরা ছাত্র আন্দোলনে সামনের সারিতে ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বালি উত্তরপাড়ার স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পতিতপাবন পাঠক (প্রাক্তন মন্ত্রী)। এঁরা দু'জনেই কম্যুনিষ্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু স্মৃতীশবাবু পরে কংগ্রেসে যোগদান করেন। পতিতপাবন পাঠক অদ্যাবধি নিজ আদর্শের প্রতিই আস্থাশীল হয়ে আছেন। রণজিৎবাবুর সঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের আর এক সক্রিয় সহযোদ্ধা ছিলেন শালকিয়ার শংকরলাল মুখোপাধ্যায় (প্রাঃ কংগ্রেস বিধায়ক)। এখানে মনে রাখা যেতে পারে যে রণজিৎবাবুরা এ. বি. এস. এ-এর অর্থাৎ যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তেরই সমর্থক ছিলেন।

কৃষ্ণ কুমার চট্টোপাধ্যায় হাওড়া তথা বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের প্রথম সারির নেতাদের অন্যতম ছিলেন। প্রথমে তিনি এ. বি. এস. এ-এর সর্বোচ্চ পদে থাকলেও পরে তিনি সুভাষপন্থী বি. পি. এস. এ-এর সঙ্গে যুক্ত হন। কারণ পরে তিনি সুভাষ চন্দ্রের খুব কাছে এসে যান। তিরিশের দশকের প্রথমার্দ্ধে কৃষ্ণকুমারের চেষ্টায় হাওড়া জেলায় এ. বি. এস. এ-এর সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদকরূপে নির্বাচিত হন তদানীন্তন কংগ্রেসের ছাত্রনেতা সমর মুখার্জী। অপর পক্ষে সুভাষপন্থী ছাত্রনেতা ছিলেন মধ্য হাওড়ার বিনয় রায় (প্রাঃ কাউন্সিলার)। পরে অবশ্য কৃষ্ণকুমারের সঙ্গে সমরবাবুও সুভাষপন্থী ছাত্র সংগঠনে যোগ দেন। বিনয় রায় বলেন—সালটা সঠিক মনে নেই—হাওড়া টাউন হলে ঐ সম্মেলন উদ্বোধন করেন স্বয়ং রাষ্ট্রপতি সুভাষ চন্দ্র বসু (তখন কংগ্রেস সভাপতিকে রাষ্ট্রপতি বলা হত)। আসলে ঐ সালটি ছিল ১৯৩৮ সাল। "১৯৩৮ সালে হাওড়া টাউন হলে শরৎ বসুর সভাপতিত্বে বি. পি. এস. এ-এর জেলা ছাত্র সম্মেলন হল। রাষ্ট্রপতি সুভাষ চন্দ্র উহা উদ্বোধন করেন। এই সম্মেলনে জেলা ছাত্র সংগঠনের নতুন করে নামকরণ হয় 'হাওড়া জেলা ছাত্র ফেডারেশন'। এই নবগঠিত কমিটির সভাপতি হন আমতা থানা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক সমর মুখার্জী ও সাধারণ সম্পাদক হন বিনয় রায়।"[৮] এঁরা উভয়েই পরে কম্যুনিষ্ট দলে যোগ দেন। বিনয় রায় লেখককে বলেন—শরৎ বসু ও হুমায়ুন কবীর সারাদিন সেদিন 'টাউন হলেই' ছিলেন। কৃষ্ণকুমারের সঙ্গে মধ্য হাওড়ার ছাত্র-

নেতা সুহৃদ বিশ্বাস ও সুজন সরকার প্রথমে সেনগুপ্ত পন্থী থাকলেও এঁরাও পরে সুভাষ চন্দ্রের ফরওয়ার্ড ব্লকেই যোগ দেন। মনে রাখতে হবে, এ. বি. এস. এ-র শেষ সভাপতি ছিলেন (১৯৩৬) হাওড়ার বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা রবীন্দ্র লাল সিংহ। এতো গেল হাওড়ার কথা।

কিন্তু ইতিপূর্বেই (১৯৩৬ সালে) লক্ষ্ণৌতে 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন' (AISF) নামে একটি সর্বভারতীয় ছাত্র সংগঠন গঠিত হয়। এই সম্মেলন উপলক্ষ্যে কলকাতায় একটি প্রস্তুতি কমিটি তৈরী হয়। ঐ কমিটির বিশিষ্ট সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ছাত্রনেতা বিশ্বনাথ মুখাজী (প্রাঃ মন্ত্রী), হাওড়ার আলোকদূত দাস (প্রাঃ মেয়র), হিমাংশু সিংহ (গাজীপুর—উঃ প্রদেশ), নন্দলাল বসু, বিশ্বনাথ দুবে (শ্রমিক নেতা), আব্দুল ফারুকি (দিল্লীর কংগ্রেস নেতা) প্রমুখ। এই কমিটির সভা হয় এলবার্ট হলে (বর্তমান কফি হাউস)। লক্ষ্ণৌতে ঐ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন পণ্ডিত জহরলাল নেহরু। সেই বছরই অক্টোবর মাসে কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন (B. P. S. F.) নামে প্রাদেশিক স্তরে ছাত্র সংগঠন তৈরী হল—যার সভাপতি ও সম্পাদক হলেন যথাক্রমে কে. এম. আহমেদ ও কালীপদ মুখাজী (প্রাঃ মন্ত্রী)। পরের বছরই নির্বাচনে কম্যুনিষ্ট ছাত্রনেতা বিশ্বনাথ মুখাজী উহার সম্পাদক হন। এমনকি সংগঠনটি তাঁদের দলের হাতেই প্রায় চলে যায়। কারণ জাতীয়তাবাদী সমস্ত ছাত্রনেতারাই তখন ইংরেজের কারাগারে বন্দী। হাওড়ার আলোকদূত দাস ছিলেন কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজের একজন নামী ছাত্রনেতা। তাঁরই নেতৃত্বে ঐ কলেজের ছাত্ররা চলে। প্রখ্যাত অধ্যাপক ডঃ ভবতোষ দত্তের একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হল*—বর্দ্ধমান ছেড়ে রিপনে আসি ১৯৩৫-এ। আগের বছর আসেন নন্দলাল ঘোষ, বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত। আমার সঙ্গে আসেন বিষ্ণু দে। দুই এক বছরের মধ্যে হীরেন মুখাজী, প্রমথ বিশী, বিমলা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলেজে তখন প্রায়ই স্ট্রাইক হতো—সপ্তাহে ক্লাসের বোঝা এত বেশী ছিল এবং প্রত্যেক ক্লাসে হ্যারিসন রোডের ট্রামবাসের আওয়াজ, আর নীচে বৈঠকখানা বাজারের গোলমাল ছাপিয়ে এত চীৎকার করতে হত যে এক-আধটা স্ট্রাইক হলে খুশিই হতাম। স্ট্রাইকটা আমাদের বিরুদ্ধে না হলেই হল। তখনকার স্ট্রাইকের একজন বড় নেতা এখন হাওড়া কর্পোরেশনের মেয়র—আলোকদূত দাস। শুধু তাই নয় পরবর্তী সময়ে সুভাষচন্দ্রের 'হলওয়েল মুভমেণ্টে'ও ছাত্রদের নিয়ে বিশেষ করে প্রেসিডেন্সী ও ইসলামিয়া (বর্তমান সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা) কলেজের ছাত্রদের নিয়ে সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন। তখনও তিনি কংগ্রেসের মধ্যেই ছিলেন। ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র ইংরেজ পুলিশের গুলিতে বিদ্ধ হওয়ায় ছাত্ররা পুলিশের উপর আক্রমণ করে জনৈক পদস্থ পুলিশ অফিসারকে হত্যা করে। মুসলিম ছাত্রদের উপর গুলি চালনার ব্যাপারে তদানীন্তন বঙ্গদেশের প্রধানমন্ত্রী (তখন এই নামেই বলা হত) ফজলে হক ভীষণ ক্ষুব্ধ হন। তারপরই উহা স্থানচ্যুত করা হয়।

দেখতে দেখতেই ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগে গেল। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে প্রথমে জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে কম্যুনিষ্ট পার্টিও ইংরেজ বিরোধী আওয়াজ তোলেন। কিন্তু পরেই সুভাষ চন্দ্রের ফরওয়ার্ড ব্লক, আর. এস. পি, কংগ্রেস ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী দলের সঙ্গে কম্যুনিষ্ট পার্টির ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের পথে বিভেদ সৃষ্টি হয়। সুতরাং ছাত্র সংগঠনেও তার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ১৯৪০ সালে নাগপুরে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন দ্বিধাবিভক্ত হল। বাংলাদেশে কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রী অংশের ছাত্ররা বি. পি. এস. এফ (মির্জাপুর স্ট্রীট ছাত্র ফেডারেশন) ঐ ঠিকানায় কাজ চালাতে থাকে। এতদিন কম্যুনিষ্ট পার্টি যুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে থাকায় নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনও একই পথের সমর্থক ছিল। কিন্তু ১৯৪১ সালে হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করায় 'জনযুদ্ধে'র আওয়াজ তুলে তারা যুদ্ধের পক্ষে তথা ইংরেজ ও সোভিয়েতের জয়গান শুরু করল। শুধু তাই নয়, ১৯৪২ সালের আগস্ট বিপ্লবে যখন সারা ভারতের ছাত্রসমাজ ইংরেজ বিতাড়নের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তখন ছাত্র ফেডারেশনের অধিকাংশ সদস্য পার্টির নির্দেশে নীরব দর্শক কোথাও বা বিদেশী শক্তির জয়গানে মুখর হয়ে উঠে। কারণ আগস্ট বিপ্লবের পূর্বেই ইংরেজ কম্যুনিষ্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। ফলে ছাত্রসমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একদিকে কম্যুনিষ্ট ছাত্র ফেডারেশন ও অপর দিকে সমাজতান্ত্রিক কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক ও বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দলের জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংগঠনগুলি কাজ করতে লাগল।

১৯৪৫ সালের আগস্টের মাঝামাঝি বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়। ইংরেজ যুদ্ধে জয়ী হয়ে যুদ্ধবন্দী হিসাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের তিন সেনানায়ক যথা—শাহ নওয়াজ, ধীলন ও সায়গলের বিচারের ব্যবস্থা শুরু করল দিল্লীর লালকেল্লায়। আজাদ হিন্দ ফৌজের এই তিন বীর সেনানায়কদের মুক্তির জন্য জাতীয় কংগ্রেস দেশব্যাপী আন্দোলনের ডাক দেয়। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সেদিন ব্যারিষ্টারী গাউন পরে যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির জন্য লালকেল্লার আদালতে সওয়াল করেন—সঙ্গে ছিলেন প্রবীণ কংগ্রেস আইনজীবী ভুলাভাই দেশাই। ইংরেজের এই বিচারের চক্রান্তের বিরুদ্ধে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মত বাংলাদেশেও ছাত্র ধর্মঘট ও প্রতিবাদ দিবস পালনের ডাক দেন ছাত্র কংগ্রেস ও মির্জাপুরের ছাত্র ফেডারেশন। ছাত্র শোভাযাত্রা এগিয়ে ধর্মতলা স্ট্রীটের ওপর এলে ইংরেজ পুলিশ বিকেলবেলায় গুলি চালায়। গুলিতে ছাত্র রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এ ছাড়া আরও কয়েকজন আহত হয়। সেদিনটি ছিল ২১ নভেম্বর ১৯৪৫ সাল। পরদিন কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কম্যুনিষ্ট পার্টি একসঙ্গে বিরাট প্রতিবাদ সভার ব্যবস্থা করেছিল।

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র আজাদ হিন্দ ফৌজে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তাতে মুসলীম লীগের নেতৃবৃন্দের ঈর্ষার উদ্রেক করেছিল—এমনকি

জাতীয় কংগ্রেসও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে স্বপ্ন দেখতেন তার বাস্তবরূপ পেয়েছিল নেতাজীর হাতে। মুসলীম লীগ আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানায়কদের মুক্তি আন্দোলনে মুসলিম যুবকদের যোগদান আটকে রাখতে পারছিল না। তাই বাধ্য হয়ে কেবল একজন মুসলিম অফিসারের মুক্তির জন্য ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬ সালে এক ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেয়। এই দিনটিই 'রসিদ আলী মুক্তি দিবস' নামে ছাত্র আন্দোলনে চিহ্নিত হয়ে আছে। মূলত মুসলিম ছাত্রলীগ এই দিবস পালনের ডাক দেয়। কিন্তু 'জনযুদ্ধের' তত্ত্ব প্রচার করতে গিয়ে কম্যুনিষ্ট ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষে ঐ আন্দোলনে যোগদান করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। বিখ্যাত রাজনৈতিক সাংবাদিক শংকর ঘোষ তাঁর প্রবন্ধে লিখছেন—আজাদ হিন্দ ফৌজের সাম্প্রদায়িক ঐক্য মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবির পরিপন্থী ছিল। তাই মুসলিম লীগ প্রথমে এই আন্দোলনকে সমর্থন করেনি। কিন্তু লীগের নীরবতা সত্ত্বেও মুসলিম যুবছাত্ররা এই আন্দোলনে সোৎসাহে যোগ দিতে শুরু করেন। লীগ তখন বাধ্য হয়েই এই আন্দোলনে যোগ দেয়। তবে লীগের আন্দোলন যে হিন্দু ও শিখ অফিসারদের মুক্তির জন্য নয় তা বোঝানোর জন্য লীগ কেবল একজন মুসলিম অফিসারের মুক্তি দাবি করে ক্যাপ্টেন রশিদ আলি দিবস পালনের ডাক দিয়েছিল। জনযুদ্ধ তত্ত্বের জন্য মিত্রশক্তিকে সমর্থন করার পর কম্যুনিষ্টরা যুদ্ধাবসানে জাতীয় রাজনীতির মূলস্রোতে ফিরে আসার চেষ্টা করছিল। তাই তারাও কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পতাকার সঙ্গে লাল পতাকা বেঁধে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল।[১০] কারণ সেই সময়ে তারা ছাত্রসমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ঐ দিন কলকাতায় ছাত্র ধর্মঘটের সঙ্গে শ্রমিকরাও প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। ইংরেজ পুলিশের গুলিতে ছাত্র এবং সাধারণ মানুষও প্রাণ হারায়। মনে রাখতে হবে, ইংরেজ বিচারালয়ে রসিদ আলীরও···যুদ্ধ বন্দী হিসাবে কারাদণ্ড হয়। এইভাবে ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে জাতীয় রোষ তখন তুঙ্গে। এর পরই বোম্বাইতে নৌবিদ্রোহ (১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬), রাজবন্দীদের মুক্তি চাই (২৪ জুলাই ১৯৪৬) ও ডাক-তার ধর্মঘট (২৯শে জুলাই ১৯৪৬) প্রভৃতি আন্দোলনের সমর্থনে সর্বস্তরের ছাত্র সমাজ ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপরই ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব ও স্বাধীনতা লাভ।

অবশেষে দেশ স্বাধীন হল। ১৯৩৬ সাল থেকে ভারতের ছাত্রসমাজ 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন' (A I S F) মঞ্চ থেকে সর্বভারতীয় স্তরে এবং বঙ্গদেশে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের' (B P S F) পতাকা তলে প্রধানত ইংরেজ বিতাড়নে ও ছাত্র স্বার্থে লড়াই চালিয়ে আসছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিত্র শক্তি ও অক্ষ শক্তির তাত্ত্বিক মূল্যায়নে বঙ্গদেশেও ছাত্র সমাজ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ দুটি ভাগ হচ্ছে—বি. পি. এস. এফ (প্রধানত কম্যুনিষ্ট পার্টির দখলে) অপরটি হচ্ছে বি. পি. এস. এফ (মির্জাপুর স্ট্রীট) এই নামে। শেষোক্ত সংগঠনে ছিল প্রধানত আর. এস. পি. ফরওয়ার্ড ব্লক, আর. সি. পি.

আই. বলশেভিক পার্টি (স্ট্রসকী পন্থী) ও জাতীয়তাবাদী ছাত্ররা। পরে এটিও দ্বিধাবিভক্ত হয় আর. এস. পি. ছাড়া অপর সকলে 'ছাত্র কংগ্রেস' নামে ১/১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট (বর্তমান বিধান সরণী) থেকে কাজ চালাতে থাকে।

১৯৪৬ সালে বর্দ্ধমানের 'উইল বাড়ি'তে ছাত্র কংগ্রেসের এক সম্মেলন হয়। তাতে সভাপতিত্ব করেন নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র অরবিন্দ বসু। ভাষণ দেন বিখ্যাত সৌম্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর, সিংহলের বলশেভিক নেতা কর্ণেল ডিসিলভা, বিশ্বনাথ দুবে, জেড এইচ, খান (উভয়েই বলশেভিক) ও মথুরা মিশ্র (ফরওয়ার্ড ব্লক)। হাওড়া থেকে ছাত্র নেতাদের মধ্যে ছিলেন কানাইলাল ভট্টাচার্য, (প্রাঃ মন্ত্রী), অনিল মুখার্জী, নারায়ণ মিত্র, সুকুমার মণ্ডল ও দিলীপ দে (উভয়েই শালিখার)। পরে অবশ্য সুকুমার মণ্ডল ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য কমিটির সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৪৮ সালে ফরওয়ার্ড ব্লক আবার দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়—যথা মার্কস-বাদী ও সুভাষবাদী। 'ছাত্র ব্লক' নামে ফরওয়ার্ড ব্লকের একটি ছাত্র শাখাও তৈরী হল।

স্বাধীনতা লাভের আগে বিদ্যালয়ের নবম-দশম শ্রেণীর ছাত্ররাই সেকালে স্বাধীনতা সংগ্রামে দলে দলে সক্রিয়ভাবে অংশ নিত। কারণ সে সময়ে কলেজের সংখ্যা ছিল খুবই সীমিত। হাওড়া জেলায় তখন একমাত্র কলেজ ছিল নরসিংহ দত্ত কলেজ। তার মধ্যে আবার অধিকাংশ ছাত্রই কলকাতার কলেজে পড়াশুনা করাটা বেশী পছন্দ করতো। দেশ স্বাধীন হবার অব্যবহিত পরে তেলেঙ্গানা, কাকদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে উগ্রপন্থী কাজের জন্য সরকার কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করেন (১৯৪৮)। এর আগে হাওড়া জেলায় বি. পি. এস. এফ-কে যাঁরা গড়ে তুলেছেন তাঁদের মধ্যে প্রধান নেতা ছিলেন শিবপুরের জ্ঞানব্রত চক্রবর্তী ও গোবিন্দ কাঁড়ার। পরে শ্রীচক্রবর্তী অবশ্য কৃষক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করে জীবনদান করেন। মূলপার্টি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ায় তার শাখা সংগঠনও বে-আইনী হয়ে যায়। তাই পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্য তখন ডি. এস. ও. নাম নিয়ে ছাত্র সংগঠন কাজ করতে থাকে। মনে রাখা ভাল যে ডি. এস. ও. নামে বর্তমানে অন্য একটি দলের ছাত্র সংগঠন আছে। ঐ সংগঠনের কাজ তখন চলতো 'সন্ধ্যা বাজারের' কাছে 'বার্ণ শ্রমিক ইউনিয়ন অফিসে'র দোতলায়। ঐ সংগঠনের তখন রাজ্যসম্পাদক পর্যন্ত ছিলেন হাওড়া-শিবপুরের ছাত্র গোবিন্দ ব্যানার্জী। ঐ সময়ে আমতা গ্রামের বিজয় ঘোষ আর এক ছাত্র নেতা ছিলেন।

অবশ্য ১৯৫১ সালে সরকারী নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে আবার পূর্বের নামেই ছাত্র আন্দোলন করার সুযোগ হাতে এসে গেল। সুযোগটি হচ্ছে এই যে ১৯৫০-৫১-তে তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সরকার স্বাধীনোত্তর বঙ্গের স্কুলস্তরের শিক্ষা সংস্কারসাধনে (স্কুল কোড নামে) কিছু পদক্ষেপ নেবার সুপারিশ করেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—স্কুল কমিটিগুলিতে একজন সরকারী প্রতিনিধি নেওয়া, নিয়মিত স্কুল পরিদর্শনের ব্যবস্থা ও শিক্ষাদানের ব্যাপারে শিক্ষকদের যোগ্যতার বিচার করা, নিয়মিত হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থা, ছাত্রদের স্কুল

ভর্তি ও ছাড়ার ব্যাপারে কিছু বাধানিষেধ আরোপ করা ইত্যাদি। বি. পি. এস. এফ সহ অন্যান্য বামপন্থী দলের ছাত্র সংগঠনগুলি সেদিন শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীকার হরণ ও গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করার অভিযোগে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুললেন। ফলে ছাত্রদের মধ্যে বেশ অস্থিরতা দেখা দেয়। সেই সময়ে হাওড়া জেলার বি. পি. এস. এফ, এ-র নেতাদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন সত্যজিৎ দাশগুপ্ত (নিমু), অম্বিকা কুণ্ডু, দ্বারিকা কুণ্ডু ও রবীন মুখার্জী (সকলেই শিবপুরের)। পরবর্তীকালে সত্যজিৎবাবু হাওড়া কোর্টের নামী ব্যবহারজীবী হন এবং অম্বিকাবাবু হন কলকাতার একটি কলেজের অধ্যাপক। কালের পরিহাস এমনই যাঁরা সেদিন ঐ সামান্য সরকারী বাধানিষেধের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীকার হরণের কালো মেঘের আগমন বার্তা শুনে শিউরে উঠেছিলেন আজ শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বগ্রাসী সরকারী হস্তক্ষেপের কোন সীমারেখা আছে কি ?

হাওড়া জেলায় ছাত্র আন্দোলনের গোড়াঘর ছিল নরসিংহ দত্ত কলেজ। কারণ তখন জেলার মধ্যে ঐ একটিই কলেজ ছিল। কম্যুনিষ্ট পার্টির ছাত্র শাখার বিরুদ্ধে তখন জেলায় অন্য কোন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠন ছিল না। তবে অন্যান্য মতাবলম্বী ছাত্ররা মিলে তখন নরসিংহ দত্ত কলেজে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছিল যার নাম ছিল 'ইনডিপেণ্ডেণ্ট স্টুডেণ্টস ইউনিয়ন' সংক্ষেপে আই. এস. ইউ। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত এই কলেজে বি. পি. এস. এফ. কলেজ নির্বাচনে দাঁড়ালেও আই. এস. ইউ-র প্রার্থীদের কাছে পরাজিত হয়ে যেত। আই. এস. ইউ-র নেতারা বিভিন্ন দলমতের হলেও তাঁরা কলেজে বিশেষ কোন মতবাদের প্রবক্তা না হয়ে ছাত্র স্বার্থবিষয়ক সমস্যাদি নিরসনেই বেশী আগ্রহী ছিলেন।

এতৎসত্ত্বেও ১৯৫৩/৫৪ সালে বি. পি. এস. এফ প্রথম এই কলেজে ছাত্র ইউনিয়ন লাভ করে। বিজয়ীদের মধ্যে ছিলেন অনুপম ঘোষ, সুনীল সেন রায়, শ্যামাপ্রসাদ দত্ত ও পঞ্চানন রায়। এঁদের মধ্যে অনুপমবাবু (আসানসোলের ছেলে) তখন জেলা ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদকও হয়েছিলেন। আর শ্যামাপদবাবু (শিবপুর) পরে চিকিৎসক হয়ে আজও উক্ত পেশায় রত আছেন। এই সময়ে নরসিংহ দত্ত কলেজের নবীন অধ্যাপক হরিপদ ভারতী প্রথম জীবনে কম্যুনিষ্ট পার্টির সমর্থকরূপে কলেজে দলীয় ছাত্রদের পেছন থেকে খুবই উৎসাহ জুগিয়েছিলেন। প্রায় ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত ঐ কলেজের ইউনিয়ন ছাত্র ফেডারেশনের দখলেই ছিল।

আবার ১৯৫৮-৫৯ সাল থেকে এই কলেজের ইউনিয়ন আই. এস. ইউ-র দখলে যায়। এই সময় যাঁরা নেতা ছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন প্রসাদ ভট্টাচার্য, মানস মুখার্জী ও পুলিন সাহা। এঁদের মধ্যে প্রসাদবাবু ডক্টরেট করে **Superintendent of Customs (Preventive) W. B.** এই গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন আছেন। আর পুলিনবাবুর অকালমৃত্যু হলেও তিনি **Post & Telegraph FNPTO Class 3 Employees** ইউনিয়নের পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক ও সর্বভারতীয় কার্যকরী কমিটির প্রথম সারির নেতা ছিলেন। ভারতীয় প্রতিনিধি

হিসাবে বিদেশে একাধিকবার কর্মীদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এঁদের নেতৃত্ব কলেজে থাকতেই অপর এক ছাত্রনেতা ঐ কলেজে পড়তে আসেন। তাঁর নাম অমর ঘোষ। এঁর নেতৃত্বে আরও কয়েক বছর (১৯৬৩-৬৪) পর্যন্ত আই. এস. ইউ ইউনিয়ন চালায়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯৫৪ সালে 'ছাত্র পরিষদ' গঠিত হলেও হাওড়া জেলায় তখনও ঐ নামে না চলে আই. এস. ইউ-র পতাকাতলেই কলেজের ইউনিয়নগুলি চলতো। অমর ঘোষই ছিলেন হাওড়া জেলার প্রথম 'ছাত্র পরিষদে'র সাধারণ সম্পাদক। অমরবাবুর নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি নিজে উঁচু পদে না গিয়ে ভাল ভাল ছেলে ধরে 'ছাত্র পরিষদে'র সাধারণ সম্পাদক করতেন। বর্তমানে তিনিও কলকাতার স্টেট ব্যাঙ্কের ইউনিয়নের নেতৃপদে পেশার খাতিরেই আসীন আছেন। অমরবাবু ছিলেন মধ্য হাওড়ার পঞ্চাননতলার বাসিন্দা। এখানে একটি বিষয় স্মরণ রাখার মত যে অধ্যাপক হরিপদ ভারতী প্রথম জীবনে কম্যুনিষ্ট ভাবাদর্শের সমর্থক থাকলেও পরে তিনি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'জনসঙ্ঘ' দলের নেতৃপদে আসীন হন এবং তাঁরই উৎসাহে নরসিংহ ও দীনবন্ধু কলেজে 'বিদ্যার্থী পরিষদ' নামে ছাত্র শাখা সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়।

অন্যদিকে ১৯৫৪/৫৫ সাল নাগাদ শিবপুর বি. ই. কলেজে কাউসার আলি নামে এক মুশ্লিম ছাত্রনেতার নেতৃত্বে বি. পি. এস. এফ সেখানে ইউনিয়ন দখল করেছিলেন।

ইতিমধ্যে স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরেই শিবপুর দীনবন্ধু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি জেলার দ্বিতীয় কলেজ। প্রথমে সেখানে ছাত্র ইউনিয়ন করতে না দিলেও ১৯৫১ সালে প্রথম ইউনিয়নের নির্বাচন হয়। বি. পি. এস. এফ বনাম আই. এস. ইউ-র মধ্যে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় তাতে আই. এস. ইউ বিজয়ী হয়। প্রথমবার পরাজিত হলেও পরে কয়েক বছর পর পর বি. পি. এস. এফ ইউনিয়ন দখল রাখে। সেই সময় ঐ কলেজে উল্লেখ্য ছাত্র নেতাদের মধ্যে ছিলেন শচীন মুখার্জী ও সরল সেন। শচীনবাবু ও সরল সেন যথাক্রমে তখন জেলা সভাপতি ও সম্পাদক বছর দু'য়েক পর্যায়ক্রমে হন। ষাটের দশকের প্রথমার্দ্ধে সুবিনয় ঘোষ জেলার ছাত্র সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬৪ সালে কম্যুনিষ্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হলে শ্রী ঘোষ সি পি আই (এম)-এর ছাত্র সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। আজ তিনি জেলা সংগঠনের একজন প্রথম সারির নেতা। হাওড়া কর্পোরেশনের মেয়র-ইন-কাউন্সিলের সদস্যও হন। আর সরল সেন বর্তমানে 'গণশক্তি' পত্রিকার আন্তর্জাতিক পাতার বিভাগীয় সম্পাদক ও পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য। হাওড়া কর্পোরেশনের মেয়র স্বদেশ চক্রবর্তীও কলকাতার কলেজে ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বে ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান কুটীর ও ক্ষুদ্রশিল্প মন্ত্রী প্রলয় তালুকদারও শিবপুর দীনবন্ধু কলেজে ছাত্রনেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে আজ মন্ত্রী পর্যায়ে উন্নীত হতে সক্ষম হয়েছেন। আর একদা জেলা সম্পাদক (১৯৬৩-৬৬) দীপক দাশগুপ্ত আজ জেলার পার্টির সাধারণ সম্পাদক হয়ে জেলাকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

অপরপক্ষে ছয়ের দশকের প্রথমার্দ্ধের শেষে 'ছাত্র পরিষদ' নাম নিয়ে শহর ও

গ্রামীণ কলেজগুলিতে আন্দোলন হতে থাকে। আগে যাঁরা জেলায় আই. এস. ইউ. করতেন তাঁদের অধিকাংশই ছাত্র পরিষদে যোগ দেন। শহরে উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে ছিলেন মৃগেন মুখার্জী (অধ্যাপক হন), অমর ঘোষ, অজয় ঘোষ, কৃষ্ণপদ রায় (প্রাঃ বিধায়ক), সমীর রায় (মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেসের অন্যতম নেতা), আর গ্রামাঞ্চলের ছাত্রনেতা ছিলেন আবতাবুদ্দিন মণ্ডল (প্রাঃ বিধায়ক), সুশান্ত (বাবলু) ভট্টাচার্য (প্রাঃবিধায়ক), সরোজ কাঁড়ার (প্রাঃ বিধায়ক), শিশির সেন (প্রাঃ বিধায়ক) প্রমুখ।

১৯৬৭-৬৮ নাগাদ পশ্চিমবঙ্গে মার্কসবাদের নতুন এক তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার জন্ম হয় উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ির নকশালবাড়ি অঞ্চলে। এই তত্ত্বের ব্যাখ্যাকারীরা প্রধানত ছিলেন মার্কসীয় ও লেনিনীয় দর্শনেরই প্রবক্তা। তাঁদের মূলকথা ছিল 'বন্দুকের নলই হল শক্তির উৎস'। এই আন্দোলনকেই সাধারণভাবে 'নকশাল আন্দোলন' বলা হয়। নকশাল আন্দোলনের সামগ্রিক চিন্তা ও বক্তব্য ছাত্রসমাজের বৃহদাংশকে আকৃষ্ট করল। স্টুডেন্টস ফেডারেশন (S. F.) নাম নিয়ে বিভিন্ন কলেজে তাঁরা ছাত্র ইউনিয়নও দখল করতে লাগলেন। হাওড়ার কলেজগুলিতেও একই চিত্র দেখা গেল। এস. এফ-র কয়েকজন ছাত্রনেতা জেলায় খুব প্রভাব বিস্তার করেছিলেন—তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শংকর মজুমদার, সঞ্জীব চ্যাটার্জী ও শক্তি রায় প্রমুখ। এঁরা নরসিংহ দত্ত কলেজ ('৬৭-৭১), দীনবন্ধু কলেজ ('৬৮-৬৯), এমনকি হাওড়া গার্লস কলেজও ('৬৯) ছাত্র ইউনিয়ন দখল করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ সময়ে এঁদের প্রতিপক্ষ ছিলেন 'ছাত্র পরিষদ', বি. পি. এস. এফ নয়।

প্রথমে এঁদের ধারালো বক্তব্য ছাত্র সমাজে আপাতগ্রাহ্য হলেও ঐ সংগঠনের নাম করে যে খুনের রাজনীতি শুরু হল সেখানেই যেন আন্দোলনের ছন্দপতন হতে লাগল। এমনকি উক্ত সংগঠনের জেলার প্রথম সারির ছাত্রনেতা শক্তি রায় স্বয়ং দুষ্কৃতকারীর হাতে নিহত হন। শংকরবাবু চিত্রশিল্পী হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দেন উন্নততর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে। পরে দেশে ফিরে নিজ পেশায় কাজ করে যাচ্ছেন। আর সঞ্জীববাবু একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে উঁচু পদে আসীন আছেন।

আগেই বলা হয়েছে, নকশাল ছাত্র সংগঠনের যখন রমরমা তখন জেলাতে প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠন বলতে ছাত্র পরিষদই প্রধান। এই সময় জেলার বিভিন্ন কলেজে ছাত্র-নেতা হিসাবে উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে ছিলেন অসিত মিত্র (বিধায়ক), শংকর সান্যাল (অধ্যাপক), রঞ্জিত ব্যানার্জী (সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের জেলা সম্পাদক), কৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্র (ব্যবহারজীবী), সুশান্ত ঘোষ (ব্যবহারজীবী), মানস সেন, উৎপল ভৌমিক ও কুন্তল ভৌমিক (উভয়েই ব্যবহারজীবী), বাণী সিংহরায়, বাবু (অলোক) বিশ্বাস, সিদ্ধার্থ মজুমদার (ব্যবহারজীবী), দেবাশিষ ব্যানার্জী (ব্যবহারজীবী), আবতাবুদ্দিন মণ্ডল (প্রাঃ বিধায়ক), সন্দীপ মিত্র ও সুধীন চ্যাটার্জী। আর মহিলা নেত্রীদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখ্য ছিলেন রীণা রায় ও স্বাগতা মুখার্জী।

শ্রীমতী রায় আসানসোলের মেয়ে হলেও কলেজে পড়াশুনার ক্ষেত্র হিসাবে হাওড়াকেই বেছে নেন। পরবর্তী সময়ে সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে যুক্ত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে তাঁর স্বামী ছিলেন প্রয়াত শ্রমিক নেতা প্রদীপ ঘোষ। এঁদের মধ্যে মানস সেন ও উৎপল ভৌমিক দুষ্কৃতকারীদের হাতে নিহত হন। আবার অসিত মিত্র বেশ কিছু বছর জেলা, রাজ্য এমনকি জাতীয় স্তরে ন্যাশনাল স্টুডেণ্টস ইউনিয়ন অব ইণ্ডিয়ার (NSUI) অন্যতম সাধারণ সম্পাদকের পদ পর্যন্ত লাভ করেছিলেন—যার প্রথম সভাপতি ছিলেন বর্তমান কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রী পি. কুমারমঙ্গলম। এই অসিত মিত্র যখন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ছাত্র-পরিষদের সাধারণ সম্পাদক (১৯৭৩) এবং কেষ্টচন্দ্র চন্দ্র ও অলোক (বাবু) বিশ্বাস জেলার যুগ্ম ছাত্র আহ্বায়ক তখন হাওড়া জেলায় ছাত্রদের প্রথম বাস কনসেশন্ চালু হয়। আরও চমকপ্রদ সংবাদ এই যে, আন্দুলের প্রভু জগবন্ধু কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে অদ্যাবধি (১৯৯৬-৯৮) ছাত্র-পরিষদের ইউনিয়ন অক্ষুণ্ণ আছে। এরকম দৃষ্টান্ত জেলায় দ্বিতীয়টি নেই।

এতক্ষণ কেবল কলেজ স্তরের জেলার ছাত্রনেতাদের সম্বন্ধেই বলা হল। এবার দেখা যাক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ল' কলেজে ও রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়েও জেলার ছাত্রনেতাদের প্রভাব কি রকম ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, পি, এস, এফ,-এর প্রভাবই সমধিক ছিল। ১৯৫৪ সালেই প্রথম ছাত্র ইউনিয়নটি ইউনিভার্সিটি স্টুডেণ্টস অর্গানিজেশন (U.S.O) নামে একটি অ-কম্যুনিষ্ট এবং অ-রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন দখল করে। এঁদের প্রভাব প্রায় ১৯৫৯-৬০ পর্যন্ত ছিল। ঐ ছাত্রনেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন হাওড়া-শালিখার শুভ্রাংশু ঘোষ ও মধ্য হাওড়ার সুরেশ্বর দত্ত। বাংলা ও ইংরাজী দু'ভাষাতেই ভাল বক্তা বলে শুভ্রাংশুবাবু ছাত্রমহলে আদৃত হতেন। বহু বিতর্ক সভায় অশোক সেন (প্রাঃ আইন মন্ত্রী) জে, সি, গুপ্ত সাধন গুপ্ত, (উভয়েই ব্যারিষ্টার), এন, বিশ্বনাথন (অধ্যাপক-অভিনেতা), সুধাংশু দাসগুপ্ত, উৎপল দত্ত (অভিনেতা), পরিমল মুখার্জী প্রমুখের সঙ্গে এক মঞ্চে বিতর্কে অংশ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে সুনামের অধিকারী হয়েছিলেন।

১৯৫৬ সালে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল—যা বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে বেশ নাড়িয়ে দিয়েছিল। একটি কম্যুনিষ্ট দুনিয়ার কালিমা ও অপরটি সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকের কলঙ্ক। পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিষ্ট শাসিত হাঙ্গেরীর শাসক জেনারেল ইমরে নাজী বা নাগীকে (Imre' Nagy) আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে তাঁকে দোষী বলে হত্যা করা হয়েছিল। অপরটি হচ্ছে মিশরের প্রেসিডেণ্ট নাসের সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করলে ইংলণ্ডে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী এ্যাণ্টনী ইডেন মিশরের উপর প্রচণ্ড বোমা-বর্ষণ করেন। দুটি কাজই সেদিন গণতান্ত্রিক দুনিয়ায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল—যার ঢেউ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণেও আছড়ে পড়েছিল। সেদিন

বি, পি, এস, এফ,-এর ছাত্রনেতারা সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকের আক্রমণে যতটা নিন্দা করে ছাত্রসমাজের ক্ষোভ ব্যক্ত করেছিলেন ততটাই নীরব থেকেছিলেন সোভিয়েট শাসকবর্গের নিষ্ঠুর হত্যার বিরুদ্ধে। অপরপক্ষে, ইউ, এস, ও-র নেতারা সমান নিন্দবাক্য ব্যবহার করে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণকারী দুই দেশের শাসকবর্গেরই সমালোচনা করেছিলেন—তাঁদের মধ্যে ছিলেন শালিখার শুভ্রাংশু ঘোষ ও মধ্য হাওড়ার সুরেশ্বর দত্ত। সুরেশ্বরবাবু ১৯৫৮-৫৯ সালে ইউ, এস, ও-র প্রেসিডেণ্ট পদেও আসীন হন। ল'কলেজ ইউনিয়ন ইউ, এল, সি, এস-রও অন্যতম নেতা ছিলেন তিনি। বর্তমানে হাওড়া কোর্টের প্রবীণ ব্যবহারজীবী। অপরপক্ষে সুভ্রাংশুবাবু শেষজীবনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আই, এ, এস, পদ থেকে অবসর গ্রহণ করে সমাজ কল্যাণে কাজ করছেন। সত্তরের দশকের প্রথমার্দ্ধ পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ শেষ করা হবে। এই সময়েও ল' কলেজ ইউনিয়ন ইউ, এল, সি, এস-র দখলেই ছিল। ছ'য়ের দশকের শেষার্দ্ধে ইউনিভার্সিটি ল' কলেজ অ্যাথলেটিক ক্লাবের স্পোর্টস সেক্রেটারী ছিলেন শালিখার সুব্রত বসু। সে সময়ে তিনি হকিতে 'ইউনিভার্সিটি ব্লু' হন। পরে ব্যবহারজীবী হয়ে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের বার এসোসিয়েশনেরও সম্পাদক হয়েছিলেন। তাঁরই ভাই সুপ্রিয় বসুও (৬৪-৬৫)-তে এম, এ (পল সাইন্স) পড়ার সময় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইউনিয়নটি বি, পি, এস, এফ-এর দখলেই ছিল। কিন্তু সুপ্রিয়বাবু ক্লাশে বিরোধী পক্ষের ছাত্র প্রতিনিধি হিসাবে সর্বাধিক ভোটে জয়ী হয়েছিলেন। ক্লাশে অপর জয়ী প্রার্থী ছিলেন অনিল বিশ্বাস (বর্তমান রাজ্য সম্পাদক সি, পি, আই, এম)। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (পুলিশ ও তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী) ও প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী (সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা) এঁরাও তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে প্রথমশ্রেণীর ছাত্রনেতা ছিলেন। সুপ্রিয়বাবু ল' কলেজ এ্যাথলেথিক ক্লাবের স্পোর্টস বিভাগেরও সম্পাদক হন এবং ক্রিকেটে 'ইউনিভার্সিটি ব্লু' হন। আর বিধানসভার সদস্যও নির্বাচিত হন দুবার।

জেলার অপর এক ছাত্রনেতার নাম সুশান্ত ঘোষ। '৭২-৭৫ পর্যন্ত ল' কলেজ ইউনিয়নের নাম করা ছাত্রনেতা ছিলেন। বর্তমানে হাওড়া কোর্টের ব্যবহারজীবী। ক্রিমিনাল বারে একাদিক্রমে আট বছর ('৯১—৯৮) সম্পাদক পদে বহাল ছিলেন।

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর থেকে ছাত্র ইউনিয়ন এস, এফ, আই-এর দখলেই ছিল। ছাত্র পরিষদ এই ইউনিয়নটি সর্বপ্রথম দখল করেন '৭০—৭১-তে। ৭৪ সাল পর্যন্ত তা বজায় ছিল। একাজে যাঁরা নেতৃত্বে ছিলেন তাঁদের মধ্যে হাওড়া দাসনগরের অচ্যুতানন্দ পাঠক, (ব্যবহারজীবী), মৃগেন মাইতি ও শৈলজানন্দ দাস (কাঁথি—বিধায়ক) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত দুজনই মেদিনী-পুরের। অচ্যুতবাবু ছিলেন ঐ ইউনিটের সভাপতি, উপরন্তু NSUI-এর ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। মৃগেন বাবু ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। তাঁদেরই আমলে রবীন্দ্র ভারতীতে ছাত্রদের হোস্টেল ব্যবস্থা, পূর্ণমাত্রায় ফ্রি সীপের ব্যবস্থা

ও তাদের ছাত্রদের বাসের কুপন ব্যবস্থা প্রথম চালু হয় বলে দাবি করা হয়। মৃগেনবাবু বর্তমানে রাজ্য সরকার কর্মচারী ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক।

এই পর্যায়ের আলোচনা এখানেই ছেদ টানা হল। গত পঁচিশ-তিরিশ বছরের মূল্যায়নের সময় এখনও আসেনি বলেই মনে হয়। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে অতীতের বেশীর ভাগ ছাত্রনেতাদেরই নিষ্ঠা, সততা সর্বোপরি মূল্যবোধের অভাব বর্তমানে খুবই অনুভূত হচ্ছে।

---

১. ২. ৩. অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দাস।

৪. ৫, সাক্ষাৎকার রণজিৎবাবুর সঙ্গে ৬. ৯. ৯২।

৬. মুক্তি সংগ্রামে বাংলার ছাত্র সমাজ—সম্পাদনা—বরুণ দে।

৭. সবার অলক্ষ্যে (২য় ভাগ)—ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়।

৮. বিপ্লবী হরেন্দ্রনাথ ঘোষ—সম্পাদনা—ডঃ শিশির কর।

৯. আট দশক—ডঃ ভবতোষ দত্ত।

১০. বঙ্গ থেকে বঙ্গ—বাংলায় রাজনৈতিক সাংবাদিকতার বিবর্তন—শংকর ঘোষ আনন্দবাজার পত্রিকা ২৪শে মার্চ, ১৯৯৭।

সাহিত্যের আড্ডায়

সাহিত্যের অধ্যায়টি আলোচনার আগে সাহিত্যের আড্ডা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন। সাহিত্যের আড্ডা যে সাহিত্য-সৃষ্টিতে কিভাবে রসদ যোগায় সে সম্বন্ধে সাহিত্যিকদের বহু আলোচনা পাঠকদের হয়তো অজানা নেই। হাওড়া শহরেও এ রকম কয়েকটি উঁচুদরের সাহিত্যের আড্ডা ছিল যেখানে বঙ্গদেশের তদানীন্তন নামীদামী লেখকদের উপস্থিতিতে জমে উঠতো। তারই কিছু রূপরেখা এখানে দেওয়া হল।

আড্ডাও যে সাহিত্য সৃষ্টিতে কিভাবে সাহায্য করতে পারে তা কথাশিল্পী শরৎ-চন্দ্রের উদ্ধৃতিটি এখানে উল্লেখ ক'রলে পাঠক তার উপকারিতা উপলব্ধি করতে পারবেন। 'রবিবাসরের' নাম আমাদের হয়তো সবারই জানা আছে। বঙ্গ সাহিত্যে শরৎচন্দ্র থেকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত এর সঙ্গে আমৃত্যু অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ একবার প্রস্তাব করেন যে, 'রবিবাসরে' মহিলা সদস্যা নেওয়া হোক। এখানে উল্লেখ্য, তখন নিয়ম ছিল কোন মহিলাকে রবিবাসরে সদস্যপদ দেওয়া যাবে না। কবি জলধর সেন একবার প্রস্তাব করলেন যে, রবিবাসর যখন সাহিত্যিকদের আসর তখন রাধারানীকে (কবি নরেন্দ্র দেবের স্ত্রী) বাসরের সদস্যারূপে নেওয়া হোক। উত্তরে শরৎচন্দ্রের মন্তব্যটি অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি বলেছিলেন—তাতে মুস্কিল হ'বে এই যে, 'রবিবাসরে' এসে সাহিত্যিকরা আর প্রাণ খুলে আড্ডা দিতে পারবেন না। মেয়েরা উপস্থিত থাকলে হয়তো লঘু হাস্য পরিহাস প্রকাশে বাধা বোধ হবে অনেকের।[১] ব্যাপারটা এখানেই শেষ হ'ল না। রাধারানী দেবীর অনুরোধে এ সম্বন্ধে গুরুদেবের মতামত চেয়ে পাঠানো হ'ল। এমনকি রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এলে এ নিয়ে তিনি শরৎচন্দ্রের সঙ্গেও কথা বলেন। গুরুদেবের এক প্রশ্নের জবাবে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—'রবিবাসর' ঠিক 'সাহিত্য সভা' নয়। কাব্য ও সাহিত্যের আলোচনা অবশ্য প্রতি বাসরেই হয়—কিন্তু 'আড্ডাই' প্রধান। মেয়েরা থাকলে আমাদের পক্ষে একটু সতর্ক ও আড়ষ্ট হ'য়ে আলাপ আলোচনা ক'রতে হবে। আড্ডার অবাধ স্বাধীনতা অনেকটা খর্ব হবে।

গুরুদেবের রায়টিও এখানে উল্লেখ করার মত। তিনি বলেন—তোমাদের এ আড্ডায় মহিলাদের না থাকাই ভালো। কারণ তাঁরাও তোমাদের মজলিশে উপস্থিত থাকতে অসুবিধা বোধ করতে পারেন।[২]

শরৎচন্দ্রের কথায় ঐ রকমই দুটি 'আড্ডা' ছিল শালিকাতে—যথা পূর্ণিমা মিলনী ও গোবর্দ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ। পূর্ণিমা মিলনী সে যুগে সাহিত্যিকদের একটি প্রিয় সাহিত্য সভা ছিল। প্রতি পূর্ণিমায় সাহিত্যিকরা মিলিত হ'তেন এই আসরে। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। দুঃখের বিষয় কবির

দেহান্তে ঐ সভাটি লুপ্ত হ'তে বসে। তাই বাংলা দেশের সাহিত্য জগতের সার্বজনীন 'দাদা' সু-সাহিত্যিক জলধর সেনের প্রচেষ্টায় আবার 'পূর্ণিমা মিলনীর' নিয়মিত অধিবেশন বসলো। তবে সেটা কলকাতায় নয়—গঙ্গার অপর পার শালিখার বাবুডাঙ্গা অঞ্চলে। জলধর সেন ছিলেন তার সভাপতি এবং প্রধান কর্মী হিসেবে ছিলেন কবি ব্রজমোহন দাস। এই সভার প্রথম কয়েকটি অধিশেবন 'শালকিয়া হাউসে' বসলেও পরে 'ঢ্যাং বাড়িতে'ই ঐ সমিতি দীর্ঘদিন ছিল। জলধর সেনের নামে ও কবি ব্রজমোহন দাসের সংগঠনে তদানীন্তন শালিখায় বহু প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের নিয়মিত আসা যাওয়া ছিল। পূর্ণিমা মিলনগুলিতে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির আবৃত্তি, চিত্তরঞ্জন গোস্বামী, নলিনীকান্ত সরকার ও অভয়পদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের কৌতুকাভিনয়ের সুখ-স্মৃতি আজও প্রবীণদের মধ্যে সুখালাপের বস্তু-স্বরূপ। অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে'র অনন্য কণ্ঠস্বর আজও প্রাচীনদের শ্রবণেন্দ্রিয়ে যেন মধুবৎ ঝঙ্কৃত হয়। বাংলা ১৩২৭ সালে (ইং ১৯২১ সালে) নতুন ক'রে শালকিয়ায় 'পূর্ণিমা মিলনী'র পঞ্চাশৎ উৎসব জলধর সেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। বহু নামকরা সাহিত্যিকরা 'পূর্ণিমা মিলনীর' পুনরুদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হ'য়ে শালিখার সাহিত্যবাসরের ক্ষেত্রে এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন।

অপর সাহিত্য আড্ডাটি ছিল গোবর্দ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ। প্রথমে এই সমিতিটির নাম ছিল 'শালিখা সঙ্গীত সমাজ'। সঙ্গীত শিক্ষাই ছিল তখন সভ্যদের মূল লক্ষ্য। ক্লাবের সদস্য গোবর্দ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় শিবপুর বি. ই. কলেজের একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে বন্ধুরা তাঁরই নামে ১৯১২ সালে গোবর্দ্ধন সঙ্গীত-সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন বাবুডাঙ্গার হারানচন্দ্র মুখার্জীর বাড়িতে। সেই থেকে এই ক্লাবটি মূলতঃ সমাজসেবার উদ্দেশ্যেই কাজ ক'রতে থাকে। সমাজ সেবার ফাঁকে ফাঁকে সৌখিন নাট্যানুষ্ঠানও ক'রতে থাকে। সে যুগে সমাজের 'পাণ্ডব গৌরব' গীতিনাট্যটি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অভিনীত হত। কলকাতার কোন এক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়িতে এই 'পাণ্ডব গৌরব' পালাটি অভিনয়ের সময় প্রসিদ্ধ নট শিশিরকুমার ভাদুড়ি ছিলেন দর্শকদের মধ্যে একজন। অভিনয়ান্তে তিনি নাট্যব্যবস্থাপক হরিগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বন্ধুপ্রেমে আবদ্ধ হন। পরবর্তীকালে গোবর্দ্ধন সঙ্গীত সমাজের নামের সঙ্গে সাহিত্য কথাটি যুক্ত হল। অবশ্য কোন্ সালে এই সংযোজন ঘটেছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে ক্লাবের সাহিত্য প্রেমিক মুষ্টিমেয় সদস্যের বিশেষ করে ব্রজমোহন দাস, বঙ্কিম চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নলিনী রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের (মণি) ঐকান্তিক আগ্রহে সাহিত্যবাসরের বৈঠক বসতে শুরু করে। পরে কবি ব্রজমোহন দাসের প্রচেষ্টায় সাহিত্য জগতের সার্বজনীন 'দাদা' জলধর সেনের সভাপতিত্বে ও 'নায়ক' পত্রিকার সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহচর্যে সমাজের সাহিত্যবাসরগুলি বেশ জমে উঠতে লাগল। জলধর সেনের আগমনে সমাজের খ্যাতি বাংলাদেশের বিদ্বজ্জন-মণ্ডলীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হতে থাকে।

সমাজের বার্ষিক সম্মেলনগুলিতে বাংলাদেশের সমসাময়িক বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও পণ্ডিত ব্যক্তি মাত্রই সম্মেলনের শোভাবর্ধন করতেন। ১৯২১ সালের সমাজের বার্ষিক সম্মেলন বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। সেই সম্মেলনে সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেছিলেন এক বিদুষী মহিলা। এই নিয়ে বেশ সোরগোল পড়েছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী সেদিনের সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। তখনকার দিনে তিনিই প্রথম মহিলা যিনি প্রকাশ্য একটি সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। তদানীন্তন The Englishman পত্রিকার মন্তব্যটি এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পত্রিকাটি লিখছে—**This is the first occasion on which a distinguished lady literateur has been elected as President of a public literary gathering (dated 30. 3. 1921).** এই বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলনটি হয়েছিল বাবুডাঙ্গার হাজরা বাড়ির মাঠেতে (বর্তমান শ্রীরাম ঢ্যাং রোড)।

গোবর্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ কর্তৃক আয়োজিত পূর্ণিমা মিলন ও সাহিত্য সভাগুলিতে তদানীন্তন কলকাতার একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া সব নাম করা সাহিত্যিকই যোগ দিয়েছিলেন। এই সাহিত্য বাসরগুলিতে আজকের মত শ্রোতারও অভাব হত না। তার প্রমাণ হিসেবে The Statesman কাগজের একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য তুলে ধরা হল। গোবর্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ সম্বন্ধে উক্ত পত্রিকা লিখছে—**One is somewhat startled to find Sri Debaprosad Sarbadhikary presiding over what a correspondent describes as a 'monstrous' meeting in Salkia last week. One's feeling of alarm, however, speedily disappears when one reads and discovers that the proceedings were entirely harmonious and unexceptionable. The occasion was the seventh anniversary of the Literary Association of the Salkia Gobardhan Sangit Samaj (dated 14. 3. 1919).**

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হাওড়ায় খুব কমই এসেছিলেন। বিশেষ করে কোন জনসভায় তাঁর বক্তৃতা করার সংবাদ তেমন জানা যায় না। জলধর সেনের চেষ্টায় গোবর্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজের বার্ষিক সম্মেলনে তাঁকে একবার আনবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কবির বার্ধক্যের কথা চিন্তা করে উদ্যোক্তারা সেই ইচ্ছা পূরণ করতে (১৯৩৯-৪০) অসমর্থ হন। তবে যতদূর জানা যায় কবি একবারই প্রকাশ্য জনসমাজে হাওড়ায় একটি সভায় যোগদান করে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সভাটি ছিল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তিপান্ন বছর জন্ম পূর্তি উপলক্ষে। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে হাওড়াবাসীর বিশেষ করে শিবপুরের বাড়িতে যে তাঁর জীবনের অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে গেছে তা অনেকেরই জানা আছে। রাজনৈতিক জীবনে তিনি একদা হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতিপদে পর্যন্ত আসীন হ'য়ে কাজ ক'রে গেছেন। শরৎচন্দ্রের অনুরাগীরা তাঁর তিপান্ন বছর পূর্তি উৎসব যেমন কলকাতায় করেছিলেন

তেমনি হাওড়া শহরের একটি পাঠাগারও কিছুদিন পরেই অনুরূপ একটি জন্মজয়ন্তী সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেই সভাটি হয়েছিল বর্তমান হাওড়া 'টাউন হলে'।

শরৎ সম্বর্ধনায় উক্ত সভাটিতে সভাপতিত্ব করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল তাঁর 'শরৎচন্দ্রের টুকরা কথা' পুস্তকে লিখেছেন—

"আমাদের জয়ন্তীর কয়েকদিন পরেই বোধ হয় হাওড়া টাউন হলে হাওড়ার কোন এক লাইব্রেরীর* পক্ষ থেকে আপনার সাহিত্য সম্পর্কে এক আলোচনা হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন বিজয় চন্দ্র মজুমদার। সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আমাকে কর্তৃপক্ষরা নিমন্ত্রণ করেন। আমি যাই।...সভা হচ্ছে—বিজয় চন্দ্র মজুমদার মশাই প্রায় আধ ঘণ্টা আপনার সাহিত্যের নানা দিক সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। ......তারপর রবীন্দ্রনাথও প্রায় মিনিট পনেরো বললেন।"

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় সেদিনের সেই আলোচনার বিষয়বস্তু কোন সংবাদ-পত্রে তো স্থান পায়ই নি এমনকি সভার বিবরণীও কেউ লিখে রাখেনি। অবিনাশ-বাবু তাই আক্ষেপ করে লিখেছেন—"এমনি দুঃখের কথা সেদিনের এই দুটি ভাষণই কেউ লিখে রাখেন নি। পরে আমি অনেক খোঁজ করেছি। শুনলাম লেখা হয়নি।"

এই সভার এক বছর আগে অর্থাৎ ১৩৩৪ সালে ৩১শে ভাদ্র শরৎচন্দ্রের বাহান্নতম জন্মজয়ন্তীও পালিত হয় হাওড়ায়। উদ্যোক্তা ছিলেন শিবপুর সাহিত্য সংসদ। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন—সুবোধ রায় (সম্পাদক), কবি জগদ্বন্ধু মিত্র, সন্ন্যাসী সাধুখাঁ, অরূপ চট্টোপাধ্যায় এবং প্রবোধ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এই জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হল বিজয় চন্দ্র মজুমদারের সভাপতিত্বে গৌরীনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী, শরৎ জন্ম শতবার্ষিকীতে সম্পাদক অশোক কুণ্ডু তাই লিখছেন—'এই উপলক্ষে 'উপহার' নামক একটি বত্রিশ পৃষ্ঠার পুস্তিকা শরৎচন্দ্রকে উপহার দেওয়া হয়। এই পুস্তিকায় শরৎ প্রশস্তি করেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়।......শিবপুর সাহিত্য সংসদ প্রবর্তিত প্রথম শরৎ জন্মজয়ন্তী পালনকে কেন্দ্র করে আজও বাঙালী শরৎ জন্মজয়ন্তী পালন করে আসছে।'

গোবর্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজের সভাপতি হিসেবে ছিলেন প্রবীণ সাহিত্যিক রায় বাহাদুর জলধর সেন মহাশয়। তিনি এই পদে দীর্ঘদিন ছিলেন—১৩২৩—১৩৪৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত। জলধরবাবু শালিখার লোক না হয়েও কি করে এখানে এসে এতদিন সভাপতি থেকে এই প্রতিষ্ঠানটিকে আত্মবৎ মনে করতেন তা সত্যি ভাববার কথা! শুধু জলধরবাবুই নয়—কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ 'চৈতন্য লাইব্রেরী'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুপণ্ডিত ও শালিখাবাসী ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও এই প্রতিষ্ঠানটিকে সুসংগঠিত করার কাজে প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছিলেন এবং এর সম্পাদকও

* পাঠাগারটির নাম ছিল—শিবপুর ইনস্টিটিউশন।

হয়েছিলেন। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক জলধরবাবুর নাম তখন বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে। তাঁরই নামে বহু সাহিত্যিক ও পণ্ডিত ব্যক্তির নিয়মিত পদধূলি পড়তো এই শালিখাতে। সমাজের বিশিষ্ট সদস্য কবি ব্রজমোহন দাসের সঙ্গে জলধর সেন এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। শালিখাবাসীও জলধরবাবুকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাতে ভোলেনি। জলধরবাবুর পঁচাত্তর বছর পূর্তি উৎসবে এক বিরাট সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করা হয়। এই সম্বর্ধনার পূর্ণ দায়িত্ব পড়েছিল সমাজের সদস্য কবি ব্রজমোহন দাসের ওপর। এই সম্বর্ধনা চলেছিল তিন দিন ধরে। প্রথম দিনের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৪ সালের ১৯শে আগস্ট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সভাপতিত্ব করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস-চ্যান্সেলার ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। পরের দিন ২০শে আগস্ট দ্বিতীয় দিনের সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয় শালিখার 'নাট্যপীঠে' (বর্তমান পিকাডিলি সিনেমায়)। সভাপতি ছিলেন সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী (বীরবল)। তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠান হয়েছিল ২১শে আগস্টে কলকাতার এলবার্ট হলে (বর্তমান কফি হাউসে)। সভাপতি ছিলেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই নিখিল বঙ্গ জলধর সম্বর্ধনা সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শালিখার ব্রজমোহন দাস।[৩] এই সম্বর্ধনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন সাহিত্যিকদের লেখা ও সম্বর্ধনা পত্রগুলি সমন্বিত করে কবিতা ও প্রবন্ধ দিয়ে 'জলধর কথা' নামে ব্রজমোহন দাস একটি অমূল্য সংকলন সম্পাদনা করেছিলেন। ব্রজমোহনবাবুর অন্যান্য বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বই হচ্ছে বিয়ের কনে, বেইমান, আহরিকা ও মাধুকরী ইত্যাদি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ব্রজমোহন দাসের সম্পর্কের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কবি ব্রজমোহনের প্রথমা স্ত্রী মারা গেলে কবি শান্তিনিকেতনে আশ্রমের শিশুদের শিক্ষাদানের কাজে তাঁকে আত্মনিয়োগ করতে আহ্বান জানান। উত্তরে ব্রজমোহন কবিকে লিখেছিলেন—সাহিত্যকে পেশা করতে চাই না। গোবর্দ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ ছাড়াও ব্রজমোহন দাসের ত্রিপুরা রায় লেনস্থ বাড়িতে সাহিত্যের মজলিস বসতো। সঙ্গে চলতো দাবা, তাস এবং পাশা খেলাও। এখানে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর শিবপুরের বাড়ি থেকে প্রায়ই আসতেন। এই ব্রজমোহন দাসই শালিখার সে যুগের একমাত্র 'রবিবাসরের' সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন। এখানে আরও উল্লেখ্য এই যে কবিগুরু 'রবিবাসরের' সর্বাধ্যক্ষ নির্বাচিত হলে ১৩৪৩ সালের ২৫শে আশ্বিন শরৎচন্দ্রের ষষ্টিতম সাম্বাৎসরিক জন্মদিনে সম্বর্ধনার অনুষ্ঠানে কলকাতায় এসে তিনি শরৎচন্দ্রকে আন্তরিকভাবে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন। কবির অনুরোধেই এটি করা হয়েছিল। সেই বছরই ৩০শে ফাল্গুন (১৩৪৩) শান্তিনিকেতনে তিনি রবিবাসরের অধিবেশন আহ্বান করেন। উত্তরায়ণ ভবনে সকাল আটটায় অধিবেশন বসে। আগের দিন কলকাতা থেকে ৩৮ জনের একটি দল সংরক্ষিত রেলের কামরায় শান্তিনিকেতনে পৌঁছায়। হাওড়াবাসী জেনে

পুলকিত হবেন যে ঐ দলের বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের মধ্যে একজন ছিলেন হাওড়ার বাসিন্দা কবি ব্রজমোহন দাস (আলোকদূত দাসের পিতা)।

তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে জেলায় সাহিত্য সভার প্রচলন করেছিলেন সাঁত্রাগাছি অঞ্চলের বিদগ্ধ মুষ্টিমেয় অধিবাসী। এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আগস্ট ১৮৫২ সালে।[৪] আর তাঁর সম্পাদক ছিলেন বিদ্যোৎসাহী ও বিত্তশালী পুরুষ কেদারনাথ ভট্টাচার্য।[৫] তাঁরই স্মৃতিতে 'কেদারনাথ ইনস্টিটিউশন'। এই সব সাহিত্য সভার কিছু কিছু সংবাদ তদানীন্তন কালের বিশিষ্ট সংবাদপত্র ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় প্রকাশিত হত। সম্ভবত এই সাহিত্য সভাটি জেলার আদি সাহিত্য সভা। পৃথিবীর ইতিহাস রচয়িতা দুর্গাদাস লাহিড়ী কর্তৃক পরিচালিত সাহিত্য সভাও সে যুগে খ্যাতিলাভ করেছিল। কদমতলার পারিজাত সমিতি, শিবপুর সাহিত্য সংসদ প্রভৃতিরও বিশেষ নাম ছিল। পুরাতন প্রসঙ্গ-এর লেখক বিপিন গুপ্তের রামকৃষ্ণপুরের বাড়িতেও এরকম সাহিত্য সভা বসতো। তাতে স্বয়ং শরৎচন্দ্রও প্রায়ই যোগ দিতেন। তাই শরৎচন্দ্র তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঢাকাতে চিঠি লিখছেন—ভাই চারু,…পাড়াগাঁয়ের মাটির বাড়ি আর রূপনারায়ণ নদ—এদের মায়া কাটিয়ে আমি বেশি দিন কোথাও থাকতে পারি না। তবে এ-ও সত্যি, এদের মায়া কাটিয়ে যাবারও বেশি দিন বাকি নেই। পুরনো বন্ধু-বান্ধব অনেকেই এগিয়ে গেছেন।…এই মাত্র এলো অধ্যাপক পরলোকগত বিপিন গুপ্তর শ্রাদ্ধ সভায় যাবার আমন্ত্রণ পত্র। শিবপুরের কত বিকাল বেলাই না একসঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করেছি।[৬] শিবপুরে 'হাওড়া সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিষদ' নামে একটি নামী সাহিত্য সভা ছিল। এই সভায় নিয়মিত আসতেন সাহিত্যিক স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিখ্যাত কথা সাহিত্যিক বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়, 'নিরক্ষর' প্রসিদ্ধ লেখক চরণদাস ঘোষ ও শিশুসাহিত্যিক যামিনীকান্ত সোম প্রমুখ সাহিত্যিকগণ। স্মরণ করা যেতে পারে যে বিভূতি বাবু কয়েক বছর তাঁর মাতুলালয়ে (শিবপুর) এসে বাস করেছিলেন। ডঃ নিমাই সাধন বসু (প্রাঃ উপাচার্য, বিশ্বভারতী) ও হরিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ই ছিলেন এই সভার মূল সংগঠক। সাঁত্রাগাছিতে বারীন মৈত্রের পরিচালনায় 'হাওড়া সাংস্কৃতিকী' নামেও একটি সাহিত্য সভা বেশ কয়েক বছর চলেছিল।

শিবপুরে 'সাহিত্য সংসদ' নামে একটি বিখ্যাত সাহিত্য সভা ছিল। এই প্রাচীন সাহিত্য সভাটির উল্লেখ কদাচিৎ শুনতে বা লেখাতে দেখতে পাওয়া যায়। এই সাহিত্য সংসদটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বয়ং 'শিবপুর কাহিনী'র লেখক অন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। 'স্মৃতির অর্ঘ্য' গ্রন্থে বসন্তকুমার পাল লিখছেন—শিবপুরে সাহিত্য আলোচনার এই প্রতিষ্ঠানটি (সাহিত্য সংসদ) বাঙ্গলা ১৩২১ সালে ১৭-ই ফাল্গুন দোল পূর্ণিমার দিন স্থাপিত হয়। অন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এর প্রাণ। এর প্রতিষ্ঠাকল্পে কতিপয় সাহিত্যসেবী ছিলেন—অধ্যাপক অক্ষয় কুমার সরকার, যুগল কিশোর মজুমদার, অতুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ধ্রুব কুমার ও কবি গিরিজাভূষণ

বসু। প্রথম অধিবেশন হয় বাজে শিবপুর নিবাসী অনাথ নাথ চৌধুরীর বাড়িতে। অন্নদাবাবু ও যুগল কিশোর মজুমদার বরাবর এর সম্পাদক ছিলেন। দু-এক মাস অন্তর সভা হত। প্রবন্ধ, কবিতা ও সঙ্গীত হত। সভায় আসতেন জলধর সেন, প্রমথ চৌধুরী (বীরবল), শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী। ১৩২৪ সালে ১২-ই অগ্রহায়ণ তারিখের অধিবেশনে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'সাহিত্যে দুর্নীতি' নামীয় প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন।

বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠানেও হাওড়া পেছিয়ে ছিল না। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দ্বাদশ অধিবেশন হয় হাওড়াতে। তিনদিনব্যাপী এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। সালটি ছিল ১৩২৬, বৈশাখ মাস।

এরই প্রায় এক দশক পর অর্থাৎ ১৩৩৫ সালে (ইংরেজী ১৯২৯) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অষ্টাদশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের সমস্ত ভার নিয়েছিলেন হাওড়ার মাজু গ্রামের কতিপয় বিদগ্ধ ও বিত্তশালী মানুষ। হাওড়া জেলার অনেক বর্ধিষ্ণু গ্রাম থাকা সত্বেও মাজুতেই একমাত্র বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন হয়েছিল। এতেই মাজু গ্রামের অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক চেতনার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিও হয়েছিলেন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ মাজু গ্রামেরই সুসন্তান ডঃ সুবোধ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বহু ভাষাবিদ এই সুবোধবাবু ছিলেন ভাষাবিদ্ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়েরই সহপাঠী। তিনি কালে বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষও হয়েছিলেন।

বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের এই অধিবেশন নানা দিক থেকেই খুব উল্লেখযোগ্য। অনুষ্ঠানের মূল সভাপতি ছিলেন ডঃ রায় দীনেশচন্দ্র সেন। সাহিত্য শাখার সভাপতি পদে এসেছিলেন ডঃ নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত। ইতিহাস শাখার সভাপতির পদে আসীন ছিলেন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার। দর্শন শাখার সভাপতি ছিলেন প্রখ্যাত পণ্ডিত ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ছিলেন ডাঃ একেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম. ডি. এম. এস. সি. এফ. জেড. এস.। আর এই সাহিত্য সম্মেলনের সম্পাদক ছিলেন—মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য।* মাজুর এই সাহিত্য সভা আরও গুরুত্বলাভ করেছিল স্বয়ং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে। স্মরণ রাখা যেতে পারে যে ১৯২৯ সালে ইস্টারের ছুটিতে রংপুরে (অধুনা বাংলাদেশ) বঙ্গীয় যুব সম্মিলনীতে শরৎচন্দ্র সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির ভাষণে শরৎচন্দ্র মহাত্মা গান্ধীকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন এবং ব্যঙ্গোক্তি করে ভাষণ দিয়েছিলেন যুবকদের সামনে। উদ্দেশ্য ছিল যুবকদের মধ্যে বিপ্লবাত্মক কাজের উন্মাদনা জাগানো। 'তরুণের বিদ্রোহ' প্রবন্ধে তিনি সেদিন যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—'সত্য মনে করে অনেক অপ্রিয় কথা

---

* এই সমস্ত নথীপত্র মাজু পাঠাগারের পুরানো ফাইল দেখতে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক জহরলাল বেরা।

বলেছি। পুরস্কার তার তোলা রইল। এই কংগ্রেস মণ্ডপেই দু'দিন পরে তিরস্কারের বান ডেকে যাবে। কিন্তু আমি তখন হাওড়ার নিভৃত-পল্লী মাজুতে ইত্যাদি।' বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্রের উপস্থিতি সেবারের মাজুতে বঙ্গ সাহিত্য পরিষদের সম্মেলনে যেন চাঁদের হাট বসে গিয়েছিল। সম্মেলন স্থান ছিল—মাজু আর. এন. বসু স্কুল মাঠ।

হাওড়ার সাহিত্য প্রয়াসী ও হাওড়া বার্তা অফিসেও প্রায় তিরিশ বছর ধরে এখনও সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে।

সাহিত্যের আড্ডা আবার স্থায়ীভাবে চায়ের দোকানেও বসতো। সেখানে একাধিক ভাড়ে চা, সিঙ্গারা ও সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে ছুটির দিনে বেশ আসর জমতো—এই রকমই একটি আড্ডা ১৯৪৮ সালে শুরু হয়েছিল প্রথমে সালকিয়া এ. এস. স্কুলের গেটের বিপরীতে 'সাঙ্গু ভ্যালি' নামে একটি আট পৌঢ়ে রেষ্টুরেণ্টে। তারপর সেটি পঞ্চাশ সাল থেকে শালিখা ত্রিপুরা রায় লেনে 'ছোড়াদা'র চায়ের দোকানে স্থান পরিবর্তন করল। সেখানে এই আড্ডাটি ছিল প্রায় আট বছর। 'ছোড়দার' আসল নাম ছিল ফণীন্দ্র নাথ মণ্ডল। প্রথমে তিনি মিষ্টির দোকানই করেছিলেন। তারপর এই আড্ডাটি বেশ জমে উঠায় মিষ্টির কারবার প্রায় তুলে দিয়ে তিনি চা সিঙ্গাড়া তৈরীর দিকেই বেশী মন দেন। এমনকি পরে তিনি একটি রেষ্টুরেণ্টও চালু করেছিলেন—যদিও বেশী দিন চালাতে পারেন নি। ছোড়দার এই দোকানে যে সব কলেজী পড়ুয়ারা আড্ডা জমিয়েছিল তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন গৌর পাল, অশোক মৈত্র, অশোক চট্টোপাধ্যায়, প্রদ্যুম্ন মিত্র, রতন ভট্টাচার্য্য, প্রকাশ সেন, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণ চক্রবর্তী প্রমুখ। শুধু তাই নয়—এই চায়ের আড্ডায় আসতেন সুভাষ মুখার্জী, রথীন্দ্র নাথ রায় ও মনীন্দ্র রায়। এঁরা সকলেই কবি হিসাবে স্বমহিমান্বিত। এই আসরে দু চারজন চিত্র শিল্পীও আসতেন তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট প্রচ্ছদপট শিল্পী বিমল দাস তো আজ খুবই নাম করেছেন। এই সাহিত্যের আড্ডা থেকেই পরবর্তীকালে রতন ভট্টাচার্য প্রথম শ্রেণীর গল্প লিখিয়ে হিসেবে পরিচিত হয়েছেন। অন্যান্যদের মধ্যে বেশীর ভাগ আড্ডাধারীরাই হয়েছেন অধ্যাপক, প্রবন্ধকার ও কবি। তবে এই আড্ডাটির সাহিত্য বাসরের আসর বসতো স্থানীয় মাধব স্মৃতি পাঠাগারে—মাসে অন্তত দুটি রবিবারে। এ ব্যাপারে পাঠাগারের তদানীন্তন সম্পাদক অভয়পদ সরকারের সাগ্রহ সহযোগিতা স্মরণ করার মতো। আজ অবশ্য ছোড়দার সেই চায়ের দোকান থাকলেও সেই রামও নেই—আর নেই তাঁর সেই চায়ের ভাড়ে চুমুক দেওয়ার মত গুণী খরিদ্দাররা। শালিখাতে বিগত কিছু বছর যাবৎ 'শব্দের ঝঙ্কার'—এর সম্পাদক সুনীল মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগেও একটি সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়ে চলছে।

শিবপুরেও একদা বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে একটি সাহিত্যের আড্ডা বসতো। নাম ছিল 'অনুশীলনী'। বর্তমান নাম 'সুর সাহিত্য।' 'হাওড়া শহরের ইতিবৃত্ত'র লেখক অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন—

সভ্যদের বাড়িতে ঘুরে ঘুরে মাসের শেষ রবিবার সাহিত্যের আসর বসে। ডাঃ রাম চন্দ্র গুপ্ত এর বর্তমান সভাপতি, সম্পাদক আভাস মজুমদার ও শান্তনু সাহা। এতে গ্রামের শিল্পী ও সাহিত্যিকেরাও যোগ দিয়ে থাকেন। ডাঃ সুশীল মুখোপাধ্যায়, ডাঃ শচীন্দ্রনাথ সাহানা, বরুণ মজুমদার, ডাঃ নির্মল সরকার, ডাঃ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, অচল ভট্টাচার্য (ঐতিহাসিক), 'নগর হাওড়া'-র লেখক ডঃ অলোক কুমার মুখোপাধ্যায়, সাংবাদিক ডঃ শিশির কর, সাংবাদিক রথীন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সিনেমা গবেষক ডঃ নিশীথ মুখোপাধ্যায় ও প্রাক্তন অল্ডারম্যান অশোক কুমার মল্লিক, অসিত চট্টোপাধ্যায়, কণিকা সেনগুপ্ত আরো অনেকে। এর বর্তমান ঠিকানা ১৪, লোকনাথ চ্যাটার্জী লেন, শিবপুর।' সুশীলবাবুর প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য সভার নাম পরিবর্তিত হয়েও এখনও পর্যন্ত চলছে জেনে খুবই আনন্দ হবার কথা।

আর একটি সাহিত্য আসরের নাম করেই অধ্যায়টির ইতি টানা হবে। সেটি হচ্ছে 'রবিসন্ধ্যা'। বয়সে নবীন হলেও পণ্ডিত ব্যক্তিদের সন্নিবেশে এটির গুরুত্ব আছে। 'রবিসন্ধ্যা' নিয়মানুযায়ী প্রতি মাসের প্রথম রবিবার যে কোন সদস্যের বাড়িতে বসা। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে লিখছেন—এই সংস্থার অধিবেশন হয় প্রতি মাসের প্রথম রবিবার সদস্য-সদস্যাদের বাড়ি ঘুরে ঘুরে (অনেকটা রবিবাসরের মতো) বিভিন্ন চিন্তাগর্ভ আলোচনা হয়। আছেন সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, বাণিজ্যনীতি, রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা। অবশ্য শুধু কলেজীয় ক্লাস ঘরের মতো শুষ্ক তত্ত্বকথার আলোচনা হয়না, তার সঙ্গে চলে রসালোচনা ও রসনারোচন খাদ্যের স্বাদ, চা-পান, সঙ্গীত পরিবেশন···। পঠিত প্রবন্ধগুলি অতি উচ্চমানের। যেমন গণিত শাস্ত্র, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থতত্ত্ব, সাহিত্য, দর্শন, সংস্কৃত সাহিত্যেরও চর্চা হয়।' সংস্থার সভাপতি ও সম্পাদকরূপে রয়েছেন যথাক্রমে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ বৈদ্যনাথ মুখার্জী ও নরসিংহ দত্ত কলেজের বিশিষ্ট অধ্যাপক ডঃ শৈলেন্দ্র কুমার বাগ।

এইভাবে হাওড়াতে অনেক সাহিত্যের আড্ডা তৈরী হয়েছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মেই সেগুলির অস্তিত্ব বেশীর ভাগই লুপ্ত হয়ে গেছে—যাও আছে তাও টিম টিম করে জ্বলছে। তবে সেইসব প্রচেষ্টা যে বৃথা গেছে একথা বলা যাবে না। জেলার অনেক প্রাচীন লেখক, কবি, সাহিত্যিক ও নাট্যকারের পরিচয় ইতিমধ্যেই পাঠক পেয়েছেন—আরও জানতে পারবেন পরবর্তী অধ্যায়ে।

---

১. ২. রবিবাসর—সম্পাদনা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩. জলধর সেনের আত্মজীবনী—লিপিকার নরেন্দ্রনাথ বসু।

৪, ৫, হাওড়া শহর কত পুরাতন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ—ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬, শরৎ স্মৃতি—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রবাসী কার্তিক—১৩৪৫।

কীর্তি যাঁদের দেশ-বিদেশে

যাঁরা পুরনো সিনেট হল দেখেছেন তাঁদের নিশ্চয়ই মনে আছে উঁচু দেওয়ালের বিরাট বিরাট সোনার ফ্রেমে বাঁধানো বিভিন্ন নামী লোকেদের তৈল চিত্রগুলির কথা। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ও কলকাতা টাউন হলের দেওয়ালেও ঐ রকম নামী ও দামী ব্যক্তিদের ছবি ঝুলতে দেখা যাবে। দূর থেকে এক একটি ছবির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতে হয় ছবিগুলির জীবন্ত রূপ দেখে। মনে মনে শিল্পীদের কাজকে তারিফ করে খুশি মনে হল থেকে বেরিয়ে আসা হয়। ক'জনই বা আমরা ছবির তলায় যে আবছা নামটি আলো-ছায়াতে লুকিয়ে আছে তা পড়ে দেখবার চেষ্টা করেছি। যদি চেষ্টা করতাম তবে দেখতে পেতাম—ইংরেজিতে লেখা আছে **Bamapada Banerjee** নামে একটি নাম।

এবার যাওয়া যাক খোদ লণ্ডন শহরে। লণ্ডনের বহুবিধ দর্শনীয় জিনিষের মতই একজন ভারতীয়ের পক্ষে 'ইণ্ডিয়া হাউস' অবশ্যই দ্রষ্টব্য স্থান। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে বহু স্মৃতিবিজড়িত এই ইণ্ডিয়া হাউসের কথা আমরা ভুলতে পারব না। সেখানেও যদি ঘুরে দেখেন তাতেও দেখতে পাওয়া যাবে দেওয়ালে দেওয়ালে ভারতীয় চিত্রকরদের ওরিয়েণ্টাল আর্টের অপরূপ চিত্রসমূহ, যেমন—সুধাংশু চৌধুরীর অঙ্কিত আনারকলি, বনদেবী, চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁর নারী প্রহরিণী-বৃন্দা ছাড়াও পুরু ও আলেকজাণ্ডার, মহারাজ অশোকের কন্যা বোধিদ্রুম নিয়ে সিংহলে যাচ্ছেন, সম্রাট আকবর ফতেপুর শিকরীর নকসা দেখছেন প্রভৃতি চিত্রসমূহ।

এবারে আসা যাক ভারতীয় যাদুঘরে। সেখানেও দেখতে পাওয়া যাবে নামী ও দামী ব্যক্তিদের বড় বড় প্রমাণ মাপের তৈল চিত্র। ছবিগুলির তলায় কষ্ট করে তাকালে দেখা যাবে কোন কোন ছবিতে লেখা আছে বিষ্ণুপদ রায় চৌধুরী। এভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে হাওড়ার শিল্পীদের বিভিন্ন ছবি বিভিন্ন স্থানে। কিন্তু এঁদের পরিচয় তেমন বিশেষভাবে আমরা তলিয়ে দেখি না বা দেখার চেষ্টাও করি না। অথচ এঁদের অতীত কাজের সাফল্যের জন্য উত্তরাধিকারী হিসেবে আমাদের গর্বের শেষ নেই। তাঁদের পরিচয় একে একে দেওয়া যাক।

সাধারণ বাঙ্গালীর ঘরের সন্তান বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম হুগলী জেলার শিমলাগড় গ্রামে। বাল্যকাল থেকেই আঁকার খুব ঝোঁক ছিল। তাই অঙ্কের খাতায় অঙ্ক কষার বদলে ব্যঙ্গ ছবিই আঁকতেন। একবার গ্রাম্য স্কুল পরিদর্শনে তৎকালীন বিশিষ্ট ইংরেজী লেখক শম্ভু চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ গ্রামে যান। তাঁর চেহারাটি বিরাট ভুঁড়ি সর্বস্ব ছিল। ছাত্র বামাপদ তাঁকে দেখে ক্লাসে বসেই একটি ব্যঙ্গ চিত্র এঁকে অনেকের ভয় মিশ্রিত প্রশংসা লাভে সক্ষম হয়েছিল। পরে গ্রাম্য স্কুল

ছেড়ে কলকাতার বৌবাজারের সরকারী আর্ট স্কুলে (বসুমতী পত্রিকার ঠিক পাশের বাড়িতে) এসে ভর্তি হন। তখন থেকে তিনি শালিখা বাবুডাঙ্গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। প্রতিকৃতি অংকনে বামাপদবাবুর এক সহজাত ব্যুৎপত্তি ছিল। তাই তিনি প্রখ্যাত জার্মান চিত্রশিল্পী ডবলু. সি. বেকারের কাছে শিক্ষার্থী হিসেবে নাম লেখান। অবশ্য এ ব্যাপারে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ লক সাহেবের সাহায্যের কথাও স্বীকার করতে হয়। পাশ্চাত্ত্য শিল্পীর কাছে শিক্ষালাভ করলেও বামাপদ কিন্তু ভারতীয় শিল্পরীতি ত্যাগ করেননি।

প্রতিকৃতি অংকনে ছবিকে এমনই মাধুর্যপূর্ণ ক'রে তুলতেন যা বামাপদকে ক'রে তুলেছিল এক অতুলনীয় পোর্ট্রেট শিল্পী। ১৮৭৯ সালের জুন মাস। বামাপদের জীবনে খুলে গেল এক নতুন দিগন্ত। তদানীন্তন ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড লিটনের সভাপতিত্বে ও ছোট লাট স্যার এ্যাসলি ইডেনের সহ-সভাপতিত্বে বৌবাজারের সরকারী আর্ট স্কুলে এক চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমান বসুমতী বিল্ডিং-এ সেই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

এই প্রদর্শনীতে সমকালীন ভারতের বহু বিদেশী ও দেশী চিত্রকরগণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। আনন্দের ও গৌরবের কথা—জীবনে প্রথম প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েই বামাপদের **Jugglar and Monkey** তৈলচিত্রটি লর্ড লিটন ও স্যার এ্যাসলি ইডেনের বিচারে প্রথম স্থান লাভ ক'রে স্বর্ণপদক পেল। চিত্র অংকনে বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই প্রথম ইংরেজ রাজপুরুষের হাত থেকে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হলেন। এর পরই বামাপদকে জীবনধারনের জন্য শিল্পকলাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে হয়। অর্থোপার্জনের আশায় বামাপদকে ঘুরে বেড়াতে হয় বাংলার বাইরে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের অনেক জায়গায়। বহু রাজা মহারাজা ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের তৈলচিত্র অংকন ক'রে শিল্পী বামাপদ অর্থ ও যশ দুইই লাভ করলেন। কিন্তু পিতৃবিয়োগের সংবাদ তাঁকে আবার বঙ্গদেশে ফিরিয়ে আনল। বাংলার বহু মনীষীর যথা—ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, স্যার আশুতোষ, মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, কেশব চন্দ্র সেন প্রমুখের জীবন্ত তৈলচিত্র অংকনে বঙ্গদেশে বামাপদের শিল্পী পরিচিতি জনে জনে কীর্তিত হ'তে থাকে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মহাপ্রয়াণের শতবর্ষ ১৯৯১ সালে পালিত হয়ে গেল। এ ব্যাপারে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে অনেক সময়োপযোগী প্রবন্ধ ও রচনাদিও প্রকাশ করে দেশবাসী বিদ্যাসাগর, করুণাসাগর ও দয়ার সাগরের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতি আঁকার ব্যাপারে দেশ পত্রিকা (২৭ জুলাই, ১৯৯১ সাল) একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে বঙ্গবাসীর ধন্যবাদের পাত্র হয়ে আছেন। এই পত্রিকায় যে কটি প্রবন্ধ প্রকাশ পেয়েছিল তার মধ্যে বিদ্যাসাগরের ছবি আমরা যা বিভিন্ন বইতে ও স্থানে দেখতে পাই সে সম্বন্ধে লেখক কমল সরকার এক অনবদ্য ইতিহাসনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন ছবি দিয়ে। বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগরের প্রথম তৈল চিত্র যিনি আঁকেন তিনি কোন দেশী শিল্পী নন।

তিনি ছিলেন একজন বিদেশী। তাঁর পুরো নাম বি. হাডসন। তিনি কলকাতায় পাইকপাড়া রাজবাড়ির একজন বেতনভুক চিত্রকর ছিলেন। 'বিদ্যাসাগর' জীবনী-কার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সর্বদাই সেখানে (রাজবাড়িতে) গতিবিধি ছিল।[১] এই হাডসন সাহেবের উৎসাহেই বিদ্যাসাগর ছবি আঁকার জন্য অত ব্যস্ততার মধ্যেও সিটিং-এর সময় দিতেন। সেই ছবিটিতে সময়কাল না থাকলেও কমল সরকার লিখছেন—বিহারীলাল সরকারের 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থের সাহায্যে এ সিদ্ধান্তে আসা যায়, হাডসন ছবিটি এঁকেছিলেন ১৮৫১ সালের শেষ দিকে কিংবা ১৮৫২ সালের গোড়ায়। বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং তাঁর বয়স একত্রিশ অথবা বত্রিশ বছর। ১৮৫১ সালের জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হন তিনি।[২] উল্লেখ্য, হাডসন সাহেব বিদ্যাসাগরের এই ছবির জন্য কোন পারিশ্রমিক নেননি শত অনুরোধ সত্ত্বেও। এর পরও কেউ কেউ বিদ্যাসাগরের তৈলচিত্র অংকন করেছেন যাঁদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ফণী সেন। তাঁর আঁকা চিত্রটি সংস্কৃত কলেজে উন্মোচন করেন ছোটলাট স্যার জন উডবার্ন (২৮ মার্চ ১৮৯৯)।[৩]

কিন্তু হাডসনের পর বিদ্যাসাগর মহাশয় সিটিং দিয়ে তাঁর তৈলচিত্র একমাত্র যে দেশীয় শিল্পীকে দিয়ে আঁকিয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন হাওড়া—শালিখার অধিবাসী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। বামাপদ অঙ্কিত নিজ তৈলচিত্রটি দেখে স্বয়ং বিদ্যাসাগর অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন। তিনি দক্ষিণা দিতে গেলে শিল্পী বিনয়ের সঙ্গে তা নিতে অস্বীকার করেন। এই ছবিটি যে ১৮৯০ সালে আঁকা হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে বলা

Calcutta, 29 July 1890

Baboo Bamapada Banerjea has painted a portrait of me which is well executed. My friends who have seen it consider it a very good piece of work and I am also very well satisfied with it.

Iswarachandra Sharma

যতীন্দ্রমোহনের কাছে বামাপদের প্রশংসা করে বিদ্যাসাগরের চিঠি

যায়। কারণ ঐ বছরই তিনি বামাপদকে একটি প্রশংসা সূচক পরিচয় পত্র দিয়ে জোড়াসাঁকোর জমিদার যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের কাছে পাঠান। উদ্দেশ্য, তাঁরা যাতে শিল্পীকে দিয়ে তাঁদের তৈলচিত্র আঁকান। বিদ্যাসাগরের নিজের হাতের লেখা চিঠিটির হুবহু নকল ছেপে দেওয়া হল।

মৃত্যুর কয়েক মাস আগে বিদ্যাসাগর মহাশয় বামাপদকে ডেকে তাঁর কাশ্মীরী-জোড়া শাল, (তখনকার দিনে জোড়া শাল ব্যবহারের রেওয়াজ ছিল) 'বর্ণপরিচয়' লেখার নিজের দোয়াত ও তাঁর ব্যবহারের পাকানো কাঠের ছড়িখানি উপহার দেন।

বামাপদকে দেওয়া ছড়ি, শাল ও বর্ণপরিচয় লেখার দোয়াত

আজও উত্তরপাড়ায় বামাপদপুত্র যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে উহা সযত্নে রক্ষিত আছে। যোগেশ চন্দ্রের সঙ্গে দেখা করে সেই সব জিনিষের ছবি তোলা হয়। বামাপদ-র দুই কন্যা বীণাপাণি মুখোপাধ্যায় ও লতিকা চট্টোপাধ্যায় 'দেশ' পত্রিকায় (৫।৭।১৯৫২) একই কথা লিখেছেন—'পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহাকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন। বামাপদবাবু প্রায়ই তাঁহার নিকট যাইতেন। তাঁহার ও তদীয় জননীর যে তৈলচিত্র তিনি করিয়াছিলেন তাহার জন্য কোনও পারিশ্রমিক তিনি গ্রহণ করেন নাই।' শিল্পীর জীবনে এ এক পরম সৌভাগ্য যা অর্থের অঙ্কে বিচার করা যাবে না।

বামাপদ অঙ্কিত সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পাগড়ী মাথায় প্রতিকৃতিটি নিয়েও কাঁঠালপাড়ায় এক মজার ঘটনা ঘটে। একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের বেয়াই তাঁর বাড়িতে বেড়াতে আসেন। বাড়িতে ঢুকেই তিনি দোতলায় সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে নীচে পাশের ঘরে বঙ্কিমের পাগড়ী মাথায় আমাদের চির পরিচিত তৈল চিত্রটি দেখে বলেন—'এত বেলায় সেজে গুজে কোথায় যাচ্ছেন, বেয়াই মশায়?' পরক্ষণেই আসল বেয়াইকে সামনে দেখে তাঁর ভুল ভাঙে। এই বিখ্যাত ছবিটি যেদিন বাড়ির দেওয়ালে টাঙানো হয় সেদিনও আর একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্রের

বাড়ির পোষা কুকুরটি ছবিটির দিকে লাফিয়ে লাফিয়ে দেওয়ালে উঠবার চেষ্টা করে। বঙ্কিম চন্দ্র নাকি বলেছিলেন—'আসল মনিব ছেড়ে ছবির মনিবের প্রেমে পড়েছে কুকুরটি। বঙ্কিম চন্দ্র নিজের পাগড়ীটি উপহারস্বরূপ বামাপদকে দান করেছিলেন। বামাপদপুত্র যোগেশবাবু বলেন যে অনেক চেষ্টা ক'রেও তিনি পাগড়ীটিকে রক্ষা করতে পারেননি, যেমন পেরেছেন বিদ্যাসাগরের স্মৃতিগুলি রাখতে।

শিল্পী বামাপদ কেবলমাত্র প্রতিকৃতি অঙ্কনেই নিজেকে সীমিত রাখলেন না। প্রাচীন ভারতের রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাকে তাঁর চিত্রে জীবন্ত রূপ দিয়ে ছবি আঁকতে শুরু করলেন। বহুবর্ণ চিত্রিত এই ছবিগুলি জার্মানী থেকে ছাপিয়ে এনে এদেশে তিনি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কারবার করার কাজে উদ্যোগী হন। একমাত্র বোম্বাইয়ের রাজা রবি বর্মা ছাড়া একাজ তখনকার দিনে আর কেউ করতে সাহসী হননি। অবশ্য বসুমতীর প্রতিষ্ঠাতা স্বগীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর একাজে উদ্যোগী হবার প্রধান উৎসস্বরূপ ছিলেন।

১৮৯০ সালে জার্মানী থেকে ছেপে আনবার জন্য 'অর্জুন ও উর্বশী' এবং 'উত্তরার নিকট অভিমন্যুর বিদায়' এই দুটি ছবি প্রথম প্যঠান হয়। পরে আরও বিখ্যাত ছবি যেমন শকুন্তলার প্রতি দুর্বাসা, শান্তনু ও গঙ্গা, কৈকেয়ী ও মন্থরা, নল-দময়ন্তী প্রভৃতি ছবি জার্মানী থেকে ছেপে আসে। আজও পুরানো আমলের বাড়িতে এই ছবিগুলি জীর্ণ অবস্থায় দেওয়ালে ঝুলতে দেখা যাবে। কিন্তু শিল্পীর ব্যবসা ভাগ্য একান্তই মন্দ ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা তখন বেজে উঠেছে। শিল্পীর অর্ডার দেওয়া ছাপানো কুড়ি হাজার টাকার বেশি ছবি জার্মানী থেকে জাহাজে আসছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ Torpado জাহাজটি শত্রুপক্ষের গোলাতে সমুদ্রে ডুবে যায়। এই সংবাদে শিল্পী ভীষণ ভাবে মুষড়ে পড়েন। এরপরে শিল্পী তাঁর নিজের একটি চিত্র প্রদর্শনী করেন কলকাতা ভবানীপুরের পোড়াবাজার অঞ্চলে (বর্তমান আসলী সোনা চাঁদীর দোকান)। সেখানেও এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে তাঁর ভীষণ ক্ষতি হয়। বিধাতা বুঝি তাঁকে কেবল সম্মান লাভের জন্যই জগতে পাঠিয়েছিলেন—অর্থলাভ ক'রে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনধারণ করা তাঁর আর জীবনে সইল না। বামাপদবাবুর ঐসব পৌরাণিক চিত্রগুলি শুধু ভারতেই নয় বিদেশীদের কাছেও সমাদৃত হ'ত। তখনকার দিনে সুইডেন থেকে দেয়াশলাই এদেশে বিক্রি হত। ঐ বিদেশী কোম্পানী দেয়াশেলাইয়ের ওপর বামাপদ বাবুর আঁকা ছবি দিয়ে তার শোভাবর্ধন করতো। দুর্বাসা ও শকুন্তলা ছবিটির একটি ইতিহাস আছে। শিল্পী বামাপদ নিজেই দুর্বাসার সাজে সজ্জিত হ'য়ে তার একটি ফটো তোলেন। পরে তিনি সেটিকে হুবহু আঁকেন। আর নিজ-স্ত্রীকে তিনি সামনে বসিয়ে শকুন্তলার ছবিটি এঁকেছিলেন। শিল্পীর বস্তু নিষ্ঠার এ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কেবল চিত্র শিল্পী হিসেবেই নয়—বামাপদ বাবু ছিলেন একুনে সাহিত্য-রসিক ও হাস্যরসিক বৈঠকী লোক। শালকিয়ার 'নাট্যপীঠে' তাঁর যে শোকসভা অনুষ্ঠিত

হয়েছিল তাতে সভাপতির ভাষণে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক স্বর্গীয় রায় জলধর সেন বাহাদুর বলেছিলেন—"বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর সঙ্গে বাঙ্গালার সেকেলের মজলিশী লোকের অভাব হইল। প্রকৃতই বামাপদবাবুর শিল্প কীর্তি ধরে রাখবার জন্যই একটি সুযোগ্য স্থান কলকাতায় হওয়া উচিত।"[৪] সে প্রস্তাব আজও অপূর্ণই রয়ে গেছে।

অপর শিল্পীর নাম সুধাংশু শেখর চৌধুরী। প্রথম জীবনে শালকিয়ার বিপ্লবী দলের সঙ্গে মিশে তুলির বদলে পিস্তল ধরেছিলেন। দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য অনেকের মত যুবক সুধাংশুও নিজেকে সেই খাতে বহাতে চেয়েছিল। সুধাংশুবাবুর জীবনে আর্ট শিক্ষার প্রথম গুরু ছিলেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরে ক্ষিতীন্দ্রনাথের সুপারিশেই শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের কাছে আর্টের শিক্ষা গ্রহণ করেন। সুধাংশুবাবুর বন্ধু বিশিষ্ট শিল্পী ও বিপ্লবীযুগের অন্যতম সৈনিক উত্তরপাড়ার চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ১৯৮০ সালে জুলাই মাস নাগাদ সাক্ষাৎকারে জানতে পারা যায় তিনিও শালিকাতে নিয়মিত আসতেন। তাঁর আসার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন যে, সুধাংশু শেখর ও তিনি দু'জনেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। বন্ধু সুধাংশুর সান্নিধ্যই তাঁকে বিপ্লবীকর্মে যুক্ত হ'তে উৎসাহ দিয়েছিল। সেই থেকে তিনিও শালিখার বিপ্লবীদলের নেতা বিজন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে জড়িত হ'য়ে পড়েন। সুধাংশুই তাঁকে এই কাজে টেনে আনেন। দক্ষিণেশ্বরের বোমার মামলায় (১৯২৫) যুবক সুধাংশুও জড়িত ছিল। বিপ্লবাত্মক কাজে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য সুধাংশুকে পাঠান হ'ল ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুন শহরে। পরিকল্পনা ছিল বিপ্লবী গুরু রাসবিহারী বসুর সহায়তায় অস্ত্র সংগ্রহে সুবিধা হবে ব'লে। কিন্তু ইংরেজ গোয়েন্দার নজর এড়াতে পারা গেল না। সেখানেই গ্রেপ্তার হ'ল সুধাংশু। বিচারে ১৮ মাসের জেল হ'ল। এরপরই সুধাংশুর জীবনের মোড় ঘোরে। তিনি বিপ্লবী দলের সঙ্গে সংস্পর্শ চিরতরে ত্যাগ করার বাসনা প্রকাশ করেন।

এই ঘটনার দু'তিন বছরের মধ্যেই একটি সুযোগও তাঁর কাছে আসে। ১৯২৮ সাল। ভারত সরকার লণ্ডনে 'ইণ্ডিয়া হাউস' সাজাবার জন্য ভারতীয় শিল্পীদের এক প্রতিযোগিতায় আহ্বান করেন। বিখ্যাত ইংরেজ প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার জন মার্শাল ছিলেন তখন ভারত সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা। তাঁরই আমন্ত্রণে ১৯২৯ সালে রণদা উকিল, সুধাংশু শেখর চৌধুরী, ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ বর্মন ও ললিত মোহন সেন প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ ইংলণ্ডে যান। বলা হয়, সেখানে গিয়ে **Royal College of Art**-এর অধ্যক্ষ **W. Rothenstien**-এর অধ্যাপনায় ভিত্তি চিত্র (**Mural Decoration**) শিক্ষা করবে। এ ধরনের শিক্ষানবীশের ব্যাপারে ভারতীয় শিল্পীদের যোগ্যতার প্রতি একটু কটাক্ষ করার ভাবই ফুটে উঠছে সন্দেহ নেই।

বিলেতের প্রসিদ্ধ পত্রিকা **Times** লিখছে—**Four Indian Artists (Messrs**

L. M. Sen, D. K. Deb Barman, Sudhanshu Chowdhury and Ranada Ukil) have arrived in London for training to take part in the decoration of the New India House. Before taking up the work they will undergo a year's training at the Royal College of Art, South Kenisington, under Prof. W. Rothenstien and spend six months in further study in Italy (25th Sept. 1929)[৫]

কিন্তু আসল ব্যাপারটি মোটেই তা নয়। সুধাংশু চৌধুরী শিল্পী অর্দ্ধেন্দু কুমার গঙ্গোপাধ্যায়কে যে চিঠি দিয়েছিলেন তা পড়লেই **Times**এর মন্তব্যের অসারতা প্রমাণিত হ'বে।

চিঠিতে লিখছেন ঃ

21, Cromwell Rd. London
5.10.29

প্রণাম শতকোটি নিবেদনমিদং,

আমাদের কলেজ গত ২৫শে সেপ্টেম্বর খুলেছে। **Rothenstien** প্রথম দিন আমাদের সমস্ত কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছে পরিচয় করে দিয়ে বলেছেন—এই চারজন ভারতের শিল্পী আমাদের কলেজে এসেছেন এবং এঁরা মাত্র এক বছর এখানে থাকবেন। তারপর **India House** এ কাজ করবেন। আশা করি তোমরা এঁদের সাদরে অভ্যর্থনা করবে এবং তোমাদের পরস্পরের ভাবের আদান প্রদানের **Eastern** এবং **Western Arts** সম্পর্কের আরও গাঢ় হবে। হয়তো ভবিষ্যতে একটা নূতন **School of Decoration** গড়ে উঠতে পারে এই থেকে। তারপর আমাদের চারজনকে বললেন যে, তোমরা এখানে **Artist** হিসেবে এসেছো, **Student** হিসেবে নয়। তোমাদের কোন রকম ভয় নাই **National Tradition** নষ্ট হবার। তোমরা এসেছো **Technique** আয়ত্ত করতে **Drawing** শিখতে নয়। কলেজের অন্যান্য ছাত্রদের মত তোমাদের কোন নিয়মকানুন মানতে হবে না।[৬]

সুধাংশু চৌধুরী ইণ্ডিয়া হাউসের **Exhibition Room** এ দু'খানি ছবি আঁকেন একটি আনারকলি অপরটি বনদেবী! ইণ্ডিয়া হাউসের গম্বুজে আঁকেন চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁর নারী প্রহরিণীবৃন্দ···। সুধাংশুবাবুর চিত্রগুলি ইংরেজদের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রশংসিত হয়। **India House** থেকে **Secretary for the High Commissioner** যে চিঠি দেন তা তদানীন্তন উপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদিত প্রসিদ্ধ 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ১৩৩৮ সনে ছাপা হয়েছিল। চিঠিটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

Dear Mr. Chowdhury,

You will be interested to know that His Majesty the King Emperor and Her Majesty the Queen Empress honoured India House on the 12th March with an informal visit and personally inspected your

work and that of your colleagues. এ ছাড়া ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানীতেও সুধাংশুবাবুর ছবির প্রদর্শনী সেদেশীয়দের কাছে প্রশংসিত হয়।

এই দুই শিল্পীর নাম হাওড়ার প্রবীণরা অনেকে জানেন। তাঁদের কীর্তির কথা অনেকের স্মৃতিতে আবছা হ'য়ে গেছে। এই দুই শিল্পীই শালিকার অধিবাসী ছিলেন। বামাপদবাবুতো এই শালকিয়াতেই দেহ রেখে গেছেন। তিনি থাকতেন বর্তমান বাবুডাঙ্গার ঘোষাল বাগানে। আর সুধাংশুবাবু শালিখা ত্যাগ ক'রে বেহালায় মৃত্যুবরণ করেন ১৯৯২ সালের জানুয়ারী মাসে। এঁরা দু'জনেই শিল্পীজগতে হাওড়ায় স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে গেছেন—যাঁদের প্রশস্তি কীর্তনে আমরা ধন্য।

পরবর্তী সময়ে আর এক নামী পোট্রেট শিল্পী হচ্ছেন কিশোরী রায়। কলকাতার গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজের ওয়েষ্টার্ণ পেণ্টিং-এর অধ্যাপক ছিলেন। শিল্পী হবার ব্যাপারে কিশোরীবাবুর স্কুল জীবনের একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখ্য। শালিখা স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে—১৯২৮ সাল। সভাপতির আসনে আছেন ডঃ ডবলু. সি. আর্কট (**Dr. W. C. Urquhart**) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার। বালক কিশোরী ঐ সময়ের মধ্যেই আর্কট সাহেবের একটি প্রতিকৃতি এঁকে ফেলেছে। আর্কট সাহেবকে দেখাতেই তিনি ভীষণ খুশি—ঘোষণা করলেন এক বিশেষ পুরস্কার। শুধু তাই নয়—তাঁরই চেষ্টায় বালক কিশোরী ভর্তি হ'ল গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজে। পরবর্তী জীবনে কিশোরী রায় প্রখ্যাত চিত্রকর জে. পি. গাঙ্গুলীর (**J. P. Ganguly**) সঙ্গে বেশ কয়েক বছর কাজ করেন। রক্সি ও চিত্রা সিনেমা এবং রায়গড় রাজপ্রাসাদের মুরাল পেণ্টিং তাঁরই হাতে আঁকা।[৭] তাঁর বিখ্যাত ছবি হচ্ছে—**A peep into gloomy future** অর্থাৎ অন্ধকারময় ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি। আমৃত্যু তিনি শালিখার উত্তম ঘোষ লেনের অধিবাসী ছিলেন।

অপর এক উল্লেখযোগ্য শিল্পী হচ্ছেন সুরেন্দ্র নাথ দাস। জন্ম হাওড়া জেলার মাজু গ্রামে। ব্যাঁটরা মধুসূদন পাল চৌধুরী স্কুলে নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে কলকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে অঙ্কন বিদ্যা শেখেন। ১৯০৩ সালে আর্ট স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেন। তারপরই পঞ্চাননতলা রোডে ষ্টুডিও খুলে রোজগারে নামেন। শুধু দেশেই নয় বিদেশেও তাঁর ছবি প্রশংসিত এবং পুরস্কৃত হয়। ১৯২৪ সাল। লণ্ডন শহরে 'বিশ্ব চিত্র শিল্প' প্রতিযোগিতা হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নামী দামী শিল্পীরা তাতে যোগ দিচ্ছেন। সুরেন্দ্রনাথও সেই প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য তৈরী হলেন। 'শকুন্তলা' নামে তাঁর একটি ছবি সেখানে পাঠালেন ভারত সরকারের মাধ্যমে। ঐ ছবিটি বিদেশী বিচারকদের বিচারে ভূয়সী প্রশংসা পেল। ১৯৫৪ সালে ভারতে অতিথি হিসাবে এসেছিলেন সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন দুই রাষ্ট্রনায়ক বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভ সাহেব। ঐ দুই নেতা কলকাতা ও হাওড়ার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে গেছেন। হাওড়ার বেঙ্গল জুটমিল ও

শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন তাঁরা ঘুরে দেখেছিলেন। অনেকে ভাবতে পারেন বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখার বস্তু হতে পারে কিন্তু জুট মিল দেখার কি আছে?—সেই ইতিহাসটি আমাদের অনেকেরই ইতিমধ্যেই বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গেছে। যাতে একেবারেই ভুলে না যাই তাই ঐতিহাসিক কারণেই এটা উল্লেখ করা হল। সাংবাদিকরা হাওড়াকে তাঁদের পছন্দে রাখার কারণ কি জানতে চেয়েছিলেন। তার উত্তরে তাঁরা বলেছিলেন—বোটানিক্যাল গার্ডেনের বিখ্যাত বটবৃক্ষের প্রাচীনত্ব ও বিরাটত্ব সম্বন্ধে তাঁরা গল্প শুনেছেন। তাই তার প্রত্যক্ষরূপ দেখে চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করতে চেয়েছিলেন। আর বেঙ্গল জুট সম্বন্ধে তাঁরা বলেছিলেন যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তাঁদের দেশে গানি ব্যাগ এই মিল থেকে প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করা হতো। যার মানও খুব উন্নত ছিল। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের জুট মিলগুলির অবস্থা সসেমিরে হলেও সেই সময় ঐ সব মিলের অবস্থা ছিল রমরমা। মেয়ে শ্রমিকরা তখনকার দিনে ঐ পাটকলে কাজ করতেন। তাঁদের বাচ্চাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মিলে 'ক্রেজে'র পর্যন্ত ব্যবস্থা ছিল। ছুটির পর তাঁরা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের আবার বাড়ি নিয়ে যেতেন। বেঙ্গল জুট মিলের অবস্থা তখন এতই উন্নত মানের ছিল। তাই অতিথিরা সেটি দেখতে চেয়েছিলেন। তদানীন্তন সংবাদপত্র পাঠেই উহার সত্যতা জানা যাবে। এই দুই বিশিষ্ট অতিথিদ্বয়কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে সুরেন্দ্রনাথের অঙ্কিত দুটি তৈলচিত্র দিয়ে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল। ছবি দুটির নাম ছিল 'স্নেহচ্ছায়ায় সীতা' ও 'রাধাকৃষ্ণ'।[৮]*

সুরেন্দ্রনাথ কেবল শিল্পীই ছিলেন না। তিনি একজন কৃতবিদ্য প্রযুক্তিবিদও ছিলেন। ১৯৩৯ সালে 'মেটালিক ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস' প্রতিষ্ঠা করে রেলের ব্যবহারের জন্য 'দেশীয় প্রথায় জ্যাক' উৎপাদন করেন। নিজ প্ল্যানে ডিজাইন করে নিজের কারখানাতেই তা তৈরীর ব্যবস্থা করলেন এক থেকে একশ টন ওজনের জ্যাক। এ দেশে রেলে প্রথম তাঁরই তৈরী দেশী জ্যাক ব্যবহার করা হয়েছিল।* জ্ঞানের আলো' নামে একটি বই লিখে তিনি হাওড়াকে আরও আলোকিত করেছিলেন।

আর এক বর্ষীয়ান চিত্রশিল্পী এখনও নিজের তুলি চালিয়ে যাচ্ছেন সৃষ্টির আনন্দে। প্রচার বিমুখ এই অশীতিপর শিল্পী হচ্ছেন শিবপুরের বিখ্যাত রায়-চৌধুরী পরিবারের বংশধর বিষ্ণুপদ রায়চৌধুরী। জন্ম ১৯০৯ সাল। জল ও তেল রঙের ছবি ও পোর্ট্রেট শিল্পে সমান সিদ্ধ হস্ত। ছেলেবেলায় দাদামশাই বিখ্যাত শিল্পী ও. সি. গাঙ্গুলীই ছিলেন তাঁর ছবি আঁকার প্রধান উৎসাহদাতা। পরে শিল্পগুরু অবনীন্দ্র ও নন্দলাল বসুর শিল্প রীতিতে ছবি আঁকতে থাকেন। বিষ্ণুবাবু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটি স্কুলের প্রথম যুগের ছাত্রদের অন্যতম। বিষ্ণুবাবুর আঁকা ছবি প্রথম থেকেই শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের প্রশংসা লাভে সমর্থ হয়।

---

* হাওড়ার গৌরব কাহিনী লেখক সলিল মিত্র লিখেছেন—সুরেন্দ্র নাথ তাঁর আঁকা ক্রন্দেভ এবং বুলগানিনের ছুটি তৈলচিত্র তাঁদের উপহার দেন।

১৯১৯ সালে ওরিয়েণ্টাল আর্ট সোসাইটির বার্ষিক প্রদর্শনীতে বিষ্ণুবাবুর দশ বছর বয়সে আঁকা, 'হরপার্বতী' নামে একটি ছবি শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়ে তখনকার দিনে সোসাইটি প্রদত্ত পাঁচশ টাকার নগদ পুরস্কার লাভ করে। আর স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ শিল্পীর কাজে মুগ্ধ হয়ে 'ঝর্ণা' ছবির জন্য ব্যক্তিগত একশ টাকার একটি বিশেষ পুরস্কার দেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২০ সালে শিল্পীর 'ধ্রুব' নামক একটি ছবির জন্য প্রশংসা করে অভিনন্দন জানান। এ ছাড়া শিল্পী তাঁর বার বছর বয়সে (১৯২১ সালে) বিদেশী শাসকদের প্রতিভূ লর্ড রেনাল্ডের হাত থেকে ঐ ছবির জন্য নগদ পুরস্কারও পান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ১৯২৮—৩০ মধ্যে শিল্পীর অনবদ্য চিত্র কালী ও দুর্গা মূর্তির ছবির এলবাম ছাপানো হয়। বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিল্পীকে গোল্ড সেণ্টার্ড মেডেল দিয়ে পুরস্কৃতও করেন। এরপর বহুকাল শিল্পী কোন পুরস্কারের প্রত্যাশা না করেই একান্তে ঘরে বসে শিল্প সাধনা করে যাচ্ছেন—নেহাত সৃষ্টির নিছক আনন্দেই। দেরীতে হলেও হাওড়াবাসী জেনে খুশি হবেন যে বিষ্ণুবাবু জীবন সায়াহ্নে এসে আবার পুরস্কৃত হলেন। তবে সেটা কোন ব্যক্তি বিশেষের পুরস্কার নয়—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহিত্য, নাটক ও শিল্প একাডেমির পুরস্কার। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এক অনুষ্ঠানে বিষ্ণুবাবুকে তাঁর শিল্প সাধনার স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৮৯—৯০ সালের একাডেমি এওয়ার্ড দিয়ে সম্মানিত করা হয়। নগদ পনেরো হাজার টাকা ও একটি মানপত্র শিল্পীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। কলকাতা আর্ট কলেজের একদা অধ্যাপক ছিলেন আন্দুলের অধিবাসী বিশিষ্ট শিল্পী ভূনাথ মুখোপাধ্যায়।

হাওড়ার মাজু গ্রামের আর এক খ্যাতনামা শিল্পী ছিলেন নরেন্দ্রনাথ সরকার। যাদববাটী অঞ্চলে ১৮৮১ জন্ম হয়। স্কুলের পড়া শেষ না করেই কলকাতার গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্ট এ্যাণ্ড ক্র্যাফটে ভর্ত্তি হন। পরে তিনি ঐ কলেজের বিদেশী অধ্যক্ষের স্বৈরাচারী শাসনের প্রতিবাদে সিনিয়ার ছাত্র রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তের নেতৃত্বে কলেজ ত্যাগ করেন। পরে রণদাবাবু প্রতিষ্ঠিত জুবিলী আর্ট অ্যাকাডেমিতে তিনি আঁকা শেখেন। পাশ্চাত্য রীতিতে ছবি আঁকার অনুসারী হলেও নরেন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে ভারতীয় রীতিতেই ছবি এঁকে শিল্পী জগতে এ দেশে নিজস্থান করে নেন। তাঁর বিখ্যাত তেল ও জল রংয়ের ছবি ছিল—যোধাবাই ও জেবউন্নিসা, উর্বশী ও অর্জুন, কচ ও দেবযানী, শকুন্তলা ও দুষ্মন্ত, যম ও নচিকেতা প্রভৃতি।[১০] প্রতিকৃতি অঙ্কনেও তিনি ছিলেন সিদ্ধ হস্ত। মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী, মহারাজা বিজয়চাঁদ মহতাব ও মহারাজা শশীকান্ত আচার্য চৌধুরী প্রমুখের প্রতিকৃতি অঙ্কনে তিনি প্রশংসিত হন। তখনকার দিনে ভারতবর্ষ, যমুনা, মানসী প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর ছবি পাঠকদের আনন্দবর্দ্ধন করতো।

মাজু (যাদববাটী গ্রাম) বিশ্বনাথ সোম নামে আর এক শিল্পীকে জন্ম দিয়ে হাওড়াকে চিত্রশিল্প জগতে একটি বিশেষ স্থানে উন্নীত করেছে। মাতুল নরেন্দ্রনাথের উৎসাহেই বিশ্বনাথবাবু কলকাতার সরকারী আর্ট কলেজে ভর্তি হন। শিক্ষক

সতীশ সিংহ ও বসন্ত কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে শিক্ষালাভ করে জল ও তেল রঙের চিত্রাঙ্কনে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তাঁর শিল্পকাজে সমসাময়িক সমাজের প্রভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। বাংলাদেশের ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষ ও শ্রমিক জীবনের কঠোর সংগ্রাম তাঁর শিল্প সৃষ্টিকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর বিখ্যাত ছবি ছিল মার্টিন লোকোশেড, সিটি আণ্ডার ব্ল্যাক আউট, দ্বিতীয় বিশযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে উদ্বাস্তু সমস্যা প্রভৃতি।[১১]

এই গ্রামেরই আর এক উল্লেখযোগ্য শিল্পী হচ্ছেন নিখিলেশ দাশ। তিনিও নিজগুণে ও বৈশিষ্ট্যে আধুনিক চিত্র শিল্পীদের মধ্যে নিজ স্থান করে নিয়েছেন। বর্তমানে তিনি হাওড়া কদমতলার অধিবাসী। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষ্য দক্ষিণ মাজুর সন্তান কালীপদ ঘোষালও চিত্র জগতের নামী শিল্পী হিসাবে নিজ স্থান করে নিয়েছেন। হাওড়া জেলার একটি গ্রামীণ অঞ্চল থেকে এত সংখ্যায় কৃতী চিত্রশিল্পীর আবির্ভাব সম্ভবত মাজু ছাড়া জেলার অন্য কোন গ্রামাঞ্চলে দেখা যাবে না।

এবার কয়েকজন আধুনিক চারুশিল্পীদের সম্বন্ধেও কিছু আলোকপাত করা যাক। এ সব শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন প্রকাশ কর্মকার (বালি), বিজন চৌধুরী (বালি), গোপাল সান্যাল (বেলুড়), রবীন মণ্ডল (মধ্য-হাওড়া), শিক্ষিকা অনীতা রায়চৌধুরী (শিবপুর), মহিম (রঞ্জন) রুদ্র (মধ্য-হাওড়া), দেবব্রত চক্রবর্তী (বালি)। বিজনবাবু ও দেবব্রতবাবু ওপার বাংলায় জন্মালেও বালিতেই বাসিন্দা হয়ে আছেন। এই সমস্ত শিল্পীরা স্বাধীনোত্তর ভারতে তাঁদের শিল্প কর্মে শিল্পী জগতে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে আসন করে নিয়েছেন। বঙ্গদেশ, তথা ভারতে এঁরা 'ক্যালকাটা পেইণ্টার্স' নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। এদের মধ্যে আবার মহিম রুদ্র শিল্পচর্চার জন্য সুদূর সুইডেনেই নিজ কর্মক্ষেত্র গড়ে তুলেছেন তাঁর বিদেশী স্ত্রী শিল্পী গানব্রিট রুদ্রের সঙ্গে। প্রকাশবাবু, রবীনবাবু, নিখিলেশবাবু, গোপালবাবু, অনীতা দেবী এঁরা সকলেই সারা ভারতেই আজ চিত্রজগতে অতি পরিচিত নাম। বিজনবাবু আবার ১৯৮২ সালে প্যারীসে আন্তর্জাতিক চিত্র প্রদর্শনেও যোগ দিয়ে জেলার সুনাম বাড়িয়েছেন। দেবব্রত চক্রবর্তী আবার মেডেলিং ও ভাস্কর্যে সুনাম অর্জন করেছেন। ১৯৪৬ সালে হাওড়া ময়দানে আজাদ হিন্দ ফৌজ সেনা নায়কদের এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেছিলেন বিশিষ্ট জননেতা শিবনাথ ব্যানার্জী। সেই সভায় বিশেষ বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা পণ্ডিত জহরলাল নেহরু। সেদিনের মণ্ডসজ্জার কাজ করেছিলেন আইজাক বেলিলিয়াস স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্র রবীন মণ্ডল। সেই চিত্রগুলি দেখে পণ্ডিত নেহরু পর্যন্ত শিল্পীকে দেখতে চান। বালক রবীনকে দেখে শ্রীনেহরু বিস্মিত হয়ে যান। সেদিনের বালক রবীনের মধ্যে যে হাওড়ার উদীয়মান শিল্পীর বীজ উপ্ত হয়েছিল—আজ তিনি ভারতের চিত্রকরদের কাছে রবীন মণ্ডল নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি ভারত সরকারের ললিত কলা একাডেমির জেনারেল কাউন্সিলের অন্যতম সদস্যও ছিলেন।

হাওড়া শহরের আর এক নামী চিত্রশিল্পী ১৯৯৭ সালের ২৪শে অক্টোবর ইহলোক ত্যাগ করেছেন। লোকশিল্প জগতে তাঁর নাম শিল্পী সমাজে খুবই পরিচিত—তিনি হচ্ছেন ধর্মনারায়ণ দাসগুপ্ত। ছোটবেলা থেকেই হাওড়া শহরে মানুষ—মধ্য হাওড়ার একটি স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে শান্তিনিকেতনে অঙ্কনে শিক্ষালাভ করেন। বালক বয়স থেকেই কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাঁকে চলতে হয়। বেশ কয়েক বছর ধরে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিস্যুয়াল আর্ট ডিপার্টমেন্টের ডীন হিসাবে কাজ করছিলেন। প্রথম জীবনে পাশ্চাত্য শিল্পরীতি বিশেষ করে ফরাসী শিল্পকলার প্রতি আকৃষ্ট হলেও পরে তিনি ভারতীয় শিল্প-রীতির প্রতিই অনুরক্ত হয়ে ওঠেন। কালীঘাটের পটের উপর তাঁর কাজ তাঁকে বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী হিসাবে চিহ্নিত করেছে। একরাশ ঘন কেশ বিশিষ্ট এই শিল্পীটি তাঁর ছবি আঁকার ক্যানভাসে নানা বর্ণের ও রঙের সংমিশ্রণে এক অসাধারণ শিল্প-রুচির পরিচয় দিয়ে গেছেন। তাঁর ছবির অভিব্যক্তিই ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। যেমন, তিনি যখন কোন হিংসা বা বীভৎসতার অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে চাইতেন তখন তিনি প্রায়শঃই একটি বাঘের মুখোস অথবা কোনো লোক-নর্তকের মুখে একটি বাঘের মুখোস এবং হাতে একটি তরবারি দিয়ে ছবি আঁকতেন। এই ভাবময় শিল্পীর লোকান্তর শিল্প জগতের মত হাওড়াবাসীরও গৌরব বহুলাংশে ম্লান হল বই কি!

আর এক চিত্রকর ও লেখক ছিলেন হাওড়ার ভাণ্ডারগাছা গ্রামের প্রভাত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতা সুরূপা (ইন্দিরা) দেবীর উৎসাহে শান্তিনিকেতনে ভাষা ও চিত্রকলা শিখতে যান। আচার্য নন্দলাল বসুর নামী ছাত্রদের নিয়ে গঠিত 'কারু সংঘের' তিনি ছিলেন অন্যতম হোতা। পরে তিনি শান্তিনিকেতনের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে অদূরে সুরুল গ্রামে চিত্রকলা অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর অঙ্কিত 'প্রাচীন ভারত' বিষয়ক চব্বিশখানা ঐতিহাসিক ছবি এক চমৎকার শিল্পকর্মের নিদর্শন।

বাংলা দেশে কার্টুন বা ব্যঙ্গ চিত্র এঁকে যে কজন বাঙ্গালী শিল্পী অদ্যাবধি যশস্বী হয়েছেন তাঁর মধ্যে হাওড়া বালি গ্রামের রেবতীভূষণ ঘোষ অন্যতম শ্রেষ্ঠ। প্রথম জীবনে বেসরকারী, সরকারী এমনকি হাই স্কুলে শিক্ষকতায়ও তিনি তৃপ্ত হতে পারেন নি। সংস্কৃতে অনার্স হলেও পরিশেষে ব্যঙ্গচিত্র ও ছড়া রচনার মধ্যেই তিনি মুক্তির স্বাদ পান। তিরিশের দশকের কলকাতার ফুটবল মাঠের এক প্রখ্যাত ফুটবলার বালিরই ছেলে ল্যাংচা মিত্রকে নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র এঁকে বেশ হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিলেন। আনন্দবাজারে প্রথম ব্যঙ্গচিত্র দিয়ে জীবন শুরু করলেও পরবর্তী কালে বিভিন্ন দৈনিক বাংলা কাগজে কাজ করেছেন। শুধু কি তাই দিল্লীতে চিলড্রেনস বুক ট্রাস্টের তিনি স্টাফ আর্টিষ্ট হিসাবে প্রচুর কাজ করেন। ছোটদের কাছে ঘনাদা, অ্যানিমল ওয়াল্ড' ও সবুজ টিয়া এক সময়ে ভীষণ সমাদর লাভ করেছিল। মৌমাছির (বিমল ঘোষ) পরিচালনায় 'আনন্দমেলা'র পাতায় তাঁর ব্যঙ্গ চিত্রের সঙ্গে ছড়া পড়ার জন্য এক সপ্তাহ অধীর আগ্রহে কিশোর কিশোরীরা অপেক্ষা করতো। শিশুদের

বইতে ইলাস্ট্রেশনে মুন্সিয়ানা দেখাবার জন্য তিনি 'শিশু সাহিত্য পরিষদ' কর্তৃক সম্বর্দ্ধিত ও পদক লাভ করেন। শেষ জীবনে বালিকেই তিনি বার্দ্ধক্যের বারাণসী বলে বেছে নিয়েছেন।

হাওড়ার গ্রামের আর এক বিদগ্ধ শিল্পী ও লেখক হলেন পূর্ণেন্দু পত্রী। পূর্ণেন্দুবাবুর পৈত্রিক বাসস্থান ছিল বাগনানের নাউল গ্রামে। বাগনানের মুগকল্যাণ হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতার বউ বাজারের ইন্ডিয়ান আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। ঐ স্কুলে স্ট্রাইক হওয়ায় পূর্ণেন্দুবাবুর সেখানে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। মাঠে, ময়দানে, গঙ্গার ধারে স্কেচ করার কাজেই সে মত্ত। এর পরই শুরু হল জীবন সংগ্রাম—সঙ্গে চললো কবিতা লেখা। কফি হাউসের আড্ডায় দেখা হল অনেক প্রগতিশীল কবি ও লেখকদের সঙ্গে। তিনি কেবল পুস্তকের প্রচ্ছদপট ও অলংকরণেই খ্যাতি লাভ করলেন না সাহিত্য চর্চায়ও মুন্সিয়ানা দেখালেন। 'কি করে কলকাতা হল' তাঁর এক উল্লেখযোগ্য বই। প্রচ্ছদপট শিল্পী ও লেখক ছাড়াও পূর্ণেন্দ্রবাবুর আরও একটি পরিচয় আছে সেটি হচ্ছে সিনেমা পরিচালক। বাংলার পট ও পটুয়া সমাজকে নিয়ে তিনিই প্রথম একটি ৩৫ মিলিমিটারে রঙ্গিন তথ্যচিত্র পরিচালনা করেন।[১২] বলার অপেক্ষা রাখে না যে গুণীজনের কাছে সেটি খুব আদৃত হয়। তাঁর সাহিত্য কর্মের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে ১৯৯৬ সালে 'বিদ্যাসাগর' পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেন।

এবারে হাওড়ার কয়েকজন কমার্শিয়াল আর্টিস্টের কথাও উল্লেখ করা যাক। প্রথমেই মনে পড়ে বিখ্যাত শিল্পী শৈল চক্রবর্তীর কথা। শিল্পী শৈল চক্রবর্তীর নামের সঙ্গে চিত্রপ্রেমিক ও পুস্তকপ্রেমিক পাঠক মাত্রই পরিচিত আছেন। তিনি স্কুল জীবন থেকেই চিত্রচর্চা শুরু করেন। তবে তিনি কোন আর্ট স্কুলে পড়ে চিত্রাঙ্কন শেখেননি। তিনি নিজ চেষ্টায় চিত্রকলায় স্বশিক্ষিত হয়ে উঠেন। শৈলবাবুর শিল্পকলা কেবল ভারতীয়দেরই রসাস্বাদনে তৃপ্ত করেনি সুদূর দক্ষিণ আমেরিকার রাও-ডি জেনরোতে (১৯৭৬) এবং ১৯৮৫-তে নিউ জার্সিতে তাঁর একক প্রদর্শনীতে সে দেশগুলিতেও সাড়া পড়ে গিয়েছিল। শৈলবাবু কেবল চিত্রশিল্পীই নন—তিনি লেখকও বটে। শিশু ও কিশোরদের জন্য তিনি খান পঁচিশ বই লিখেছেন—তাঁর মধ্যে তিনটি বই-ই ভারত সরকারের পুরস্কার প্রাপ্ত। এই শৈল-বাবুর জন্মস্থান হচ্ছে আন্দুলের উত্তর মৌড়ীগ্রাম। শুধু তাই নয় আন্দুল উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় থেকেই তিনি স্কুলের শিক্ষা শেষ করেন।

এছাড়া আধুনিক কমার্শিয়াল শিল্পীদের মধ্যে সুনাম অর্জন করেছেন বিমল দাস, নারায়ণ দেবনাথ, এইচ. পাল, বিশ্বরঞ্জন দে ও কানাই পাল প্রমুখ। আনন্দবাজার পত্রিকায় কর্মরত বিমল দাসের অঙ্কিত ইলাস্ট্রেশন বিশেষ করে দেশ পত্রিকায় তাঁর প্রচ্ছদ অঙ্কন শিল্পী মহলে খুবই প্রশংসিত হতে শোনা যায়—সাধারণের কথা না হয় বাদই দেওয়া হল। আর এক কার্টুনিস্ট হচ্ছেন হাওড়ার নরেন রায়—সুফি নামে পরিচিত।

চিত্রকর কিশোরীবাবু ছোট ভাই নীলমণি রায়ও একজন উঁচু দরের স্টীল ফটোগ্রাফার—যাঁর ফটো আন্তর্জাতিক ফটো প্রদর্শনীতে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে পুরস্কৃত হয়েছে একাধিকবার। ১৯৫৩ সালে হাঙ্গেরীর বুখারেস্ট শহরে যে আন্তর্জাতিক ফটো প্রতিযোগিতা হয়েছিল তাতে নীলুবাবু যুবক বয়সের তোলা একটি ফটো প্রথম স্থান অধিকার করে, তাতে একটি স্বর্ণপদক ও ডিপ্লোমা ডি লরিয়েট (**Diploma De Laureat**) সম্মানসূচক প্রশংসাপত্র পান। ফটোটি ছিল বীরভূমের গ্রামে কর্মরত একটি চাষীর ফটো—**Pride of Harvest.** ১৯৫৪ সালে অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে আর একটি আন্তর্জাতিক ফটো প্রদর্শনী হয়েছিল—বিষয়বস্তু ছিল **Exhibition On Village Life.** এতেও নীলুবাবুর **Thrashing** অর্থাৎ ধানঝাড়া নামে ফটোটি প্রথম পুরস্কার লাভ করে। এরপরই নিমন্ত্রণ আসতে থাকে পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি থেকে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে নীলুবাবুই এখনও পর্যন্ত এই সম্মানের অধিকারী হ'য়ে আছেন। প্রৌঢ় নীলুবাবু আজও প্রাচীন ভারতের মন্দির গাত্রের ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পের ফটো তুলে নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন শালিখার বাড়িতে থেকেই।

আর এক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফটোগ্রাফার হচ্ছেন বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত। কলকাতার ফরিয়াপুকুরে আদি নিবাস হলেও তিন পুরুষ ধরে হাওড়া শালিখায় বাস করছেন। স্কুল জীবন থেকেই ফটো তোলার ভীষণ ঝোঁক। কলেজ স্ট্রীটের বিখ্যাত ইউনিভার্শাল আর্ট গ্যালারির ডার্ক রুমে কাজ শিখে সংবাদপত্রের ফটো তুলতে থাকেন। দিল্লীতে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের ফটোগ্রাফার হিসেবে জীবন শুরু করেন। তারপর কলকাতায় আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগ দিয়ে চীফ ফটোগ্রাফার পদে উন্নীত হন। প্রেস ফটোগ্রাফার এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়ার সভাপতি পদেও আসীন হন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফটো প্রতিযোগিতায় শ্রীরক্ষিত একাধিকবার সম্মানিত হয়েছেন। চলচ্চিত্রে যেমন 'অস্কার' পুরস্কারটি বিশ্বের সেরা সম্মান তেমনি ফটোগ্রাফীতেও হল্যাণ্ডের ওয়ার্লড প্রেস ফটো কমপিটিশনে বিজয়ীরও সেই সম্মান। এই দুর্লভ সম্মানও বিশ্বরঞ্জনবাবু একাধিকবার লাভ করেন। প্রথমবার তিনি এই সম্মান লাভ করেন ১৯৭৪ সালে। প্রেস ফটোগ্রাফার এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া (পি. পি. এ. আই.) কর্তৃক একাধিকবার ভারতের সেরা ফটোগ্রাফারের সম্মানে ভূষিত হন। বিশ্বরঞ্জন বাবু কয়েকবারই জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন সেরা ছবি তোলার জন্য। তার মধ্যে একটি হচ্ছে দালাই লামা যখন তিব্বত থেকে পালিয়ে হাঁটা পথে ভারতে ঢোকেন সে মুহূর্তে বিশ্বরঞ্জনবাবু পর্বত সঙ্কুল দুর্গম পথে গিয়ে তাঁর পলায়নরত অবস্থায় প্রথমে ছবি তোলেন। আনন্দের কথা 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' সেই ছবি প্রকাশিত হওয়ায় ফটোগ্রাফার বিশ্বরঞ্জনবাবুর, সাহস ও ফটোর তারিফ হয় গুণীজনদের আসরে। তাঁর ভ্রমণ কাহিনী লেখায়ও বেশ ঝোঁক ছিল। ১৯৮০-র ২৩শে জুলাই শালকিয়ার বাড়িতে হঠাৎ মারা যান।

আর্টিস্টদের কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে শালিখার এক বিস্মৃতপ্রায় আর্টিজেনের

কথা। তিনি হচ্ছেন প্রিয়নাথ অধিকারী (বলাই অধিকারীর ঠাকুরদা)। হুগলী জেলার এক গ্রামের দরিদ্র সন্তান প্রিয়নাথ। রোজগারের আশায় মাত্র বার বছর বয়সে এসে শালিকায় বাসা বাঁধেন। কলকাতার মিণ্টে (পোস্তার কাছে) একজন ডাইস খোদাই কর্মী হিসেবে যোগ দেন। নিজগুণে পরে তিনি ঐ সংস্থার প্রধান ডাইসম্যান পদে উন্নীত হন। তদানীন্তনকালে শুধু ভারতবর্ষেই নয় সারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ডাইসম্যান হিসেবে সম্মানিত হয়েছিলেন। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের সিংহাসন আরোহণ উৎসব উপলক্ষ্যে 'করোনেসন মেডেল' তৈরী করার জন্য ব্রিটিশ সরকার সারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশে কয়েকজন বিশিষ্ট ডাইস খোদাই শিল্পীকে ভার দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, কলকাতার মিণ্টের ডাইসম্যান প্রিয়নাথবাবুর নক্সাটিই সেরা ব'লে বিবেচিত হয়ে 'করোনেসন মেডেল' রূপে মুদ্রিত হ'ল। ইংরেজ সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হলেন প্রিয়নাথবাবু। এই প্রিয়নাথবাবুর প্রপৌত্ররাও ঐ ডাইস তৈরীর ব্যবসায়ে সেই ঐতিহ্যকে বজায় রেখে চলেছেন। ইংরেজ মহাকবি সেক্সপিয়ারের চতুর্থ-শতবার্ষিকী (১৯৬৪ সালে) উৎসবকে স্মরণীয় ক'রে রাখবার জন্য ব্রিটিশ সরকার সেরা শিল্পীদের নক্সা আহ্বান করেছিলেন। এবারও প্রিয়নাথবাবুর পুত্র-প্রপৌত্ররা যে নক্সাটি ক'রে দিয়েছিলেন সেটিই ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করেন। এটা একটা ইতিহাসে উল্লেখ করার মত জিনিষ।

১৯০১ সালে সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেকে প্রিয়নাথ অধিকারীর অঙ্কিত রাজারানীর নক্সা

আর দুই তরুণ সম্ভাবনাময় শিল্পীর কথা এখানে উল্লেখ করার মত। শিল্পী বয়সে তরুণ হ'লেও শিল্পকার্যে নিজ গুণপনা দেখিয়ে জনমানসে স্থান করে নিয়েছে। তার নাম অমল কারক। বিভিন্ন আঙ্গিকে ও বিভিন্ন অপ্রচলিত জিনিষ দিয়ে দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণে অমলের কৃতিত্ব বাংলার কারুশিল্পে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। অপর এক ভাস্কর হচ্ছেন রঘুনাথ সিংহ। এঁরা সকলেই জেলার পূর্বসূরীদের ঐহিত্য ধরে রাখার কাজে চেষ্টিত আছেন।

এই অধ্যায়ের অন্তভাগে জেলার দু'জন বিশিষ্ট সংগ্রাহকের সম্বন্ধে কিছু না বললে অধ্যায়টি ত্রুটিপূর্ণ থেকে যাবে। এঁরা হচ্ছেন মধ্য হাওড়ার চৌধুরী বাগানের সিদ্ধানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও বালি গ্রামের বাসুদেব গঙ্গোপাধ্যায়। নীলানন্দ পুত্র সিদ্ধানন্দ বি,ই, কলেজের পাশ করা ইঞ্জিনীয়ার। ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ডিপ্লোমা নিয়ে প্রথমে সরকারের পি, ডাবলু, ডি

এবং পরে সি, এম, ডি-এর চীফ ইঞ্জিনীয়ার হয়ে অবসর নেন। ছাত্রবেলা থেকেই সঙ্গীতের উপর আসক্তি থাকলেও পিতার অনুশাসনে সেটাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে পারেননি। এতৎ সত্ত্বেও সঙ্গীতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল প্রবল। তাই বাংলার প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গানের রেকর্ডের এক বিরল সংগ্রহ গড়ে তুলেছেন। সেই সব সংগৃহীত রেকর্ডের গান শোনার সুযোগ কতিপয় ব্যক্তির মত আমারও হয়েছে। অনেক রেকর্ড আবার এতই জীর্ণ হয়ে গেছে যে তিনি নিজের ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা বলে সেগুলি যত্ন সহকারে উদ্ধারও করতে সমর্থ হয়েছেন। বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন জ্যেষ্ঠভ্রাতা সত্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তিনি নিজেই ১৯৩১ সালে একটি রেডিও সেট বাড়িতে তৈরী করেন। সেই থেকেই গান শোনার ঝোঁক আসে বালক সিদ্ধানন্দের মনে। আমরা জানি কাবলিওয়ালারা সাধারণ ছাপোষা মানুষদের টাকা ধার দেয়। কিন্তু একবার সিদ্ধানন্দবাবুর ঠাকুরদা অঘোরনাথ চ্যাটার্জীর কাছ থেকে এক কাবলিওয়ালাই তিরিশ টাকা (তখনকার দিনে) ধার নিয়েছিল। সে টাকা নগদে শোধ দিতে না পারায় দেশে যাবার আগে সে দাতাকে তার একটি শিলাইকল, একটি দেওয়াল ঘড়ি ও একটি চোঙাওয়ালা গ্রামোফোন দিয়ে যান। সেই গ্রামোফোনে গান শুনতেই সিদ্ধানন্দবাবু রেকর্ড কিনতেন—আর প্রতিটি প্রাচীন রেকর্ডই যত্ন সহকারে রেখে দিতেন। হাওড়া শহরে এমন ব্যক্তির সন্ধান সম্ভবত পাওয়া দুষ্কর হবে যাঁর সন্ধানে সংগৃহীত আছে প্রায় এক হাজারের মত প্রাচীন গানের গ্রামোফোন রেকর্ড। শুধু তাই নয়, গ্রামোফোন কোম্পানীর প্রথম প্রকাশিত গানের রেকর্ডটিও তাঁর সংগ্রহে 'রেকর্ড' হয়ে আছে।

অপরপক্ষে ডাক টিকিট, প্রাচীন মুদ্রা, বনসাই তৈরী আর্কিড চাষ ও ফুল চাষের ব্যাপারে একাধিক আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে বালির বাসুদেব গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাসুদেববাবুর পুরস্কারের ঝুলিতে দেশীয় অপেক্ষা আন্তর্জাতিক পুরস্কারের সংখ্যাই বেশী। ১৯৮৪ সালে রাজ্য প্রদর্শনীতে গ্রেট ব্রিটেন-এর বিদ্যুৎ বিষয়ক প্রতিযোগিতায় রৌপ্য পদক পান, ১৯৮৫ সালে জয়পুরে জাতীয় বিদ্যুৎ বিষয়ক প্রতিযোগিতায় রৌপ্য পদক পান, ১৯৮৯ সালে গ্রেট-ব্রিটেনের উপর রৌপ্য পদক পান। ১৯৯৬ সালে হর্টিকালচার সোসাইটির উদ্যোগে বাড়ির ছাদে বাগান করার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান পান। আর বনসাই তৈরীর কাজে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। আরও উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ১৮৪০ সালে স্যার রোলান্ড হিল পৃথিবীর যে প্রথম ডাক টিকিট প্রবর্তন করেন সেটিও বাসুদেববাবু সংগ্রহে সঞ্চিত আছে। এসব খবরই খুব উৎসাহজনক সন্দেহ নেই।

১, ২, ৩, বিদ্যাসাগর সন্দ্বিৎসা—কমল সরকার—দেশ ২৭শে জুলাই ১৯৯১।
৪. শালিখার ইতিবৃত্ত—হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫. ৬, বিচিত্রা—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৩৩৮ সন।
৭, ভারতবর্ষ—১৩৫৩ সন।
৮. ১০, ১১. ভারতের ভাস্কর্য ও চিত্র শিল্প—কমল সরকার।
৯. হাওড়ার গৌরব কাহিনী—সলিল মিত্র।
১২. আমার বন্ধু পূর্ণেন্দু ও কৌশিকী—বিশেষ রোমন্থন সংখ্যা ১৯৯৭—তারাপদ সাঁতরা।

সারস্বত আঙিনায়

হাওড়া জেলা প্রাচীন কাল থেকেই সারস্বত সাধনায় কৃতিত্বের দাবি করতে পারে। হাওড়া-হুগলী সীমান্তে ভূরিশ্রেষ্ঠী বা ভূরিশ্রেষ্ঠ নামে একটি সামন্ত রাজ্য ছিল। সেই ভূরিশ্রেষ্ঠী রাজ্যটিই আজকের ভুরশুট গ্রাম নামে পরিচিত। ট্রেন পথের চাইতেও আজকাল অতি সহজেই হাওড়া বাস টার্মিনাস থেকে ভুরশুট ভায়া গড় ভবানীপুর এল. বাসে চড়ে ঐ গ্রামে যাওয়া যায়। এই ভুরশুট আবার দুই অংশে বিভক্ত যেমন ডিহি ভুরশুট ও পার ভুরশুট। এই ডিহি ভুরশুটই হাওড়া জেলার উদয়নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত। এই গ্রামটি দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলের মধ্যে ব্রাহ্মণদের বসবাসের একটি উপযুক্ত স্থান ছিল। ভূরিশ্রেষ্ঠী নাম যদিও শ্রেষ্ঠী বা বণিকদের অধ্যুষিত অঞ্চলই বোঝায়—তথাপি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের যে যুগপৎ সমান প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই: 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থের লেখক বিনয় ঘোষ তাই লিখেছেন—'রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের আদি বাসস্থান ও বিদ্যাস্থানের মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্থান হল দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত ভূরিশ্রেষ্ঠ বা ভুরশুট। প্রচুর শ্রেষ্ঠীর বাস ছিল বলে ভূরিশ্রেষ্ঠী বা ভুরশুট নাম হলেও, গ্রামে আধিপত্য ছিল ভূরিকর্মা বা তপোবিদ্যাসম্পন্ন ব্রাহ্মণদের। দশম শতাব্দীতে এই রাজ্যে শ্রীধরাচার্য নামে এক প্রসিদ্ধ শ্রীধরস্বামী দর্শন শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন। তাঁরই রচিত গ্রন্থ হচ্ছে 'ন্যায়কন্দলী'।' শ্রীধরাচার্য নিজ পরিচয় দিতে গিয়ে বৃহস্পতিকে নিজ পিতামহ বলে উল্লেখ করেছেন। শ্লোকটি হচ্ছে—

> অম্ভোরাশেরিবৈত স্নাৎ বভুব ক্ষিতি চন্দ্রমাঃ।
> জগদানন্দ কৃদ্‌বন্দ্যো বৃহস্পতিরিতি দ্বিজঃ॥১

অর্থাৎ সমুদ্র থেকে যেমন চন্দ্রের উৎপত্তি হয়েছিল, তেমনি এই ভূরিসৃষ্টি গ্রাম থেকে জগদানন্দকারী ভূমণ্ডলের চন্দ্র সদৃশ বন্দ্য-ব্রাহ্মণ বৃহস্পতি উদ্ভব হয়েছিলেন। এই বৃহস্পতির পুত্র ছিলেন আবার কীর্তিমান। আর তাঁরই ছেলে হল শ্রীধরাচার্য। বিনয় ঘোষ আরও—লিখেছেন 'শ্রীধরের কাল যদি দশম শতাব্দীর শেষ দিক হয়, তা হলে বৃহস্পতির জন্মকাল নবম শতাব্দীর শেষ ভাগ হওয়াই সম্ভবপর। এই বৃহস্পতির জন্মকালেই দেখা যায় ভূরিশ্রেষ্ঠ বহু রত্নের কেন্দ্র ও জনবহুল গণ্ডগ্রামে পরিণত হয়েছিল। বৃহস্পতির হঠাৎ অভ্যুদয় কোন তেপান্তরের মাঠে নিশ্চয়ই হয়নি।...অন্তত শতাধিক বছর গড়ে উঠতে লাগলেও খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত ভূরিশ্রেষ্ঠীর প্রাচীন ইতিহাসের আভাস পাওয়া যায় শ্রীধরের উক্তি থেকে। পাল রাজাদের অভ্যুদয়কাল থেকে কিংবা তার আগে থেকেই ভূরিশ্রেষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়।'

এই রাজ্যের রাজা সে সময় কে ছিলেন তা নিয়েও বিভিন্ন মত আছে। তবে

শ্রীধরাচার্যের সময় ভূরিশ্রেষ্ঠী যে কায়স্থরাজ পাণ্ডু দাসের শাসনাধীন ছিল তা বিনয় ঘোষও মনে করেন। পরে বাংলার শাসনকর্তা হুসেন শাহের রাজত্ব কালে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) গড় ভবানীপুর-বাসী মুখটি বংশীয় চতুরানন মহানেউকী (নিয়োগী) ভূরশুট দখল করেন। 'চতুরাননের দৌহিত্র ফুলিয়ার মুখটি বংশীয় কৃষ্ণ রায় হলেন ভূরশুট রাজ্যের প্রথম ব্রাহ্মণ রাজা।'[২] রাজা কৃষ্ণ রায় ১৫৮৩-৮৪ খ্রীঃ ভূরশুটে যে রাজত্ব করছিলেন তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ইতিহাসের দিক থেকে সময়টা হল আকবর বাদশাহের রাজত্ব কাল।[৩] এই বংশের নামকরা রাজা ছিলেন প্রতাপ নারায়ণ। তাঁরই সভাসদ্ ছিলেন জাতিতে বদ্যি ভরত মল্লিক। 'চন্দ্রপ্রভা' (১৬৭৬ খ্রীঃ) ও 'রত্নপ্রভা' (১৬৮০ খ্রীঃ) রচনা করে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। প্রতাপ নারায়ণের পুত্র শিব নারায়ণ এবং তাঁর পুত্র হলেন নরনারায়ণ। এই নরনারায়ণের সময়ই ১১১৯ সনে বর্ধমান রাজ কীর্তিচন্দ্র ভূরশুট দখল করেন।[৪]

বিজিত নরনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণকে কীর্তি পুত্র চিত্রসেন বহু দেবোত্তর সম্পত্তি পুনরায় দান করেন। এই লক্ষ্মী নারায়ণের পুত্ররাই গড়—ভবানীপুর ছেড়ে পেঁড়ো-বসন্তপুর গ্রামে এসে বাস করতে থাকেন। ভূরশুটের গড়ভবানীপুরের গড়ের পরই উল্লেখযোগ্য গড় হল এই পাণ্ডুয়া গড় বা পেঁড়ো গ্রাম। রাজা কৃষ্ণ রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বসন্ত রায়ের নামেই বসন্তপুর।[৫] এই রাজ বংশেরই এক অধস্তন শাখা এখানে রাজত্ব করতেন। সেই বংশেই জন্মেছিলেন ভারতচন্দ্র মুখজ্যা অর্থাৎ মুখোপাধ্যায়। উপাধি রায়গুণাকর। পিতার নাম নরেন্দ্র নারায়ণ এবং মাতার নাম ভবানী। জন্ম ১১১৯ সাল।[৬] বালক বয়সে ভারত চন্দ্র মাতুলালয়ে (হুগলীর দেবানন্দপুরে) থেকে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধান শিক্ষা করেন। কিন্তু বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের চক্রান্তে তাঁকে রাজ্য ছেড়ে উড়িষ্যায় গিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হয়।

সেখানে কিছুকাল থেকে ভারত চন্দ্র আবার ফিরে আসেন নিজ গ্রামে। কিন্তু রোজগারের অভাব হওয়ায় তিনি তাঁর বন্ধু ইন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর (ফরাসী চন্দননগরের দেওয়ান) সহায়তায় নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজসভায় সভাকবি পদে নিযুক্ত হন। মাহিনা চল্লিশ টাকা।[৭] রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র ভারত চন্দ্রের কবিত্ব শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে উত্তর চব্বিশ-পরগনার মূলাজোড় (শ্যামনগর) গ্রামটি ইজারা দেন। এই গ্রামেই বাংলা সাল ১১৬৭ (১৭৬০ খ্রীঃ) কবি ভারত চন্দ্র মাত্র ৪৮ বছর বয়সে মারা যান।[৮] তাই কবি জীবনের তিনটি স্থানই ছিল বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ। হাওড়া পাণ্ডুয়া বা পেঁড়ো ছিল তাঁর শৈশবের শিশু শয্যা, নদীয়ার কৃষ্ণনগর ছিল যৌবনের উপবন আর উত্তর চব্বিশ পরগনার মূলাজোড় ছিল বার্ধক্যের ব্যারাণসী।

কবি ভারত চন্দ্র তাঁর কবি প্রতিভার প্রথম নিদর্শন দেখান 'সত্যপীরের কথা'র মাধ্যমে (১৭৩৭-৩৮ খ্রীঃ)। আর তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'অন্নদা মঙ্গল' কাব্য রচিত হয়

রাজা কৃষ্ণ চন্দ্রেরই নির্দেশে। রচনা কাল ১৭৫২ খ্রীঃ। ডঃ মদন মোহন গোস্বামীর মতে—'এই কাব্যটি তিন খণ্ডে বিভক্ত—প্রথম খণ্ড-অন্নদা মাহাত্মা, দ্বিতীয় খণ্ড—বিদ্যাসুন্দর, তৃতীয় খণ্ড—মানসিংহ-ভবানন্দ কাহিনীর পর অন্নদা মঙ্গল গ্রন্থ সাঙ্গ হইয়াছিল।'

এই তিনটি খণ্ডই মুদ্রিত আকারে প্রথম প্রকাশ করেন সাংবাদিক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। সময় কাল ১৮১৬ খ্রীঃ। এরপর যে খণ্ডটি ছাপানো হল তা সম্পাদনা করলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৪৭, ১৮৫৩ খ্রীঃ। উল্লেখ্য, বিদ্যাসাগর মহাশয় চাকুরী ছেড়ে সহকর্মী বন্ধু মদন মোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে এক প্রেস স্থাপন করেন। সেই প্রেস থেকেই প্রথম যে বইটি ছাপা হয় তা হচ্ছে ভারত চন্দ্রের 'অন্নদা মঙ্গল'। বলা বাহুল্য, এতে বাণিজ্য খুব ভালই হয়েছিল।

ভারত চন্দ্র যে কত বড় কবি ছিলেন এবং বঙ্গ ভাষা যে তাঁর দ্বারা কত সমৃদ্ধ হয়েছিল তা ঈশ্বর গুপ্তের রচনা থেকে স্পষ্ট হবে। তিনি লিখেছেন—ভারত চন্দ্র যেমন যুগ সৃষ্ট ছিলেন তেমনি তিনি যুগ স্রষ্টাও ছিলেন।······এই যুগন্ধর কবির রচনাবলীকে আশ্রয় করিয়াই সমগ্র একটি যুগের ভাব, ভাষা ও সংস্কৃতি প্রকাশ পাইয়াছে।······বাঙ্গালীর স্বাধীনতার অন্তিম কবি জয়দেব, মুসলমান শাসনের দুর্দিনের কবি বিদ্যাপতি—চণ্ডীদাস, মুসলমান আমলের শেষ উল্লেখযোগ্য কবি ভারত চন্দ্র।'

প্রকৃতপক্ষে ভারত চন্দ্র ছিলেন বঙ্গ সাহিত্যে রথ ও পথ। শুধু সাহিত্যেই নয়—তাঁর কাব্যরস বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের প্রথম প্রতিষ্ঠার কাজে দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে রস সঞ্চারে অপরিহার্য বলে সেদিন বিবেচিত হয়েছিল। উৎসাহী পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে ১৭৯৫ খ্রীঃ ২৭শে নভেম্বর বাংলা নাট্যশালা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতার নাম ছিল হেরাসিম লেবেডেফ নামে এক রুশবাসী। নাট্যশালাটি স্থাপিত হয়েছিল ২৫নং ডুমতলাতে (বর্তমান এজরা স্ট্রীট)।[৯] নাটকটি ছিল 'The Disguise' এর বঙ্গানুবাদ।[১০] নাটক ও নাট্যমঞ্চের বিষয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল নিম্নরূপ—

Mr. Lebedeff's New Theatre in the Doomtullah Decorated in the Bengalee Style will be opened very shortly wiih a play called, 'The Disguise.'

এই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা হল এইজন্য যে এই নাটকের আবহসঙ্গীতসহ সব দৃশ্যে যে সুর সংযোজনা করা হয়েছিল তাও কবি ভারত চন্দ্রের কবিতা ও গানের সুর দিয়ে নাটকটিকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলা হয়েছিল। বিজ্ঞাপনে তাই লেখা হয়েছিল—**To those musical instruments which are held in esteem by the Bengalees will be added by European. The words of the much admired poet Shree Bharat Chandra Roy are set to Music.**[১১] বলা

বাহুল্য এই অভিনয় এতই সফল হয়েছিল যে ১৭৯৬ সালে ২১শে মার্চ তারিখে দ্বিতীয় অভিনয়ে লেবেডেফ তাঁর টিকিটের দাম বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

পাঠক জেনে হয়ত হতবাক হবেন যে 'অন্নদা মঙ্গলের' প্রথম পুঁথিটি ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারিসেই আছে। সুসাহিত্যিক শংকর তাঁর 'মানব সাগর তীরে' ভ্রমণ কাহিনীতে লিখছেন—পৃথ্বীন্দ্রবাবুর অনেক অভিজ্ঞতা, ওর কাছেই শুনলাম, ভারত চন্দ্রের অন্নদা মঙ্গলের প্রথম পুঁথি প্যারিসেই আছে। সেকালের ফরাসী পাদ্রিরা বিশ্বের নানা প্রান্তে ধর্ম প্রচারে বেরিয়ে সুযোগ পেলেই নাকি ফরাসী সম্রাটের গ্রন্থাগারের জন্য বইপত্র সংগ্রহ করতেন!'[১২]

উদয়নারায়ণপুর থানার আর একটি সারস্বত সাধনার গ্রাম ছিল রসপুর। এই গ্রামের প্রধান বাসীন্দা হচ্ছে মাহিষ্য ও কায়স্থ সম্প্রদায়ের লোকেরা। এই কায়স্থদের মধ্যে রায়পাড়াটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ এই পাড়াতেই রায় বংশে রামকৃষ্ণ রায় ইতিহাস প্রসিদ্ধ। শিবায়ন কাব্যের তিনি ছিলেন প্রণেতা। বিনয় ঘোষ কবি রামকৃষ্ণ রায়ের জন্মকাল সম্বন্ধে বলেছেন—মনে হয়, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম বা দ্বিতীয় দশকে জন্মেছিলেন।[১৩] তিনি আরও লিখেছেন—'কবি নিজেকে প্রায়ই 'কবিচন্দ্র' বা কবিচন্দ্র দাস' বলে পরিচয় দিয়েছেন—যেমন

কবিচন্দ্র রচিলা সঙ্গীত শিবায়ন।
ভক্ত নায়কে দয়া কর পঞ্চানন॥[১৪]

তবে বিষ্ণুপুরের (বাঁকুড়া) কবিচন্দ্র নামে আর এক কবিও 'শিবায়ন' রচনা করেছিলেন। তিনি এবং রসপুরের কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ অভিন্ন ব্যক্তি নয়। এই শিবায়ন গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল ১৬৩৫—৪০ মধ্যে।

সাঁকরাইলের জোরহাট ছিল তপোবিদ্যার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। দ্বিজ হরিদেব 'রায়মঙ্গল' (দক্ষিণ রায়) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ ছাড়া তিনি (হরিদেব) 'শীতলা মঙ্গল' নামেও একটি কাব্য রচনা করেছিলেন।[১৫]

হাওড়া শহরে খুরুটও মধ্যযুগে সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। এখানে দ্বিজ রঘুনন্দনের লেখা 'পঞ্চানন মঙ্গল' নামে একটি পুঁথি পাওয়া গেছে—তাতে রামকান্ত পণ্ডিত নামে জনৈক লিপিকারের সই দেখা যায়। এ ছাড়া রামেশ্বর ভট্টাচার্য রচিত শিবায়ন বা শিব সঙ্কীর্তন বা হরমঙ্গল নামে একটি পুঁথি (বাংলা সাল ১২২৩, ইংরাজি ১৮১৬) পাওয়া গেছে। তাতে তিনি নিজেকে খুরুটের অধিবাসী বলে পরিচয় দিয়েছেন।[১৬] অবশ্য গোপাল হালদার লিখেছেন—রামেশ্বর ভট্টাচার্যের জন্ম হয় মেদিনীপুরে।*

বালি গ্রামও একদা সংস্কৃত চর্চার এক প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। মোঘল আমলে 'বালি বিদ্যাসমাজ' নামে একটি সংস্কৃত চর্চাকেন্দ্রের নাম পাওয়া যায়।[১৭] বালিতে কয়েকটি সংস্কৃতজ্ঞ পরিবারের নামও পাওয়া যায়—তার মধ্যে বিশিষ্ট নৈয়ায়িক ছিলেন 'বাঘা' প্রগলভ ভট্টাচার্য। উঁনার ছেলে গোপাল তর্কালঙ্কার বিবাহ করেন কমল

* বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা—গোপাল হালদার।

নারায়ণ তর্ক পঞ্চানন মহাশয়ের কন্যাকে। এই তর্ক পঞ্চানন ছিলেন যশোর রাজ প্রতাপাদিত্যের সভাকবি। এ ছাড়া চৈতল—চট্টো পরিবারের আর এক পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার। এই চন্দ্রশেখরের পৌত্র রামচন্দ্র ন্যায়ালঙ্কার তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে 'চকবালি' গ্রামটি উপহার পেয়েছিলেন। তাঁরই বংশধর পরবর্তী সময়ে চক-ভট্টাচার্য নামে পরিচিত হয়ে আসছেন। বালির আর একটি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বংশ হচ্ছে ঘোষাল বংশ। বালিতে এই বংশের আদি পুরুষ ছিলেন রাজেন্দ্র ঘোষাল। চার বা পাঁচ পুরুষব্যাপী পণ্ডিতের বংশ বলে এঁরা প্রসিদ্ধ ছিলেন। তবে এই বংশের শ্রেষ্ঠ ন্যায়শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন রামশঙ্কর তর্ক পঞ্চানন। তাঁর বিখ্যাত চতুষ্পাঠী ছিল বালির বড়গাঁ ডাঙ্গায় আনুমানিক ১১৬৫-১২০৪ সাল (ইং ১৭৫৮-৯৭)।[১৮] এই শতাব্দীতে মুসলিম কবিদের মধ্যে ছিলেন শাহ গরিবুল্লাহ ও সৈয়দ হামজার প্রমুখ।

মধ্যযুগের বাংলাভাষায় আরবী-ফারসী প্রভাবিত পুঁথি সাহিত্যের আদি কবি তথা 'জনক' হচ্ছেন এই শাহ গরীবুল্লাহ। এঁনার জন্ম হয় আনুমানিক ১৬৭০ খ্রীঃ বর্তমান হাওড়া জেলার (পূর্বে হুগলীর বালিয়া পরগনা) পাঁতিহাল অঞ্চলের হাফেজপুর (ডাক—মুন্সীর হাট) নামক গ্রামে। পিতার নাম ছিল শাহবুদ্দি কোরেশী ওরফে ফুলওয়ারী সাহেব। তিনি ছিলেন একজন দরবেশ অর্থাৎ আল্লার নামে সমর্পিত প্রাণ। পিতার ন্যায় গরীবুল্লাহও একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন—তাই ফকির গরীবুল্লাহ থেকে তাঁর নাম হয় শাহ গরীবুল্লাহ। 'শাহ' শব্দের অর্থ 'জ্ঞানালোকমণ্ডিত'। কেউ কেউ আবার তাঁকে 'দেওয়ানজী' বলেও ডাকতো। শোনা যায়, শাহ-র কৃপায় নাকি বর্দ্ধমানের রাজা একটি দেওয়ানী মামলায় জয়ী হন। তাই থেকে তাঁকে দেওয়ানজীও বলা হত। ধর্মপ্রাণ গরীবুল্লাহ দীর্ঘ একশ বছর বেঁচে ছিলেন। তিনি দেহত্যাগ করেন ১৭৭০ খ্রীঃ। তাঁর সমাধিক্ষেত্র আজও দেখা যাবে মুন্সীর হাটের কাছেই নাইকুলি গ্রামে। ঐ মাজারে প্রতিবছর ১১ই কার্তিক তাঁর মহাপ্রয়াণ দিবসে উরুস (ধর্মীয় অনুষ্ঠান) হয়ে থাকে।

শাহ গরীবুল্লাহের লেখা পাঁচখানি পুঁথির খোঁজ পাওয়া গেছে—সেগুলির নাম হচ্ছে—জঙ্গনামা, সোনাভান, আমীর হামজা (১ম পর্ব), ইউসুফ—জোলেখা ও সত্যপীরের পুঁথি। এই গুলিতে প্রচুর ফারসী, উর্দু, হিন্দী এমনকি বাংলা শব্দেরও মিশ্রণ রয়েছে। পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে এগুলি রচিত। গরীবুল্লাহ তাঁর 'জঙ্গনামা' পুঁথিতে বলেছেন যে ইসমাইল গাজী বা বড় খাঁ গাজী-ই হচ্ছেন তাঁর কবিত্বের মূল উৎস। তাঁরই (বড় খাঁ গাজী) আদেশে তিনি ঐ কাব্য রচনাতে হাত দেন। ইউসুফ—জোলেখা পুঁথিতেও তিনি তাই লিখেছেন—

অধীন ফকির কহে কেতাবের বাত।
বড় খাঁ বাতুনে যারে দিল মোলাকাত॥'

যদিও এই বড় খাঁ গাজী বা ইসমাইল গাজী একই ব্যক্তি ও সমসাময়িক কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ঐতিহাসিকদের মধ্যে থেকেই গেছে। তবে আরবী ও ফারসী

প্রভাবিত পুঁথি সাহিত্যের চর্চাকেন্দ্র দুটি কিন্তু পাণ্ডুয়ায়ই ছিল—একটি ত্রিবেণী-পাণ্ডুয়া ও অপরটি বসন্তপুর—পাণ্ডুয়া (হাওড়া)।

শাহ গরীবুল্লাহের পুঁথিগুলির মধ্যে 'জঙ্গনামা' খুব জনপ্রিয় ছিল। তার কারণ ফারসী কাব্য 'মকতুল হোসেন' অনুসরণে তিনি এই কাব্য রচনা করেছিলেন। আর এই কাব্যের বিষয়বস্তু হচ্ছে মুসলমান সমাজের কাছে খুবই দুঃখের উপাখ্যান। এই পুঁথিতে কারবালার প্রান্তরে হজরত রসুলের প্রাণাধিক দৌহিত্র ইমাম হোসেন কিভাবে ইয়াষীদ সৈন্যের হাতে প্রাণ দিয়েছিলেন তারই মর্মন্তুদ কাহিনী। শাহ-নিজেই যে তা স্বীকার করেছেন তা কবিতাটি পড়লেই বোঝা যাবে, যেমন—

"ফারসী কেতাব ছিল মোক্তাল হোচেন।
তাহা দেখি কবিতায় করিনু রচন॥
রচিতে কবিতা যদি খাতা মুঝে হয়।
মেহের করিয়া মাফ করিবে সবায়॥
রচনের ঝুট সাচ্চা আমি নাহি ঠেকি।
কেতাবে যেমন আছে আমি তাহা লেখি।"

গুরু কবি গরীবুল্লাহের সঙ্গে তাঁর প্রিয়তম শিষ্য সৈয়দ হামজার-এর একটু আলোচনাও মন্দ লাগবে না। এই সৈয়দ হামজারও একজন নামী মুসলমান কবি ছিলেন। তাঁর জন্ম হয় বর্তমান আমতার উদং গ্রামে ১৭৩৩ খ্রীঃ। তদানীন্তন কালে উহা হুগলী জেলার অধীনে ছিল। পার্শ্ববর্তী দামোদরের বন্যায় কবি উদং ছেড়ে আশ্রয় নেন পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামে। সেখানে তিনি মেহেদি মোল্লার আশ্রয়ে আঠারো বছর বাস করেন। তাঁর বিখ্যাত 'মধুমালতী'কাব্যে কবি নিজের পরিচয় সেই ভাবেই দিয়েছেন, যেমন—

'সৈয়দ হামজা বলে মুরশিদ ভাবনা।
উদানা (উদং) বসতি যার ভূরশুট পরগনা॥
আমার বাপের নাম হেদাতুল্লা মীর।
তাহার বাপের নাম আব্দুল কাদির॥
বিধাতা দিয়াছে দুই পুত্র মোর ঘরে।
কলিমুদ্দি কতুবদ্দি জগতে প্রচারে॥
তাহা সবারে কুশলে রাখেন করতার।
দুই পুত্রে লক্ষ্মীলাভ প্রমাই অপার॥
মেহেদি মোল্লার হউক দুকুল উজালা।
কভু যেন কুলে তার নাহি পরে মলা॥
সাকিন বসন্তপুরে যাহার বসতি।
যার বাড়ি আঠারো বৎসর মোর স্থিতি॥

এখানে মনে রাখা ভাল যে বসন্তপুর গ্রামে থেকেই সৈয়দ হামজার তাঁর গুরু অনুসৃত রীতিতে কাব্য রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যই ছিল 'মধুমালতী'।

গুরুর অসমাপ্ত কাব্য 'আমীর হামজা' (২য় পর্ব) তিনি সমাপ্ত করেছিলেন। ১৮০৭ খ্রীঃ কবির জীবনাবসান হয়।

হাওড়ার গ্রামাঞ্চলে আমতার নারিট গ্রামটিও ছিল এক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র। আনুমানিক ১৭১৫-২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পার্শ্ববর্তী শিয়াখালা (হুগলী) গ্রাম থেকে গৌরীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় নারিটে এসে বসবাস করতে থাকেন। পরে তাঁরই বংশধররা পুরুষাণুক্রমে সংস্কৃত চর্চার জন্য টোল ও চতুষ্পাঠী তৈরী করে চলেন। এই বংশেরই বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন মহামহোপাধ্যায় মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়। তিনিই পরবর্তী কালে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। মহেশ চন্দ্রের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে কুসুমাঞ্জলির ওপর টিপ্পনী, দয়ানন্দ সরস্বতীর বেদ ভাষ্যের ওপর সরস আলোচনা, প্রাকৃত কথা, হিন্দু পঞ্জিকার সংস্কারের ওপর আলোচনা ইত্যাদি। মহেশ চন্দ্র 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি পেয়েছিলেন ইংরেজ শাসনকর্তাদের কাছ থেকে। তারও একটি ইতিহাস আছে। সে কথা জেনে পাঠক নিশ্চয়ই মহেশ চন্দ্রের চরিত্রের প্রকৃত পরিচয় পেতে পারবেন। সেই ইতিহাসটি হচ্ছে এই—

ভিক্টোরিয়ার ৫০ বছর রাজ্যশাসন পূর্ণ হওয়ার জুবিলি উপলক্ষে ১৮৮৭ সালে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি দানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। দরবারে তাঁদের স্থান রাজাদের পরেই নির্দিষ্ট হয়। সরকারী এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান হল—**Queen-Empress of India being desirous to commemorate the event of the Jubilee of Her Majesty's Accession to the Throne has, resolved to institute a new title for oriental learning-persons upon whom the title of Mahamahopadhyaya has been conferred shall be Darbar take rank next below the titular Rajas.**[২০]

হাওড়াবাসীর পক্ষে পরম আনন্দের বিষয় এই যে ঐ উপাধি প্রাপকদের তালিকায় প্রথম নামই ছিল মহেশ চন্দ্রের। এই কথা জানতে পেরে মহেশ চন্দ্র কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করেন। তিনি তদানীন্তন ভারত সরকারের স্টেট সেক্রেটারী স্যার এ্যান্টনী ম্যাকডোনাল্ডকে ধরে নিজের নাম কাটিয়ে নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক ভুবন মোহন বিদ্যারত্নের নাম তালিকার প্রথমে দেন।[২১] এই রকম উদার গুণসম্পন্ন নিরভিমান পণ্ডিত ছিলেন তিনি। বঙ্গদেশ থেকে যে ন'জনকে এই উপাধি দেওয়া হয়েছিল তাঁদের নামও গুণানুসারে সরকারী তালিকা থেকে তুলে দেওয়া হল। (১) ভুবন মোহন বিদ্যারত্ন (নবদ্বীপ), (২) মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন (হাওড়া), (৩) শ্রীরাম শিরোমণি (মুর্শিদাবাদ), (৪) রাখালদাস ন্যায়রত্ন (ভট্টপল্লী নিবাসী), (৫) প্রসন্ন ন্যায়রত্ন (নদীয়া বেলপুকুর), (৬) দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন (হুগলী কোন্নগর), (৭) চন্দ্র কান্ত তর্কালঙ্কার (মৈমনসিংহ), (৮) তারিণী চরণ শিরোমণি (ফরিদপুর)। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার (১৩৫১, কার্তিক সংখ্যা)—লেখা হয়েছে—

এঁদের ছাড়াও পণ্ডিত আরও ছিলেন। কিন্তু তাঁরা আবার নেননি। যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয় ও বিক্রমপুরের সর্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক প্রসন্ন কুমার তর্করত্ন।

এ ছাড়া সাঁত্রাগাছি, শালিখার বামুনগাছি ও বাবুডাঙ্গাতেও সংস্কৃত শিক্ষার জন্য কয়েকটি বিখ্যাত টোল ছিল। আজ অবশ্য তা দেখতে পাওয়া যাবে না।

মুসলমান শাস্ত্র চর্চা কেন্দ্র হিসেবে মোকতাব ও মাদ্রাসার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র এ জেলায় পাওয়া যায় না। তবে অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে—মধ্য যুগের শেষার্ধে ভূরশুট পরগনায় কয়েকটি মোকতাবের হদিস পাওয়া গিয়েছিল। আর শাঁকরাইলের টিকি পীড় (Teke pir) মসজিদেও একটি মোকতাবের হদিস পাওয়া গিয়েছিল।

আলোচনান্তে দেখা যাচ্ছে যে হাওড়া জেলার বিভিন্ন অংশেই সংস্কৃত চর্চার অনুশীলন কেন্দ্র ছিল। তাতে অনেক পণ্ডিত প্রবরেরই স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এই স্মৃতিগুলির মধ্যে বোধ হয় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা জড়িয়ে আছে হাওড়া-শালিখা নামক গ্রামের সঙ্গে। ১৮২৮ সালে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পুত্র ঈশ্বর চন্দ্রকে ইংরেজী শেখাবার জন্য কলকাতায় নিয়ে আসেন। আট বছরের ঈশ্বর চন্দ্র পায়ে হেঁটে পিতার সঙ্গে কলকাতায় পেঁছান। সঙ্গে ছিলেন তাঁর বাল্য শিক্ষক কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। শিয়াখালা হয়ে বেনারস রোড (তখন অহল্যাবাঈ রোড) ধরে শালিখার বাঁধাঘাট দিয়ে গঙ্গা পার হয়ে বড়বাজারে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কলকাতার সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক ছিলেন পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন। ঈশ্বর চন্দ্র স্বয়ং তাঁরই কাছে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' পুস্তকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—জয়নারায়ণ সে যুগের একজন খ্যাতনামা নৈয়ায়িক। তাঁহার নিকট যে সকল ছাত্র ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে দুইজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের একজন পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর—অপরজন মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন (ইনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র নন)।" 'এই ন্যায়রত্ন হচ্ছেন আমতা-নারিটের প্রসিদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন। তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পর্যন্ত হয়েছিলেন।'[৮৮]

তর্ক পঞ্চানন মহাশয় বাল্যকালে পিতা হরিশ্চন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে ব্যাকরণ ও ধর্মশাস্ত্র শিখে শালিখায় আসেন ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে। জয়নারায়ণ কেবল ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা করেই ক্ষান্ত হননি—তিনি শালিখায় গুরুর মৃত্যুর পর একটি চতুষ্পাঠীও স্থাপন করেছিলেন। তখনকার নিয়মানুযায়ী ঐ সব ছাত্রদের যাবতীয় ব্যয়ভার গুরুমশায়কেই বহন করতে হত। তাই এই কেন্দ্রটি চালাতে জয়নারায়ণ মশায়কে ভীষণ অর্থ কষ্টে পড়তে হয়। বিদ্যাসাগরের মেজো ভাই শম্ভু চন্দ্র বিদ্যারত্ন তাই লিখেছেন—'অনন্তর শালিখা নিবাসী কতিপয় সদাশয় লোক তাঁহার চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের সাহায্য করিতে লাগিলেন।'

এতক্ষণে হয়তো আমরা তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের গুরুর নামটি জানবার জন্য খুবই

উৎসুক হয়ে উঠেছি। তাঁর নাম হচ্ছে পণ্ডিত প্রবর জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্ত। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে 'সংবাদপত্রের সেকালের কথা'য় লিখেছেন— "১৮০৬ সনের এপ্রিল মাসে কলকাতার দক্ষিণে ২৪ পরগনার অন্তর্গত মুচাদিপুর গ্রামে জয়নারায়ণের জন্ম হয়।...শালিখা নিবাসী জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্তের নিকট তিনি ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৮৪০-১১ই আগস্ট তর্কপঞ্চানন মাসিক ৮০ টাকা বেতনে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ন্যায়-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।'

আর এক বিদেশী পণ্ডিতের স্বদেশী গুরুর কথাও আমাদের জেলার ইতিহাসে সারস্বত সাধনায় এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে। এদেশের বিদ্দজ্জনের কাছে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ স্যার উইলিয়াম জোন্সের নাম সদাই পরিচিত। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এদেশে তদানীন্তন সুপ্রিম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি হয়ে আসেন। বিচারপতি হিসেবে সংস্কৃত শেখার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেন। কিন্তু মুস্কিল হল কিভাবে শিখবেন বা কেই-বা শেখাবেন। কোন সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণই ম্লেচ্ছ সাহেবকে দেবভাষা শেখাতে রাজী ছিলেন না। নিরুপায় হয়ে জোন্স সাহেব তাঁর বন্ধু কৃষ্ণনগরের মহারাজা শিব চন্দ্রের সাহায্য প্রার্থী হলেন। কিন্তু সমাজচ্যুত হওয়ার ভয়েতে কেউ তাঁকে সংস্কৃত শেখাতে রাজী হলেন না। অবশেষে কলকাতার খুব কাছেই পাওয়া যায় এক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে। বাড়ি তাঁর হাওড়া-শালিখা গ্রামে। তিনি হচ্ছেন পণ্ডিত রামলোচন কবিভূষণ। রামলোচনের সংসারে স্ত্রী, পুত্র-কন্যা কেউ ছিলেন না।[২৩] সুতরাং সমাজ চ্যুতির ভয় তাঁকে মোটেই টলাতে পারে নি। তিনি ঠিক করলেন যে উৎসাহী বিচারপতিকে তিনি সংস্কৃত শেখাবেনই। জোন্স সাহেবও হাতে যেন চাঁদ পেলেন। রামলোচন কবিভূষণ জাতিতে বদ্যি কায়স্থ হলেও বৈদ্য (চিকিৎসা) বিদ্যায়ও তিনি পারদর্শী ছিলেন। পল্লীর নিম্নবর্ণের লোকেরা তাঁর কাছে চিকিৎসা পেয়ে ধন্য হতেন। মাসিক একশ টাকা দক্ষিণায় কবিভূষণ জোন্স সাহেবকে সংস্কৃত শেখাতে সম্মত হলেন। তবে শর্ত ছিল কয়েকটি—যেমন পাল্কী করে তাঁকে শালিখা থেকে এসপ্লানেডে (মতান্তরে খিদিরপুর) যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে হবে। আর তাঁরই আদেশে জোন্স সাহেব একটি ঘরে নতুন করে শ্বেত পাথরের মেঝে করালেন। পড়ার ঘরে দুটি চেয়ার ও টেবিল ছাড়া অন্য কিছু থাকবে না। প্রতিদিন গঙ্গাজল দিয়ে ঘরটি ধোয়ারও ব্যবস্থা করা হল। সংস্কৃত অধ্যয়নের আগে খালি চা ছাড়া অন্য কিছু ভক্ষণ করতেন না জোন্স সাহেব। এই ক'রে জোন্স সাহেব একজন নিরামিষাশী হয়ে ওঠেন।[২৪] সংস্কৃত শিক্ষার জন্য একজন বিদেশী যে কত ত্যাগ স্বীকার ও আত্মপীড়ন সহ্য করতে পারেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছেন স্যার উইলিয়ম জোন্স।

বলা বাহুল্য, এক বছরের মধ্যে জোন্স সাহেব সংস্কৃত ব্যাকরণ বেশ ভাল করেই শিখলেন। একদিন পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে জোন্স সাহেব জানতে পারেন যে জার্মান সাহিত্যের মত সংস্কৃত সাহিত্যেরও নাটক আছে। পণ্ডিত মশায়ের কাছ

থেকে কবি কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটকের বইটি পড়ে ফেলেন। শুধু পড়াই নয়—ঐ বইটিকে প্রথমে ল্যাটিন ও পরে ইংরেজিতে অনুবাদ করে ইউরোপে পাঠান। অনুদিত গ্রন্থটি জোন্স সাহেব মহাকবি 'গেটে'কেও পাঠিয়ে দেন। 'কবি ঐ অনুবাদ পড়ে অলৌকিক আনন্দে মুগ্ধ হয়ে উঠলেন। তিনি আনন্দের মত্ততায় শকুন্তলার স্তুতিতে একটি কবিতা লিখে ফেলেন।'[২৫] স্যার উইলিয়ম জোন্স 'শকুন্তলা' অর 'দি ফ্যাটাল রিং' ইংরেজিতে প্রকাশ করেন ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর। ১৯৮৯ সালে ২০শে অক্টোবর কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়ামে ডঃ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের পৌরোহিত্যে শকুন্তলার ইংরেজী অনুবাদের দুশ বছর পূর্তি-অনুষ্ঠানে উইলিয়ম জোন্সের গুণপনা সম্বন্ধে সকল বক্তাই ছিলেন মুখর। তারই সঙ্গে কেউই কিন্তু রামলোচন কবিভূষণের নাম করতে ভোলেন নি। স্বয়ং জোন্স সাহেবও ঐ পুস্তকের ভূমিকায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন কবিলোচনের স্মৃতিতে।* তবে কবিলোচন ইংরেজী জানতেন না বলে অপর এক ইংরাজী জানা পণ্ডিতেরও সাহায্য নিয়েছিলেন। ১৮০৭ সালে টিগনমাউথ (Tignmouth) তাঁর লাইফ এণ্ড মেময়ার্স অব্ স্যার উইলিয়ম জোন্সের ভল্যুউম (নয়) গ্রন্থে লিখেছেন—**At length a very sensible Brahmin named Radhakant, who had been longattentive to English manners assisted by teacher Ram Lochan began it translating it verbally into Latin. Turned it word for word to English translated from the original Sanskrit and Pracit.**

তাই লিখি হাওড়াবাসীর পূর্বপুরুষদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গুরুর গুরু এবং স্যার উইলিয়ম জোন্সের মত বিদগ্ধ পণ্ডিতের সংস্কৃত শিক্ষকের অবস্থিতি কি কম গৌরবের ও শ্লাঘার বিষয়! বিদ্যাসাগরের বাঙ্গালীত্ব যেমন বাঙ্গালীর গৌরব সর্বস্ব তেমনি ম্লেচ্ছভাষীকে সংস্কৃতরূপ দেবভাষা শিক্ষা দেবার জন্য রামলোচনের অনন্য সাধারণ জেদও ইতিহাসে স্মরণ করার মত। আর প্রধানত অব্রাহ্মণ অধ্যুষিত এই গ্রামটিতে এঁদের আবির্ভাবও এক অবিশ্বাস্য সংবাদ। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র, জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্ত, রামলোচন কবিভূষণের মত প্রথিতযশা ব্যক্তিদের পাদস্পর্শে হাওড়ার ধুলোমাটি হাওড়াবাসীর কাছে তীর্থরেণুতে পরিণত হয়েছে।

হাওড়া জেলার আন্দুল গ্রামটিকে বলা হয় 'দক্ষিণের নবদ্বীপ'। প্রকৃতপক্ষে আন্দুল রাজাদের গুণগ্রাহীতায় এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের তপবিদ্যা সাধনার ফলে ঐ গ্রামস্থ সন্নিহিত অঞ্চলে সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার প্রভূত প্রসার ঘটেছিল। আন্দুলের বিদগ্ধ ও বিত্তশালী জগন্নাথ প্রসাদ ১৮৩২ সালে 'অমর কোষ' নামে একখানি বৃহৎ সংস্কৃত অর্থকোষ রচনা করে অমর হয়ে আছেন। এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'য় (২য় খণ্ডে) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন—'শ্রীযুক্তবাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক সম্প্রতি সংস্কৃত 'অমর কোষ' গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। তাহাতে প্রত্যেক সংস্কৃতের অর্থ বাঙ্গালাতে প্রস্তুত হইয়াছে। তাহা প্রায় ৪০০

* ঐ সভাতে লেখক স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন।

পৃষ্ঠা পরিমিত হইবে। এই মূল গ্রন্থ যাঁহাদের আবশ্যক তাঁহাদের ইহাতে মহোপকার হইবে।' তাঁর এই 'অমর কোষে'র বঙ্গানুবাদ ১৮৩৯ সালে 'শব্দ কল্পতরঙ্গিনী' নামে প্রকাশিত হয়।[২৬] এই অনুবাদের ভার নিয়েছিলেন শ্রীযুক্ত রামোদয় বিদ্যালঙ্কার নামে জনৈক পণ্ডিত। ব্রজেন্দ্রনাথ আরও লিখছেন—ঐ গ্রন্থ উক্ত বাবুর (জগন্নাথ প্রসাদ) অনুমতিতে শ্রীযুক্ত রামোদয় বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। অপর শ্রুত হওয়া গেল যে ঐ বাবু গ্রন্থটি বাঙ্গালাতে ভাষান্তরিত করিতেছেন। তাহা প্রস্তুত হইলেই মুদ্রাঙ্কিত করিবেন।'[২৭]

বিশিষ্ট লেখক প্রমথনাথ বিশীর মতে—১৮১৭ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের মহোত্তম যুগ। উমেশচন্দ্র দত্ত, ব্রহ্মমোহন মল্লিক, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অমৃতলাল বসু প্রমুখ ব্যক্তিগণ সেই সময়ের অনেক কিছু দেখেছেন। তাঁরা সেই যুগ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন আবার সেই যুগকে প্রভাবিত করেছেন। এঁদের মধ্যে কৃষ্ণকমল ও অমৃতলাল বাবুর সম্বন্ধে হাওড়াবাসীর বেশ দুর্বলতা আছে। কারণ কৃষ্ণকমলবাবু ও অমৃত-লালবাবু দুজনেই হাওড়া জেলায় দীর্ঘদিন বাসও করেছিলেন। কৃষ্ণকমল বাবুর নামেতো রাস্তাই রয়েছে কালীবাবুর বাজারের পাশে। কৃষ্ণকমল বাবু বিপিন গুপ্তের 'পুরাতন প্রসঙ্গ'*—এ নিজেই বলছেন—'১৮৬১ হতে আমি হাওড়ায় বাস করতাম।' হাওড়ায় ছিলেন প্রায় ১৮৮৩ পর্যন্ত অর্থাৎ ২২ বছর। আর অমৃত বাবুও হাওড়া শালিখায় শ্বশুর বাড়ির কাছে থাকতেন।** এই কৃষ্ণকমল বাবুর বিদ্যামত্তার খ্যাতি সেকালে পণ্ডিত ব্যক্তি মাত্রই শ্রদ্ধায় স্বীকার করতেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের তিনি অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ, সারদাচরণ মিত্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, কবি নবীনচন্দ্র সেন।[২৮] পরে হাইকোর্টে ওকালতি—এমনকি 'টেগোর ল' লেকচারারও হন। শেষ জীবনে রিপন কলেজের প্রিন্সিপাল হয়ে অবসর নেন। কৃষ্ণকমলের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় ফরাসী দার্শনিক কোঁৎ ও ইংরেজ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট ও পুষ্ট করেছিল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও কৃষ্ণকমলবাবুর পাণ্ডিত্যের গুণগ্রাহী ছিলেন। বিপিনবিহারী গুপ্তকে ১৩১৮, ১৪ই পৌষ তারিখে এক চিঠিতে লেখেন—কৃষ্ণকমলবাবু প্রবীণ পণ্ডিত, তিনি লেখেন না। এইজন্য তাঁহার মত ও স্মৃতি আপনি যেমন করিয়া আদায় করিয়াছেন তাহা না করিলে পাওয়াই যাইত না।[২৯]

ঠিক তেমনি হাওড়া পেল বিপিনবিহারী গুপ্তকেও। শৈশব ও যৌবন কলকাতায় কাটলেও তাঁর বার্ধক্যের বারাণসী কিন্তু ছিল হাওড়া রামকৃষ্ণপুরের মাটি। বরিশাল কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়ে জীবন শুরু। পরে আমৃত্যু কলকাতায় রিপন কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপনা করেন। সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হতে আচার্য

* বিদ্যাভারতী সংস্করণ।

** যাত্রা থিয়েটার অধ্যায়ে বিশদ বিবরণ আছে।

রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর আগ্রহই ছিল তাঁর প্রধান সম্বল। তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হচ্ছে 'পুরাতন প্রসঙ্গ।' 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' তাঁর অপর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ। ৬১ বছর বয়সে তিনি হাওড়া রামকৃষ্ণপুরে ১৩৪২ সালের ১৯শে মাঘ পরলোকগমন করেন।[৩০] হাওড়ায় এখনও তাঁর বংশধররা আছেন।

এবারে বঙ্কিম চন্দ্র, রবীন্দ্র নাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রসঙ্গে আসা যাক। শরৎচন্দ্র প্রথমে বাজে শিবপুরে কয়েক বছর কাটিয়ে হাওড়া-পানিত্রাসের সামতাবেড় নামক গ্রামে বাড়ি করেন। শেষ জীবনে তিনি বালিগঞ্জে অশ্বিনী দত্ত রোডেও বাড়ি করেছিলেন। সেই অর্থে শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাহিত্যজীবনের সম্পর্ক হাওড়াবাসীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বঙ্কিম চন্দ্র ও রবীন্দ্র নাথের ক্ষেত্রে তা হয়ে উঠেনি বা হয়ে ওঠা সম্ভবও ছিল না।

হাওড়ায় বঙ্কিম চন্দ্র—বঙ্কিম চন্দ্রের হাওড়ায় অবস্থান নেহাতই সরকারী কার্যোপলক্ষে। বঙ্কিম চন্দ্র হাবড়ায় (তখন হাওড়াকে হাবড়া লেখা বা বলা হত) তিনবার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসেন—যেমন ১৮৮১, (১৮৮৩-১৮৮৫ জুন) ও শেষবার (১৮৮৬-১৮৮৭) সাল। একবার তিনি হাওড়ায় ঘরও ভাড়া নিয়ে থাকেন বর্তমান পঞ্চাননতলা রোডে। এখন সেখানে একটি বঙ্কিম চন্দ্রের আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করে খালি জায়গাটিকে 'বঙ্কিম পার্ক' নামে নামাঙ্কিত করে স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করেছেন হাওড়া পৌরসভা। এই বাড়িটিকে ঘিরে যে ইতিহাস আছে তাও কম চমকপ্রদ নয়। বঙ্কিম চন্দ্রের হাওড়ায় থাকার সুবাদে অনেক গুণী ব্যক্তিরই আগমন ঘটত এখানে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও কিশোর বয়সে এই বাড়িতে এসে বঙ্কিম সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। সেদিনের সেই ইতিহাস 'জীবন স্মৃতি'-তে বিশ্বকবি নিজেই লিখে গেছেন। কারণ এই রকম মণিকাঞ্চন যোগ খুব কমই ঘটে। তিনি লিখেছেন—অবশেষে একবার যখন হাওড়ায় তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখন সেখানে তাঁহার বাসায় সাহস করিয়া দেখা করিতে গিয়াছিলাম। দেখা হইল, যথাসাধ্য আলাপ করিবারও চেষ্টা করিলাম। কিন্তু ফিরিয়া আসিবার সময় মনের মধ্যে যেন একটা লজ্জা লইয়া ফিরিলাম। অর্থাৎ আমি যে নিতান্তই অর্বাচীন, সেইটে অনুভব করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমন করিয়া বিনা পরিচয়ে বিনা আহ্বানে তাঁহার কাছে আসিয়া ভালো করি নাই। বঙ্কিম সন্দর্শনে রবীন্দ্রনাথ আরও কয়েকবার গিয়েছেন তবে সেটা হাওড়ায় নয়—কলকাতার ভবানীচরণ দত্ত স্ট্রীটের বাড়িতে।

বঙ্কিম চন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে হাওড়ায় তিনবার এলেও কোন বারই এক নাগারে বেশীদিন ছিলেন না। হাওড়ায় অবস্থান বঙ্কিম চন্দ্রের জীবনে মোটেই সুখকর হয়নি। প্রথমবার (১৮৮১) আসার পরই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সি. ই. বাকল্যাণ্ডের সঙ্গে ঘোরতর বিবাদ বাধল। বিবাদের কারণ হল বঙ্কিম চন্দ্র পুলিশের চালানি মোকদ্দমাগুলি প্রায়ই প্রমাণাভাবে ছেড়ে দিতেন। একবার হাবড়া মিউনিসিপ্যালিটি থেকে নোটিশ জারি করা হল যে **Combustible** (দাহ্য) পদার্থ দিয়ে

বাড়ি আচ্ছাদিত করা চলবে না। যদি করা হয় তা হলে দণ্ডার্হ হবে। পৌরসভার তদানীন্তন সেক্রেটারী ছিলেন মিঃ ডনিথরন নামে এক শ্বেতাঙ্গ। Combustible-এর বাংলা করা হল 'জলীয়'। এই নোটিশ এক বুড়ীর বাড়িতে গিয়ে পড়ল। তার একখানি গোলপাতায় আচ্ছাদিত ঘর ছিল। সে লেখাপড়া জানে না। 'নোটিশে "তিনি (সেক্রেটারী) 'জলীয়' কি 'জ্বলীয়' লিখিয়াছিলেন আমি তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না।'* বুড়ী এক দিগ্‌গজ প্রতিবেশীর কাছে নোটিশটি নিয়ে যায়। সে তাকে জল দিয়ে ঘর না ছাইতে পরামর্শ দেয়। বুড়ী পাতার ঘরকে জল মুক্ত করার নামে আরও Combustible (দাহ্য বা জ্বলীয়) করে তুললো। পৌর সভা থেকে কিছুদিনের মধ্যেই অনুসন্ধান করে বুড়ীকে আইন ভাঙ্গার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়। বুড়ীর বিচার করতে গিয়ে বঙ্কিম চন্দ্র বুঝলেন কোথায় যেন অনর্থ ঘটেছে। যে নোটিশের অর্থ বিচারক স্বয়ং বুঝে উঠতে পারছেন না—তা একজন মূর্খ স্ত্রীলোক কি করে বুঝবে? তাই বৃদ্ধাকে বঙ্কিম চন্দ্র মুক্তি দেন।

বৃদ্ধাকে মুক্তি দেওয়া নিয়ে বাকল্যাণ্ড সাহেব রেগে গিয়ে বঙ্কিম চন্দ্র সম্বন্ধে অপমান সূচক মন্তব্য লেখেন। এইভাবে দুয়ের মধ্যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়। যদিও পরে সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটকে তাঁর লিখিত মন্তব্য তুলে নিতে হয়েছিল। দ্বিতীয়বার (১৮৮৩) যখন তিনি হাওড়ায় বদলি হন তখনও ই. ভি. ওয়েষ্ট মেকট নামে অপর এক শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে তাঁর কলহ বাধে। এবারও রেলের সঙ্গে এক মোকদ্দমায় বঙ্কিম চন্দ্রের রায়েতে মেকট সাহেব সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। মেকট সাহেবও বঙ্কিম চন্দ্রকে বেগ দিতে ছাড়েন নি; তিনি আদেশ দেন যে বঙ্কিম চন্দ্রকে হাওড়ায় বাস করতে হবে—কলকাতা থেকে যাতায়াত করা চলবে না। তারই ফলে বঙ্কিম চন্দ্রকে হাওড়ায় বাসা করতে হল যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এর অল্পকাল পরে মেকট সাহেবও বদলি হয়ে যান।

বঙ্কিমচন্দ্রও ১৮৮৫ সালের মার্চ মাসে তিন মাসের ছুটি নিয়ে হাওড়া থেকে দ্বিতীয়বার বিদায় নেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে বদলি হয়ে ১৮৮৬ সালে শেষ তিন মাসের প্রথম দিকে আবার হাওড়ায় আসেন। কিন্তু তখন মেকট সাহেব আবার হাওড়ায় ম্যাজিস্ট্রেট রূপে কাজ করায় বঙ্কিমচন্দ্র বিবাদ এড়াতে ছ'মাসের ছুটি নেন। ছুটির পরই মেদিনীপুরে চলে গেলেন—১৮৮৭-তে।

আগেই বলা হয়েছে, হাওড়ার সঙ্গে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটা আত্মিক যোগ ছিল। তিনি হুগলী জেলার দেবানন্দপুরে জন্মালেও পরবর্তীকালে প্রথমে হাওড়া শহরে ও পরে গ্রামেতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। আজ তাঁর পানিত্রাস-সামতাবেড়ের বাড়িটি একটি সংরক্ষণ শালায় পরিণত হয়েছে। শরৎচন্দ্র বাজে শিবপুরে থাকাকালীন (১৯১৬ সাল থেকে) তাঁর বাড়িটি একটি সাহিত্যিকদের তীর্থ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। একাধারে যেমন এখানে বসে তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন অন্যধারে হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতিরূপে দেশের মুক্তি

* বঙ্কিম জীবনী—শচীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সাধনেও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। শুধু সাহিত্যিক কেন দেশ সেবায় নিবেদিত বিপ্লবীরাও গোপনে তাঁর কাছে অর্থ সাহায্যের জন্য এখানে আসতেন। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে 'অনুশীলন সমিতি'র প্রাণপুরুষ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী মাঝে মাঝে শরৎচন্দ্রের কাছে শিবপুরের বাড়িতে আসতেন—উদ্দেশ্য বিপ্লবী কাজে অর্থ সাহায্য। বিপিনবাবু শরৎচন্দ্রের মাতুল ছিলেন। শরৎচন্দ্র কেবল মানব সেবার জন্য অর্থ দেননি পশু কল্যাণেও নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। একসময়ে হাওড়া পশু ক্লেশ নিবারণী সমিতি (C. S. P. C. A.) বা সোসাইটি ফর প্রিভেনসন অব ক্রুয়েলটি টু এ্যানিমেলস-এর তিনি ছিলেন চেয়ারম্যান। হাওড়া পৌরসভার মূল ভবনের পূর্ব কোণের দোতলার বাড়িটির তলার ঘরটিই ছিল তাঁর অফিস ঘর। আজও শ্বেতপাথরের সেই ট্যাবেলেটটি লাগানা আছে তবে পোস্টারের দৌরাত্ম্যে পাঠোদ্ধার করা কষ্টকর হবে। এখানে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হল। তা থেকেই শরৎচন্দ্রের পশুপ্রীতি সম্বন্ধে তাঁর আন্তরিকতা ফুটে উঠবে। শরৎচন্দ্রের অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন ঢাকার চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখক ও অধ্যাপক হিসেবেও তাঁর বেশ নাম ডাক ছিল। একবার শরৎচন্দ্র বন্ধুর বাড়ি ঢাকায় যাবেন বলে বাড়ি থেকে রওনা হয়ে রেল স্টেশনে এলেন। কিন্তু সেদিন ১লা এপ্রিল, ১৯৩০ কলকাতা ও হাওড়ায় গাড়োয়ানরা সত্যাগ্রহ ও ধর্মঘট করায় পশুদের কি হবে তা ভেবে তিনি আর বন্ধুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারলেন না। শরৎচন্দ্রের চিঠিটি এখানে উদ্ধৃত করা হল।

হাওড়া Rly. Station.
1st April, 1930

ভাই চারু,

আজ ঢাকার জন্যে রওনা হয়েও বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। আজ কলকাতায় গাড়োয়ানের দল C. S. P. C. A.-র কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করায় একটা মহামারী ব্যাপার ঘটে। **Sergeant**-দের সঙ্গে পেটাপেটি হয়,—কেল্লা থেকে গোরা এসে গুলি চালায়। শুনছি ৪ জন মরেছে। ও তো গেল কলকাতার কথা। কিন্তু হাবড়া শহরেও C. S. P. C. A. আছে এবং আমি তার **Chairman.** আজ হাবড়ার **Magistrate** এবং S. P. কোনমতে হাবড়ার দাঙ্গা বাঁচিয়েছে। কিন্তু কাল কি ঘটে বলা যায় না। অথচ এই **Department**-এর কর্তা হয়ে আমার এ সমায়ে দেশ ছেড়ে কোথাও যাওয়া চলে না। এইজন্যেই মাঝপথ থেকে ফিরে যাচ্ছি।[৩৩]

ইতি—
তোমার শরৎ

শরৎচন্দ্রের পানিত্রাসের বাড়িতে একটি কুকুর ছিল। তার নাম ছিল ভেলো। ভেলো ছিল তাঁর অতি প্রিয়। তার মৃত্যুতে শরৎচন্দ্র হাউ হাউ করে কেঁদেছিলেন। 'হাওড়া বার্তার প্রবীণ সম্পাদক ডাঃ শম্ভু চরণ পাল তাঁর স্মৃতিচারণে বলেন—পরে

ভেলোর চামড়া ট্যান করে ঘরে স্টাকড্ অবস্থায় সাজিয়ে রাখতেন। কেউ গেলেই বলতেন এই দ্যাখো ভেলো বসে আছে।

বাজে শিবপুরের বাড়িতে শরৎচন্দ্র বেশ কয়েক বছর (প্রায় দশ বছর) ছিলেন। এই বাড়িতে বসে তিনি যে কটি প্রশংসনীয় সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন তার মধ্যে 'চরিত্রহীন' ও ছিল।* কিন্তু এই বইটি লিখতে গিয়ে প্রতিবেশীদের হাতে তাঁকে ভীষণ হেনস্তা হতে হয়েছিল। সে কাহিনী শুনলে আজকের হাওড়াবাসীরা নিজেরাই লজ্জা পাবেন।

হাওড়া বার্তা'র বর্ষীয়ান সম্পাদক ডাঃ শম্ভু চরণ পালের মুখের কথাই এখানে তুলে ধরা হল। হাওড়া শরৎচন্দ্রকে দুবার কাঁদিয়েছিল। প্রথম ঘটনাটি ঘটে শিবপুরের বাড়িতে। শরৎচন্দ্র তখন 'চরিত্রহীন' লিখছেন। লেখা প্রায় শেষ। পাড়ার লোকেরা খবর পেয়ে একদিন শরৎচন্দ্রের বাড়ি আক্রমণ করল। তাদের দাবি ভদ্র পাড়ায় বসে 'চরিত্রহীন' নামে উপন্যাস লেখা চলবে না। সেই চরিত্রবানরা শরৎচন্দ্রের ঘরে ঢুকে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটি কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলল। পরে আমাদের একথা বলতে গিয়ে শরৎচন্দ্র কান্না চাপতে পারেননি। বইটি তিনি আবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নতুন করে লেখেন।[৩*] হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি থাকাকালীন তিনি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে জেলার বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী হিসেবে কাজ করেছিলেন। সেই সুবাদে শরৎচন্দ্রের বাড়িতে তাঁর যাতায়াত ছিল। ডাঃ পাল ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৯১ সালে মারা যান।

শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার কথা বলা যাক। এই ঘটনাটি পানিত্রাসে থাকাকালীন ঘটেছিল। শরৎচন্দ্র যাঁদেরকে অন্তস্থল থেকে ভালবাসতেন তাদের মধ্যে কবি নরেন দেব ও রাধারানী বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এঁদের বিয়ের প্রধান ঘটক ও পরামর্শদাতা ছিলেন স্বয়ং শরৎচন্দ্র। পরে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এ বিবাহে আনন্দে সম্মতি দিয়েছিলেন। পাঠক হয়তো অবগত আছেন যে রাধারানী ছিলেন বিধবা। তের বছর আট মাস বয়সে রাধারানীর বৈধব্য দশা শরৎচন্দ্রকে পীড়িত করেছিল। তারই একটা বিহিত করতে নরেন দেবের সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঠিক করেন। সেই বিয়েটি হয়েছিল হাওড়া লিলুয়ার বাগানবাড়িতে। বাড়িটির নাম ছিল 'দেবালয়'। লিলুয়ার 'দেবালয়'-তে সেযুগে বাংলা দেশের সাহিত্যিক কবি প্রমুখ গুণীজনের নিয়মিত উপস্থিতিতে চাঁদের হাট বসে যেতো। কবি নরেন-দেবের বিয়ে—তাও আবার বিধবা রাধারাণীর সঙ্গে। সুতরাং নামী সাহিত্যিক ও সাংবাদিক সবাই গিয়ে পেঁছেছেন বিবাহবাসর লিলুয়ার 'দেবালয়ে'।** বিয়েতে কল্লোল গ্রুপকে প্রথমে নেমন্তন্ন না করলেও তাঁরা নরেনদার বিয়ে শুনে সবাই 'দেবালয়ে' এসে হাজির। এঁদের মধ্যে ছিলেন অচিন্ত্য, প্রেমেন্দ্র, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ প্রমুখ।

---

* হাওড়া শহরের ইতিবৃত্ত—অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

* স্টেশন থেকে মিনিট ছয়েকের পথ। এটি রাধারানী দেবীর শ্বশুর বাড়ির সম্পত্তি ছিল।

ভারতী গ্রুপের প্রধান নায়ক বর্ষীয়ান সাহিত্যিক ও সম্পাদক জলধর সেনও যথাসময়ে এসে হাজির। কিন্তু যাঁর বিহনে সবাই হত তিনি হচ্ছেন শরৎচন্দ্র। এ যেন শিবহীন যজ্ঞ হতে চলেছে। সত্যি সেদিন বিবাহবাসরে শরৎচন্দ্র ছিলেন অনুপস্থিত। আসলে শরৎচন্দ্রকে যে ছেলেটি মারফৎ চিঠি দিয়ে সব জানানো হয়েছিল সে চিঠি আর তাঁর কাছে পৌঁছায়নি। কারণ সে ছেলেটি পথে তার পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনে সোজা তাদের গ্রামে চলে যায়। সেই নিয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে নবদম্পতির সম্পর্ক মধুর করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। সেদিনের লিলুয়ার 'দেবালয়' সাহিত্যিক, নাট্যকার ও কবিদের কাছে কি রকম ছিল তা হেমেন্দ্রকুমার রায়ের গান থেকেই বোঝা যাবে—

বাবু, পাঁচ মিনিটের ট্রেন জার্নি—
টিকিট এক আনা—
দেবদেবী দর্শন মিলে গা—
ইলিশ মুর্গী খানা—

সেই ইলিশ নিয়ে শিশির ভাদুড়ি আবৃত্তি করতে করতে ঢুকছেন—

বহুদিন মনে ছিল আশা
ধরণীর এক কোণে রহিব আপন মনে,
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা।[৩৫]

এর সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গও এসে যায়। জোড়াসাঁকো ও হাওড়ার মধ্যে ব্যবধানের মাত্রা কেবল গঙ্গা পারাপার। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু খুব কমই হাওড়ায় এসেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে তরুণ বয়সে একবার এসেছিলেন। সেকথা আগেই বলা হয়েছে। আর হাওড়া টাউন হল-এ শরৎচন্দ্রের এক সম্বর্ধনা সভায় এসেছিলেন। যা হোক রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালীকে জগৎসভায় যে উঁচু স্থানে বসিয়ে দিয়ে গেছেন তা বঙ্গবাসী চিরকাল কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রতিভা আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা প্রবন্ধের বিচার্য বিষয় নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে ছেলেবেলায় যিনি সাহিত্য চর্চায় আকৃষ্ট করেছিলেন এবং সাহিত্য রচনায় প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন তিনি কিন্তু ছিলেন হাওড়ার অধিবাসী। তাঁর নাম অক্ষয় চন্দ্র চৌধুরী। অক্ষয়বাবুর জন্মস্থান ছিল দক্ষিণবঙ্গের 'নবদ্বীপ' আন্দুল গ্রামে। সেখানে বিখ্যাত রায়চৌধুরী পরিবারের সন্তান ছিলেন তিনি। পিতার নাম মিহির চৌধুরী। সে যুগে তিনি একজন নামকরা এ্যাটর্নী ছিলেন। অক্ষয়চন্দ্রও পিতার ন্যায় ওকালতি পাশ করে কলকাতা হাইকোর্টে এ্যাটর্নীর কাজ করতেন।[৩৬] গান ও কবিতা রচনায় অক্ষয়বাবুর মুন্সিয়ানা ছিল। যদিও গানের গলাটা প্রায়ই সুরে বেসুরে বেজে উঠত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবন স্মৃতি' গ্রন্থে লিখছেন—বাংলা কত উদ্ভট গানই তাঁহার মুখস্থ ছিল। সে গান সুরে বেসুরে যেমন করিয়া পারেন, একেবারে মরিয়া হইয়া গাহিয়া যাইতেন। সে সম্বন্ধে শ্রোতারা আপত্তি করিলেও তাঁহার উৎসাহ অক্ষুণ্ণ থাকিত।

অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গীত রচনা সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'জীবন স্মৃতি'-তে লিখছেন—আমি পিয়ানো বাজাইয়া নানাবিধ সুর রচনা করিতাম। আমার দুই পার্শ্বে অক্ষয় চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কাগজ পেন্সিল লইয়া বসিতেন। আমি যেমনি একটি সুর রচনা করিলাম অমনি ইঁহারা সেই সুরের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ কথা বসাইয়া গান রচনা করিতে লাগিয়া যাইতেন। একটি নতুন সুর তৈরী হইবামাত্র সেটি আরও কয়েকবার বাজাইয়া ইঁহাদিগকে শুনাইতাম। সেই সময় অক্ষয়চন্দ্র চক্ষু মুদিয়া বর্মা সিগারেট টানিতে টানিতে মনে মনে কথার চিন্তা করিতেন। পরে যখন তাঁহার নাক মুখ দিয়া অজস্রভাবে ধূমপ্রবাহ বহিত তখন বুঝা যাইত যে, এইবার তাঁহার মস্তিষ্কের ইঞ্জিন চলিবার উপক্রম করিয়াছে। তিনি অমনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া চুরুটের টুকরাটি সম্মুখে যাহা পাইতেন, এমনকি পিয়ানোর উপরেই তাড়াতাড়ি রাখিয়া দিয়া হাঁফ ছাড়িয়া 'হয়েছে হয়েছে' বলিতে বলিতে আনন্দদীপ্ত মুখে লিখিতে শুরু করিয়া দিতেন। রবি কিন্তু বরাবর শান্তভাবেই ভাবাবেশে রচনা করিতেন। রবীন্দ্রনাথের চাঞ্চল্য কচ্চিৎ লক্ষিত হইত। অক্ষয়ের যত শীঘ্র হইত রবির রচনা তত শীঘ্র হইত না।

এবার সাহিত্যের দিকটাই বলি। অক্ষয় চন্দ্র ইংরেজিতে এম. এ. ছিলেন। বায়রন, শেলী ও শেক্সপীয়ারের কাব্য সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। রবীন্দ্র-নাথের বাল্যকালে অক্ষয় চন্দ্র বিশেষভাবে তাঁর কাব্য প্রতিভাকে উসকে দিতে এমনকি সংশোধন করে দিয়ে সাহিত্য রচনায় উৎসাহিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখছেন—সাহিত্যভোগের অকৃত্রিম উৎসাহ সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের চেয়ে অনেক বেশি দুর্লভ; অক্ষয়বাবুর সেই অপর্যাপ্ত উৎসাহ আমাদের সাহিত্য বোধশক্তিকে সচেতন করিয়া তুলিত।[৩৭]

প্রকৃতপক্ষে ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে তথা বৈষ্ণব সাহিত্য, টপ্পা, কবিকঙ্কন, মুকুন্দরাম, রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র, কবিয়াল রাম বসু, হরঠাকুর ও শ্রীধরের মত কথকদের প্রতি তাঁর আগ্রহ ও কাব্যপাঠের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট ছিল। তিনি সাহিত্যরস লেখকের মধ্যে ধরাতে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও তাই লিখছেন—'নিজের লেখা তাঁহাকে কত শুনাইয়াছি এবং সে লেখার মধ্যে যদি সামান্য কিছু গুণপনা থাকিত তবে তাহা লইয়া তাঁহার কাছে কত অপর্যাপ্ত প্রশংসালাভ পাইয়াছি। যোগ্য গুরুর এখানেই পরম সার্থকতা।' আর হাওড়াবাসী হিসাবে এই গর্ব রাখার জায়গা কোথায়!

আসলে অক্ষয়চন্দ্র ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের (রবীন্দ্রনাথের দাদা) বন্ধু। সেই সুবাদেই ঠাকুর বাড়িতে তাঁর আনাগোনা ছিল ঘরের লোকের মত। রবীন্দ্রনাথও তাই সান্নিধ্য লাভে বঞ্চিত হননি। অক্ষয় চন্দ্রের জন্ম—১৮৫০, মৃত্যু—১৮৯৮ সাল।[৩৮]

সাহিত্যিক অক্ষয় কুমার দত্ত জীবন সায়াহ্নে বালিতে বিরাট বাড়ি কিনে বেশ কয়েক বছর বাস করেন। সেই বাড়ির অস্তিত্ব আজও আছে। তবে মালিকানা বদলে

গেছে। জি. টি. রোডের ঠিক ওপরেই বাড়িটি আজ জাহাজী কোম্পানীর মেরামতি কেন্দ্র হিসেবে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। এই বাড়ির তখন নাম ছিল 'শোভনোদ্যান'। এই বাড়িতে বসেই অক্ষয়বাবু তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' নামক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণামূলক বইটির দুটি খণ্ড শেষ করেন। ১ম খণ্ড (১৮৭০) ও দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৮৩) সালে প্রকাশিত হয়। তিনি তাঁর 'শোভন' উদ্যানে বৃক্ষ-লতাদি সম্বন্ধে গবেষণা কাজও চালাতেন। বালির এই উদ্যানটি সম্বন্ধে ছন্দকবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মন্তব্যটি বড়ই মূল্যবান। তিনি লিখছেন—ছোট হইলেও সেকালে কনিষ্ঠ বোটানিক্যাল নামে পরিচিত ছিল।…নানা দেশ হইতে আনীত এত বিচিত্র তরুলতার সংগ্রহ এদেশে অন্য কোন উদ্যানে ছিল না।[৩৯] পাঠক জেনে পুলকিত হবেন যে সমসাময়িক সাহিত্যিক ও সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র সরকার বালির এই 'শোভনোদ্যানটির' নামকরণ করেছিলেন 'চারুপাঠ ৫ম ভাগ'। স্মরণ করা যেতে পারে যে 'চারুপাঠ ৪র্থ ভাগ' পর্যন্ত অক্ষয় কুমারের সাহিত্য কীর্তি সে যুগে ঘরে ঘরে আদৃত ছিল।

কল্যাণেশ্বর তলায় মন্দির নির্মাণে তিনিই উদ্যোগী হয়ে ব্যয়ভার বহন করেন। তাঁরই পৌত্র হচ্ছেন ছন্দ কবিশ্রেষ্ঠ সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত। এই সত্যেন্দ্র নাথের শ্বশুর বাড়ি ছিল শালিখায়। বিখ্যাত 'বাঙ্গালবাবু'-র (রামযতন বসু) বাড়ির জামাই ছিলেন তিনি। রামযতনের দুই ছেলে রামরতন ও রাজলোচন। রাজলোচনের পুত্র বিখ্যাত ঈশানচন্দ্র বসুর কন্যা কনকলতার সঙ্গে সত্যেন্দ্র নাথের বিবাহ হয়। সেই সুবাদে হাওড়ার সঙ্গে কবির বেশ সৌহার্দ্র সম্পর্ক ছিল। জামাই শিবভক্ত বলে শ্বশুর নিজ বাড়িতে একটি শিব মন্দিরও তৈরী করেন। আজও বাঙ্গালবাবুর পোলের নিচে টেলিফোন এক্সচেঞ্জের পাশে বাড়িটি রয়েছে, রয়েছে শিব মন্দিরটিও। আজ আর সে বাড়িতে কোন বঙ্গবাসীকে দেখতে পাওয়া যাবে না। মালিকানা পালটে গেছে। তাঁর মৃত্যু হয় অদ্ভুত উপায়ে। কোন পীড়া নেই। রাতে একটু দেরিতে আহার করে সুপারির একটি বড় টুকরো চিবতে চিবতে ভয়ানক বিষম লাগল। অবিলম্বে শ্বাসরোধ হয়ে তিমি মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।*

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শালকিয়ায় এক প্রসিদ্ধ নাট্যকারের জন্ম হয়েছিল। তাঁর নাম আজ স্মৃতির অন্তরালেই প্রায় চলে গেছে। তিনি হচ্ছেন হরিশ চন্দ্র মিত্র। জন্ম ১৮৩৮-৩৯ সাল। সাংবাদিকতা ও বহু সাহিত্য পত্রিকা নিজ হাতে পরিচালনা করে ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন। কিন্তু তাঁর নাটকগুলি একদা দর্শক সমাজে বিশেষ রেখাপাত করেছিল। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক ছিল—হাস্যরস তরঙ্গিণী, ম্যাও ধরবে কে ?, ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে, কীচক বধ-কাব্য, নির্বাসিতা সীতা, বিধবা বঙ্গাঙ্গনা ও হতভাগ্য শিক্ষক প্রভৃতি।

হাওড়া জেলা স্কুলের শিক্ষক বিধুভূষণ ভট্টাচার্য (মুখোপাধ্যায়) 'হাওড়া হুগলীর কথা' ও 'রায়বাঘিনী' লিখে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাঁরই ছেলে

* বাংলার মনীষী—রথীন মিত্রর লেখায় ও রেখায়—সাপ্তাহিক বর্তমান ১৩ই জুন '৯৮।

বাণীকুমার (আসল নাম বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়) কলকাতা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে সর্বজন পরিচিত। মহালয়ার দিন মহিষাসুরমর্দিনীর স্তব পাঠ করে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র যে খ্যাতি লাভ করেছিলেন তা বাণীকুমারেরই রচিত। বীরেন্দ্রকৃষ্ণের পরলোকগমন সংবাদে (৪ঠা নভেম্বর ১৯৯১) আনন্দবাজার পত্রিকা লিখছে—বীরেন্দ্রবাবুর মহিষাসুর মর্দিনীর স্তোত্রপাঠ করার ব্যাপারটি অবশ্য একেবারেই নাটকীয় এবং কাকতালীয়। বাণীকুমার স্ক্রিপট লিখেছিলেন। পঙ্কজ মল্লিক জুড়েছিলেন গানগুলি। দশ বছর বয়স থেকে চণ্ডী মুখস্থ থাকায় বীরেনবাবু অনেকটা নিজের মনেই স্ক্রিপটটি পড়ছিলেন। সেই সময়ই এক রকম স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঠিক হয়ে যায়, তিনিই মূল অনুষ্ঠানে স্তোত্রপাঠ করবেন। আজ পর্যন্ত সেই মহালয়ার অনুষ্ঠানই বেতারে চলে আসছে অপ্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে। এই 'বাণীকুমার' হাওড়ার সন্তান। প্রখ্যাত পণ্ডিত ডঃ সুকুমার সেনও তাঁর 'দিনের পরে দিন যে গেল' গ্রন্থে লিখছেন—ইনি (বৈদ্যনাথবাবু) বেতারে চাকরি পেয়েছিলেন কলকাতায়। সেখানে থেকে উনি যথেষ্ট গান করেছিলেন। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ (ভদ্র) বাবুর এবং অপর সহযোগী গুণীদের সঙ্গে মিলে ইনি বেতারে মহালয়ার ভোরের অনুষ্ঠানের বহুবর্ষস্থায়ী যে ব্যবস্থা করেছিলেন, তা আমাদের আধুনিক সংস্কৃতির অঙ্গরূপে গণ্য হয়েছিল।

দুর্গাদাস লাহিড়ীর নাম অনেকেই ভুলে গেছি। পুরাতন পাঠাগারে আজও তাঁর অক্ষয় কীর্তি 'পৃথিবীর ইতিহাস' খুঁজে পাওয়া যাবে। একাধিক খণ্ডে লিখিত এই বইটিতে বিশ্বের ইতিহাসের খবর পাওয়া যাবে। এজন্য তিনি একটি ছাপাখানাও স্থাপিত করেছিলেন। তার নাম ছিল Albion Press। বেদের অনুবাদ তাঁর আর এক স্মরণীয় কাজ। তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস সাত খণ্ডে সমাপ্ত করেই মারা যান।

বিংশ শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট কবি ও সমালোচক ছিলেন মোহিত লাল মজুমদার। জীবনের শেষের দিকে তিনি বছর চারেক হাওড়ার বাগনান গ্রামে কাটিয়ে গেছেন। বাগনান স্টেশনের রেল লাইনের ঠিক উত্তর দিকে লাল বাড়িটিতেই তিনি ছিলেন। এটি তাঁর এক বন্ধুর বাড়ি ছিল। কবি জীবনীকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মতে ১৯৪৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নিয়ে রুগ্ন শরীর ভাল করবার জন্য সোজা তিনি বাগনানের 'লাল বাড়িতে' এসে ওঠেন। কিন্তু কবিপুত্র মনসিজ মজুমদার 'পিতৃ ও তর্পণ' প্রবন্ধে[৪০] লেখেন—চাকুরির মেয়াদ শেষ হবার এক বছর আগেই ১৯৪৩-এ বাবা অবসর নিয়ে চলে আসেন হাওড়া জেলার বাগনানে। সেখানে মোহিতলাল ১৯৪৪-৪৭ সাল পর্যন্ত ছিলেন। এই বছরগুলিতে তিনি সারাদিন লেখা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। বাগনানে ভাড়া বাড়িতে এসে কবি বেশ কষ্টেই পড়েন। কবি পত্নী তরুলতা দেবী তাঁর জবানীতে বলছেন—ঢাকা থেকে চলে আসার পর হঠাৎ টাকা পয়সার বেশ ধাক্কা খেতে হল। তবে ও আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। বাগনানে থাকবার সময় ওঁর উপার্জন ছিল শুধু লেখালেখি থেকেই। বাগনানে থাকাকালীনই কবির লেখা 'বাংলা কবিতার ছন্দ' (১৯৪৫ সাল), 'বাংলার নবযুগ'

(১৯৪৬ সাল), জয়তু নেতাজী' (১৯৪৬ সাল), কবি শ্রীমধুসূদন (১৯৪৭ সাল) লেখেন। এর মধ্যে 'বাংলার নবযুগ' প্রবন্ধের বইটি আজ দুষ্প্রাপ্য হলেও যে কোন শিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তিকে ইহা নাড়া দেবে। বাগনানের পর তিনি বড়িষায় চলে যান। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

কবি জীবনের সঙ্গে হাওড়ার সম্পর্ক এখানেই শেষ হয়। কিন্তু কবির প্রথম জীবন সংগ্রামে যে এই জেলারই একটি অংশে শুরু হয়েছিল সেকথা, কিন্তু খুব কম পাঠকই জানেন। তথ্যানুসন্ধান করতে গিয়ে সেই স্বল্প জানিত ঘটনাটির একটু বিবরণ দেওয়া হল। কবিবন্ধু কবিশেখর কালিদাস রায় 'চল্লিশ বছরের বন্ধু মোহিতলাল' প্রবন্ধে[৪১] লিখছেন—কবির যৌবন কালটাও স্বচ্ছল অবস্থার মধ্য দিয়ে কাটেনি। ছাত্র জীবনে অনেক সুবিধা সুযোগ পাননি। ছাত্রব্রত উদ্‌যাপনের আগেই চাকরি নিতে হয়েছিল। মাস্টারি করতে হয়েছে অনেক দিন।' এই মাস্টারিই শুরু করেন প্রথম হাওড়ার 'শালিখা হিন্দু স্কুলে'। সদ্য বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে (তখনকার মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন) কৃতিত্বের সঙ্গে বি. এ. পাশ করেই ১৯০৮ সালে এই স্কুলে যোগদান করেন একেবারেই সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে। সেই সময় ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন অচ্যুত দত্ত। এই অচ্যুত দত্তই পরবর্তী কালে এক প্রসিদ্ধ ইংরেজির অধ্যাপক হয়ে বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যক্ষ পদে আসীন হন। হিন্দু স্কুলে ঢোকার পরের বছরই অর্থাৎ ১৯০৯ সালে মোহিত লালের বিবাহ হয়। বছর দেড়েক মোহিতলাল এই স্কুলে ছিলেন। তারপরই কমিটির সঙ্গে ছুটি জনিত দিনে মাইনে কাটা নিয়ে মনোমালিন্য হলে চাকরি ছেড়ে চলে যান।* এই মোহিত লাল সম্পর্কেই এ যুগের বিখ্যাত লেখক নীরদ চন্দ্র চৌধুরী তাঁর বিখ্যাত An Autobiography of an unknown Indian (1951) গ্রন্থের ২৮৯ পৃষ্ঠায় 'মাষ্টার মশাই' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখছেন—**I remember him as something more than one of my teachers, for as Mohit Lal Mazumdar the distinguished contemporary poet and critic, he exerted a very strong and beneficial influence on my later life. He introduced me to the literary society of Calcutta and made a writer of me almost by main force.**

একজন যোগ্য শিক্ষকের পক্ষে এহেন কৃতবিদ্য ছাত্রের লেখনী থেকে আর বেশি কি প্রশংসা পাওয়ার আছে !

* মোহিত লালের জীবনের এই অনাস্বাদিত তথ্যটি আমাকে দিয়ে সহায়তা করেছেন উক্ত স্কুলের অবসর প্রাপ্ত প্রবীণ শিক্ষক পরেশ মিত্র মশায়। তিনি আরও জানান যে সে সময়ে বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন শালিখার বিশিষ্ট ধনাঢ্য বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি রাসবিহারী ঘোষাল। রাসবিহারীবাবু স্কুলের কোন এক অনুষ্ঠানে এই গল্পটি করেছিলেন। আলোচনার সময় উপস্থিত ছিলেন ঐ স্কুলের অন্যতম প্রধান শিক্ষক কালীপদ গাঙ্গুলী। পরেশবাবু ঐ স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র এবং পরে করণিক থেকে যোগ্যতা বলে শিক্ষক পদে উন্নীত হন। সুতরাং ঘটনাটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব উড়িয়ে দেওয়া যাবে না।

বিংশ শতাব্দীর আর দুই জ্যোতিষ্ক ছিলেন সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও কালিদাস নাগ। একজন ভারত তথা বিশ্বখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ অপরজন ইতিহাসবিদ্। এঁদের উভয়েরই জন্মস্থান ছিল হাওড়ায়। শুধু জন্মস্থানেই নয়—সুনীতি কুমারের জীবনের সঙ্গে হাওড়ার একটা নিবিড় যোগ ছিল। কারণ শিবপুর ছিল তাঁর মাতুলালয়। সুনীতিবাবু নিজের 'জীবন কথা'-য় লিখছেন—'১৮৯০, ২৬শে নভেম্বর ভাগীরথী বা গঙ্গার তীরে কলকাতার উপনগর হাওড়ার অধীনস্ত শিবপুর পল্লীতে মামার বাড়িতে আমি ভূমিষ্ঠ হই। শিবপুর এখন আমার এই ৮৬ বছর বয়সে সর্বগ্রাসী ক্রমবর্দ্ধমান। এখনকার কালে অতি নোংরা হাওড়া শহরের কবলে পড়েছে। কিন্তু আমার জন্মের সময় আর ছেলেবেলায় বহু বৎসর ধরে, যৌবনকাল পর্যন্ত শিবপুর ছিল কলকাতার পাশে অবস্থিত চমৎকার একটি পল্লী অঞ্চল।' সুনীতিবাবুর পাণ্ডিত্য সর্বজন স্বীকৃত। সুতরাং আর কোন বিশেষণ তাঁর পরিচয় দানে নিষ্প্রয়োজন। সুনীতিবাবুর পিত্রালয়ও ছিল উদয়নারায়ণপুরের সিংটী শিবপুর গ্রামে। ডঃ কালিদাস নাগও শিবপুরে জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯১ সালে। ভারতে ইতিহাস গবেষণায় তাঁর অবদান স্বীকৃত। তাঁর রচিত ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক এককালে স্কুলে ও উচ্চশিক্ষায় খ্যাতিলাভ করেছিল। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভ্রমণ সঙ্গী হওয়ার সুযোগ এবং রোমাঁ রলাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তাঁর জীবনের পরম সম্পদরূপে গণ্য হয়।

হাওড়া শহরের ইতিবৃত্ত-এর লেখক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও লিখছেন—ডক্টর কালিদাস নাগ জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বাড়িতে বাস করে শিবপুর দীনবন্ধু ইনস্টিটিউশন থেকে (তখন অবশ্য এ স্কুলের নাম দীনবন্ধু ইনস্টিটিউশন ছিল না) প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

হাওড়ার বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ যে কেবল সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থ রচনা করেই সে যুগে খ্যাতিলাভ করেছিলেন তা নয়। ইংরাজীতে গ্রন্থ রচনায়ও কেউ কেউ খুবই মুন্সিয়ানা দেখিয়েছিলেন। এই রকম একজন কবি ছিলেন কাশীপ্রসাদ ঘোষ। হাওড়া জেলার ইতিহাস-এর লেখক অচল ভট্টাচার্য লিখছেন—'হাফ-ওল্ড-বাঙ্গাল' নামে অভিহিত কাশী প্রসাদ ছিলেন খাঁটি ঘটি, পৈতৃক নিবাস হাওড়া জেলার পৈতাল গ্রামে। শ্রীযুক্ত ঘোষের কবিতাটির নাম ছিল **Boatmen's Song to Ganga.** এই কবিতাটির প্রশংসায় ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন* তাঁর উন্ন্যাসিক দেশবাসী সম্বন্ধে যা মন্তব্য করেছিলেন তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন—'যে সব সংকীর্ণমনা ইংরাজ ভারতের নেটিভদের ছোট করে দেখেন, তাঁরা মন দিয়ে এই কবিতাটি পড়ুন। নিজেদের প্রশ্ন করুন—বিদেশী ভাষা দূরে থাক, নিজেদের মাতৃভাষাতেও কি তাঁরা এমন কবিতা লিখতে পারেন?'[৪২] ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ থিওডোর ডগলাস 'দি বেঙ্গলী বুক অব ইংলিশ ভার্স' নামে বাঙ্গালী কবিদের একটি

* তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন। তাঁর সর্বজন প্রশংসিত পুস্তক ছিল Selection from English Poets এবং Literary Leaves.

সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাতে সতের জন কবির কবিতা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তার মধ্যে কাশী প্রসাদ ঘোষের কবিতাটি সর্বপ্রথম ছাপা হয়েছে। আরও উল্লেখ-যোগ্য বিষয় হচ্ছে যে লংম্যানস্ গ্রীণ এণ্ড কোম্পানীর প্রকাশিত এই বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আর একজন হাওড়াবাসী অভয় চরণ দাস (শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ দাসের পিতা) **Indian Ryot—Land Tax, Permanent Settlement and Famine** নামে একখানি বই লিখে সেকালে ইংরেজের চক্ষুঃশূল হয়ে গিয়েছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে কিভাবে এদেশে রায়ত ও জমিদারদের মধ্যে হিংসাত্মক সম্পর্ক তৈরী করে খুনখারাবি ও হাঙ্গামা বাঁধিয়ে দিয়েছিল তার এক কঠোর সমালোচনা পূর্ণ আলোচনা এই বইটিতে আছে। বইটি ছাপা হয়েছিল ১৮৮১ খৃীষ্টাব্দে। এই বইটি সে সময় এতই রাজনীতি ও অর্থনীতিবিদদের কাছে সমাদর লাভ করেছিল যে সুদূরে লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রখ্যাত ভারত বিশেষজ্ঞ রুশ পণ্ডিত মিনায়েভ-সংগ্রহের মধ্যে আজও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ হিসেবে রক্ষিত আছে। 'রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী গ্রন্থে' চিন্মোহন সেহানবীশ লিখছেন—বঙ্কিমচন্দ্র মিনায়েভকে তাঁর যে বইগুলি তাঁর নাম স্বাক্ষর করে উপহার দেন সেগুলিও সযত্নে রক্ষিত হয়েছে ঐ মিনায়েভ-সংগ্রহে। বইটিতে বিখ্যাত ভারত হিতৈষী রেভারেণ্ড জেমস্ লঙের একটি স্বাক্ষরও আছে বলে চিন্মোহনবাবু উল্লেখ করেছেন। বইটি হয়তো মিনায়েভকে লঙ সাহেবই উপহার দিয়েছিলেন। এই অনুমানের স্বপক্ষে ঐ বইটিতেই তিনি আরও লিখছেন—'…রাশিয়ার সঙ্গে তাঁর (লঙ সাহেবের) সম্পর্ক বহুদিনের। আয়ারল্যাণ্ডে তাঁর জন্ম হলেও তাঁর শৈশব ও বাল্য কেটেছিল রাশিয়ায়। তিনি যখন পাকাপাকি ভাবে ভারতবর্ষ ছেড়ে দেশে ফিরে যান তখনও তিনি তৃতীয়বার ভ্রমণ করেন রাশিয়ায়।' অভয়বাবু হাওড়া শহরে থাকলেও আদি নিবাস ছিল মাজু গ্রামে।

হাওড়া জেলায় আধুনিক শিক্ষা (বিশেষ করে স্ত্রীশিক্ষা) বিস্তারে যদি কোন ব্যক্তির নাম করতে হয় তাহলে সর্বাগ্রে যাঁর নাম মনে আসে তিনি হচ্ছেন অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য। প্রকৃতই স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে তাঁকে কেউ কেউ জেলার বিদ্যাসাগর ও বেথুনের সঙ্গে তুলনা করেন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তিনি মোট দু'ডজনের বেশী প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ স্থাপন করে গেছেন। দেশপ্রেমিক বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা আছে। এখানে শিক্ষক ও শিক্ষা-সংগঠক হিসাবেই অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। শিবপুরের প্রাচীন ভট্টাচার্য বংশের বাসিন্দা বিজয়কৃষ্ণ রিপন কলেজিয়েট স্কুলের (বর্তমান অক্ষয় শিক্ষায়তন) কৃতী ছাত্র ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি কলকাতার সেণ্ট পলস কলেজের অধ্যাপকের কাজ নেন। তাঁর অমর কীর্তি হচ্ছে 'হাওড়া গার্লস কলেজ'-এর (বর্তমান বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজ) প্রতিষ্ঠা। বিজ্ঞান, কলা ও শিক্ষিকা-শিক্ষণ একই ছাদের তলায় তিনি না করে গেলে জেলায় তা আদৌ হতো কিনা সন্দেহ। ঠিক একইভাবে তিনি প্রতিষ্ঠা করে

গেছেন বর্তমান শিবপুর দীনবন্ধু কলেজ। মোট কথা হাওড়া শহরে বিশেষ করে শিবপুর অঞ্চলে তাঁর স্নেহস্পর্শ লাভ করেনি এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কমই ছিল। হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার সমিতির তিনি ছিলেন প্রধান স্থপতিকার। তিনি একাধিক পুস্তকও লিখে গেছেন যার মধ্যে 'মিউনিসিপ্যাল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন-ইন-বেঙ্গল' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অপর এক অধ্যক্ষ হচ্ছেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন। হাওড়ার প্রথম কলেজ নরসিংহ দত্ত কলেজের তিনি ছিলেন দ্বিতীয় অধ্যক্ষ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের কৃতী ছাত্রদের অন্যতম। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ছাত্র ছিলেন তিনি। তাঁর রসায়ন শাস্ত্রের গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ বিদেশের কাগজেও প্রকাশিত হয়ে প্রশংসা পায়। আজ এই কলেজটি যে পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে এটা শ্রী সেনেরই অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল। কলেজ শিক্ষার ১৬টি পাঠ্যসূচীর মধ্যে ১৩টি বিষয়েই এখানে অনার্স পড়ার ব্যবস্থা আছে। জ্ঞানেন্দ্রনাথের সতীর্থ ছিলেন বিজ্ঞানী জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, মেঘনাদ সাহা ও জ্ঞানরঞ্জন মুখার্জী। সফল অধ্যক্ষ হিসাবে তাঁকে হাওড়াবাসী ভুলবে না।

হাওড়া-আন্দুলের আর এক প্রথিতযশা অধ্যাপক ছিলেন বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলায় এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করলেও ইংরেজী (এম. এ.) ও সংস্কৃত তিনটি ভাষাতেই তিনি ছিলেন পারঙ্গম। প্রথম আন্দুল এইচ. সি. ই. (বর্তমান মহিয়াড়ী কুণ্ডুচৌধুরী ইনস্টিটিউশন)-এ শিক্ষকতা করলেও পরে তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যাপনায় জীবন কাটান। সে সময় স্কটিশের বিপিনবাবুর নাম ছাত্র ও অধ্যাপকদের মুখে মুখে সদাই আলোচিত হত। অধ্যক্ষা ডঃ দীপ্তি ত্রিপাঠি বিপিনবাবুর পড়ানোর গুণগান করে লিখছেন—'আমাদের অন্ধ দৃষ্টিতে তিনি যে জ্ঞানাঞ্জন পরিয়ে দিতেন তাতে আমরা সীমিত দৃষ্টির বদলে রসদৃষ্টি পেতাম। সে অর্থে তিনি ছিলেন প্রকৃত গুরু। ফলে আমাদের সময় বাংলা অনার্সে স্কটিশ চার্চ হ্যাট্রিক করল। ১৯৪৩-এ অবন্তী, ১৯৪৪-এ আমি, ১৯৪৬-এ সুনন্দা ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হয়ে বেরুলাম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হৈচৈ পড়ে গেল। স্কটিশ করছে কি? বিপিনবাবুর আনন্দ কে দেখে?'*

আমতা নারিটের বিখ্যাত ভট্টাচার্য বংশের দৌহিত্র মুখার্জী পরিবারের এক বিখ্যাত সন্তান হচ্ছেন ডাঃ বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়। চিকিৎসা শাস্ত্রে ডিগ্রী নিয়ে তিনি লক্ষ্নৌতে সেণ্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর হন। পরে কলকাতার ক্যান্সার রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর হন। শেষ বয়সে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত হন। একদা তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি নিযুক্ত হন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তিনি একাধিকবার বিদেশে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

* বিপিনকৃষ্ণ স্মৃতিরক্ষা কমিটি স্মরণি ১৯৮৯।

নারিটের আর এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হচ্ছেন মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের জ্যেষ্ঠপুত্র মন্মথনাথ ভট্টাচার্য। ইনি ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল পদে উন্নীত হন বলে দাবি করা হয়। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল। স্বামীজী দক্ষিণ ভারতে যখন গিয়েছিলেন তখন মন্মথবাবুর বাড়িতে ছিলেন—কারণ সেই সময় শ্রীভট্টাচার্য মাদ্রাজে কাজ করতেন।* স্বামীজীর পত্রাবলীতে কোন কোন জায়গায় মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের উল্লেখ আছে। শ্যামবাজারে 'মন্মথনাথ ভট্টাচার্য স্ট্রীট' তাঁরই নামে। শেষ জীবনে তিনি ওখানেই থাকতেন।

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে ও উপন্যাসে শংকরের (মণিশংকর মুখোপাধ্যায়) নাম আজ পাঠক মনে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর বহু উপন্যাস পাঠক সমাজে খুবই সমাদৃত। তাঁর ভ্রমণ কাহিনীগুলি পাঠকের মনকে নতুন নতুন খবরে ও সাহিত্যরসে আপ্লুত করে। এই শংকর সাহিত্যকে পেশা হিসাবে না নিলেও নেশা হিসেবেই বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে চলেছেন। তিনি আশৈশব থেকেই হাওড়া-বাসী। সম্প্রতি তিনি হাওড়া ছেড়েছেন। তাঁর লেখার মধ্যে প্রায়শই কিশোর জীবনের বিদ্যালয়ের মধুর স্মৃতি ও তাঁদের বাড়ি কাসুন্দিয়া অঞ্চলের স্মৃতিগুলি যেন বার বারই ফিরে এসেছে! জন্মভূমি হাওড়াকে তিনি যেন মাতৃসমা বলে মনে রেখেছেন। তাঁর 'চৌরঙ্গী' উপন্যাসের কথা সাহিত্য পিপাসু মানুষই অবগত আছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' চেয়ারের প্রথম প্রফেসর হচ্ছেন বিশিষ্ট সাহিত্য-সমালোচক, প্রবন্ধকার ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৮ খণ্ডে) তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বাংলা সাহিত্যে প্রাদেশিক, বিদেশী, এমনকি আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব যে কিভাবে সমন্বয়ী অব্যয়ের মত কাজ করেছে তা বিশ্লেষণে তিনিই একমাত্র নজির হয়ে আছেন। কর্মক্ষেত্রে অবসর নিলেও মাতৃভাষা চর্চায় এখনও তিনি সমান তালে সাহিত্য একাডেমীর পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলের চেয়ারম্যান হয়ে যৌবনোচিত উপায়ে কাজ করে যাচ্ছেন। স্কুল জীবন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত বাংলা পরীক্ষায় তিনি কোনদিন দ্বিতীয় হননি। ১৯৯৬ সালে তিনি রাজ্য সরকারের 'বিদ্যাসাগর পুরস্কারে' ভূষিত হন। হাওড়ার বাসিন্দা হিসেবে নিজে গর্ববোধ করেন এবং স্থায়ীভাবে হাওড়াকে বার্দ্ধক্যের বারাণসী বলে বেছে নিয়েছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রামতনু লাহিড়ী' প্রফেসার হলেন হাওড়ার (ওলা-বিবি তলার) শংকরী প্রসাদ বসু। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও সারদা মা পরিমণ্ডল নিয়ে গবেষণা ও আলোচনায় মেরী লুইস বার্ক-র (গার্গী) পরই তাঁর স্থান। রমণীয় ক্রিকেট থেকে তিনি গুরুগম্ভীর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পরিমণ্ডলে প্রবেশ করে তাঁদের আলোতে নিজেকেও পাঠক মহলে উদ্ভাসিত করে তুললেন। ১৯৮৬ সালে

---

* মন্মথনাথ ভট্টাচার্য মাদ্রাজে একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল ছিলেন—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (নবম খণ্ড) পৃষ্ঠা-৮৭।

বিবেকানন্দ বিষয়ক মৌলিক গবেষণার জন্য রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পক্ষ থেকে শংকরীবাবুকে 'বিবেকানন্দ পুরস্কারে' ভূষিত করা হয়। উল্লেখ্য, মেরী লুইস বার্ক-র পর শ্রীবসুই প্রথম এই পুরস্কার পেলেন। বৈষ্ণব রস সাহিত্যে মধ্যযুগের কবি ও কাব্য, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি তাঁর দুটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

হাওড়া জেলা থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক পদে ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়ই অদ্যাবধি একমাত্র উদাহরণ যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বাণিজ্য বিভাগের প্রথম সচিব হন। স্যার আশুতোষ স্বর্ণপদক প্রাপ্ত শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে ও নাটকে লৌকিক ঐতিহ্য ও লোক সংস্কৃতি প্রভাব বিষয়ক গবেষণা করে পণ্ডিত সমাজে নিজ আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ ব্যাপারে কানাডা আমেরিকা ও ইংলণ্ডের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও বক্তৃতা করে এসেছেন। শিবপুরের বাসিন্দা হিসেবে জীবন কাটাচ্ছেন।

অপর এক ঐতিহাসিক হচ্ছেন ডঃ ননীগোপাল চৌধুরী। গ্রিফিথ পুরস্কার প্রাপ্ত শ্রীচৌধুরী শিবপুরের প্রাচীন বাসিন্দাদের অন্যতম। ব্রিটিশ রিলেশন্স উইথ হায়দারাবাদ ও কার্টিয়ার গভর্ণর অব বেঙ্গল দুটি ইংরেজি পুস্তকই পণ্ডিত সমাজে আদৃত। 'সাহেনসা আকবর' বাংলা বইটি বহুল প্রশংসিত। শিবপুর দীনবন্ধু কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ।

এবারে চারজন উপাচার্যের নাম করা হচ্ছে যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সারস্বত প্রাঙ্গণে স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গে সুনামের সঙ্গে কাজ চালিয়ে জেলার খ্যাতি বৃদ্ধি করেছেন। এঁরা হচ্ছেন ভাণ্ডারগাছি গ্রামের ডঃ মণি চক্রবর্তী, আমতা জয়পুরের বাসিন্দা ডঃ অরবিন্দ বসু, হাওড়া শহরের ডঃ সুবিমল মুখোপাধ্যায় ও রামকৃষ্ণপুরের প্রাচীন বাসিন্দা ডঃ নিমাই সাধন বসু।

তৈল বিশেষজ্ঞ গবেষক ডঃ চক্রবর্তী কল্যাণী বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের পদে দীর্ঘদিন আসীন ছিলেন। তাঁর সঙ্গে রাজ্য-রাজনীতি ও শিক্ষক সংস্থার সক্রিয় দায়িত্ব নিয়ে সমানভাবে কাজ চালিয়ে গেছেন।

খাদ্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ ডঃ অরবিন্দ বসু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাজ করেছেন যোগ্যতার সঙ্গে। ভারতে বেশ কয়েকটি এগ্রো কালচার প্রোজেক্ট তাঁর পরিচালনায় চলছে।

আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ডঃ সুবিমল মুখোপাধ্যায় (মৃত) কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে কাজ করেন। তিনি ছিলেন রাষ্ট্র বিজ্ঞানের সুরেন্দ্রনাথ চেয়ার অধ্যাপক। রাষ্ট্র বিজ্ঞানে তাঁর কতিপয় পুস্তক পণ্ডিত জনের দ্বারা সমাদৃত।

আধুনিক ভারতের ঐতিহাসিকদের মধ্যে ডঃ নিমাই সাধন বসু একটি বহুল আলোচিত নাম। কবিগুরুর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের পদে আসীন হয়ে সেই নাম আরও সুনামে পরিণত হয়েছে। ইতিহাস বিষয়ক বক্তৃতাদানে ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ তাঁর বিদ্যাবত্তার স্বীকৃতি

প্রমাণ করে। রামকৃষ্ণপুরের বসু পরিবারে লক্ষ্মী-সরস্বতীর সাধনার কাজে তিনি এক অনন্য ব্যক্তিত্ব।

জেলার ইতিহাস রচনার কাজে তারাপদ সাঁতরা (বাগনান) একটি উজ্জ্বল নাম। তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কারে ও সংরক্ষণে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। এই বিষয়ে কয়েকখানি পুস্তকও লিখেছেন।

হাওড়া সাঁত্রাগাছি নিবাসী ডঃ কানাই লাল ভট্টাচার্য রসায়ন শাস্ত্রে মৌলিক গবেষণার জন্য ডি. ফিল উপাধি পান। সরস্বতীর বরপুত্র হয়েও দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের সংগ্রামেই নিজেকে নিয়োজিত করেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সান্নিধ্যে এসে ফরওয়ার্ড ব্লকের কাজে ব্রতী হন। একাধিকবার রাজ্যের মন্ত্রী হয়ে কাজ করেছেন। সাপের বিষ প্রতিরোধে তাঁর আবিষ্কৃত ওষুধের নাম 'ডঃ ভট্টাচার্য'স মালটিপল ভেনম'।

আর এক সাহিত্যের গবেষক হচ্ছেন অধ্যক্ষ সন্তোষ রায়। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম বিষয়ক গবেষণায় তিনি খ্যাতি লাভ করেন। আমতার—খরিয়প নিবাসী বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডঃ সরোজ কুমার বসুর নামও এখানে উল্লেখ্য। তিনি কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হত। বালির এক পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন ডঃ সুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। অধ্যাপক হিসেবে খুব নাম ছিল। তাঁর লেখা এক কালে নিয়মিত প্রকাশ হত বসুমতী, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায়। তাঁর 'দুই কবি—অরবিন্দ ও রবীন্দ্র' উল্লেখযোগ্য বই। কথা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সুধাংশু বাবুকে দিয়ে তাঁর 'বিচারক' উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ করে 'পেপার ব্যাক বই' ছেপেছিলেন। কারো কারো মতে তারাশঙ্কর বাবু নাকি ঐ বইটির ইংরেজী সংস্করণ নোবেল প্রাইজের বিবেচনার জন্য পাঠিয়েছিলেন। বইটির এক কপি বালির নিশিকান্ত চ্যাটার্জীর কাছে দেখতে পাওয়া যাবে। হাওড়াবাসী অধ্যাপক প্রতাপ মুখোপাধ্যায় (অধুনা বাঙ্গুর নিবাসী) কয়েকটি গবেষণামূলক বই লিখে পণ্ডিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যেমন—বিষয় কলকাতা, পর্বান্তরের বিষয় কলকাতা ও ভাষাবিদ হরিনাথ দে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এবারে জেলার কয়েকজন কবির নাম করা যাক। প্রথমেই প্রখ্যাত প্রবীণ কবি ও শিল্পানুরাগী বিষ্ণু দের কথা উল্লেখ করতে হয়। বাংলা ও ইংরেজীতে অনেক পদ্য গদ্য লিখেছেন। সাহিত্য কীর্তির জন্য 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার 'রুশতী পঞ্চশতীর' জন্য সোভিয়েট ল্যাণ্ড পুরস্কার পেয়েছেন। হাওড়ার পাতিহাল গ্রামে তাঁর জন্ম। গ্রামবাসীরা তাঁর স্মৃতিতে বিষ্ণু দে মঞ্চ স্থাপন করেছেন।

হাওড়া জেলার তিরিশের দশকের নামী কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন দীনেশ দাস। ১৯৩৮ সালে 'কাস্তে' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ হলে পাঠক সমাজে তিনি 'কাস্তে কবি' নামেই সমধিক পরিচিত হন। প্রথম জীবনে দেউটি হাই স্কুলে শিক্ষকতা দিয়ে জীবন শুরু—মাঝখানে সাংবাদিকতা করলেও জীবন শেষ করেন চেতলা হাই

স্কুলে শিক্ষকতা করে। 'রাম গেছে বনবাসে' বইটির জন্য ১৯৮৩ সালে বারীন্দ্র পুরস্কার পান। আমতার আনুলিয়া গ্রামে কবির জন্ম।

এছাড়া জেলার উল্লেখযোগ্য আধুনিক কবিদের মধ্যে আছেন অপূর্ব কৃষ্ণ ভট্টাচার্য (নারিট), বটকৃষ্ণ দাস (হাওড়া), সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় (শিবপুর), গোবিন্দ পদ মুখোপাধ্যায় (শিবপুর), শিবেন চট্টোপাধ্যায় (শিবপুর), অজিত বাইরী (উদয়নারায়ণপুর), ডঃ নীরেন্দু হাজরা (উদয়নারায়ণপুর, বর্তমানে শালিখায়), শম্ভু রক্ষিত (শিবপুর), নিমাই মান্না (আমতা চাকপোতা), অশোক চট্টোপাধ্যায় (শালিখা), সুনীল হাজরা (হাওড়া), সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় (শালকিয়া, বর্তমানে ইউরোপে)। নিমাই মান্নার কবিতা একাধিক ভারতীয় ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে।

গল্প উপন্যাসের নাম করা লেখকদের সংখ্যাও হাওড়ায় কম নেই। শরৎ সাহিত্য বিষয়ক লেখক গোপাল রায় এই জেলারই আমতা রামচন্দ্রপুর গ্রামের মানুষ। বিনীতা বন্দ্যোপাধ্যায় (সুকন্যা, সাঁত্রাগাছি) বাংলা দেশে ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টির অন্যতমা পথিকৃৎ। তাঁর নূরজাহান, ক্লিওপেট্রা, কুমারী রানী এলিজাবেথ ও নেপোলিয়ন বোনাপার্ট প্রভৃতি উপন্যাসের কথা এখনও পাঠকের মনে আছে। আধুনিক দুই বিশিষ্ট গল্প লেখক হচ্ছেন হাওড়া নলপুরের রতন ভট্টাচার্য ও (অধ্যাপিকা) বাণী বসু (শালকিয়া)। শ্রীমতী বসু মমের শ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্প অনুবাদ দিয়ে শুরু করলেও আজ তাঁর গল্প পাঠক মহলে সাড়া জাগিয়েছে। তাঁর 'অন্তর্ঘাত' বইটির জন্য তিনি ১৯৯১ সালে 'তারাশংকর স্মৃতি পুরস্কার' লাভ করেন। এছাড়া তিনি 'মৈত্রেয় জাতক' লিখে ১৯৯৭-এর এপ্রিল মাসে 'আনন্দবাজারের 'আনন্দ' পুরস্কার এবং একই সালে এশিয়ান পেইন্টে'স-এর 'শিরোমণি' পুরস্কারও লাভ করেন। অপরপক্ষে শিবপুরের 'নিরক্ষর' উপন্যাস খ্যাত চরণদাস ঘোষ ও ঐ অঞ্চলেরই কল্লোল যুগের কবি সন্ন্যাসী সাধুখাঁর নাম সাহিত্যের পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। এছাড়া শিবপুরের রামপদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার হিসেবে পাঠক সমাজে বেশ পরিচিত। অপর চার গবেষক ও প্রবন্ধকার হাওড়ার তথা বাংলার সারস্বত প্রাঙ্গণেও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন—তাঁরা হচ্ছেন ডঃ দুর্গা শংকর মুখোপাধ্যায় সাঁত্রাগাছি, ডঃ প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত (রামকৃষ্ণপুর), ডঃ সুখেন্দু সুন্দর গঙ্গোপাধ্যায় (রামরাজাতলা) ও অধ্যক্ষ ডঃ অশোক কুণ্ডু (পুরাশ কানপুর)। গল্পকার শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ও হাওড়ার অধিবাসী ছিলেন। শালিখার মাণিক মুখোপাধ্যায় গল্প লিখিয়ে হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

এর পরই এমন একজন মহিলা কবি ও কথাসাহিত্যিকের নাম করা হবে যিনি আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যে অতি পরিচিত নাম—তিনি হচ্ছেন সদ্য প্রয়াত কবিতা সিংহ। পদ্য ও গদ্য মিলিয়ে তিনি প্রায় পঞ্চাশখানি পুস্তক লিখে গেছেন। ছাত্রী হিসাবেও বেশ কৃতী ছিলেন। ইংরেজীতেও তিনি সমান কলম চালাতে পারতেন।

প্রথম জীবনে অমৃতবাজার পত্রিকায় কলমনিস্ট হিসাবে কাজ করতেন। পরে তিনি আকাশবাণীর বাংলা বিভাগের প্রযোজিকা থেকে স্টেশন ডিরেক্টরের পদে উন্নীত হয়ে অবসর গ্রহণ করেন। কবিতা সিংহ 'সুলতানা চৌধুরী' ছদ্মনামেও লিখতেন। তাঁর সাহিত্যের স্বীকৃতি হিসাবে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'লীলা পুরস্কার', যুগান্তর গোষ্ঠীর 'মতিলাল পুরস্কার' ও 'ভুয়ালকা পুরস্কার'ও পেয়েছেন। আমেরিকা ও জার্মানী সফর করেছেন লেখার সূত্রেই। এই কবিতা সিংহ কিন্তু জন্মেছিলেন হাওড়ার বিখ্যাত আন্দুল গ্রামে—১৯৩১ সালে, ১৬ই অক্টোবর, ১ নম্বর আন্দুল রাজ রোডের বাড়িতে।*

শিশু সাহিত্য সৃষ্টিতেও হাওড়া জেলার মানুষ পেছিয়ে থাকে নি। 'গোকুলে মধু ফুরায়ে গেল আঁধার আজি কুঞ্জবন'—এর কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের নাম সুবিদিত। তাঁর 'টুকটুকে রামায়ণ' সে কালে কে না পড়েছে! 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা ছাপা হলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রশংসা করেন। বঙ্কিম চন্দ্রও নবকৃষ্ণের কবি প্রতিভার স্বীকৃতি দিতে ভোলেন নি। নবকৃষ্ণবাবুর 'শিশু রামায়ণ' কবিতার বইটি পড়ে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র বলেছিলেন—'ছোটদের কাছে বিদেশের গল্প বলার আগে নিজের দেশের গল্প বলা উচিত। এই বই সুন্দর হয়েছে। দেশের ছেলেদের খুবই উপকার হবে, তারা আনন্দ পাবে।' নবকৃষ্ণবাবু আমৃত্যু আমতা নারিটের বাসিন্দা ছিলেন। পিতা রাজনারায়ণ তর্ক বাচস্পতিও সে যুগের নাম করা পণ্ডিত ছিলেন। আর এক প্রবীণ শিশু সাহিত্যিক ছিলেন যামিনী কান্ত সোম। শিশু ও কিশোরদের জন্য অনেক কবিতা গল্প ও জীবনী গ্রন্থ লিখে গেছেন। বিশ্ব কবির জীবিতকালে 'ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ' নামে কবির প্রথম ছোটদের জীবনী তিনিই লেখেন। এই বইটি হিন্দী ও উর্দুতে পর্যন্ত অনুদিত হয়।[৪৩] মেটারলিঙ্কের 'ব্লুবার্ড' অবলম্বনে তাঁর লেখা 'নীলপাখী' এককালে কিশোরদের মনে সাড়া জাগানো বই ছিল। এই যামিনীবাবু মেদিনীপুরে জন্মালেও অবসর জীবনে বহু বছর রামকৃষ্ণপুরে থেকেই মৃত্যুবরণ করেন।

ছোটদের জগতে 'বিষ্ণু শর্মা' নামটি খুবই পরিচিত নাম! তাঁর শিকারের কাহিনী, গোয়েন্দা কাহিনী ও বিদেশী গল্পের অনুবাদ শিশু ও কিশোরদের অতি প্রিয় ছিল। আসল নাম ছিল বিশু মুখোপাধ্যায়। বসুমতী পত্রিকায় ছোটদের পাতার তিনি ছিলেন পরিচালক। বিশুবাবু ছিলেন হাওড়া চন্দ্রভাগা গ্রামের অধিবাসী। তাঁর সাহিত্যে হাতেখড়ি হয়েছিল 'কল্লোল' পত্রিকায়।

শালিখার অধিবাসী 'নির্ঝরিনী' কবিতার বিতর্ক সুনীল সরকারকে (দ্রঃ ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন) রবীন্দ্র সান্নিধ্যে নিয়ে আসে। স্কুলের শিক্ষকতা ত্যাগ করে কবিগুরুর ইচ্ছাতে ১৯৪২ সালে শ্রীনিকেতনের অধ্যক্ষ হন এবং বিশ্বভারতীর ইংরেজী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদে নিয়োজিত হন। শেষ জীবনে তিনি 'বিনয় ভবনের' (বি. এড.) অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হন। সুনীল

* আজকাল—১৬ই অক্টোবর, ১৯৯৮।

বাবু সাহিত্য ক্ষেত্রেও নিজ স্বাক্ষর রেখে গেছেন। 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ও সাধনা' নামক পুস্তকটি তাঁর মননশীলতার জন্য সুধী সমাজে পরিচিত। কিশোরদের জন্য তাঁর লিখিত 'কালোর বই' এককালে বহুল পঠিত ছিল। নাটক রচনায়ও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। কলকাতার 'রঙ মহল' রঙ্গমঞ্চে তাঁর রচিত 'কথা কও' নাটকটি বহুদিন এক নাগাড়ে চলেছিল—যার সুখস্মৃতি কলকাতাবাসীর আজও মনে পড়ে। ঠিক একইরকম ভাবে তাঁর 'এক পেয়ালা কফি' নাটকটিও অনেকদিন ধরে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। সুনীলবাবু যে একজন সফল অভিনেতাও ছিলেন একথা শালকিয়া এ, এস, স্কুলে দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বছরেরও বেশী শিক্ষকতা জীবনে প্রবীণ শিক্ষকদের কাছে শুনিনি। ভবতোষ দত্তের 'আটদশক' পড়ে আমার মত অনেকেই হয়তো আনন্দে উল্লসিত হবেন। ভবতোষবাবু লিখেছেন—আমি যখন কলেজে (প্রেসিডেন্সী) ঢুকলাম তখন ওখানে কোন ছাত্র আন্দোলন ছিল না।···কিন্তু ছিল 'রবীন্দ্র পরিষদ ও বঙ্কিম-শরৎ সমিতি। রবীন্দ্র পরিষদের সভাপতি ছিলেন দার্শনিক অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। সম্পাদক ছিলেন পর পর বিনয়েন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতুল গুপ্ত ও শিশির দত্ত। রবীন্দ্র পরিষদে দু'একবার রবীন্দ্রনাথও এসেছিলেন। আমার যেদিনটির কথা মনে পড়ছে সেদিন ফিনিকস থিয়েটারে কলেজের ছাত্ররা 'গান্ধারীর আবেদন' অভিনয় করে তাঁকে দেখিয়েছিলেন। অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন সুনীল সরকার (পরে বিশ্বভারতীর বিনয় ভবনের অধ্যক্ষ)। আর একবার 'রবীন্দ্র পরিষদে'র অধিবেশন বসল জোঁড়া-সাঁকোর বিচিত্রা-ভবনে কবির আমন্ত্রণে। রবীন্দ্রনাথকে তাঁর জোব্বা-জাব্বা পরিহিত রূপেই আগে দেখেছি, এখন দেখলাম ধুতি আর গরদের পাঞ্জাবি পরা খালি পায়ে। অনেক কথা বললেন ছাত্রদের--বিশেষভ সুনীল সরকারের প্রশ্নের উত্তর দিলেন প্রসন্ন মনে।'

হাওড়া জেলার দুই সংস্কৃত বিশারদ পণ্ডিতের কথা উল্লেখ করার মত—একজন হচ্ছেন মহোপাধ্যায় মুরারিমোহন বেদান্তাদীতীর্থ শাস্ত্রী ও অপরজন হচ্ছেন নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় স্মৃতিতীর্থ। বলা বাহুল্য, এঁরা দুজনেই স্বস্ব ক্ষেত্রে দিকপাল। মুরারীবাবু হাওড়া পণ্ডিত সমাজের সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গ পণ্ডিত মহা সম্মেলনের সম্পাদক। তাঁর সংস্কৃতে পাণ্ডিত্যের জন্য রাষ্ট্রপতি তাঁকে 'জাতীয় সংস্কৃত শিক্ষক' পুরস্কারে ভূষিত করেছেন। অপরপক্ষে নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য সমাজের ও নিখিল বঙ্গ সংস্কৃত সেবী সমিতির অন্যতম কর্ণধার। বহু সংস্কৃত নাটকের লেখক, নিত্যানন্দবাবু ১৯৯৬তে 'জাতীয় সংস্কৃত শিক্ষক রূপে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পুরস্কৃত হন। সংস্কৃতের পুনরুজ্জীবনে এঁদের অবদান ভোলা যাবে না।

'অরুণ বরুণ কিরণ মালা'-র নাম শিশু সাহিত্য দরদী মাত্রই জানেন। ছোটদের মনের মতো করে লিখতে শৈলেন ঘোষ সিদ্ধ হস্ত। শিশুদের নাটক রচনা নির্দেশনায়ও তাঁর মুন্সিয়ানা আজ শিশু রঙ্গমঞ্চে সুপ্রতিষ্ঠিত। মণিমেলা মহাসম্মেলনে 'রবীন্দ্র

সরোবর স্টেডিয়ামে' ১৯৬৪ সালে মণিভাই বোনেরা 'অরুণ বরুণ কিরণ মালা' নাটকটি অভিনয় করল তাঁরই নির্দেশনায়। এই নাটকটির জন্যই ভারত সরকারের সঙ্গীত নাটক এ্যাকাডেমী থেকে শৈলেনবাবু রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ করেন। শৈলেনবাবু তাঁর শিশু সাহিত্যের স্বীকৃতি রূপে 'মৌমাছি ট্রাষ্ট' প্রদত্ত 'মৌমাছি পুরস্কার'ও লাভ করেন। স্মরণ রাখা যেতে পারে বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক মণিমেলা সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা এবং ভারতে শিশু ও কিশোর আন্দোলনের ভগীরথ 'মৌমাছি'-র (বিমল ঘোষ) নামে প্রতি বছর সেরা শিশু সাহিত্যিককে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। এই শৈলেন ঘোষ হাওড়া-শালিখায় কিশোর ও যৌবন কাটিয়ে প্রৌঢ়ত্বে বাসা বেঁধেছেন কলকাতায়। হাওড়ার আর এক খ্যাতনামা শিশু সাহিত্যিক হচ্ছেন ভবানী প্রসাদ মজুমদার। স্বাধীনতা সংগ্রামী রমেশ দাসও শিশুদের জন্য কয়েকটি বই লিখেছেন। 'গীতার কথা শোন' মৌমাছি পরিচালিত আনন্দমেলায় সে যুগে বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। ডাঃ শ্রীধর সেনাপতির কবিতা ও গল্প মৌমাছির আনন্দ-মেলায় শিশুদের আনন্দ দিত। এঁরা উভয়েই শালিখার বাসিন্দা।

পরিশেষে বিজ্ঞান গবেষণায় হাওড়ার মনীষার কিঞ্চিৎ আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিজ্ঞান জগতে হাওড়ার যিনি খ্যাতি ছড়িয়ে ছিলেন দেশে বিদেশে তিনি হচ্ছেন স্মরণীয় ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। ১৮৭৬ সালে 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স' প্রতিষ্ঠা তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। সেদিনের সেই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটি আজ এক মহীরূহে পরিণত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের বীক্ষণাগারে বসেই বিজ্ঞানী সি. ভি. রমন তাঁর 'রমন এফেক্ট' আবিষ্কারের জন্য আন্তর্জাতিক 'নোবেল' পুরস্কার' লাভ করেন। বিশ্ব বিজ্ঞানে ভারতীয়দের অবদান প্রতিষ্ঠিত করেন। ডঃ সরকার নিজে একজন প্রখ্যাত এলোপ্যাথ চিকিৎসক হয়েও তিনি পরবর্তীকালে হোমিও চিকিৎসাতেই জীবন শেষ করেন। এজন্য তাঁকে অ্যালোপাথিক চিকিৎসক সমিতি থেকে পর্যন্ত বহিষ্কার করা হয়। কিন্তু তিনি নিজ সিদ্ধান্তে অটল থেকে আমৃত্যু হোমিও চিকিৎসা করে যান। তিনি নিজেই ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান স্বরূপ। তাঁরই হাতের স্নেহস্পর্শে গড়ে উঠেছিল কলকাতার ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিনি অন্যতম চিকিৎসক ছিলেন। এই মহেন্দ্রলাল ছিলেন হাওড়ার জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত পাইকপাড়া গ্রামের অধিবাসী। চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষ চর্চা ও প্রকৃতি বিজ্ঞানেও তিনি পারদর্শিতা দেখিয়ে গেছেন।

হাওড়া শহরের প্রখ্যাত চিকিৎসকের সংখ্যাও নগণ্য নয়। বালির অধিবাসী ডাঃ পঞ্চানন চ্যাটার্জীর নাম দেশে-বিদেশে খ্যাত। শল্য চিকিৎসক হিসাবে তিনি এক সময় কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলেন। দেশে-বিদেশে শল্য বিদ্যায় তাঁর অশেষ খ্যাতি থাকলেও প্যাথলজি এবং এনাটমিতেও তিনি সব্যসাচীর মত কাজ করে গেছেন। হাওড়ার শিবানন্দ বাটিতে তাঁর জন্ম হয়। আর এক দিকপাল চিকিৎসক ডাঃ মণি দে। তিনি ছিলেন একজন চিকিৎসক বিজ্ঞানী। M. N. Dey, K. D.

Chatterjee লিখিত প্যাথলজির বই ভারতের বাইরেও পড়ান হয়। উপরন্তু তিনি ছিলেন কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ। হাওড়ার কালী প্রসাদ ব্যানার্জী লেনের আর এক খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন ডাঃ যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তী। ভারত বিখ্যাত ধাত্রীবিদ্যা বিশারদ যজ্ঞেশ্বরবাবু ছিলেন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন চিকিৎসক-বিজ্ঞানী। হাওড়ার গড়ভবানীপুর গ্রাম আর এক ভারত বিখ্যাত চিকিৎসকের জন্ম দিয়েছিল—তাঁর নাম ডাঃ সত্যবান রায়। চক্ষু, নাসিকা ও দাঁতের চিকিৎসক রূপে তিনি ছিলেন ভারত বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ। একসময়ে তিনি লোকসভার সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন। মধ্য হাওড়ার অধিবাসী ডাঃ শম্ভু মুখার্জী একজন প্রখ্যাত রেডিওলজিষ্ট ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিও কোর্স চালু করে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী হাওড়া-মাকড়দহের বাসিন্দা ডাঃ এস. এন. ব্যানার্জী ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞান চিকিৎসা বিভাগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী গবেষক গিরীন্দ্র শেখর বসুর সহকর্মী ছিলেন। হাওড়ার অপর এক খ্যাতনামা ফিজিওলজির অধ্যাপক ও গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন ডাঃ চণ্ডী চরণ চ্যাটার্জী। তাঁর ফিজিওলজির বই বহুল পঠিত। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন চিকিৎসক-বিজ্ঞানী। বাজে শিবপুরের অধিবাসী ডাঃ তড়িৎ কুমার ঘোষ চিকিৎসা জগতে একটি সদা প্রশংসিত নাম। ডাঃ ঘোষও ছিলেন একজন চিকিৎসক-বিজ্ঞানী। তাঁরই হাতে গঠিত হয় বাঙ্গুর ইনস্টিটিউট অব নিউরোলজী বিভাগটি। মধ্য হাওড়ার কালী ব্যানার্জী লেনের আর এক বিশিষ্ট সমাজদরদী সংগঠক চিকিৎসক হচ্ছেন ডঃ দীনবন্ধু ব্যানার্জী। চিকিৎসাক্ষেত্রে ও সমাজ কল্যাণের কাজে পারদর্শিতা দেখিয়ে তিনি ডঃ বিধান চন্দ্র রায় জাতীয় পুরস্কার (১৯৮০) এবং শিশু কল্যাণে নেহরু ফেলো পুরস্কারে (১৯৮৯) পুরস্কৃত হন। জনস্বাস্থ্যের কল্যাণে হাওড়ার গ্রামে গঞ্জে কাজ করে গেছেন নিরলস ভাবে। অপর এক চিকিৎসক গবেষক হচ্ছেন শিবপুরের বিখ্যাত বনেদী ঘরের ছেলে ডাঃ চন্দন রায় চৌধুরী। লাংস্ ফাংসানের ওপর গবেষণার নতুন তথ্য উদ্ভাবন করে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। সংগঠনেও বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মৃতপ্রায় এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক রূপে অধিষ্ঠিত হয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানের দ্বিশতবর্ষ পূর্তি উৎসবের কথা পণ্ডিত ব্যক্তিদের দীর্ঘ দিনের সুখস্মৃতি হয়ে থাকবে। ডঃ রাধা গোবিন্দ কর ছিলেন হাওড়া সাঁত্রাগাছির বাসিন্দা। তিনি এক সময়ে কারমাইকেল কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁরই নামে আজকের আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ নামাঙ্কিত হয়েছে।

হাওড়া শালিখার আর এক বিশিষ্ট চিকিৎসক ছিলেন ডাঃ ননীলাল ঘোষ। যক্ষ্মারোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ঘোষ ছিলেন হাওড়া রেড ক্রশ সোসাইটির প্রথম অবৈতনিক সম্পাদক এবং হাওড়া টিউবারকুলোসিস এসোসিয়েশনের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা অবৈতনিক সম্পাদক (১৯৫৪)। হাওড়া জেনারল হাসপাতালে চেস্ট ক্লিনিক বিভাগটি তাঁরই উদ্যোগে প্রবর্তিত হয়। মালিপাঁচঘরায় বিমল কুমার ব্যানার্জী ও নন্দরানী চেস্ট

ক্লিনিক স্থাপন তাঁর এক অমর কীর্তি। যক্ষ্মারুগীর চিকিৎসায় তিনি ছিলেন জেলার একমাত্র নিবেদিত প্রাণ, চিকিৎসক ও পরম বন্ধু।

এবার জেলার কয়েকজন খ্যাতনামা হোমিও চিকিৎসকেরও নাম করা যাক। শুধু হাওড়ায় নয়—পূর্ব ভারতের বিখ্যাত হোমিও চিকিৎসক ছিলেন ডাঃ গঙ্গাধর মুখার্জী। চিকিৎসা বিদ্যায় ও হৃদয়ে তিনি ছিলেন শিবতুল্য। অতি অল্পেই সন্তুষ্ট হয়ে মানব দরদী চিকিৎসক রূপে জেলায় স্মরণীয় হয়ে আছেন। হাওড়ার কালী বাবুর বাজারের কাছে তিনি থাকতেন। অপর পক্ষে উনিশ শতকের আশির দশক থেকে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত হাওড়া শিবপুরের আর এক হোমিও চিকিৎসক ছিলেন। লোকে তাঁকে 'ধন্বন্তরি' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর নাম ছিল ডাঃ দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়। নন-ম্যাট্রিক দীনবন্ধু বাড়িতে হোমিও চিকিৎসার বই পড়ে পড়ে এমনই দক্ষ চিকিৎসক হয়ে উঠলেন যে জনৈক বাংলার ছোট-লাটের স্ত্রীর রোগ সারিয়ে তিনি এ, জি, বেঙ্গলের অডিট বিভাগে চাকুরী পান। পরে এই দীনবন্ধু বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের কাছে হাতে কলমে আধুনিক হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নত শিক্ষা লাভ করেন। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার দীনবন্ধুবাবুর প্রসস্তি করে যা বলেছিলেন তার বঙ্গানুবাদ এইরূপ—তিনি (দীনবন্ধু) প্রতি সকালে এক শতাধিক প্রায় রুগী দেখতেন ও কাউর বাড়ি গেলে ফি নিতেন না। তাঁর সেবার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, প্রকৃতপক্ষেই তিনি ছিলেন 'দীনের বন্ধু'।*

হাওড়া কাসুন্দিয়া নিবাসী আর এক হোমিও চিকিৎসক ছিলেন ডাঃ নিতাই চরণ চক্রবর্তী। তিনি হোমিওপ্যাথিক কলেজে পরীক্ষা দিয়ে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাওড়ায় হোমিও চিকিৎসার কেন্দ্র স্থাপনে চেষ্টিত হন। তাঁরই স্বপ্নের বাস্তবায়িত রূপ নিয়েছে জি, টি, রোডস্থ মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য হোমিও-প্যাথিক কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে—যদিও এটি প্রথমে স্থাপিত হয় সাঁত্রাগাছির শংকর মঠে হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল নামে। পরে নাম পরিবর্তন হয়। তাঁরই সুযোগ্য পুত্র হচ্ছেন বর্তমানে বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক ডাঃ ভোলানাথ চক্রবর্তী। সর্বভারতীয় হোমিও চিকিৎসা ক্ষেত্রেও তাঁর স্থান অতি উচ্চে। তিনিই প্রথম বাঙ্গালী হোমিও চিকিৎসক যিনি রাষ্ট্রপতির চিকিৎসকদের তালিকায় স্থান পেয়েছিলেন। ১৯৮৩ সালে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জইল সিং শ্রী চক্রবর্তীকে তাঁর অন্যতম চিকিৎসক হিসাবে নিয়োজিত করেছিলেন। বালি গ্রামের আর এক হোমিও চিকিৎসক মতিলাল মুখোপাধ্যায় (মতিবাবু) এক আমলে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলেন। বালির দশ আনি জমিদার বাড়ির ছেলে হয়েও সংসার ত্যাগ করেন এবং স্থানীয় এক আশ্রমে সন্ন্যাসীতুল্য জীবন যাপন করে মৃত্যুবরণ করেন। নিজের চেষ্টায় হোমিও শাস্ত্র পড়ে চিকিৎসা শুরু করেন বিনা পারিশ্রমিকে। শুধু হাওড়া জেলায়ই নয় সুদূর সুন্দরবন, মেদিনীপুর প্রভৃতি

* হরচন্দ্রের বংশতালিকা—হরচন্দ্র স্মৃতিরক্ষা কমিটি।

অঞ্চল থেকেও রুগীরা আসতেন। ৮০ বছর বয়সে ১৯৬১ সালে দেহ রাখেন। মৃত্যুর দিনেও মেদিনীপুর থেকে রুগীরা এসে ওষুধ না পেয়ে তাঁর শবানুগমনে বন্ধু হয়েছিলেন—হয়তো তাঁরা মনে রেখেছিলেন—শ্মশানেচ য তিষ্ঠতি সবান্ধব। তাঁরই স্নেহধন্য শিষ্য হচ্ছেন উত্তর পাড়ার হাসান নামে এক বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক।

সব শেষে দুজন বিশিষ্ট কবিরাজ এবং একজন বিস্মৃত প্রায় অথচ আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইঞ্জিনীয়ারের কথা বলেই এই অধ্যায়টি শেষ করা হবে। কবিরাজ দ্বয়ের একজনের নাম হচ্ছে পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা ও দ্বিতীয় জন হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য ঠাকুর। শ্রীশর্মা ছিলেন ধবল ও শ্বেতী রোগের অদ্বিতীয় চিকিৎসক। হাওড়া কুষ্ঠ কুটির তাঁরই অমর স্মৃতি বহন করে চলেছে। শ্রীচৈতন্য ঠাকুর হচ্ছেন ভারতীয় বনৌষধি বিশারদ। তাই তাঁকে 'আয়ুর্বেদাচার্য' বলে আখ্যা দেওয়া হয়। শিবকালী ভট্টাচার্য তাঁর 'চিরঞ্জীব বনৌষধি' পুস্তকটি তাঁর নামেই উৎসর্গ করে সঙ্গত কাজই করেছেন।[৪৪]

মধ্য হাওড়ার চৌধুরী বাগানের নীলানন্দ পুত্র সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় শিবপুর বি, ই, কলেজের ইঞ্জিনীয়ার হয়ে কানাডার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন। জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ক বিভাগে তাঁর অসামান্য দক্ষতা ছিল। পশ্চিমবঙ্গে তখন এ ব্যাপারে তেমন চাকুরীর সুযোগ না থাকায় তিনি নির্মীয়মান রাউরকেল্লার ইস্পাত নগরীর জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের প্রধান স্থপতিকার হিসাবে চাকুরী করে বিদেশী অভিজ্ঞ বাস্তুকারদের ভুয়সী প্রশংসা লাভ করেন। পরে তিনি হাওড়া এইচ, আই, টি এবং কলকাতার সি, এম, পি, ও-র মুখ্য বাস্তুকার হন। ভারতের জনস্বাস্থ্য ও ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে কোন 'কোড' ইতিপূর্বে ছিল না। তিনিই এই কোড প্রথা চালু করার ব্যাপারে পথিকৃৎ ছিলেন। কলকাতার পানীয় জলের সমস্যা ও বর্ষায় সঞ্চিত জল দ্রুত নিষ্কাশনের ব্যাপারে ফোর্ড ফাউ-ণ্ডেশনের এক বিশেষজ্ঞদল সমীক্ষা চালান: তাতে সঞ্চিত জল বিরাট বিরাট পাম্প বসিয়ে জল নিষ্কাশনের সুপারিশ করা হয়। আর বলা হয়, ঐ সব পাম্প বিদেশ থেকে এনে বসালে কম খরচ হবে। সুধানন্দ বাবু আপাতমধুর এই নীতিকে মেনে নিতে পারেন নি। প্রথমে খরচ কম হলেও পাম্প বিকল হলে তখন যন্ত্রাংশ কিনতে ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে যাবার মত হবে। তাই তিনি এই দেশেই বিরাটকায় পাম্প তৈরীর জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করেন। আনন্দের কথা জাতীয় সরকারও তাঁর সুপারিশমত মহারাষ্ট্রে পাম্প তৈরীর ব্যবস্থা করেন। আজও তাই চলছে। বিদেশী পাম্প কেনার প্রস্তাবে সম্মতি দেবার আশায় সুধানন্দ বাবুকে **W H O**-র ফেলোসিপ দিয়ে (১৯৬৭-৬৮) আমেরিকা ও ইউরোপে পাঠানো হয়। কিন্তু দেশের স্বার্থ বিরোধী কোন প্রস্তাবই সুধানন্দের ইস্পাত সুলভ সিদ্ধান্তকে নড়াতে পারে নি। আজকের যুগে কাটমানির লোভে দেশের ক্ষতিকর কতই না চুক্তির খবর সংবাদপত্রে দেখতে পাওয়া যায়। সেই বিচারে সুধানন্দবাবুর সততার এটা কি একটি বিরল দৃষ্টান্ত নয়! অবসরের পর **WHO**-র পরামর্শ দাতা হিসাবে

নিয়োজিত হয়ে সুধানন্দবাবু আম্মান, বেইরুট লেবানন প্রভৃতি দেশে জনস্বাস্থ্যের পরিকল্পনা রচনা করে দিয়ে আসেন। পেশায় সুধানন্দবাবু ইঞ্জিনীয়ার হলেও সাহিত্যচর্চা ছিল তাঁর নেশা। তাঁর উল্লেখযোগ্য ইংরেজীতে বই হচ্ছে **Tears On Tomb Stones** (যার বাংলা অনুবাদ 'অশ্রু শিলা লেখ') আর 'লেবাননের ঋষি খলিল জিব্রান।' এখানে উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন আমেরিকায় যান তখন খলিল জিব্রানের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেছিলেন। সাক্ষাৎ চলাকালীন সময়ের মধ্যেই জিব্রান রবীন্দ্রনাথের একখানি প্রতিকৃতিও এঁকে ফেলেন। এই অনাস্বাদিত সংবাদটি সুধানন্দ বাবুর ছোটভাই সুপরিচিত অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার সিদ্ধানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে লাভ করি।

১, ২, ৩, ৪, ৫, ১৩, ১৪ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ।

৬, ৭, ভাবত চন্দ্র—ডঃ মদন মোহন গোস্বামী।

৮, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড—সুকুমার সেন।

৯, ১০, ১১. বঙ্গীয় নাট্যশালা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১২, মানব সাগর তীরে—শংকর—আনন্দবাজার পত্রিকা রবিবাসরীয় ১. ১১. ৯১।

১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২২ **West Bengal District Gazetteers—Howrah, Amiya K. Banerjee.**

২০, ২১, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস (১ম খণ্ড)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৩. ২৪. ২৫. প্রচলিত হিন্দি—মহাবীর প্রসাদ ত্রিবেদী।

২৬, ৪২, উনবিংশ শতাব্দীর নব চেতনায় হাওড়ার ভূমিকা—অচল ভট্টাচার্য।

২৭. সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম খণ্ড)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৮, ২৯, পুরাতন প্রসঙ্গ—বিপিন বিহারী গুপ্ত।

৩০. ৩১. ৩২. বিপিন বিহারী গুপ্তর জীবন কথা—পুরাতন প্রসঙ্গ।

৩৩. শরৎ স্মৃতি—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রবাসী কার্তিক সংখ্যা।

৩৪, যুগান্তর—চরিত্রহীন-এর পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে ফেলেছিল পাড়ার লোকেরা ১০. ৯, ৮৯.

৩৫, শরৎচন্দ্র—মানুষ ও শিল্প—রাধারানী দেবী।

৩৬, ৩৮. হাওড়ার গৌরব কাহিনী—সলিল মিত্র।

৩৭, জীবন স্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩৯. বালি সাধারণী সভা—শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ ১৯৮১।

৪০. দেশ ১৫ই এপ্রিল ১৯৮৯।

৪১. শনিবারের চিঠি—ভাদ্র ১৩৫৯।

৪৩. সংসদ বাঙ্গালী চরিতাভিধান—সুবোধ সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু।

৪৪. হাওড়ার খ্যাতিমান কিছু চিকিৎসক—ডাঃ দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়—**Souvenir 13th Annual State Conference Howrah 1984 [S. T. E. A.]**।

ভারতের মুনি-ঋষিরা ছিলেন প্রকৃতি প্রেমিক--তাঁরা তাঁদের সাধনার ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিতেন পাহাড়-পর্বতের গুহা ও অরণ্য। প্রকৃতির শ্যামল অঞ্চল ও নিস্তব্ধতাই ছিল তাঁদের সাধনার আদর্শ ক্ষেত্র। দূষণমুক্ত পরিবেশ তাঁদের জীবনীশক্তিকে করে তুলতো আরও দীর্ঘায়িত। কিন্তু পৃথিবীপৃষ্ঠে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ক্রমবর্দ্ধমান বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে নগরায়ণ শুরু হলে প্রকৃতির ভারসাম্য ক্রমশঃ নষ্ট হতে লাগলো। কাটা হল গাছপালা, ভাঙ্গা হল পাহাড় পর্বতের অংশ, জল-ধারার গতি রুদ্ধ করে তৈরী হল জলাধার। এ সবই কিন্তু মানব প্রগতিতেই করা হয়েছে বা এখনও হচ্ছে। কিন্তু আজ এমন জায়গায় এসে মানুষের সভ্যতা পেঁীছেছে তাতে করে মানুষই আবার ভীত হয়ে পড়ে বলছে—এই সভ্যতা শেষ পর্যন্ত রক্ষা হবে তো! নগরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি হয়ে উঠেছে রুক্ষ, প্রতিহিংসা পরায়ণ ও অত্যধিক উষ্ণ। তাই ১৯৯১-৯২ নাগাদ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের (UNO) উদ্যোগে রায়-ডি-জেনিরিয়ো শহরে মিলিত হয়েছিলেন বিশ্বের জননায়করা। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'পরিবেশ ও উন্নয়ন'। এই সম্মেলনে উন্নত, অনুন্নত, ধনী-দরিদ্র সব দেশই যোগদান করেছিল। সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করে যে আগামী দিনে বাঁচতে হলে বর্তমান শিল্পায়নের ফলে পৃথিবীতে যে পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড সঞ্চিত হচ্ছে যা সূর্যতাপে মিশে ক্রমবর্দ্ধমান উত্তাপ বৃদ্ধি করছে তাতে সৃষ্টির ভারসাম্য নষ্ট হতে বাধ্য। তাই প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার প্রতি তাঁরা দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন পৃথিবীর সব দেশের সরকারের। এমনকি এই প্রথম যে জাতিপুঞ্জ এই কাজে বে-সরকারী (NGO) প্রতিষ্ঠানদেরও সাহায্য চাইলেন। কারণ সরকার যেখানে দ্রুত পেঁীছাতে পারেন না সেখানে তাঁরা অনায়াসে পেঁীছে কাজ শুরু করতে পারেন। ঐ সম্মেলন থেকেই স্লোগান দেওয়া হল 'অরণ্যের শান্তি' (Green Peace) চাই।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে আমাদের দেশে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার ব্যাপারে জনসাধারণের সম্যক জ্ঞান অপেক্ষাকৃত কম—এ ব্যাপারে তথাকথিত শিক্ষিত অশিক্ষিতের সীমারেখা টানা নিতান্তই ছেলেমানুষী ব্যাপার।

আমাদের দেশে বনাঞ্চল যে প্রয়োজনের তুলনায় বেশ কম এটা সবারই জানা। তাই সরকার (কেন্দ্র-রাজ্য) নতুন করে বনসৃজন-পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। সারা দেশে জোর কদমে বৃক্ষরোপন উৎসব শুরু করা হয়। সর্বত্র সমান তালে না হলেও সামাজিক বনসৃজন পরিকল্পনার মাধ্যমে অনেক নতুন অরণ্যও সৃষ্টি করা হলো। কিন্তু উপযুক্ত বিধি ও প্রশাসনিক বাধা নিষেধ বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ না হওয়ায় যত্রতত্র সেইসব বন আবার অসৎ পথে কাটাও শুরু হতে লাগল। কোথাও বা উপনগরী ও শিল্পকারখানা নির্মাণে যথেচ্ছ ভাবে বৃক্ষ ছেদন হতে লাগল। এই অবস্থা চলতে

থাকায় প্রকৃতিপ্রেমিক কিছু মানুষকে করে তুললো প্রতিবাদী। শুধু বৃক্ষচ্ছেদনই নয় শহরাঞ্চলে কারখানা, গাড়ীর ধোঁয়া, নদীতে শিল্প সংস্থার বর্জ্য পদার্থ নিক্ষেপনে জনসাধারণের জীবন 'জল'কে করে তুললো বিষতুল্য। জাতীয় সরকার পরিবেশ দপ্তর নামে স্বতন্ত্র মন্ত্রক গঠন করে নতুন করে আইন তৈরী করলেন। তবুও যেন কোথায় ফাঁক থেকে গেছে। দূষণের তালিকা তৈরী করে ঘোষণা করা হল ভারতের মধ্যে হাওড়া ও দিল্লী নাকি সর্বাধিক পরিবেশ দূষণে দুষ্ট। অথচ কোন প্রতিকার চাইতে গেলে এ ওর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে রেহাই পেতে চায়। এমতাবস্থায় পরিবেশ সচেতন কতিপয় মানুষ পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখার আবেদন নিয়ে মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের কাছেও আবেদন করে ব্যর্থ হন। সর্বশেষে সর্বাধিক পরিবেশ দূষণযুক্ত হাওড়াকে বাঁচাবার জন্য সমাজসেবী সুভাষ দত্ত দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয় সুপ্রিম কোর্টের কাছে বিচারের জন্য এক বৃহৎ রীট পিটিশন করেন। পেশাগত ভাবে চার্টার্ড একাউণ্টটেণ্ট হয়েও ৫০০ পাতার (দূষণের ছবিসহ) রীট আবেদন করেন ২৫শে এপ্রিল ১৯৯৫ সালে। দীর্ঘদিন ধরে সওয়াল চলে সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি কুলদীপ সিং এবং সাগির আহমেদের বেঞ্চে। প্রথমে সুভাষবাবুর আবেদনের গুরুত্ব না পেলেও পরে তাঁর বক্তব্যকে সমর্থনে এগিয়ে আসেন ইণ্ডিয়া বার কাউন্সিলের সভাপতি খ্যাতনামা আইনবিদ্ এফ. এস. নরীম্যান, সুপ্রিম কোর্টের বার এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রখ্যাত আইনবিদ্ কপিল শিবাল এবং হাওড়া বার এসোসিয়েশনের কতিপয় সদস্য যার নেতৃত্বে ছিলেন মোহিত কুমার চক্রবর্তী। কলকাতা হাইকোর্টের কোন প্রতিনিধি আমন্ত্রণ পাওয়া সত্ত্বেও উপস্থিত ছিলেন না। হাওড়া বার থেকে যে হলফনামাটি সুপ্রিম কোর্টে দেওয়া হয়েছিল সেটি এতই তথ্যপূর্ণ ও আইনসম্মত হয়েছিল যে কোর্ট তা অগ্রাহ্য করতে পারেনি। অত্যন্ত গৌরবের ও আনন্দের কথা এই যে উক্ত মুসাবিদাটি পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছিলেন হাওড়া বারের অভিজ্ঞ ও প্রবীণ আইনবিদ সুব্রত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদ্বয় তাঁদের রায়ে যে কথা বললেন তা শুধু হাওড়া জেলা নয়, পশ্চিমবঙ্গ নয় সারা ভারতের বিচার বিভাগে এক যুগান্তরকারী অধ্যায়। রায়ে বলা হল—**To Constitute a Special Bench for Controlling and monitoring different Environmental Issues of the State.** অর্থাৎ কলকাতা হাইকোর্টে 'গ্রীন বেঞ্চ' নামে একটি পৃথক বেঞ্চের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ বিষয়ক মামলা নিয়মিত শুনতে হবে। ভারতের প্রথম 'গ্রীন বেঞ্চ' স্থাপিত হল এই কলকাতা হাইকোর্টেই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে। 'গ্রীন বেঞ্চে'র প্রথম মামলা শুরু হয় কলকাতা হাই-কোর্টের ১৭নং ঘরে ৩রা জুন ১৯৯৬ সালে। এই বেঞ্চের প্রথম বিচারপতি ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের বর্তমান বিচারপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি রণজিৎ কুমার মিত্র। হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক নাগরিক সমিতি কর্তৃক আনীত পরিবেশ দূষণের মামলা দিয়ে শুরু হলেও আজ রাজ্যের সর্বত্র পরিবেশ দূষণ, শব্দ দূষণ ও বায়ু দূষণ প্রভৃতির মামলাই এই বেঞ্চে হচ্ছে—

যার সুফল আজ পশ্চিমবঙ্গবাসী ভোগ করতে শুরু করেছেন। উমেশবাবুর তৎপরতায় যে শুভ সূচনা হয়েছিল তা পরবর্তীকালে বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রণজিৎ কুমার মিত্রের হাতে বিচারের বাণী নিভৃতে না কেঁদে নির্ভীক হয়ে উঠল। এসবের জন্য যে ব্যক্তি বঙ্গবাসী তথা ভারতবাসীর কাছে ধন্যবাদার্হ তিনি হচ্ছেন সুভাষ দত্ত। হাওড়া কোর্টের মোহরা বাণেশ্বর-পুত্র সুভাষবাবুর ছাত্রজীবন কাটে ভীষণ দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে। ঢাকা জেলার ধামরাইলের অন্তর্গত সুনগর থেকে উদ্বাস্তু ক্যাম্প ফেরৎ মধ্য হাওড়ার গুঁইটারন্ডার লেনে এক টালির ঘরে এসে আশ্রয় নেয়। পিতার মৃত্যুর পর কঠিন দারিদ্র্যের মধ্যে পড়তে হয়। অক্ষয় শিক্ষায়তনে স্কুল জীবনেই মায়ের তৈরী ঠোঙা বিক্রী করে পড়াশুনা চালাতে হয়। তবে কাকা সুরেশ্বর দত্ত (আইনজীবী) ও অপূর্বলাল মজুমদার (প্রাঃ স্পীকার) উদ্বাস্তু সমিতির মাধ্যমে যে সংগ্রাম করতেন তা দেখে ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর প্রতিবাদী মন গড়ে ওঠে। তদানীন্তন কালে বামপন্থী ও কম্যুনিষ্ট নেতাদের আদর্শবোধ ও সরল জীবন যাত্রা তাঁকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে উৎসাহ জুগিয়েছিল। পরিণত জীবনে তাঁরই প্রতিফলন দেখা গেল—ব্যক্তি পরিষেবা থেকে বৃহত্তর সামাজিক পরিষেবা লাভে যাতে নাগরিকরা বঞ্চিত না হন তার চেষ্টা করা। তাই প্রবীণ সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক নেতা শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি করে গড়ে তুললেন গণতান্ত্রিক নাগরিক সমিতি—যার মাধ্যমে তিনি হাওড়াবাসী তথা পশ্চিমবঙ্গবাসীর সেবা করে যাচ্ছেন। নিজে ব্যবহারজীবী না হয়েও নিজের মামলার সওয়াল নিজেই করেন। সওয়াল শুনলে মনে হবে যে তিনি নিজেও বুঝি একজন আইন পাশ করা দক্ষ আইনজীবী। হাইকোর্ট সূত্রের খবর বিচারকগণ পর্যন্ত তাঁর সততা, কর্মে নিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই হয়তো তারকেশ্বরের দুধপুকুরের জনস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপ রোধে খরচাপাতি করার পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন জেলা শাসক ও সুভাষ দত্তের যুগ্ম স্বাক্ষরের ওপর। একি কম আস্থার কথা! সম্প্রতি জার্মানীর এক গবেষক হানস্ ডেম্বোস্কী (**Hans Dembowski**) তাঁর পরিবেশ সম্বন্ধে যে থিসিস রচনা করেছেন তাতে সুভাষবাবু প্রদর্শিত প্রচুর তথ্যের সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে। সাগরপারেও যে সুভাষবাবু স্বীকৃতি পাচ্ছেন এটা কম কথা নয়।

১৯৮৬ সালের নভেম্বর মাস। কলকাতার প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রগুলিতে সংবাদ প্রকাশিত হল—হাওড়া-উদয়নারায়ণপুরের এক অখ্যাত গ্রামের (সোনাতলা) যুবক সরোজরঞ্জন কাঁড়ার সমাজসেবায় 'রাষ্ট্রপুঞ্জের আন্তর্জাতিক (UNO) পুরস্কার' লাভ করেছেন। সেই পুরস্কার আবার দেওয়া হল খোদ লণ্ডনের রাজপ্রাসাদ বাকিংহাম প্যালেসে। যুবরাজ প্রিন্স চার্লস (ডায়নার স্বামী) নিজ হাতে সরোজবাবুকে দুঃস্থদের বাসগৃহ বিনা ব্যয়ে তৈরী করে দেওয়ার স্বীকৃতি হিসেবে ঐ সম্মানজনক পুরস্কার দেন—যার নগদ মূল্য দশ হাজার পাউন্ড। উল্লেখ্য, এ ধরনের পুরস্কার জেলার মধ্যে গ্রামের ছেলে সরোজবাবুই প্রথম পান। কে এই সরোজ

কাঁড়ার—কি তাঁর পরিচয়, তা একটু আলোচনা অসঙ্গত হবে না বলে মনে হয়। উলুবেড়িয়া কোর্টের মোহরা কানাইলাল-পুত্র সরোজ প্রাথমিক শিক্ষালাভের সময় থেকেই দেবসাহিত্য কুটীরের চারআনা সিরিজের মহাপুরুষদের জীবনী পাঠেই দুঃস্থদের সেবার কাজে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে সেবামূলক কাজ সমানে চালিয়ে যান। দুঃস্থদের সেবায় তিনি তখন যোগাযোগ স্থাপন করেন CARE নামে এক মার্কিন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে। ভারতীয় রেডক্রশ সোসাইটি থেকেও তিনি গ্রামসেবার কাজে মাঝে মাঝে সহায়তা লাভ করতেন। গ্রামের রাজনীতিতেও তিনি কলেজ জীবন থেকেই জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সমাজসেবার কাজে তাঁর প্রেরণাদাতা ছিলেন প্রথমত পুরোহিত (সুধাময় চক্রবর্তী), দ্বিতীয়ত (জয়দেব দাস ও সত্যচরণ কাঁড়ার) ও তৃতীয়ত হচ্ছেন অরবিন্দ রায় (প্রাঃ বিধায়ক)। রাজনৈতিক ক্ষমতালাভ করলে হয়তো আরও বেশি করে গ্রামের মানুষের সেবাতে সুবিধে হবে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ১৯৭২ সালে ঐ অঞ্চলের বিধায়করূপেও একবার জনপ্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হন। পরবর্তী কালে অবশ্য রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হলেও সফল হতে পারেননি। কিন্তু সরোজবাবুর কাজের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে সমাজসেবার কাজকে তিনি রাজনীতির কূট-কচালী থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। তাই তাঁর বিপক্ষে বিরুদ্ধবাদীরা বিভিন্ন সময়ে প্রশাসনিক স্তরে দুর্নীতির অভিযোগ এনেও তা সত্য বলে প্রমাণ করতে পারেনি—পারেনি তাঁর ক্রমবর্দ্ধমান গ্রামীণ উন্নতির পথকে অবরোধ করতে। জার্মানীর DESWOS নামে একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে 'সোনাতলা মিলন সংঘ'-এর নামে বিস্তীর্ণ এলাকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অনাথাশ্রম, বৃদ্ধাশ্রম ও কুটীর শিল্পের পুনরুজ্জীবনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। সাম্প্রতিক কালে সরোজবাবু সুদূর গ্রামে যে সামান্য মূল্যে আধুনিক চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল চালু করেছেন তা জেলার যে কোন হাসপাতালের ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠবে। আজ এই সংস্থাটি থেকে প্রাথমিক শিক্ষায় তিন হাজার, মাধ্যমিক স্তরে বারশ এমনকি কলেজীয় স্তরে কিছু ছাত্রছাত্রী মাসিক ছ'শ টাকা 'শিক্ষা দক্ষিণা' পেয়ে যাচ্ছেন। গ্রামের দুঃস্থদের মধ্যে ছ'হাজার বাড়ি (মাটির দেওয়াল, টালির চাল), পাঁচশো ইঁটের দেওয়াল টালির চাল করে গৃহহীনদের গৃহদান করেছেন। এই কাজ UNO থেকে তদারকি দল সরেজমিনে দেখেই সরোজবাবুকে একশ আঠারোটি দেশের মধ্যে সেরা বলে ঘোষণা করেন। চাষী-কল্যাণেও সরোজবাবুর কীর্তি স্মরণ রাখার মত। হাওড়া-হুগলী সীমান্তে চব্বিশপুরের হানা দিয়ে বন্যার জল ঢুকে হাওড়ার চাষীদের বিপুল ক্ষতি করে। সরকারী পর্যায়ে এর কোন প্রতিবিধান স্বাধীনতার পরও করা হয়নি। তাই সরোজবাবু নিজ ব্যয়ে ও উদ্যোগে উদয়নারায়ণপুরের রামসরণচক থেকে হুগলীর বলাইচকবাজার পর্যন্ত পাঁচ কিলোমিটার মাটিব বাঁধ তৈরী করেন। আজ তার ফলে ছ'হাজার একর জমির ফসল ঘরে তুলতে পেরে উপকৃত হচ্ছেন প্রায় লক্ষাধিক

গ্রামবাসী। অবশ্য একাজে সরোজবাবুকে শ্রম ও কিছু অর্থ নিয়ে গ্রামবাসীরাও তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন কোন সরকারী সাহায্য না গ্রহণ করেই। সরোজবাবুর এই বৃহৎ কর্মযজ্ঞের কাজ সম্পাদনের জন্য বেতনভুক কর্মচারী আছেন ১৩৩ জন— তার মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগই গ্রামের মানুষ। এটাও কম কথা নয়।

এবার এমন একজন মানুষের কথা আলোচনা করা যাক যিনি মাধ্যমিক স্কুলের চৌকাঠও পেরুন নি, চাকুরী জীবনে নানা ঘাটে ঘাটে ঘাত প্রতিঘাতের লড়াই করে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে একটি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মী হিসাবে কর্মজীবন শেষ করেন। অবসরের সময় সর্বসাকুল্যে মাহিনা হয়েছিল মাত্র বারশো টাকা। কিন্তু তিনি জীবনে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা স্মরণে রাখার মত। এই ভদ্রলোকটির নাম সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। পৈত্রিক নিবাস হাওড়ার মাজুগ্রামে। পিতা নির্মল চন্দ্র রোজগারের জন্য প্রথমে কলকাতার শাঁখারিটোলায় থাকলেও ১৯৩৬ সাল থেকে শালিখারই স্থায়ী বাসিন্দা। ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের বংশধর নির্মলপুত্র সুনীল কুমারের মনে নিরক্ষরতা দূরীকরণের আত্যন্তিক আগ্রহ ছিল যুবক বয়স থেকেই। তাঁরই নৈশ বিদ্যালয়ে নিখরচায় পড়ে কত ছেলের যে অক্ষর পরিচয়সহ জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়েছেন তা প্রত্যক্ষ করেছেন স্বাধীনোত্তর কালের শালিখাবাসী। সুনীলবাবু গুরুসদয় দত্তের 'ব্রতচারীর' আদর্শে দীক্ষিত হয়ে প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন —'পরহিতে কিছু শ্রম নিত্য / ব্রতচারীর অবশ্য কৃত্য। বসুমতী পত্রিকায় ছাটাইয়ের কোপে পড়ে শেষে শালকিয়া বালিকা বিদ্যালয় ও শিল্পাশ্রমে শিক্ষাকর্মী পদে কাজ করতে থাকেন। এদিকে পার্শ্ববর্তী একটি বালিকা বিদ্যালয়ের ভঙ্গুর স্কুলবাড়ির উন্নতিতে তিনি তাঁর পিতামাতার স্মৃতি রক্ষার্থে প্রথমে পঞ্চাশ হাজার টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নাম পরিবর্তনের জন্য এক লক্ষ টাকা দানের শর্ত দেন। সুনীল বাবুর হাতে তখন অত টাকা ছিল না। তা বলে কি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে হবে! দৃঢ়চেতা সুনীল বাবু সেই শর্তই মেনে নিলেন। শুরু হল তাঁর আর এক জীবন। পূর্বেই বলা হয়েছে শেষের দুতিন বছর সুনীলবাবুর মোট মাইনে গিয়ে দাঁড়ায় বারশো টাকা। অবিশ্বাস্য হলেও প্রতি মাসে দুশো টাকার মধ্যে নিজের খরচ চালিয়ে তিনি প্রতিমাসে হাজার টাকা করে জমিয়ে সেই শর্ত পূরণ করেছিলেন। তার জন্য তিনি প্রায় এক বছর ঐ ক'মাস ছাতু খেয়ে জীবন ধারণ করেছেন। আজীবন অকৃতদার সুনীলবাবু এই ভাবে শর্ত পূরণ করে শালকিয়া নির্মলচন্দ্র ও সিদ্ধেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়কে দাঁড় করালেন। আজও শালিখার রাস্তায় শুভ্র কেশযুক্ত লাঠি হাতে সুনীল বাবুকে দেখতে পাওয়া যাবে। কাউকে আবার বলতেও শোনা যায় 'দেখ, দেখ, শালকের দাতাকর্ণ যাচ্ছেন।' সত্যি তো যিনি কপর্দক শূন্য হয়ে সব দান করে দিলেন—এ বিশেষণ তাঁরই প্রাপ্য। ধন্য বিদ্যাসাগরের বংশধর!

হাওড়া শহরে সাদা পাঞ্জাবী ও কাপড় পরা কাঁচাপাকা দাড়িওয়ালা কোন ভদ্রলোককে যদি রাস্তায় ভিখারীর সঙ্গে কথা বলতে দেখেন তবে বুঝবেন উনিই

হচ্ছেন শালিখার শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদেশী সাংবাদিকরা শ্যামবাবুকে আখ্যা দিয়েছেন 'ক্যালকাটা বেগার্স ফ্রেন্ড'। শ্যামবাবু কেবল আজ ভিখারীর বন্ধু বলে হাওড়া-কলকাতায়ই পরিচিত নন,—বি বি সি-র খ্যাতনামা সাংবাদিক মার্ক টুলি থেকে শুরু করে ওয়াল স্ট্রীট জার্নালের সাংবাদিক জেমস পি, স্টারবা এবং জার্মানীর সাংবাদিক মাইকেল বার্ন সবাই এসে শালিখার হরগঞ্জ রোডের শ্যামবাবুর ড্যাড়ায় গল্প করতে করতে মাটির ভাঁড়ে চা খেয়ে গেছেন। জার্মান টেলিভিসনে শ্যামবাবুকে নিয়ে ভিখারীদের সেবার ছবিও দেখানো হয়েছে। লণ্ডনের জনৈক সাংবাদিক ডেভিড ওয়াটকিং জর্ডানের কাগজে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তা পড়ে সংযুক্ত আরব লীগ থেকে জোয়ান নুন্যান ও জর্ডানের কতিপয় ব্যক্তি শ্যামবাবুকে চিঠি লিখেছেন যে তাঁরা দু'দেশই ভিখারীদের সেবার জন্য শ্যামবাবুকে অর্থ দিতে চান। ধন্যবাদ দিয়ে শ্যামবাবু তাঁদের জানিয়ে দিয়েছেন তিনি অপরের অর্থে তাঁদের সেবা করেন না। এই শ্যামবাবুর পৈত্রিক নিবাস ছিল বর্দ্ধমান জেলার সমুদ্রগড় অঞ্চলের রামেশ্বরপুর গ্রামে। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামে শেষ করে পিতার সঙ্গে শালিখায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন স্বাধীনতার আগেই। দোকান সরকারের কাজে সামান্য আয়ে কোন মতে সংসার চালান পিতা শ্রীপতি বাবু। স্কুল জীবনে একবার কঠিন পীড়ায় পিতার জীবন সংশয় হয়ে পড়ে। এক সহৃদয় প্রতিবেশী চিকিৎসকের দয়ায় সে যাত্রায় জীবন ফিরে পান শ্রীপতিবাবু। সেদিন তাঁর সহানুভূতি না লাভ করলে হয়তো স্কুল জীবনেই পিতৃহারা হতে হতো শ্যামবাবুকে। সেদিন থেকেই চিকিৎসকের সান্নিধ্যে এসে কি ভাবে সংসারের ও পল্লীর দুঃস্থদের জীবনরক্ষা করা যায় তার চিন্তা দিনরাত করতে থাকেন। তাই ম্যাট্রিক প্যাশ করার আগেই 'খেপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ পাথর'-এর ন্যায় কখন লেদ মেসিনে বয়ের কাজ, কখন ফুটপাতে আম বিক্রি করে দুঃস্থ রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থায় ব্যস্ত থাকতেন। শেষে ম্যাট্রিক পাশ করে সিনেমায় চাকুরী নিয়েও ছাত্র আন্দোলনে গ্রেপ্তার হলে চাকুরী যায়। অবশেষে বি, কম, পড়তে পড়তে রাষ্ট্রীয় পরিবহনে চাকুরী পান এবং অবসর নিয়ে বৃদ্ধ বয়সেও ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বেগার্স রিসার্চ ব্যুরো'-র মাধ্যমে আজও তাঁদের সেবা করে যাচ্ছেন। তবে এই সেবার কাজে তাঁকে যে চিকিৎসক অকৃপণ-ভাবে প্রথম থেকে সাহায্য করে চলেছেন তিনি হচ্ছেন ডাঃ সুভাষ ভদ্র। আর সঙ্গে আছেন ডাঃ নির্মল দত্ত ও ডাঃ আই, বি, রায়চৌধুরী। শ্যামবাবুর মতে—কেউ ইচ্ছে করে ভিখারী হতে চায় না। তারাও চায় সমাজে জীবন ধারণের একটু নিরাপত্তা ও প্রান্তিক মর্যাদা। ভিখারীরা প্রথম জীবনে কে কি ছিল তাও তিনি তাঁদের সঙ্গে মিশে, তাঁদের জীবন কথা লিখে একটি বইও প্রকাশ করেছেন। বইটির নাম—'যাদের কথা কেউ বলেনি'। ঘর-সংসারী রোজগারী লোকও যে কিভাবে ভিখারীর বৃত্তি নিতে বাধ্য হয়েছে তারও একাধিক কাহিনী তিনি ঐ বইতে লিখেছেন। শ্যামবাবুর মোদ্দা কথা হচ্ছে—ভিখারীদের ব্যাপারে পঞ্চায়েত, পৌরসভাগুলির উচিত স্থানীয়ভাবে তাঁদের পুনর্বাসনের চেষ্টা করা। এ বিষয়টি

শ্যামবাবুকে যেমন ভাবিয়ে তুলেছে তেমন অবশ্য ভাবায় না অপরদের। কারণ তাঁদের বক্তব্য ভিখারী একটি পৃথক সমাজ—তারা অনেকে পিতৃমাতৃ পরিচয়হীন হলেও ফুটপাতে ও শহরের ফাঁকা জায়গায় তাদেরকে সংসারীজীবন যাপনও করতে দেখা যায়। তাঁরা নিজেদের গণ্ডী ছেড়ে দিয়ে বাধাধরা জীবন যাপনে কদাচ রাজী হন। তবে শ্যামবাবুর যে আদর্শবোধ থেকে ভিখারীশূন্য সমাজ দেখতে উদ্বুদ্ধ হয়ে আজীবন কাজ করছেন—তার মানবিক মূল্যের সাধুবাদ না জানিয়ে উপায় কি !

এর পরই উল্লেখ করতে হয় মধ্য হাওড়ার রামগোপাল স্মৃতিরত্ন লেনের মদনমোহন সরকারের পুত্র নিশীথ সরকারের কথা। পৈতৃক নিবাস হাওড়া জগৎবল্লভপুরে হলেও কারখানার কারিগর হিসাবে পিতা শহরে এসে বাসা বাঁধেন। আর্থিক অনটনে অক্ষয় শিক্ষায়তনের চৌকাঠ পেরোন সম্ভব হয়নি নিশীথবাবুর। কিন্তু বিদ্যালয়ের বাইরে থেকে পড়াশুনা করে নিজেকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। যুবক বয়স থেকেই বিকলাঙ্গদের সেবা করতে বেশী তৃপ্তি পেতেন। কেন্দ্রীয় সরকার বিকলাঙ্গদের সেবায় অনেক পরিকল্পনা নিলেও ভুক্তভোগীরা তার খবর রাখেন না। তাই তাঁদের সুযোগ সন্ধানী দালাল বা রাজনৈতিক দলের খপ্পরে পড়তে হয়। ফলে প্রতিবন্ধীরা তাঁদের কাছে অর্থের বিনিময়ে কখনও বা নিজের স্বাধীন চিন্তার পরিবর্তে রাজনৈতিক চক্রেও আবর্তিত হতে থাকেন। কিন্তু নিশীথবাবু একান্তই জন-সেবার খাতিরে নিজের চাকুরীর ফাঁকে ফাঁকে সরকারী সুযোগ সুবিধা বিনা শুল্কে আদায় করে দেন। হাওড়া জেলায় প্রতিবন্ধীদের নাম নথিভুক্ত করার দুটি কেন্দ্র আছে যেমন হাওড়া জেনারেল হাসপাতাল ও উলুবেড়িয়া মহকুমা হাসপাতাল। এই দুটি কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্তদের ওপরই নির্ভর করছে কে শতকরা কত শতাংশ প্রতিবন্ধী—তার ওপরই আবার তাদের সুযোগ সুবিধা লাভেরও সীমারেখা।—যেমন বাস পাশ, রেলপাশ, ফোন পাবার সুবিধা, পড়শুনা ও চাকুরী করার সুযোগ ইত্যাদি। নিশীথবাবু নিজের পরিশ্রম দিয়ে জেলার প্রতিবন্ধীদের একক ভাবে।ছলেনকরে যাচ্ছেন ১৯৮২ সাল থেকে। তারই স্বীকৃতি হিসাবে এত অল্প সময়ে কোর্টের জল তিনি জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের (U. N. O.) ঘোষিত আন্তর্জাতি জানালেন। 'ভারত সন্তান' (Son of India) হিসাবে জেলা থেকে প্রথম পুরস্কৃত বললেন—সরকারের মান সম্মান উন্নয়ন ও যুব ক্রীড়া দপ্তর থেকে। ১৯৯২-৯৩ সালে জেion. দপ্তর থেকে পুরস্কৃত হন। আরও উল্লেখযোগ্য পুরস্কার লাভ করেন ১৯৯৫-খ্রীষ্ট সালে 'জাতীয় যুব পুরস্কার'। ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ক্রীড়া দপ্তরের এই পুরস্কারের মূল্য ছিল নগদ দশ হাজার টাকা, একটি স্বর্ণ পদক, গাত্রবস্ত্র ও মানপত্র। সেই অর্থ নিশীথবাবু কতিপয় প্রতিবন্ধীদের লেখাপড়ার কাজেই ব্যয় করছেন।

এদেশে বিদেশী শাসনে ও স্বাধীনোত্তর যুগেও অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি শিক্ষা বিস্তারে দান করে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন—যাঁদের কয়েকজনের নাম সদাই লোক মুখে উচ্চারিত হতে শোনা যায়। আমাদের হাওড়া জেলাতেও এরকম হয়তো খুঁজে

পাওয়া যাবে—তবে এখানে একজনের নাম উল্লেখ করা হচ্ছে একটি বিশেষ কারণে। শিক্ষালাভে বঞ্চিত হওয়ার জ্বালা যে কিরূপে বাগনানের একজন গ্রামের কারিগরকে দংশন করেছিল তাই উল্লেখ করা হচ্ছে। ১৯০০ সাল। বাগনান থানার টেঁপুরে নবাসন গ্রামে এক নিম্নবিত্ত পরিবারে জন্ম নেন ঈশান চন্দ্র রায়। জন্মের ছ'মাসের মধ্যেই হলেন পিতৃহারা আর ষোল বছরে হন মাতৃহারা। স্কুলের চৌকাঠ আর পার হওয়া গেল না। দাদারা তাকে সোনারূপার কাজ শিখতে লাগান। ব্যবসা বুদ্ধিও ছিল ভীষণ। গ্রামেই প্রথম স্বর্ণালঙ্কারের দোকান দেন। তারপর ব্যবসায়ের অধিক উন্নতির জন্য কোলাঘাটেও দোকান খোলেন। সরস্বতীর কৃপা লাভে বঞ্চিত হলেও মা লক্ষ্মী তাঁর প্রতি বড়ই সুপ্রসন্না হন। কোলাঘাটে সে যুগে নিখরচায় একটি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালু করেন। ১৯২৪-২৫ সালে বাগনানে মেয়েদের উল্লেখ করার মত কোন স্কুল ছিল না। ঈশানবাবু গ্রামের রসিক রায়কে সঙ্গে নিয়ে বিনা বেতনে প্রথমে দশটি মেয়ে নিয়ে একটি বিদ্যালয় খোলেন। নিজ ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির নাম হয় টেঁপুর বালিকা বিদ্যালয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি কোলাঘাটে (মেদিনীপুরেও) কোলা ইউনিয়ন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে যান। দুটি বিদ্যালয়ে একুনে তিনি পাঁচ লক্ষ টাকা দান করে গেছেন। এছাড়া ছটি প্রাথমিক স্কুলও নিজ ব্যয়ে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। দরিদ্র সেবার কথা নাই—বা বলা হল। বাগনানের মানুষ ঈশানবাবুকে প্রকৃত শিক্ষা দরদী বিত্তবান ব্যক্তি হিসাবেই আজও স্মরণে রেখেছেন।

ম্য।
া। অবে
নয়ে বৃদ্ধ বয়
তাঁদের সেবা
ভাবে প্রথ
আছে

আদালত-প্রাঙ্গণে

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আইন প্রণয়ন, প্রশাসন এবং বিচার বিভাগের প্রয়োজনীয়তা ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নেই। তবে এদের মধ্যে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা গণতন্ত্রকে করে তোলে আরও মহান। এই আদর্শ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় স্বাধীন ভারত যে তার লক্ষ্যবস্তু বলে মনে করে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা ও প্রতিষ্ঠা যে স্বাধীনতার পরেই শুরু হয়েছে তাও মনে করার পর্যাপ্ত কারণ নেই—কারণ পরাধীন ভারতেও ভারতীয় আইনবিদ ও জজেরা সেই আদর্শকেই রক্ষা করার কাজে সচেষ্ট ছিলেন—হয়তো সর্বত্র বিদেশী শাসকের চাপে পড়ে তা পুরোপুরি রক্ষা করা যায়নি। প্রাক্‌স্বাধীনতা বা স্বাধীনোত্তর যুগে কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে হাওড়া জেলার সংখ্যা বেশী না হলেও তাঁদের যোগ্যতা ও কৃতিত্ব স্মরণে রাখার মত। এ রকমই কয়েকজন হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক। প্রথমেই যাঁর কথা বলা হবে তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত বিচারক দ্বারিকানাথ মিত্র।

খুব সম্ভবত তিনিই সর্বাপেক্ষা কম বয়সে বাঙ্গালী বিচারপতি হিসেবে কলকাতা হাইকোর্টে যোগ দিয়েছিলেন। সুপণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মতে—দ্বারিকানাথ মিত্রের মত সমুজ্জ্বল ধীশক্তিসম্পন্ন লোক, এমন **brilliant intellect,** আমার নয়নগোচর হয় নাই। বত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ না হইতেই তিনি হাইকোর্টের জজ হয়েন। বিচারপতি হবার ব্যাপারে একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করলেই তাঁর আইনের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে ধারণা হবে। তদানীন্তন বাংলার ছোটলাট ছিলেন গ্রে সাহেব। তিনি একদিন দ্বারিকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন যে তাঁর হাইকোর্টের জজ হতে আপত্তি আছে কিনা। উত্তরে দ্বারিকাবাবু তাঁর সম্মতির কথা জানালেন। লাটসাহেব বললেন—'**Did you apply for the post ?**' দ্বারিকবাবু বললেন—'**No, I thought that these appointments did not go by application.**

বলা বাহুল্য, কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি বিচারপতি হলেন। প্রধান বিচারপতি স্যার বার্নস-এর মৃত্যুর পর অন্যান্য সাহেব বিচারপতিদের সঙ্গে দ্বারিকাবাবুর মতবিরোধ দেখা দেয়। স্যার লুইস জ্যাকসনের সঙ্গে মিত্র মশায়ের তিক্ত সম্পর্ক ছিল। কিন্তু দ্বারিকাবাবুর মৃত্যুতে সেই জ্যাকসন সাহেব যে শোকপ্রস্তাব পাঠ করেছিলেন তা নাকি হাইকোর্টে নজির বিহীন। আচার্য কৃষ্ণকমলবাবু বলছেন—কিন্তু দ্বারিকাবাবুর মৃত্যুতে যখন হাইকোর্ট শোকপ্রকাশ করেন এই জ্যাকসন সাহেব জজদিগের তরফ থেকে তাঁহার যেরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন সেরূপ প্রশংসাবাদ আর কখনও হাইকোর্টে শুনা যায় নাই।[১] প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক কোঁতের ভক্ত

দ্বারিকবাবুর ইংরেজী সাহিত্যে এবং অঙ্ক শাস্ত্রেও ছিল অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। **Hindu Law of Inheritance and Succession** সম্বন্ধে সর্বোত্তম ব্যাখ্যাকারী হিসেবে তাঁর স্বীকৃতি ছিল। এই দ্বারিকবাবু ছিলেন হাওড়া আমতা থানার আগুনসি গ্রামের সন্তান। পরিণত বয়সে 'ক্যান্সার' রোগে আক্রান্ত হলে নিজ জন্মভূমিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা শ্রেয়ঃ বলে তিনি মনে করেছিলেন। আচার্য কৃষ্ণকমলবাবু লিখছেন—দ্বারিকাবাবুর সহিত শেষ সাক্ষাৎ আমার স্মৃতিপটে এক প্রকার অঙ্কিত হইয়া আছে। তিনি তাঁহার নিজ জন্মভূমি আমতার নিকটবর্তী আগুন্সি নামক গ্রামে প্রাণত্যাগ করিতে যাইবার কালে হাইকোর্টের নিকটবর্তী গঙ্গাতীরে কিয়ৎক্ষণের জন্য ফেটিন গাড়িতে শয়ান অবস্থায় অপেক্ষা করিয়াছিলেন। সেই সময় আমি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত গাড়ির নিকটে গেলাম। আমাকে দেখিয়া ব্যগ্রতা সহকারে ঘাড় একটু তুলিয়া তিনি নমস্কারসূচক হস্ত সঞ্চালন করিলেন। সেই আমার তাঁহার সহিত শেষ দেখা। প্রায় চল্লিশ বছর অতীত হইয়াছে। এখনও বৎসরের মধ্যে ৫।৭ বার তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিতে পাই।[২] এই প্রশংসা কি হাওড়াবাসীর পক্ষে কম প্রার্থিত?

এরপরেই যাঁর নাম উল্লেখ করা হবে তিনি হচ্ছেন বিচারপতি সৈয়দ নাশিম আলি সাহেব। জন্ম ১৮৯৯—বাগনান থানার বাইনান গ্রামে। উলুবেড়িয়া হাই-স্কুলের মেধাবী ছাত্র নাশিম আলি ম্যাট্রিকে ভাল ফল করে প্রেসিডেন্সী কলেজে আই, এস, সি,-তে ভর্তি হন। পরে দর্শন শাস্ত্রে অনার্স পান। ১৯১০ সালে স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে দর্শনে এম, এ, পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেন। প্রথম জীবনে আলিপুর কোর্টেই আইন ব্যবসা শুরু করেন। তারপর তিনি কলকাতা বারে যোগদান করেন ১৯১৬ সালে। নাশিম আলি সাহেবের আইন ব্যবসার জীবনে যুগান্তকারী ঘটনা হল 'ভাওয়াল সন্ন্যাসী কেস'। সরকার পক্ষের উকিল হয়ে নাশিম আলি সাহেব ভাওয়াল সন্ন্যাসীকেই প্রকৃত ব্যক্তি বলে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু আদালত তাঁর যুক্তি না মেনে তাঁর বিরুদ্ধে রায় দেন। পরে হাইকোর্টে আপীল হলে বেঞ্চ নাশিম আলির বক্তব্যকেই সঠিক বলে মত প্রকাশ করেন। তারপর আপীল হল প্রিভি-কাউন্সিলে। সেখানেও হাইকোর্টের রায়কেই যথাযথ বলে ঘোষণা করা হল—অর্থাৎ আলিপুর কোর্টে নাশিম আলি প্রদত্ত যুক্তিই বহাল রইল। নাশিম আলির আইনে কিরূপ ব্যুৎপত্তি ছিল ভাওয়ালের কেস আজও বিচারের ইতিহাসে একটি নজির হয়ে আছে। বলা বাহুল্য, তারপর থেকে আলি সাহেবকে আর পেছনের দিকে তাকাতে হয়নি। ১৯৩৩ সালে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম মুশলিম বাঙ্গালী জজ হিসেবে মনোনীত হয়ে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত জজিয়তি করেন। শেষ জীবনে তিনি কয়েক বছর ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির কাজ করতে করতে ইহলোক ত্যাগ করেন। প্রথম জীবনে তিনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে আসেন এবং মণ্টেগু চেমসফোর্ড রিফর্ম লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য মনোনীত হন। যদিও পরে তিনি মুশলিম লীগে যোগ দেন। মুসলমান

সমাজের উন্নতিতে 'ওয়াকফ বোর্ডে'র কথা সকলেরই জানা আছে। এই ওয়াকফ বোর্ডের মাধ্যমে ধর্মপ্রাণ মুস্লিম ধনাঢ্য ব্যক্তিরা তাঁদের সমাজের অবহেলিত ও দরিদ্র মানুষদের শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতির জন্য প্রচুর সম্পত্তি দান করে গেছেন। তার আয় থেকেই হাজার হাজার মানুষ উপকৃত হন—(যদিও সেই দানবীর মানুষদের প্রদত্ত সম্পত্তি অন্যায়ভাবে স্বার্থান্বেষী লোকেরা আত্মস্মাৎ করছে বলে আজ অভিযোগ উঠেছে। এই ওয়াকফ বোর্ডের আইন তৈরী হয় ১৯৩৪ সালে—আর যাঁরা এই আইনের মোসাবিদা করেছিলেন তাঁদের তিনজনের নাম হচ্ছে জাস্টিস আমীর আলী সাহেব, জাস্টিস সারওয়ার্দী সাহেব ও জাস্টিস নাশিম আলি সাহেব। মধুর অমায়িক ব্যবহার, উদারমনা এই ধর্মভীরু মহাপ্রাণ ব্যক্তির জীবনাবসান হয় ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬। প্রসঙ্গক্রমে এখানে বাইনানের আর এক আইনি-অধ্যাপকের নাম উল্লেখ করার মত। তিনি হচ্ছেন নাশিম আলির স্বগ্রামের অন্তরঙ্গ বন্ধু অসিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। তিনিও আলি সাহেবের সঙ্গে এম, এ, পাশ করেন। বি, এল, পরীক্ষায় অসিবাবু প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হ'ন। তিনি টেগোর্স লেকচারারের পদ লাভ করেন।

সৈয়দ নাশিম-আলি পুত্র এস, এ, মাসুদ হচ্ছেন আর একটি উল্লেখযোগ্য নাম। বাংলার সারস্বত প্রাঙ্গণে মুস্লিম সমাজের এক উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন তিনি। জন্ম হাওড়া জেলার আজনগাজি গ্রামে (কাশমুলি)। পিতার মত তিনিও ছিলেন মেধাবী ছাত্র। স্কুল-শিক্ষা লাভ করেন কলকাতার মিত্র ইন্‌স্টিটিউশনে। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে দর্শনে অনার্স পান। একই বছরে এম, এ এবং এল. এল, বি, উত্তীর্ণ হন ১৯৩৬। সালে। মুস্লিম ল'তে তিনি প্রথম হন। লিংকন ইন থেকে তিনি ব্যারিস্টারী পাশ করে ১৯৪৪ সালে কলকাতা বারে যোগদান করেন। সেই থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত আইন ব্যবসা চালিয়ে যান। ১৯৬৪ সালে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের জজ হন। দেশ স্বাধীন হবার পর কলকাতা হাইকোর্টে তিনিই প্রথম বাঙ্গালী মুস্লিম জজ। শুধু তাই নন মাসুদ সাহেব প্রথম বাঙ্গালী জজ যিনি ষষ্ঠ ফিনান্স কমিশনের সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল' কলেজের জুরিসপ্রুডেন্স ও রোমান ল'তে তাঁর অধ্যাপনার খ্যাতির কথা ছাত্র ও অধ্যাপকদের এককালে আলোচনার বস্তু ছিল। ছাত্র সমাজের কাছে তিনি এতই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন যে ল' কলেজ ইউনিয়নে তিনি একাদিক্রমে সাত বছর সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন। শেষ জীবনে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির পদেও আসীন হয়ে ১৯৭৭ সালে অবসর নেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়, ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট অফ এ্যাডভান্স স্টাডিজ সহ তিনি জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার কমিশনের ভারত সরকারের প্রতিনিধিরূপে কাজ করে গেছেন। তাঁর কাজের স্বীকৃতি হিসাবে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' খেতাবে ভূষিত করেন। এত কিছুর মধ্যেও তিনি কিন্তু তাঁর জন্মভূমিকে ভুলে যান নি। বছরে তিন চারবার করে তিনি গ্রামের বাড়িতে

যাতায়াত করে গ্রামের লোকের সঙ্গে কখনও মাজারে কখনও বা হরিসভায় গিয়ে খোষ গপ্পে মেতে উঠতেন। এহেন গ্রামবন্ধুর মৃত্যু হয় ১৯৯১ সালে। মাসুদ-পুত্র (জলি সাহেব) বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্টে সিনিয়ার এ্যাডভোকেটরূপে কাজ করছেন।

মধ্য হাওড়া পঞ্চাননতলা (বর্তমান দেশপ্রাণ শাসমল রোড) রোডের উপরই পরেশ চন্দ্র দত্তের বাড়ি। বাড়িটি অতি সাধারণ—চোখে পড়ার মত একেবারেই নয়। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা ঐ বাড়িটির সামনে দিয়ে গেলেই বেপাড়ার বন্ধুদের বা আত্মীয় স্বজনকে বলতে ভোলেন না যে এটি জজ সাহেবের বাড়ি। এই জজ সাহেব হলেন পরেশচন্দ্রের পৌত্র মুরারী মোহন দত্ত। মুরারীবাবুর পিতা গৌর মোহন নিজেও ছিলেন একজন হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট। চার পুরুষের বাস এই পঞ্চানন তলায়। গৌরবাবু কলকাতা বারের সহকারী সম্পাদকও নির্বাচিত হয়েছিলেন। স্কুলও কলেজে মুরারীবাবু একজন অসাধারণ ছাত্র কোনদিনই ছিলেন না। আইজ্যাক বেলিলিয়াস স্কুলের এই সাধারণ ছাত্রটি যে একদিন ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হয়ে জেলার এক ঐতিহাসিক নজির সৃষ্টি করবেন এটা কি কেউ তখন ভেবেছিল! অদ্যাবধি জেলাতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হওয়ার যোগ্যতা একমাত্র মুরারীবাবুই পেয়েছেন। স্কুল কলেজে রেজাল্ট চমকপ্রদ না হলেও ল' পরীক্ষায় ফল খুবই ভাল হয়েছিল। কিন্তু আইনজীবী হওয়ার বাসনা তাঁর আদৌ ছিল না। চাকুরী যতদিন না হয় ততদিনই তিনি কলকাতা বারে যুক্ত থাকবেন বলে মনে মনে স্থির করেন। তাই তিনি হাইকোর্টে গেলেও নিজেকে খুবই অসহায় বলে মনে করতেন। কোন সিনিয়ারের অধীনেও তিনি যেতে চান না। এরকম ভাবে চলে বেশ কয়েকমাস—হতাশায় তিনি প্রায় ভেঙ্গে পড়ার মত। হঠাৎ একদিন কোর্টের এ্যাডভোকেটদের ঘরে একজন পুলিশ সাব ইনস্পেক্টর ঢোকেন। সরকারী কর্মী হিসাবে প্রায়ই তাকে সরকারী উকিলের সঙ্গে আলোচনা করতে আসতে হত। তিনি আবার জ্যোতিষ্কবিদ্যাও একটু আধটু জানতেন। তিনি উকিলবাবুদের চেম্বারে ঢুকলেই নাকি তাঁকে দিয়ে সবাই হাত দেখাতেন। মুরারীবাবুর এই শাস্ত্রে তেমন কোন বিশ্বাস ছিল না। তাই সবাই হাত দেখালেও তিনি খুবই নিস্পৃহ হয়ে বসে থাকেন। সকলের কথায় তিনিও অবশেষে হাত বাড়িয়ে দিলেন! উক্ত পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টার মশায় মুরারীবাবুকে বললেন যে তাঁকে ঐ পেশায়ই থাকতে হবে। অবশেষে চাকুরীর দরখাস্ত আর না করে পেশায় মন দিলেন। তবে এই ব্যাপারে তাঁর গুরু ছিলেন আইনে পণ্ডিত ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাবান ছাত্র বরিশাল (বাংলাদেশ) নিবাসী প্রফুল্ল কুমার রায় মহাশয়। তিনি ১৯৫২ সালে এই হাইকোর্টের বারে যোগ দেন। মুরারীবাবু আইম ব্যবসায়ে আরও একজন আইনবিদের অধীনে কাজ করেন যাঁর নাম হচ্ছে চন্দ্র নারায়ণ লায়েক (গাঙ্গুলী)। আসানসোলের অধিবাসী ছিলেন তিনি। পরে তিনিও হাইকোর্টের জজ হন। ১৯৬৯-তে ১৮ই সেপ্টেম্বর মুরারীবাবু কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি

পদে মনোনীত হন। দীর্ঘদিন ধরে হাইকোর্টে জজিয়তি করে তিনি সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতির পদে উন্নীত হন—১৯৮৯-তে ৩০শে অক্টোবর। মুরারীবাবুর বিচারের বৈশিষ্ট্য ছিল মানবিক দিক (**Human Consideration**) বিবেচনা করে। আইনের চোখে হয়তো পুরোপুরি অনুমোদন লাভ করছে না—তথাপি তিনি মানবিকতার খাতিরে বিচার প্রার্থীর পক্ষেই রায় দিতেন। এ ক্ষেত্রে একটি রায়ের কথা উল্লেখ না করে পারা যাচ্ছে না। এক বিধবা ভাড়াটিয়া তাঁর নাবালিকা এক কন্যাকে নিয়ে একটি বাড়িতে বাস করেন। নিচের দুইকোর্টে তিনি হেরে গেছেন। হাইকোর্টে বাড়ির মালিক এক বিখ্যাত আইনবিদকে মামলা করতে দিয়েছেন মুরারী বাবুর ঘরেই। মুরারীবাবু বিধবার বিপক্ষের নামজাদা আইনজীবীকে পরিষ্কার বলেন যে আইনে তাঁর বক্তব্য জোরালো হলেও তিনি বিধবার পক্ষেই রায় দেবেন। কিছুক্ষণ যুক্তি তর্ক করে মুরারীবাবু প্রথমার্দ্ধের সওয়াল স্থগিত করে দেন। দ্বিতীয়ার্দ্ধে সওয়াল শুরু হতেই বাড়িওয়ালার জাঁদরেল আইনজীবী বিচারককে (মুরারীবাবু) বলেন তাঁরা উভয়েই বিশ্রামের ফাঁকে মামলা মিটিয়ে নিয়েছেন। এই রকম আরও কেস হয়েছ যেখানে মুরারীবাবুর হিউম্যান কনসিডারেশনের রায় আপীলে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত অনুমোদন করেছেন। আজও মুরারীবাবু হাওড়াকে বার্দ্ধক্যের বারাণসী বলে মনে করে পিতামহের ভিটেতেই বসবাস করছেন।

এবার এমন একজন হাইকোর্টের বিচারপতির নাম করা হবে যিনি হাওড়া বার থেকে কলকাতা বারে যোগদান করে কয়েক বছরের মধ্যেই হাইকোর্টের বিচারপতি হন—তাঁর নাম সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়। পৈত্রিক বাড়ি ছিল উত্তর চব্বিশ পরগনার ভাটপাড়া গ্রামে। ঠাকুরদার পিতা পঞ্চানন পঞ্চতীর্থের পুত্র বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় হাওড়ায় এসে বসবাস করেন। বিপিনবাবু নিজেও আলিপুরের জেলা জজ ছিলেন। সুশান্তবাবুর স্কুল জীবন কাটে শিবপুর বি, কে, পাল, ইনস্টিটিউশনে। কলকাতার কলেজে পড়াশুনা করে ইংরেজীতে এম, এ, পাশ করেন। আইনের ডিগ্রী লাভ ক'রে তিনি প্রথমে হাওড়া বারে যোগদান করেন ১৯৬২ সালে। প্রবীণ দক্ষ আইনবিদ সুব্রত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের জুনিয়ার ছিলেন তিনি। পরে প্রভাস চন্দ্র মল্লিক ও হিমাংশু কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও কাজ করেন। ১৯৭৬-৭৭ সালে তিনি হাইকোর্টের বারে যোগদান করেন। ১৯৮৬ সালের জানুয়ারীতে হাইকোর্টের বিচারপতি হন।' ৮৬-৯৪ পর্যন্ত তাঁর সবচেয়ে বেশী মামলা হতো রাজ্যের শিক্ষা সম্বন্ধীয়। জয়েণ্ট এনট্রান্স পরীক্ষা সম্বন্ধীয় মামলা (১৯৮১-৮২) সালে তাঁর ওকালতি জীবনে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যদিও তাঁর আপীল সুপ্রিম কোর্ট বহাল রাখেননি কিন্তু পরবর্তী সময়ে যে সব সংশোধনী সরকার ছাত্রস্বার্থে করেছেন তা তাঁরই যুক্তির ফলশ্রুতি। ১৯৯৪-এর মাঝামাঝি তিনি গুজরাট হাইকোর্টের বিচারপতি হন। সেখান থেকে ১৯৯৫-র শেষাশেষি তিনি উড়িষ্যা হাইকোর্টে বিচারপতি পদে বদলী হয়ে আসেন। বর্তমানে তিনি সেখানেই আছেন—কিছুদিন সেখানে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি পদেও

আসীন ছিলেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থ—Commentaries on West Bengal Service Rules—Part I—II ব্যবহারজীবীদের একটি প্রয়োজনীয় পুস্তক। ইংরেজী ও বাংলায় সুবক্তা বলে বিচারপতির খ্যাতি আছে। আজও হাওড়াতেই জীবন কাটাচ্ছেন।

হাওড়ার আর এক বিচারপতির নাম হচ্ছে দিলীপ কুমার শেঠ। হুগলীর শ্রীরামপুরে পৈত্রিক বাস হলেও হাওড়ার পদ্মপুকুর অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে বাস করছেন। কলকাতার বারের সদস্য থাকতে থাকতেই তিনি ১৯৯৫ সালে হাইকোর্টের বিচারপতি হন। ঐ বছরই বদলী হয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টে বিচারপতির কার্যভার গ্রহণ করেন। এ্যাডভোকেট হিসাবে কলকাতা বারে তাঁর সুনাম ছিল। ভূমি সংস্কার ও পরিবহন সম্পর্কীয় আইনকানুন বিশেষজ্ঞ হিসাবে তিনি সরকারী প্যানেলের উকিল ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি সংস্কারে যে সব সংস্কারমূলক আইন বামফ্রণ্টের আমলে চালু করেন তা নাকি তাঁরই পরামর্শে চালু হয়। এটা কি কম কথা!

এতক্ষণ কয়েকজন বারের বিচারপতিদের পরিচয় দেওয়া হল। এবারে কয়েকজন হাওড়ার সার্ভিস জজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলেও অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যেমন—

গোবিন্দলাল চট্টোপাধ্যায়—পৈত্রিক বাস শিবপুরে। পিতা মেট্রো সিনেমার একজন পদস্থ কর্মী ছিলেন। স্থানীয় দীনবন্ধু স্কুলের ছাত্র ছিলেন। দর্শনে অনার্সসহ প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এম, এ, পাশ করেন। ডাবলু, বি, সি, এস, পরীক্ষায় অষ্টম স্থান লাভ করেন। ১৯৫৩ সালে চুঁচুড়ার মুন্সেফ হয়ে জীবন শুরু। তারপর জেলা জজ হয়ে ১৯৭৯ সালে সিটি সিভিল কোর্টে বিচারক হন। ওখান থেকে অন্যপদ ঘুরে ১৯৮৪ সালে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হন। অবসর গ্রহণের পর আধ্যাত্মিক বিষয়ে নিজেকে ব্যপ্ত রেখেছেন।

সন্তোষ চক্রবর্তী—জন্ম—১৯১০। পৈত্রিক বাস আমতার মেলাইচণ্ডী তলা অঞ্চলে। ছোটবেলা থেকেই হাওড়া-কাসুন্দিয়া অঞ্চলে বাস করছেন। হাওড়া জেলা স্কুলের কৃতী ছাত্র সন্তোষবাবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম, এ, পাশ করে স্বর্ণ পদক পান। পরে আইন পাশ করে মুন্সেফ হিসেবে চাকুরী নেন। আলিপুরে দায়রা জজ হয়ে তিনি ১৯৬৩-৬৪ সালে সিটি কোর্টে বিচারক হন। ১৯৬৮ সালে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতির পদ লাভ করেন। তদানীন্তন কালে জনৈক শিল্পপতি মুন্দ্রাকে প্রতারণার দায়ে সাজা দিয়ে তিনি সংবাদপত্রের শিরোনামায় স্থান করে নিয়েছিলেন। ইতিহাসে উহাই 'মুন্দ্রা কেস' নামে পরিচিত। নির্ভীক বিচারপতি সন্তোষবাবু ঋষি অরবিন্দের ভক্ত ছিলেন। তাই অবসরের দিনই তিনি বাড়ি ফিরে না এসে পণ্ডিচেরী আশ্রমে সোজা চলে যান। সেখানেই তিনি শেষ জীবন কাটান।

মনোরঞ্জন মল্লিক—আদি বাস হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়ায়। বেলুড়ে বহুদিন ধরে বসবাস করেছেন। বর্তমানে বালিগঞ্জ অঞ্চলে বাস করছেন। তিনি কয়েকখানি

আইনের ব্যাখ্যাসহ বই লিখে আইনজীবী মহলে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি বিভিন্ন জেলায় জজিয়তি করে হাইকোর্টের বিচারক হয়েছিলেন।

মলয় সেনগুপ্ত—আদি বাস মুর্শিদাবাদের বহরমপুর শহরে। গত তিরিশ বছর ধরে বেলুড়ে বসবাস করছেন। মুন্সেফ থেকে বিচারকের জীবন শুরু হয়। ক্রমে ক্রমে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি পদে শপথ নেওয়ার তিন সপ্তাহের মধ্যেই সিকিমের ভার প্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি পদে যোগদান করেন। সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করে বর্তমানে আমন্ত্রিত অধ্যাপক হিসেবে হাজরা ল' কলেজে অধ্যাপনা করছেন। সিকিমে থাকা কালীন তিনি স্টেট কনজুমার রিড্রেসেল কমিশনেরও চেয়ারম্যান ছিলেন। ভারতীয় সংবিধানের নিয়মানুযায়ী কোন ভারতীয় নাগরিক ওখানে স্থায়ীভাবে চাকুরী লাভ করতে পারেন না। ফলে বহু শিক্ষক ও অধ্যাপক এই রাজ্যে গিয়ে দীর্ঘদিন যোগ্যতাসহ কাজ করলেও ছাঁটাই হয়ে যেতেন। এরূপ একটি মামলায় তিনি স্থায়ীভাবে চাকুরী লাভের পক্ষে রায় দেন। আপিল হলেও সুপ্রিম কোর্টও সেই রায়ই বহাল রাখেন। মলয়বাবুর বিচার দক্ষতার এটি একটি বড় নজির বইকি!

পাঁচকড়ি সাধুখাঁ—মধ্য হাওড়ার খুরুটের প্রাচীন বাসিন্দা ছিলেন। মুন্সেফ হিসাবে প্রথম জীবন শুরু। পরে বিভিন্ন উচ্চ পদে থেকে কলকাতা হাইকোর্টের জজ হন। মধুর ব্যবহার ও শান্ত স্বভাবের জন্য বেঞ্চ ও বারের সকলেরই ভালবাসার ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন।

সবশেষে কয়েকজন খ্যাতিমান ব্যবহারজীবীদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেই এই অধ্যায়টির ইতি টানা হবে—যেমন ঃ

বিহারীলাল গুপ্ত—ইনি ছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে হাওড়া-হুগলীর এক নম্বর ব্যবহারজীবী। অভিজ্ঞরা বলেন ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ যেমন কলকাতা হাইকোর্টের সর্বকালের সেরা আইনজ্ঞ তেমনি বিহারীবাবুও ছিলেন হাওড়া-হুগলী কোর্টের সেরা ব্যবহারজীবী। সে সময়ে যখন অন্যান্যদের ফিস ছিল দু-পাঁচ টাকা বিহারীবাবুর ফিস ছিল তখন একশ টাকা। মধুর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এই আইনজীবীর উপস্থিতি আদালত কক্ষকে করে তুলতো উদ্দীপিত। তাঁর ইংরেজী বক্তৃতার দাপট বিদেশী বিচারকদেরও সমীহ আদায় করতো। তিনি একাই জি, পি ও পি, পি ছিলেন।

শশীভূষণ ব্যানার্জী—মধ্য হাওড়ারই সন্তান। তাঁর সুযোগ্য পুত্র ছিলেন আইনজীবী হিমাংশু ব্যানার্জী ও পৌত্র সুব্রত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি খুব রাসভারী ও নির্ভীক প্রকৃতির আইনজীবী ছিলেন।

শশাঙ্ক শেখর ব্যানার্জী—বালি গ্রামের পুরাতন স্থায়ী বাসিন্দা, খুবই ধার্মিক প্রকৃতির আইনজীবী ছিলেন। তাঁর পুত্র মোহনবাগান ক্লাবের বিখ্যাত খেলোয়াড় হচ্ছেন বদ্রু ব্যানার্জী।

চারুচন্দ্র সিংহ—হাওড়া রামকৃষ্ণপুরের প্রাচীন বাসিন্দা। পাবলিক

প্রসিকিউটার ছিলেন। হাওড়া পৌর সভারও চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁরই পুত্র ছিলেন আইনজীবী ও রাজ্যের একদা শিক্ষামন্ত্রী রবীন্দ্রলাল সিংহ। তিনি হাওড়ার চেয়ারম্যানও ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে কংগ্রেসের হয়ে সভা করতে এসেছিলেন। চারুবাবু নিত্যধন মুখাজীর্র সহযোগিতায় রাত্রির অন্ধকারে মাঠে বিষ্ঠা ফেলে সেই সভা পণ্ড করে দিয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জনের কংগ্রেস প্রার্থী সেবার চারুবাবুর কাছে পরাজিত হন।

অমৃতধন মুখাজী—হুগলী জেলারই স্থায়ী বাসিন্দা। কিন্তু হাওড়া কোর্ট ছিল তাঁর আইন বিশ্লেষণের ক্রীড়াক্ষেত্র। তিনি হাওড়া সিভিল বারের সভাপতিও ছিলেন। আইনের ব্যাখ্যায় তিনি ছিলেন অনন্য।

খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী—শালিখার বহু দিনের বাসিন্দা। দেওয়ানী ও ফৌজদারী দুটোরই মামলা করতেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম, এ, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার তিনি সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান ও জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাসের তিনি দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন।

সত্যকিঙ্কর সেন—শালিখার বাসিন্দা এই আইনজীবী দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি একটু ইংরেজ ঘেষা ছিলেন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তিনি এ. আর. পি-র চীফ ওয়ার্ডেন হিসেবে কাজ করে 'রায়বাহাদুর' খেতাব অর্জন করেন।

প্রভাস চন্দ্র মল্লিক—মধ্য হাওড়ার স্থায়ী বাসিন্দা প্রভাসবাবু ছিলেন আইনে একজন সুপণ্ডিত। তিনি একই সঙ্গে জি-পি ও পি-পি পদে আসীন ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ আইনজীবী সমিতির একদা তিনি সভাপতিও ছিলেন। তাঁর দুই জুনিয়ায় ছিলেন বিভাস চন্দ্র মিত্র ও চিন্তামণি মুখাজী। পরবর্তীকালে এঁরাও হাওড়া কোর্টে নামী আইনজীবী হন। তাঁর লাইব্রেরীটি ছিল এক বিরল পুস্তকের ভাণ্ডার। তিনি দেশবন্ধুর ভ্রাতা পি. আর. দাসের বিরুদ্ধে মামলা করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর জুনিয়ার চিন্তামণি মুখাজী মিউনিসিপ্যাল আইনে অত্যন্ত খ্যাতিমান ছিলেন। গান্ধীজীর অনুসারী চিন্তামণিবাবু ধুতি পরে কোর্টে সওয়াল করে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তিনি হাওড়া বারের সম্পাদক ও পশ্চিমবঙ্গ আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদকও ছিলেন ('৬৮-৭০)। অপর পক্ষে বিভাস চন্দ্র মিত্র ছিলেন ধার্মিক প্রকৃতির লোক এবং আইনে সুপণ্ডিত।

নির্মলা চরণ দাস—হাওড়ার বেলিলিয়াস রোডের স্থায়ী বাসিন্দা। দর্শনে এম, এ, পরীক্ষায় প্রথম হন। অনেক বছর জি, পি হিসেবে কাজ করেন। আইন জগতে এক বড় 'জুরিষ্ট' হিসেবে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।

ফণীন্দ্র নাথ মুখাজী—পঞ্চানন তলার অধিবাসী ফণীন্দ্রবাবু একজন দক্ষ আইনজীবী ছিলেন। ফণীন্দ্র কিণ্ডার গার্ডেন স্কুলটি তাঁরই স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত। তিনিই একমাত্র উদাহরণ যিনি একটি সামান্য কেসকেও ভাল কেসে রূপান্তরিত

করতে পারতেন—যাকে বলা যায় 'এলো চুলে খোঁপা বাধা। তাঁরই জুনিয়ার ছিলেন পঞ্চানন সমাদ্দার। শ্রীসমাদ্দার এম, সি, ঘোষ লেনের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। ইংরাজীতে তাঁর বক্তৃতার আদালত কক্ষে সদাই প্রশংসিত হত। তাঁরই পুত্র নরেন্দ্র নাথ সমাদ্দার কলকাতা সিটি কোর্টের বিচারক ছিলেন।

বৃন্দাবন দাস—মধ্য হাওড়ার পঞ্চাননতলার স্থায়ী বাসিন্দা—কিন্তু থাকতেন ভাড়া বাড়িতে। আজও বংশধররা সেই বাড়িতেই থাকেন। আর্জি ও জবাব লিখতে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁরই জুনিয়ার ছিলেন হিমাংশু ব্যানার্জী, হরিভূষণ মিত্র ও জগবন্ধু ঘোষ। হিমাংশুবাবু ছিলেন এক কৃতী বিদ্বান ব্যক্তি। হিন্দু ল এবং দেবোত্তর সম্পত্তি আইনে তাঁর দখল ছিল অসাধারণ। প্রিনসিপ্যাল অব ল এণ্ড কেস ল'তে তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অনন্য সাধারণ। অপর পক্ষে হরিভূষণ মিত্র ছিলেন ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের প্রবীণ আইনজীবী। অপর সহকারী জগবন্ধু ঘোষ বিখ্যাত ছিলেন আইনের ব্যাখ্যাকারী ও সেরা জেরাকারী হিসেবে। বৃন্দাবনবাবু হাওড়া বারের সভাপতিও হয়েছিলেন। সারাদিনই আইনের বই নিয়ে তিনি পড়াশুনা করতেন। ওঁনার পুত্র বনমালী দাস (ব্যারিষ্টার) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এ্যাডভোকেট জেনারেল হয়েছিলেন।

বরদা প্রসন্ন পাইন—হাওড়ার বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর পিতা অমৃতলাল পাইনের নামে মধ্য হাওড়ায় একটি রাস্তাও আছে। ফৌজদারী আইনে তিনি ছিলেন এক প্রবাদ পুরুষ। বিখ্যাত 'পাকুর' মামলায় তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি ও আইনের বিশ্লেষণ তাঁকে পূর্ব ভারতে স্মরণীয় করে তুলেছিল। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানও ছিলেন তিনি। অবিভক্ত বঙ্গের তিনি ফজলে হক মন্ত্রিসভারও সদস্য ছিলেন। তিনি ছিলেন ফৌজদারী আইনের এক কিংবদন্তী আইনজীবী। হাওড়া কোর্টের বারান্দায় একমাত্র তাঁরই আবক্ষমূর্তি স্থাপিত আছে। প্রতি বছরই আইনজীবীরা মর্য্যাদার সঙ্গে দিনটি পালন করেন। রাজনীতির জগতে তিনি ছিলেন দেশবন্ধুর শিষ্য। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভারও তিনি সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। হাওড়া কংগ্রেসের একদা তিনি ছিলেন যুবশক্তির প্রতিভূ। পরবর্তী-কালে তিনি সুভাষচন্দ্র বসুর ফরওয়ার্ড ব্লকের কোষাধ্যক্ষও নির্বাচিত হন। তাঁর সুযোগ্য সরকারী ছিলেন বালির জ্যোৎস্না ব্যানার্জী ও মধ্য হাওড়ার রমেন্দ্রনাথ সরকার। জ্যোৎস্নাবাবু পি, পি, হিসেবে হাওড়া কোর্টে যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে গেছেন। আর রমেনবাবু বিখ্যাত হন ক্রিমিন্যাল ল'-র টেকনিক্যাল ব্যক্তি-রূপে। বরদাবাবু বড় বড় কেসে রমেনবাবুকে সরকারী হিসাবে না নিয়ে মামলা করতেন না। এই রাজ্যে ভোগ্যপণ্য আইনের বহুত্রুটি রমেনবাবু সরকারকে ধরিয়ে দেন। ফলে সরকারকে তাঁরই নির্দেশিত পথে আইন সংশোধন করতে হয় পরবর্তী কালে।

বলাইচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বাজে শিবপুরের স্থায়ী বাসিন্দা। আইনবিদ্যা ছাড়াও তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। হাওড়া সিভিল বারের সভাপতি ছিলেন।

হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য সমাজের সহঃসভাপতিও ছিলেন। আদালত প্রাঙ্গণের মত খেলার প্রাঙ্গণেও তাঁর গতিবিধি ছিল অবাধ। ক্যালকাটা রেফারি এসোসিয়েশনের তিনি পাশ করা রেফারি ছিলেন। তাঁর আইনের অমূল্য লাইব্রেরীটি হাওড়া বার এসোসিয়েশনকে দান করে গেছেন। তিনি জি পি হিসেবেও কাজ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ আইনজীবী সমিতির তিনি কার্যনির্বাহী সদস্যও ছিলেন।

রণজিৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বালি গ্রামের প্রাচীন বাসিন্দা। ছাত্র আন্দোলনের পুরোধাদের অন্যতম। স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার বরণ করেন। আইনে ছিলেন অতি প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। কলকাতা বারের বিশিষ্ট আইনজীবী বলে সকলের স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ আইনজীবী সমিতির তিনি ছিলেন সাধারণ সম্পাদক (১৯৫৮-৫৯)। তিনি সুপ্রিম কোর্টেও মামলা করতে যেতেন। আজ যে লোক-আদালতের প্রচলন হয়েছে তার পরিকল্পনা তিনি ভারতের বার কাউন্সিলের সভাপতি এম. সি. শীতলাবাদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রথম স্বপ্ন দেখেন ১৯৫৮-৫৯ সালে। তিনি একজন বড় মাপের জুরিষ্ট ছিলেন। বালির এই সুসন্তান ডিসেম্বর মাসে পরলোকগমন করেন।

জগন্নাথ প্রসাদ পোড়েল—পৈত্রিক বাড়ি হুগলী জেলায়। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই শালিখার স্থায়ী অধিবাসী। ইংরাজি সাহিত্যে বিশেষ জ্ঞান ছিল। ফৌজদারী আদালতে খুবই নামডাক ছিল। অভিজ্ঞদের মতে জেরাতে মাষ্টার ছিলেন বরদাবাবু আর সওয়ালে ছিলেন জগন্নাথবাবু। ক্রিমিন্যাল বারের সহ-সভাপতি ছিলেন। হাওড়ার ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ ব্লকের (U. P. B.) তিনি ছিলেন সভাপতি। নন্দীবাগান সেকেণ্ড বাই লেনের নাম পরিবর্তন করে জগন্নাথ পোড়েল লেন নামকরণ করা হয়েছে। শালিখার আর এক পি-পি ছিলেন সূর্যকুমার মুখার্জী।

রাখালচন্দ্র দাস—হাওড়া রামরাজাতলার স্থায়ী বাসিন্দা। মুন্সেফ পদে নিযুক্ত হয়ে প্রথম জীবন শুরু। পরে তিনি অতিরিক্ত জেলা জজ ও অস্থায়ী জেলা জজ রূপেও কাজ করেন। তিনি একদা 'করোনার' (Coroner) পদেও আসীন ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি আবার নতুন করে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ৮৭ বছর বয়সে এখনও তিনি হাওড়া বারে মামলা করে যাচ্ছেন। মোসাবিদার কাজে তাঁর খ্যাতি আছে।

বঙ্কিম চন্দ্র কর—পঞ্চাননতলার স্থায়ী প্রাচীন বাসিন্দা। পি-পি রূপে হাওড়া কোর্টে কাজ করেছেন। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার একদা অধ্যক্ষ ছিলেন। পৈত্রিক বাস ছিল হুগলী জেলায়। হাওড়া জেলা কংগ্রেসের একজন প্রথম সারির নেতা ছিলেন।

অরবিন্দ ঘোষাল—আদি বাড়ি উলুবেড়িয়ায়। পঞ্চাননতলার স্থায়ী বাসিন্দা। বামফ্রণ্টের আমলে প্রথম জেলা জি-পি হন। লেবার ল'তে অভিজ্ঞ ছিলেন। একদা ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থীরূপে বিধায়ক ও উলুবাড়িয়ার সাংসদ নির্বাচিত হন।

প্রফুল্ল কুমার রায়—হাওড়া-কাসুন্দিয়া অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। পৈত্রিক

বাস ছিল হুগলীর চিংড়ে গ্রামে। হাওড়া ফৌজদারী বারে রমেন সরকার ও কিরণ ঘোষ মহাশয়দ্বয় যখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন তারই মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এলেন সম্ভাবনাময় প্রফুল্লবাবু। আইনের জ্ঞানের সঙ্গে সামান্য একটি কেসকে সার্থক করে তুলতেন তাঁর সুন্দর বাচনভঙ্গী ও সুললিত বক্তৃতার ছন্দে। দায়েরা বা সেসন কেসে তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ। জেরার কাজে একালের একজন খ্যাতিমান আইনজীবী হয়ে ওঠেন। অপর পক্ষে কিরণ ঘোষ মহাশয় ছিলেন আইনের পোকা। শোনা যায়, তিনি নাকি বিচারককে বলতেন জামিন হবে না জেনেও তিনি মক্কেলের হয়ে আবেদন করছেন তাদেরই অনুরোধেই।

সুব্রত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—সুধাংশু-পুত্র সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু আজ হাওড়া বারেই নয় উত্তরবঙ্গ ও কলকাতা হাইকোর্টেও একজন সুপরিচিত আইনজীবী। তিনি পরপর তিনবার পশ্চিমবঙ্গ আইনজীবী সমিতির সভাপতি পদে আসীন ছিলেন। একদা তিনি হাওড়ার জি-পিও ছিলেন। বর্তমানে তিনি পঃ বঃ আইন-জীবী কল্যাণ তহবিলের সরকারী প্রতিনিধি সদস্য। হাওড়া বারের সভাপতি ছিলেন। পিতার ন্যায় তিনিও একজন বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদি। তাই হয়তো তিনি হাওড়া জেলা স্পোর্টস এসোসিয়েশন, এরিয়ান ক্লাব, হাওড়া ইউনিয়ন ক্লাব, এমনকি মোহনবাগান ক্লাবেরও লীগ্যাল কমিটির সদস্য আছেন। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের হয়ে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন যেখানে জ্যোতির্ময়ী নাগ (পরে বিচারপতি হন) তাঁর জুনিয়ার ছিলেন। আনন্দের কথা উড়িষ্যার বিচারপতি সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় একদা তাঁর জুনিয়ার ছিলেন। হাওড়া কোর্টের অধিকাংশ আইনজীবী তাঁর জুনিয়ার ছিলেন। আইনজীবী ছাড়াও তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতা উল্লেখের দাবি রাখে।

হাওড়ার বিচারক ও বিশিষ্ট আইনজীবীদের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হল—যা এতাবৎ কোথাও উল্লেখ নেই। কিছু ত্রুটি থেকে যেতেই পারে—সংশোধনও সংযোজনের ভার রইল ভবিষ্যৎ লেখক ও গবেষকদের ওপর।

———